সৈয়দ আনোয়ার হোসেন • মুনতাসীর মামুন
সম্পাদিত

বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মুনতাসীর মামুন
সম্পাদিত

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩
মে ১৯৮৬

প্রকাশক
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

মুদ্রাকর
কাজী মুকুল
ডানা প্রিন্টার্স
গ—১৬, মহাখালী বা/এ, ঢাকা—১২

প্রচ্ছদ
কাজী হাসান হাবিব

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা

Armed Resistance Movement in Bangladesh. Edited by Syed Anwar Husain and Muntassir Mamoon. Published by the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. First Edition, May 1986. Price : Tk, One Hundred and Fifty only.

উৎসর্গ

বাংলাদেশের বিভিন্ন গণ আন্দোলনে
শহীদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন

নিবেদন

অভিন্ন বাংলা, বহুদিন বিদেশী শাসনের অধীনে ছিল। এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ছিল বিদেশীদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আর বাঙালী, বিদেশী অনুপ্রবেশকে প্রয়োজনীয় শক্তি নিয়ে রুখতে পারেনি বা তা সম্ভব হয়নি এ সমাজের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, বিদেশী শাসন প্রসারের পথে অন্তরায় হয়েছিল অসংখ্য ছোট বড় প্রতিরোধ। এ প্রতিরোধ শুধু বিদেশী প্রভুর বিরুদ্ধেই ছিল না, প্রতিরোধ ছিল স্থানীয় শোষণ নির্যাতন মূলক সমাজ ব্যবস্থার শিখন্ডীদের বিরুদ্ধেও। প্রকৃতি বিচারে এ দু'ধরনের প্রতি-রোধ আন্দোলন বাংলার ইতিহাসের ঐতিহ্য। আজকের বাংলাদেশ, যে ভৌগোলিক এলাকার পরিচয় বহন করছে, সে এলাকায় এমনি প্রতিরোধ আন্দোলন সমূহের একটি সুশৃংখল ইতিহাসের অভাববোধ থেকেই বাংলা-দেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল (১৯৮৪-৮৫) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এ বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকল্পের জন্য। তবে ঠিক করা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলা-দেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত সময় সীমায় সংঘটিত প্রধান সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

কাউন্সিল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে, বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ ও পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের কাছ থেকে প্রবন্ধ আহবান করা হয়েছিল। কাউন্সিলের আরো সিদ্ধান্ত ছিল প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি নিয়ে সুবিধামত সময়ে কর্মশালার আয়োজন করা। উদ্দেশ্য, প্রবন্ধকারের সিদ্ধান্তের যতদূর সম্ভব বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের ৩ জানুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটির ভেত্রিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন—প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবির, ডঃ কামাল সিদ্দিকী ও অধ্যাপক রতনলাল চক্রবর্তী। উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে চুলচেরা তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। বাকী প্রবন্ধগুলি নিয়েও এ ধরনের কর্মশালা করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু নানা

প্রতিকূলতার কারণে তা আর সম্ভব হয়নি।

প্রবন্ধ আহ্বানের সময়, প্রবন্ধকারদের ওপর কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা তাত্ত্বিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে দেয়া হয়নি। আর সে কারণেই প্রবন্ধগুলোতে বক্তব্যের প্রকৃতি ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের রীতি ভিন্নতা লক্ষণীয়। অবশ্য এতে আমাদের মৌল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়নি। আমরা চেয়েছিলাম, প্রতিটি প্রতিরোধ আন্দোলনের পটভূমি, সংগঠন, নেতৃত্ব, সমাজ ভিত্তি, সশস্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ব্যর্থতা/সফলতা ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করতে। এবং প্রবন্ধকাররাও তাঁদের প্রবন্ধে কমবেশী এ বক্তব্যগুলো তুলে ধরেছেন।

বর্তমান সংকলনে প্রবন্ধের সংখ্যা পনেরটি। প্রথম প্রবন্ধটি সিরাজুল ইসলামের। তিনি আলোচনা করেছেন, আঠারো উনিশ শতকে কৃষক বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঘনঘন বিদ্রোহের কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, মুঘল আমলে ছিল সুসংগঠিত আমলাতন্ত্র, আপৎকালীন সময়ে কৃষককে রক্ষার জন্য বিভিন্ন বন্দোবস্ত। কোম্পানী আমলে লুপ্ত করা হয়েছিল সে ব্যবস্থা, ফলে 'কৃষকের জন্য সরকার এক অদৃশ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।' গ্রাম প্রশাসনিক ভাবে হয়েছিল পরিত্যক্ত, আপৎকালীন ব্যবস্থা সম্পর্কেও সরকার ছিল উদাসীন। এবং সে কারণে ঐ সময় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ঘনঘন।

সিরাজুল ইসলামের মতে, কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে সাধারণত দু'ধরনের তর্ক আছে। আঠারো-উনিশ শতকের বিদ্রোহগুলি ছিল প্রাক রাজনৈতিক, 'কেননা এগুলি ছিল মূলতঃ ধর্মীয়, অপরিকল্পিত, অসংগঠিত, লক্ষ্যবিহীন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববিহীন এবং স্বতস্ফূর্ত।' অনেকে আবার মনে করেন এগুলি ছিল রাজনৈতিক, কেননা এগুলির ছিল পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।'

ঐ আমলের বিদ্রোহ-সমূহের প্রধান কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন— 'রায়তের নিরাপত্তার বিধায়ক পরগণা নিরিখ ও দস্তুর নামক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির পতন' ঘটেছিল কোম্পানীর শাসনের পর। উদাহরণ হিসেবে তিনি সন্দ্বীপ বিদ্রোহ (১৭৬৪), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), বাকেরগঞ্জ বিদ্রোহ (১৭৯২)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কৃষক বিদ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরগণা নিরিখ ও দস্তুর পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

উপজাতীয় বিদ্রোহগুলির লক্ষ্য ছিল, 'ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করা এবং উপজাতি সমূহের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বজায় রাখা।' আবার ফকির সন্যাসী বিদ্রোহ, সিলেট বিদ্রোহ (১৭৮২, ১৭৯৯), কুমিল্লার ফিরিঙ্গী খেদা বিদ্রোহ (১৭৮৭) প্রভৃতি প্রথমে ধর্মীয় কারণে শুরু হলেও পরে রূপান্তরিত হয়েছিল ব্যাপক বিদ্রোহে।

সিরাজুল ইসলাম তারপর আলোচনা করেছেন, এগুলির সংগঠন ও নেতৃত্ব নিয়ে—মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর আধিপত্য ছিল যেখানে, সেখানেই উনিশ শতকে বিদ্রোহ হয়েছিল বেশী, এবং রায়তরা বিদ্রোহ করলেও নেতৃত্ব ছিল মধ্যস্বত্ব ভোগীদের হাতে। চেতনার প্রশ্নে তিনি তত্ত্বগত আলোচনায় রণজিৎগুহের তত্ত্ব আংশিক মেনেছেন এবং লিখেছেন 'বিদ্রোহে অংশগ্রহণ-কারীরা অবশ্যই রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ছিল, শ্রেণীগত ভাবে নয়।'

এই প্রবন্ধটি সিরাজুল ইসলাম উপস্থাপন করেছিলেন কর্মশালায় এবং এর তাত্ত্বিক কাঠামো নিয়ে প্রবল বিতর্কও হয়েছিল। আলোচনাকারীদের অনেক প্রশ্ন লেখকের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়নি। আলোচকদের মধ্যে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের আলোচনাটি ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রফেসর ইসলামের তাত্ত্বিক ফ্রেমের ব্যাপারে যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা আমরা মনে করি বিবেচনার দাবী রাখে। এ জন্য, পরিশিষ্টে প্রফেসর জাহাঙ্গীরের আলোচনাটি মুদ্রিত হল।

রতনলাল চক্রবর্তী লিখেছেন দু'টি প্রবন্ধ, 'ফকীর সন্যাসী বিদ্রোহ' (১৭৬৩—১৮০০) ও 'রংপুর কৃষক বিদ্রোহ' (১৭৮৩)। রতনলাল দীর্ঘদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন রেকর্ডরুমে কাজ করেছেন। ফলে তাঁর প্রবন্ধ দু'টিতে অনেক নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

রতনলালের মতে ফকীর সন্যাসী বিদ্রোহকে নিছক 'ডাকাতি' অথবা 'জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পর্যালোচনা করা হয়েছে নয় মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।' তাঁর মতে এর কোনটিই ঠিক নয়। এ বিদ্রোহ শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম নয়। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হিসেবেই এ বিদ্রোহ নিজেস্ব গুরুত্ব বহন করে।

তাঁর মতে, ফকীররা ছিল মাদারীয়া সম্প্রদায়ের 'বুরহানা' আর সন্যাসীরা ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু যোগী। তাঁদের মধ্যে ছিল ভ্রাতৃত্ব বোধ যা তাদের ঐক্য প্রচেষ্টায় করেছিল সহায়তা। তারা ছিল স্থানীয় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার যে বলেছেন তারা বহিরাগত, তা ঠিক নয়। ফকীরদের অধিকাংশের ছিল লাখেরাজ সম্পত্তি ও সন্যাসীদের মহাজনী ব্যবসা, ধর্মীয় আখড়া রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। রতনলালের মতে, ফকীর সন্যাসী বিদ্রোহ ছিল 'বাংলায় কেম্পানী কর্তৃপক্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া।'

রংপুরের বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, রংপুরে কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থা ব্যর্থতার সাথে রয়েছে বিদ্রোহের যোগসূত্র। সরকারী নথিপত্র অনুসারে জমিদারী পরিচালনায় অব্যবস্থা এবং বহিস্কৃত ও হতাশাগ্রস্থ জমিদারদের প্ররোচনায় ১৭৮১ সালে কৃষকদের অনেকে ব্যর্থ হয় বর্ধিত

হারে রাজস্ব প্রদানে। অসন্তোষের আরেকটি কারণ ছিল, প্রচলিত মুদ্রার বণ্টনে ওজন ঘাটতি। কারণ, এ জন্য জমিদার ও কৃষক উভয়েই হয়েছিল ক্ষতিগ্রস্থ। এ ছাড়া ছিল অবৈধ আদায়। তা ছাড়া রাজস্ব ও অন্যান্য দাবী আদায়ের জন্য কৃষকদের ওপর অবর্ণনীয় অমানবিক অত্যাচারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। বিদ্রোহের নেতাগণ ছিলেন 'বসানিয়া' বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

ভেলান ফন স্ক্রেন্ডেলের মূল প্রবন্ধটি ছিল ইংরেজীতে, প্রকাশিত হয়েছিল আমস্টার্ডাম থেকে। এ সংকলনের জন্য প্রবন্ধটি সংকলিত করতে তিনি অনুমতি দিয়েছেন। মূল প্রবন্ধটি খানিকটা সংক্ষেপ করে অনুবাদ করে দিয়েছেন সিরাজুল ইসলাম—'ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ-পূর্ব ভারতে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া ও কৃষক প্রতিরোধ (১৮২৪-১৮৩৩)' নামে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে ময়মনসিংহ বিদ্রোহকে সংযুক্ত করে স্ক্রেন্ডাল বলতে চান যে, 'প্রাথমিক ঔপনিবেশিক যুগের কৃষক বিদ্রোহ-গুলিকে পরবর্তী যুগের নিরিখে বিচার না করে সমকালীন পরিস্থিতির নিরিখে বিচার করলে বিদ্রোহের প্রকৃত রূপ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বিদ্রোহী এলাকাটির রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল বৃহত্তর রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি অথবা আঞ্চলিক স্বাধীনতা। অষ্টাদশ দশকের শেষভাগে উত্তর ময়মনসিংহে অনেক পরস্পর বিরোধী শক্তি ছিল, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল যাদের মধ্যে একটি। কৃষি উৎপাদনের ওপর দাবী ছিল কৃষক, জমিদার, রাষ্ট্র ও আমলাদের। সব কিছু মিলে ছিল এক অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা।

প্রধানতঃ জমিদারদের রায়তদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত করের চাপ ও বেগার খাটানোর ফলে কৃষক জমিদার সম্পর্কের ঘটেছিল অবনতি। যেমন, সুসং পরগণায়. প্রথমদিকে কৃষক প্রতিরোধের লক্ষ্য ছিল বেগার প্রথার বিলুপ্তি। আশু কারণ ছিল ১৮২৪ সালে ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধ। কারণ এ যুদ্ধের জন্য জামালপুর থেকে সুসং পর্যন্ত সরবরাহ পথ তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জমিদারদের তারা আবার যা চাপিয়েছিল কৃষকদের ওপর। কৃষকরা এখন এ কারণে বাড়তি কর ও বেগার খাটতে আপত্তি জানালে সরকার তাদের নেতা টিপুকে বন্দী করে।

পাগলদের মূল বক্তব্য ছিল—মানুষে মানুষে ভেদ নেই, নেই উচ্চ-নীচ। টিপুশাহ ছিলেন করম শাহ্‌র পুত্র যিনি গদি পেয়েছিলেন ১৮১৩ সালে। এ বিদ্রোহে শুধু পাগল সম্প্রদায়ই ছিল না, অন্যেরাও ছিল। তবে, তাৎক্ষণিক ভাবে কৃষক সমাজে সংগ্রামী সংগঠনের অভাবে পাগলদের সংগঠন বিদ্রোহের প্রাথমিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল। লেখকের মতে, বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল, উদ্বৃত্তের ওপর শোষণ হ্রাস করা, বিলুপ্তি

নয়। নিষ্ঠুর শোষক প্রভুর বদলে চেয়েছিল তারা সনাতন ভূস্বামী।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আধুনিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া ও কৃষক বিদ্রোহের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে, 'ইউরোপের মত বাংলায় আধুনিক রাষ্ট্র গঠন কৃষক শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি।' তিনি আরো বলেছেন, 'রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে অপরিকল্পিত কৃষক প্রতিরোধ আজও চলছে। অবশ্য ইদানীং কালের কৃষক আন্দোলনে দেখা যায় যে কৃষক অকৃষক মৈত্রী ভাবে ভাটা দেখা দিচ্ছে। এ সকল সমস্যা কৃষক বিদ্রোহগুলোকে নূতনভাবে পরীক্ষা করে দেখার তাগিদ দিচ্ছে। এ তাগিদ আসছে রাষ্ট্র গঠনে নিরত প্রক্রিয়া থেকেই।'

ফরায়েযী আন্দোলনের ওপর মঈনুদ্দীন আহামদ খানের গবেষণা সুপরিচিত। সংক্ষিপ্ত আকারে বর্তমান সংকলনের জন্য তিনি রচনা করেছেন 'ফরায়েযী ও ওয়াহাবী আন্দোলন' (১৮৩১)। প্রথমে তিনি ইংরেজ শাসনের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করেছেন। ফারায়েযী আন্দোলন প্রকারান্তরে ওয়াহাবী আন্দোলনেরই একটি শাখা। এখানে ওয়াহাবী আন্দোলন বলতে ভারতীয় 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলনকেই বুঝিয়েছেন। এর পর্যায় ছিল তিনটি—

১. ১৮২১ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদের কলকাতা আগমন ও বাঙালী মুসলমানদের তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে প্রবল আগ্রহ।

২. ১৮২৭ সালে তিতুমীরের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের শুরু, যা শেষে রূপ পরিগ্রহ করেছিল সশস্ত্র সংগ্রামের।

৩. ১৮৩২ সালে পাটনায় মৌলবী এনায়েত আলীর নেতৃত্বে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কিয়দংশ তরীকায়ে মুহাম্মদীয়ার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে যা পরে রূপ নিয়েছিল 'আহলে হাদীছ' আন্দোলনে।

ফরায়েযী আন্দোলন ছিল প্রাথমিক ভাবে ধর্মীয় আন্দোলন। হয়েছিল পূর্ববঙ্গ ও আসামে বিশেষ করে ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা ও কুমিল্লায় এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ।

তুষখালীর বিদ্রোহ নিয়ে দীর্ঘ তথ্যমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধটি লিখেছেন বিনয় ভূষণ চৌধুরী। এ বিদ্রোহের ওপর বিস্তৃত এ ধরনের আলোচনা খুব সম্ভব এই প্রথম। তুষখালীর বিদ্রোহের ছিল দুটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়, টাকীর রায় চৌধুরীর জমিদার প্রিয়নাথ রায়ের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় পর্যায় খাজনার নতুন নিরিখ চালু করার জন্য মোরেলের প্রয়াস ব্যর্থ করা।

মূল আলোচনা শুরু করার আগে, লেখক, বিদ্রোহীদের চেতনার বিভিন্ন

রূপের বিশ্লেষণ নিয়ে যে বিতর্ক তার ওপর আলোকপাত করেছেন। এ ক্ষেত্রে 'যে বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কৃষক হিসেবে বিদ্রোহীদের চেতনা বিকশিত হয়েছে তার জটিলতা বিশ্লেষণ।' এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন তুষখালীর কৃষি অর্থনীতি ও শ্রেণী সম্পর্কের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আন্দোলনের গতি প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। নতুন আবাদের সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করেছিল সেখানকার শ্রেণী সম্পর্ক।

প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্রোহ ছিল জোরালো। তবে, প্রথম থেকে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার সময়টুকুতে বিকশিত হয়েছিল সম্পন্ন এক কৃষক শ্রেণী। এবং নিজেদের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত করেছিল তারা বিদ্রোহের মূল ধারাকে। জমিদার বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত ছিল কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধিতা ক্রমেই হয়ে এসেছিল নিস্তেজ।

মফিজুল্লাহ কবীরের প্রবন্ধের নাম 'নীলবিদ্রোহ'। এ প্রবন্ধে তিনি নীলচাষ, অসন্তোষ, বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহের সমাপ্তি সম্পর্কে ধারাবাহিক তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধে তিনি, নীল বিদ্রোহের ইতিহাস লেখার উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রচলিত উপাদান ছাড়া তাঁর মতে, স্থানীয় কিংবদন্তী উপাখ্যান, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে নীলের অভিশাপ ও যাতনা-বঞ্চনার মর্মবেদনা অনুভব করা যেতে পারে।

নীল বিদ্রোহের পটভূমি হিসেবে তিনি দু'টি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন—মুসলমানদের মধ্যে রক্ষণশীল ওহাবী ও ফরায়েযী আন্দোলন ও হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাবজনিত রাজনৈতিক সচেনতা। প্রথমটি ছিল গ্রামভিত্তিক। দ্বিতীয়টি কলকাতা কেন্দ্রিক। এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে রায়তদের সংগ্রাম ছিল হিন্দু মুসলমানদের সম্মিলিত সংগ্রাম।

'পাবনা বিদ্রোহের স্বরূপ' লিখেছেন চিত্তব্রত পালিত। পাবনা কৃষক বিদ্রোহ সহজ শ্রেণী সংগ্রামের বদলে এক জটিল সামাজিক আলোড়নের আকার ধারণ করেছিল। এই আন্দোলনে দুতৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান চাষী। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলো জোতদার, মোড়ল, প্রামাণিক, ব্যবসায়ী, সম্পন্ন চাষী, উকিল, ক্ষুদ্রচাষী সব।

পাবনা বিদ্রোহের স্বরূপ নিয়ে বিতর্ক আছে। কল্যাণ সেনগুপ্ত যিনি এ বিদ্রোহের ওপর আলাদা একটি বই লিখেছেন, তাঁর মতে, সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের বলে প্রজাস্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। অন্য-দিকে বিনয় ভূষণ চৌধুরী গুরুত্ব আরোপ করেছেন জমিদারী নিপীড়ন ও বাড়তি খাজনা আদায়ের চেষ্টাকে। এ সমস্ত বিশ্লেষণ করে লিখেছেন

চিত্তব্রত পালিত 'বিদ্রোহের মূল সূত্র ১৮৭২ এর আইনে আবওয়াব নিষিদ্ধ হলে জমিদারের চলতি খাজনার সঙ্গে ঐ চাল্ আবওয়াব জুড়ে নতুন খাজনা আদায়ের চেষ্টা এবং সেই কবুলিয়ত মানলে দখলী প্রজার প্রজাস্বত্ব নষ্ট হবার সম্ভাবনা। জোতদার এবং অন্যান্য দখলী বিত্তশালী প্রজা এই নতুন খাজনা দিতে নারাজ তাই নিয়ে আদালতের মামলা, খোলা মাঠের লড়াই।'

একটি তাত্ত্বিক ফ্রেমের কাঠামোয় মুনতাসীর মামুন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আলোচনার চেষ্টা করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন ফাননের তত্ত্বের ওপর। তাত্ত্বিক ফ্রেমের আলোকে তিনি সন্ত্রাসবাদের পটভূমি, শ্রেণী, সম্প্রদায় ও স্তর বিশ্লেষণ, সংগঠন, আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা এবং সবশেষে সন্ত্রাসবাদের স্বরূপ ও সমসাময়িক অন্যান্য রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এ সংকলনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, শুধু বাংলাদেশের নয়, উপমহাদেশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তিনজন বিপ্লবীর রচনা। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে এই আশায় রচনা তিনটি এখানে সংকলিত হলো।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার (১৯০৯—১৯৭১) যৌবনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ছাত্র ছিলেন প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৯৩০ সালে। মুক্তি পেয়েছিলেন দশবছর পর। তারপর যুক্ত হয়েছিলেন বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে সরকার তাঁকে তিনবার গ্রেফতার করে মোট ষোলবছর আটকে রেখেছিল (১৯৪৮-৫৬; ১৯৫৮-১৯৬২; ১৯৬৯); কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় ১৯৫৪ সালে তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৬৭ সালে তাঁর লেখা বই 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রামের প্রকাশনা সংস্থা 'বইঘর' থেকে। এ গ্রন্থে ১৯৩০ সালে সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তথ্যবহুল ও অনেক দুস্প্রাপ্য দলিল সংযোজিত গ্রন্থটি এখন দুস্প্রাপ্য। এ সংকলনে আমরা তাঁর সেই গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ সংকলিত করেছি সংকলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য।

অজয় ভট্টাচার্য আজীবন জড়িত বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে। কমিউনিষ্ট পার্টি'র সদস্য হিসেবে সিলেটের নানকার বিদ্রোহে'র একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন তিনি। 'নানকার বিদ্রোহ' এর ওপর দু'খন্ডে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। বর্তমান রচনাটি তিনি আমাদের বিশেষ অনুরোধে

লিখে দিয়েছেন।

সিলেটে খাই খোরাকীর বিনিময়ে জনমজুর খাটাবার ব্যবস্থাটাই ছিল নানকার ব্যবস্থা, নানকাররা ছিল প্রায় ক্রীতদাস। ১৯৪৭ সালে সিলেটে এর সংখ্যা ছিল প্রায় চার লাখ, মোট জন সংখ্যার এক দশমাংশ।

নানকাররা প্রথম বিদ্রোহ করেছিল ১৯২২ সালে। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে নানকাররা আন্দোলন করেছে এবং পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৫০ সালে এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছিল। অজয় ভট্টাচার্য, নানকার বিদ্রোহের পটভূমি এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত আন্দোলনের ধারাবাহিক একটি বর্ণনা দিয়েছেন।

টংক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মণি সিংহ পরিণত হয়েছেন কিংবদন্তীর নায়কে। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী 'জীবন সংগ্রাম'-এ (ঢাকা, ১৯৮৫) এআন্দোলন সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত ভাবে লিখেছেন। 'টংক আন্দোলন' আমাদের বিশেষ অনুরোধে বর্তমান সংকলনের জন্য তিনি লিখে দিয়েছেন।

১৯৩৭—৪৯ সালে ময়মনসিংহের গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশে চলেছিল টংক আন্দোলন। এ প্রথায় জমিতে ফসল না হলেও কৃষকেরা জমিদারকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকতো। এই প্রথার বিরুদ্ধে এবং টাকায় খাজনা দেয়ার দাবীতে হয়েছিল টংক আন্দোলন। আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন মণি সিংহ।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, আন্দোলনের ধারা হবে অহিংস আইন সঙ্গত। কিন্তু পরবর্তীকালে তা সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে রূপ নিয়েছিল।

মণিসিংহ নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে টংক আন্দোলনের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। লিখেছেন তিনি, 'আন্দোলনের কৌশলে মারাত্মক ভুল হলেও কমরেডদের বীরত্ব, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাংগঠণিক দক্ষতা, সৃজনী প্রতিভা ও রাজনৈতিক চেতনা চিরদিন অবিনশ্বর থাকবে।' এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিল টংক প্রথা বিলুপ্ত করতে।

তেভাগা আন্দোলন যে সব অঞ্চলে হয়েছিল তার একটি অঞ্চলে কামাল সিদ্দিকী ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘদিন জরীপ চালিয়েছেন। এই জরীপের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য নথিপত্রের সাহায্য কামাল সিদ্দিকী মূল লেখাটি তৈরী করেছিলেন ইংরেজীতে। ঐ আন্দোলনের এবং পরবর্তীকালের আরো কিছু আন্দোলনের আলোকে কামাল সিদ্দিকীর সিদ্ধান্ত, 'বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে ১৯৬৯ সালের মতো জঙ্গী গণ আন্দোলন, তেভাগার মতো আন্তরিকতাহীন সংগ্রাম

বা খতমের নকশালবাড়ী পন্থা নয়।' শুধু তাই নয়, 'শেষ বিশ্লেষণ সংগঠিত কৃষক প্রতিরোধকে শুধুমাত্র অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও আদর্শগত বাস্তবতা (যথা, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রেণীভিত্তিক সহযোগিতা, রাষ্ট্র, বর্ণ, ধর্ম, প্রকৃতির শক্তি ও ইত্যাদি) বিবেচনা করলেই চলবে না, তার সাথে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলিও গণ্য করতে হবে।'

'নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ'—এ, মেসবাহ কামাল ১৯৪৯-৫০ সালের নাচোল কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে তথ্য বহুল আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এ বিদ্রোহের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তিনি তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন, স্থানীয় প্রশাসনিক নথিপত্র দেখেছেন। এবং নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখিত পূর্বেকার প্রবন্ধগুলি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিলেন সাঁওতাল কৃষকরা এবং মূল সংগঠক ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টি। এ বিদ্রোহে ইলামিত্রের সাহসী ভূমিকা তাঁকে রেখেছে অমর করে। এটা ঠিক যে এ বিদ্রোহের ফলে কৃষকদের মূল দাবীসমূহ পূর্ণ হয় নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 'বাংলার নিম্নবর্গের কৃষক নিজ অবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে সংগ্রাম ও আন্দোলনে উচ্চকিত হয়েছেন তারই ধারাবাহিকতায় নাচোল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।' একটি প্রেরণাদায়ক উদাহরণ।

শেষ প্রবন্ধটির বক্তব্য একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিশ্লেষণের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো। এতে বলা হয়েছে, মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহে আভঘাত সৃষ্টির কারণে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতো প্রচন্ড একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে। অপরদিকে, প্রান্তিক বা অপেক্ষাকৃত গৌণ সাংস্কৃতিক উপাদানে অভিঘাতের কারণে একাত্তর-পূর্ব আন্দোলনগুলোর জন্ম হয়েছিল।

ব্যাপক কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ হলেও তা ক্রমান্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আকার ও রূপ ধারণ করে। অবশ্য একটি সশস্ত্র সংঘর্ষের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিশেষ ছাত্র সংগঠন ও বামপন্থী দলগুলো অনেক আগে থেকেই সচেতন ছিল। কিন্তু ঠিক ২৫ মার্চ-এ কেউই প্রস্তুত ছিলনা। সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধের দুটি প্রধান পর্যায় নির্দেশিত হয়েছে— মধ্যে-এপ্রিল পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের ব্যর্থতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত সুসংগঠিত প্রতিরোধের সাফল্য। চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতের অংশ গ্রহণ মুক্তিযুদ্ধকে একটি কৃত্রিম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এ গ্রন্থে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি আলোচিত হলো, তার

বাইরেও আছে অসংখ্য সশস্ত্র প্রতিরোধের ইতিহাস। কিন্তু আমরা শুধু-মাত্র নির্বাচিত কয়েকটি আন্দোলনের ওপরই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি। এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচিত আন্দোলনগুলির অধিকাংশের সঙ্গেই কৃষকরা ছিলেন যুক্ত। এবং তাই স্বাভাবিক। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই যুক্ত কৃষির সঙ্গে।

আগেই উল্লেখ করেছি এ বই বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংকলিত হয়নি; বিশেষ কোন তাত্ত্বিক কাঠামোও এতে অনুপস্থিত। আমরা শুধু, আমাদের দেশের জানা অজানা কিছু সশস্ত্র প্রতিরোধের সঙ্গে পাঠক/গবেষকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছি। আমরা দেখাতে চেয়েছি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ (যেখানে এই প্রথম বারের মতো প্রতিটি শ্রেণী একত্রিত হয়েছিল) এই সব সশস্ত্র প্রতিরোধের ধারাবাহিকতারই পরিণতি। ভবিষ্যতের গবেষক/পাঠকরা যদি এ গ্রন্থ পড়ে সামান্যও উপকৃত হন তা' হলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে প্রবন্ধকারদের নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মত; তার সঙ্গে সম্পাদকীয় বা এশিয়াটিক সোসাইটির মত বা দৃষ্টিভঙ্গীর কোন সম্পর্ক নেই। অনেক চেষ্টা করেও মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানো গেল না। এ জন্য আমরা দুঃখিত।

এ সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে শুরু করে প্রকাশ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আগ্রহ দেখিয়ে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক (১৯৮৪--৮৫)। এ ছাড়া লেখক-বৃন্দ, আমাদের বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জনাব ময়েজউদ্দীন খান শব্দ-সূচী প্রণয়নের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। তবে আমরা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৮৪—৮৫) ও কাউন্সিল সদস্য অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (বর্তমান সাধারণ সম্পাদক)-এর নাম। এঁরা সবাই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ঢাকা
মে, ১৯৮৬ ইং

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মুনতাসীর মামুন

সিরাজুল ইসলাম

আঠারো-উনিশ শতকে কৃষক বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র

ভূমির ব্যবহার নিয়ে প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে কৃষকশ্রেণী ও সরকারের মধ্যে কখনও বিরোধ বাধেনি ; বিরোধ বেধেছে উৎপাদনের ভাগাভাগি নিয়ে। কৃষি উৎপাদনের উপর সরকারের দাবী সার্বভৌমত্বের, আর কৃষকের দাবী শ্রমের। উৎপাদনের কে কতটুকু পাবে এবং কিভাবে পাবে—এ নিয়েই ছিল দ্বন্দ্ব। একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হ'তে ব্যর্থ হওয়া মানে ছিল দাবী আদায়ে সার্বভৌম সরকারের শক্তি প্রয়োগ আর প্রায়শঃ কৃষক কর্তৃক সে শক্তির প্রতিরোধ। রাজা যেন রাজস্ব অভাবে সমস্যায় না পড়েন, অপরপক্ষে কৃষককুলও যেন করপিষ্ট হয়ে পলায়ন বা বিদ্রোহ না করে সে জন্য মনুর বিধান ছিল ভূমির উৎপাদিকাশক্তি সাপেক্ষে রাজা যেন তাঁর 'ভাগকর' মোট উৎপাদনের এক ষষ্ঠাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।[১] কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাত্তর, করপতি, সামন্ত, উপসামন্ত প্রভৃতি মধ্যস্থিত শ্রেণীর উপরি আদায়ের চাপে অতিষ্ট হয়ে কৃষকরা যে অনেক সময় বিদ্রোহ করেছে এর প্রাচীনতম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উত্তর বঙ্গের কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ।[২]

মুঘল সরকারের নীতি ছিল উপরি আদায়কারী মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কৃষকশ্রেণীর সংগে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা এবং এমনভাবে রাজস্ব ধার্যকরা যেন কৃষকের খোরাকী ব্যতিরেকে বাকী সব উদ্বৃত্ত সরকারী জমা[৩] আকারে উঠে আসে।[৪] এ নীতি কার্যকর করতে মুঘল সরকার প্রতিষ্ঠা করে এমন একটি সুসংগঠিত আমলাতন্ত্র যা প্রতিটি গ্রামের উৎপাদন পরিদর্শন ও পরিমাপনে ছিল সক্ষম। লক্ষণীয় যে, রায়তের সমস্ত উদ্বৃত্ত সরকারী রাজস্ব হিসেবে চুষে নেওয়া সত্ত্বেও মুঘল আমলে বাংলাদেশে বিশেষ কোন কৃষক বিদ্রোহ হয়নি।[৫] এর প্রধান কারণ, একদিকে রায়তের সমস্ত উদ্বৃত্ত কর হিসেবে সংগ্রহ করার জন্য সরকার যেমন ছিল বদ্ধপরিকর, অপর

দিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অজন্মা দুর্ভিক্ষ থেকে রায়তকে রক্ষা করার জন্যও কর্তৃপক্ষ ছিল তেমনি সচেষ্ট। কর মওকুফ, তাকাভী ঋণ, খাদ্য ও কৃষি সামগ্রী সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে আপৎগ্রস্থ রায়তদের উৎপাদনে পুনর্বহাল করার সরকারী তৎপরতা নিঃসন্দেহে বিদ্রোহের পরিবেশকে প্রশমিত করে। তা ছাড়া, মুঘল রাজস্ব নীতির ফলে সব কৃষকই আর্থিকভাবে ছিল এমন সমভাবে অবনত ও সামাজিকভাবে অভিন্ন এবং গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ছিল এত সুসংগঠিত ও সতর্ক যে, ঐ পরিবেশে কৃষকের পক্ষে বিদ্রোহ সংগঠন করা ছিল অতি অবাস্তব।

কিন্তু ঐ পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ঘটে ঔপনিবেশিক যুগে। ব্যবসায়ী কোম্পানীর সরকার সর্বাধিক মুনাফার লক্ষ্যে ব্যয়বহুল মুঘল আমলাতন্ত্র ও পরগনা ব্যবস্হা ভেংগে দিয়ে একজন ইউরোপীয় ও মুষ্ঠিমেয় নিম্নবেতনভোগী দেশী আমলার তত্ত্বাবধানে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে জেলা গঠন করে।[৭] ফলে কৃষকের জন্য সরকার একটি অদৃশ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের তাগিদে স্হানীয় জমিদারদের হাত থেকে সামরিক, পুলিশ, বিচার ও অন্যান্য প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে সাধারণ আইনের অধীনে একজন সাধারণ ভূস্বামীতে পরিণত করা হয়। কৃষকদের কার্যাবলীর উপর চোখ রাখার জন্যে এখন কোন সরকারী এজেন্সী গ্রাম পর্যায়ে অবর্তমান। এক কথায় প্রশাসনিকভাবে গ্রাম এখন পরিত্যক্ত। কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্ম-সাতের জন্য সরকার শশব্যস্ত থাকলেও খরা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সে সরকার ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বাভাবিক কারণেই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় অতি ঘন ঘন।

যদিও বাংলার কোন কোন স্হান ছিল বিশেষভাবে বিদ্রোহপ্রবণ, তবে মোটামুটিভাবে বিদ্রোহের ক্ষেত্র ছিল বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় ব্যাপ্ত। সব বিদ্রোহ-ই যে সমান গুরুত্বের তা বলা চলে না। কোন কোন বিদ্রোহ ছিল অতিশয় স্হানিক ও ক্ষণস্থায়ী, আবার কোন কোন বিদ্রোহ ছিল অতিশয় ব্যাপক, সুসংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী। আঠারো-ঊনিশ শতকে ছোট বড় মোট কতগুলি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, এর কোন সঠিক তালিকা এখনও প্রস্তুত হয়নি।[৮] এ পর্যন্ত জানা বিদ্রোহগুলি তারিখ অনুসারে বিন্যাস করলে দেখা যাবে যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিদ্রোহের পৌনঃপুন্য ছিল সবচেয়ে বেশী। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্রোহের প্রবণতা কমে আসে, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আবার বৃদ্ধি

পেয়ে সত্তরের দশকে গিয়ে তুঙ্গে উঠে। আশির দশক থেকে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে নব্বই-এর দশকে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

বিদ্রোহগুলির রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়। বিশ শতকের পূর্বে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে বিশারদদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। অনেকে অভিমত পোষণ করেন যে, আঠারো-ঊনিশ শতকের বিদ্রোহগুলি ছিল প্রাক্-রাজনৈতিক কেননা এগুলি ছিল মূলত ধর্মীয়, অপরিকল্পিত, অসংগঠিত, লক্ষ্য-বিহীন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববিহীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত।[৯] আবার অনেকে মনে করেন, বিদ্রোহগুলির অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক, কেননা তাঁদের মতে বিদ্রোহগুলির পশ্চাতে ছিল পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।[১০]

একই সমস্যা সম্পর্কে বিশারদদের মধ্যে মেরুমহী পার্থক্য থাকার কারণ মূলত মতাদর্শিক। একই তথ্যভান্ডার থেকে উপাদান-উপকরণ নিয়ে দুইজন তত্ত্ব তাড়িত লেখক দুই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। সব লেখকের একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছার আরেক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিদ্রোহের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, এবং সময়ের ব্যবধানে বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন। প্রত্যেকটি বিদ্রোহ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে এবং স্থানীয় পরিবেশ ঐতিহ্য প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বর্ণ ও চেতনা-স্তর থেকে। যেমন, সন্দ্বীপ বিদ্রোহ (১৭৬৪), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), ও চাকমা বিদ্রোহের (১৭৭৭-৮৭) লক্ষ্য, সংগঠন, নেতৃত্ব মোটেই সম বৈশিষ্ট্যের নয়। অন্যান্য বিদ্রোহের বেলায়ও অনেকটা একই কথা প্রযোজ্য। আবার ঔপনিবেশিক শাসনের প্রারম্ভিককালের বিদ্রোহের লক্ষ্য ও নেতৃত্বের সংগে ঊনিশশতকের শেষার্ধের বিদ্রোহের লক্ষ্য ও নেতৃত্বে খুব মিল নেই। এ পরিস্থিতিতে কৃষকবিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র যাচাই করার একটি গ্রহণযোগ্য পন্থা হতে পারে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান বিদ্রোহগুলি থেকে কতিপয় সাধারণ উপাদান বাছাই করা এবং সময়ের ব্যবধানে উপাদান-গুলির সম্ভাব্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা। এ পদ্ধতির ঐতিহাসিক মূল্য এই যে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের যোগসূত্র কতটুকু তা পরিমাপ করা সম্ভব হতে পারে। তখন কৃষক বিদ্রোহগুলি রাজনৈতিক না প্রাক্-রাজনৈতিক ছিল সে বিষয়েও আমাদের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হতে পারে। এবং তখন কৃষক বিদ্রোহ-গুলিকে একটি সুদৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তিতেও স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে।

বিদ্রোহগুলি ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বলতে বোঝানো হচ্ছে এর শ্বেতাঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকার, সামরিক ও পুলিশ

বাহিনী, আইন আদালত, জেলা প্রশাসন, জমিদার, জমিদারী আমলা, বানিয়া, মহাজন ও ইজারাদার শ্রেণী। এমনকি মধ্যস্বত্বশ্রেণী ও বিত্তশালী কৃষকও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্গত। সমগ্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নির্ভরশীল ভূমি রাজস্বের উপর। অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন ভাগাভাগিতে রয়েছে দুটি দল—একটি ঔপনিবেশিক সরকার ও এর অঙ্গসমূহ অপরটি কৃষক সমাজ। কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ প্রক্রিয়ায় সরকারের স্থানীয় প্রতিভূ হিসেবে কাজ করে জমিদার শ্রেণী। অতএব কৃষি উৎপাদনের ভাগাভাগি নিয়ে বিদ্রোহ দেখা দিলে জমিদারকেই এর মোকাবেলা করতে হতো। জমিদার ব্যর্থ হলে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতো পুলিশ। পুলিশ ব্যর্থ হলে আসতো সামরিক বাহিনী। কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বহু।. কৃষক বিদ্রোহ দমনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ কৃষকদের সাংগঠনিক শক্তির ইংগিত দেয়। এ শক্তির উৎস ও স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে আসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; যথা, কৃষক বিদ্রোহের উদ্দেশ্য, সংগঠন, নেতৃত্ব ও সচেতনতা।

উদ্দেশ্য

একটি বিশেষ বিদ্রোহের প্রসংগ তুলে কৃষক বিদ্রোহের উদ্দেশ্য আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। ১৭৬০ সালে কোম্পানী কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বভৌম কর্তৃত্ব লাভের পর থেকে কলকাতার বানিয়া গোকুল ঘোষালকে সন্দ্বীপের ওদাদার বা রাজস্ব ইজারাদার নিযুক্ত করা হয়। ওদাদার প্রতি বছর রাজস্ব হার বাড়িয়ে চলে এবং বর্ধিত রাজস্ব সংগ্রহ করবার জন্য নানা অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অবশেষে কৃষকশ্রেণী অতিষ্ঠ হয়ে আবু তোরাব চৌধুরী নামক স্থানীয় এক উৎখাত হয়ে যাওয়া জমিদারের নেতৃত্বে ১৭৬৪ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ এমন তীব্র আকার ধারন করে যে অবশেষে সেনাবাহিনী তলব করে বিদ্রোহ দমন করতে হয়।[১১] কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পরও অসহযোগ অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন চলতেই থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতির একটি নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের জন্য কলকাতা কর্তৃপক্ষ ১৭৭৯ সালে জোনাথান ডানকান নামক একজন কর্মচারীকে ডেপুটেশনে পাঠান। সরেজমিনে তদন্ত করে ডানকান সন্দ্বীপের অবস্থা সম্পর্কে দুই খন্ডে বিশাল একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সন্দ্বীপ বিদ্রোহের উদ্দেশ্য আলোচনা করতে গিয়ে ডানকান মন্তব্য করেন যে "কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর থেকে পরগণা নিরিখ ও দস্তুর উপেক্ষা করে প্রতি বছরই রাজস্ব হার

বৃদ্ধি করা হয়। পরগণা নিরিখ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বারবার আরজী পেশ করার পরেও সুফল লাভে ব্যর্থ হয়ে রায়তরা অবশেষে বাধ্য হয় বিদ্রোহ করতে। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন আবু তোরাব চৌধুরী যিনি কোম্পানী শাসনের ইত্যবসর আগে ছিলেন একজন সম্মানিত জমিদার"।[১২]

রায়ত-জমিদার সম্পর্কে পরগণা নিরিখ এবং পরগণা দস্তুর ছিল একটি সর্বসম্মত আঞ্চলিক শাসনতন্ত্র বিশেষ যে শাসনতন্ত্র জমিদার বা রায়ত কর্তৃক ছিল অলংঘনীয়। মুঘল সরকারের নীতি ছিল কোন মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর উপর নির্ভর না করে সরাসরি রায়তের সংগে রাজস্ব সম্পর্ক স্থাপন করা। রায়তের নিকট থেকে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহ করতো সরকার নিযুক্ত জমিদার।[১৩] সরকার প্রতিটি পরগণার উৎপাদিকা শক্তি জরিপ করে যে রাজস্ব হার ঠিক করতো সে হার ছিল ঐ পরগণার জন্য স্থায়ী দস্তুর। ঐ দস্তুর লংঘন করার অধিকার জমিদারের ছিল না। পরিবর্ত্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সময় সময় পরগণা দস্তুর সমন্বয় করতো বটে, কিন্তু সে সমন্বয় কার্য সম্পাদিত করতেও কতিপয় স্থানীয় রীতিনীতি অনুসরণ করতে হতো যাকে সরকারী ভাষায় বলা হতো পরগণা নিরিখ। দস্তুর ও নিরিখ ছিল রায়তের জন্য নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

রায়তের নিরাপত্তা বিধায়ক পরগণা নিরিখ ও দস্তুর নামক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির পতন ঘটে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার পর। দীউয়ানি লাভের পর থেকে নিরিখ ও দস্তুর উপেক্ষা করে প্রতি বছর সরকারী রাজস্ব দাবী বৃদ্ধি করা হয়। নিম্নের সারণীতে রাজস্ব বৃদ্ধির একটি নমুনা লক্ষ্য করা যায়।

সারণী-১

ঢাকা প্রদেশের সরকারী রাজস্ব দাবী, ১১৭৭—১১৮২ সন

সন সাল	সরকারী রাজস্ব
১১৭৭—১৭৭২	সিক্কা টাকা ২৬,২০,৫১৬
১১৭৮—১৭৭৩	২৮,৩৪,৬৫২
১১৭৯—১৭৭৪	৩০,৯৩,৫৩৪
১১৮০—১৭৭৫	৩২,৭৫,২৮২
১১৮১—১৭৭৬	৩২,৮২,৬৫২
১১৮২—১৭৭৭	৩২,৮৩,৭৪১

উৎস: Dacca Provincial Council to Council of Revenue, 13 july 1780, *Bengal Revenue Consultation*, 21 july1780, Range 50, vol 25, pp. 1126-27.

পরিণত হতো, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে তেমন নয়। ঔপনিবেশিক শাসন তখন সর্বস্তরে স্বীকৃত, কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের অঙ্গ জমিদার শ্রেণী কর্তৃক কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ প্রতিহত করতে রায়তেরা ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ যুগের প্রতিটি কৃষক বিদ্রোহ পরিচালিত হয় জমিদারদের যথেচ্ছাচার ও খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে।[২৫]

সংগঠন ও নেতৃত্ব

কৃষক বিদ্রোহের সংগঠন ও নেতৃত্ব সম্পর্কে তথ্য অতি সীমিত। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্রোহগুলি অনেকাংশে অত্যাকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব (Charismatic personality) নির্ভর হওয়ায় এবং প্রধান প্রধান বিদ্রোহগুলির বিচার বিভাগীয় দলিল ও প্রশাসনিক তদন্ত রিপোর্ট থাকায়, সেগুলির সংগঠন ও নেতৃত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা মোটামুটি সুস্পষ্ট। কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্রোহের উদ্দেশ্য যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে বিদ্রোহের সংগঠন-নেতৃত্বেও। প্রাথমিক পর্বে কোন বিদ্রোহই এর আদি সংগঠন ও নেতৃত্বে সীমিত থাকেনি। প্রতি বিদ্রোহেরই দানা বেঁধেছে স্থানীয়ভাবে, এবং বিদ্রোহের সূত্রপাতও হয়েছে স্থানীয়ভাবে। কিন্তু পরে ক্রমশঃ দাবানলের মত তা ছড়িয়ে পড়ে সারা অঞ্চলে।[২৬] বিদ্রোহ আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করলে এর সংগঠন-নেতৃত্বেও রূপান্তর ঘটে। পর্যায়ক্রমে বিদ্রোহের নেতৃত্ব চলে যায় ধর্মীয় নেতাদের হাতে। উপমা স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে শেরপুর পাগল বিদ্রোহের (১৮২৪-৩৩) কথা। নিরিখ ও দস্তুর উপেক্ষা করে জমিদার কর্তৃক অতিরিক্ত কর আরোপ ও বেগার শ্রমের বিরুদ্ধে শেরপুর পরগনার কৃষকেরা জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েৎ। অচিরেই বিদ্রোহে যোগ দেয় উপজাতীয় প্রজারাও। বিদ্রোহ দমনে পুলিশ ব্যর্থ হলে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রায়তেরা স্থানীয় খানকা ফকীর টিপু শাহ্‌র হস্তক্ষেপ কামনা করে। টিপু শাহ্ বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। ১৮২৪ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত টিপুর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক দফা লড়াই করে পরাজিত হয়।[২৭]

বিদ্রোহের নেতৃত্ব ধর্মীয় নেতাদের কাছে হস্তান্তরিত হবার একটি বাস্তব কারণ খানকা সংগঠন। খানকা সংগঠন ছিল প্রায় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অনুরূপ। খানকার প্রধানকে বলা হয় শাহ্ জাগতিক অর্থে রাজা। রাজার মাথায় যেমন রাজমুকুট, শাহের মাথায়ও তেমন তাজ

বা দস্তুর। রাজা বসেন রাজসভায়, শাহ্ বসেন দরবারে। রাজার রাজ্যের মতো শাহ্-এরও আছে বেলায়েত। রাজা প্রজার উপর কর বসান, শাহ্ তাঁর মুরিদানের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন মুঠঠী। রাজা সালতামামি পুনিয়া করেন শাহ্ করেন ওরস। রাজা বে-আইনী কর্মের জন্য দণ্ড দেন, শাহ্ দণ্ড দেন বেদাতের জন্য। রাজার প্রতি যেমন তার সৈন্যের অকুণ্ঠ আনুগত্য থাকে, তেমনি শাহ্ এর প্রতিও অন্ধ আনুগত্য থাকে তার মুরিদানের। রাজা রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন, শাহ জেহাদ করেন তার বেলায়েত রক্ষার জন্য। অর্থাৎ খানকার শাহ্ পীর-মুরিদ সম্পর্ককে সহজেই সেনাপতি-সৈন্য সম্পর্কে রূপান্তরিত করতে পারতেন। অতএব, স্থানীয় কৃষকবিদ্রোহ বিস্তারিত হয়ে জটিলরূপ ধারণ করলে রাষ্ট্রীয় শক্তির মোকাবিলায় খান্কার নেতৃত্ব গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধের কৃষক বিদ্রোহে খানকার ভূমিকা খুব গৌন বা শূন্য। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন যতই এগিয়ে চলে ততই খান্কা সংগঠন সহ অন্যান্য সনাতন প্রতিষ্ঠান অবক্ষয়ের মুখে পতিত হয় এবং নতুন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা, আইন–আদালত, প্রশাসন, প্রভৃতি ব্যবস্থায় সনাতন সংগঠন ও নেতৃত্ব টিকে থাকা অসংগতিপূর্ণ। ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবস্থার ফলে গ্রামীণ সমাজে স্তরভেদ সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র জমিদার-তালুকদার, মধ্যস্বত্ব ভোগী ও ধনী কৃষক সমন্বয়ে উদ্ভব হয় একটি শক্তিশালী ভূ-ভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[২৮]

ভূ-ভিত্তিক মধ্যবিত্তশ্রেণী বাংলার সব অঞ্চলে সমভাবে বিকাশ লাভ করেনি। পূর্ব বঙ্গ জেলা সমূহে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে মধ্যস্বত্বশ্রেণী আধিপত্য লাভ করে সবচেয়ে বেশী। বলা বাহুল্য যে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে যত কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, এর প্রায় সবগুলোর ক্ষেত্রস্থল মধ্যস্বত্ব অধ্যুষিত অঞ্চলে।[২৯] মধ্যস্বত্ব অধ্যুষিত এলাকায় জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষক ও মধ্যস্বত্বভোগীর মধ্যে মৈত্রী খুবই স্বাভাবিক। জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করলে এর প্রথম অভিঘাত পড়তো প্রথম ডিগ্রীর মধ্যস্বত্বাধিকারীর উপর যার সংগে ছিল জমিদারের সরাসরি সম্পর্ক। প্রথম ডিগ্রীর মধ্যস্বত্বাধিকারী জমিদারের বর্ধিত খাজনার ভার বইতে না চাইলে খাজনা বৃদ্ধির মাধ্যমে তা সরিয়ে দিত দ্বিতীয় ডিগ্রীর স্বত্বাধিকারীর উপর। এমনিভাবে জমিদারের বর্ধিত খাজনার চূড়ান্ত চাপ এসে পড়তো প্রকৃত চাষীর উপর। দেখা যাচ্ছে বর্ধিত খাজনা আদায় প্রক্রিয়ায় জমিদার ছাড়া ভুক্তভোগী ছিল নিম্নবর্তী সব স্বত্ব স্তর।

অতএব কর বৃদ্ধির প্রশ্নে জমিদারের বিরুদ্ধে মধ্যস্বত্বাধিকারী ও কৃষকের মধ্যে সংহতি স্থাপন খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষুদ্র জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী মধ্যস্বত্ব ছাড়া রায়তি স্বত্বেরও অধিকারী ছিল। অতএব জমিদার কর্তৃক করবৃদ্ধির ভার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মধ্যস্বত্বভোগীকে বহন করতে হতো। তাই দেখা যায় যে,এ পর্বের বিদ্রোহে নেতৃত্ব আসে মধ্যস্বত্বভোগী থেকে?[৩০] পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩) যদিও ছিল জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ রায়তশ্রেণীর বিদ্রোহ কিন্তু এর নেতৃত্ব দেয় মধ্যস্বত্বাধিকারী ও জোতদার শ্রেণী।[৩১] অনুরূপভাবে তুশখালী (বাকেরগঞ্জ) বিদ্রোহেরও (১৮৭১—৭২) নেতৃত্ব দেয় হাওলাদার (মধ্যস্বত্ব) শ্রেণী।[৩২]

উল্লেখ্য যে, ঢাকা, বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার বিদ্রোহী কৃষক ও মধ্যস্বত্বাধিকারীরা ছিল ফরায়জী মুসলমান আর জমিদার ছিল প্রায় সবাই হিন্দু। জমিদার কর্তৃক আরোপিত যে কোন আবওয়াব বা কর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করার জন্য এরা অঞ্চলে অঞ্চলে কৃষক জোট গঠন করে। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের ভাষায়ঃ '(Faraizi jotes) entirely ignore the authorities, whereas the word of their leaders is paramount. They have set at naught all the Orders as to licenses for carrying guns, but use them murderously in all affrays'.[৩৩] বিদ্রোহী কৃষকদের সংগঠন সম্পর্কে লেফটেনান্ট গভর্ণর রিচার্ড টেম্পলের উক্তি থেকে ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি মন্তব্য করেনঃ 'In parts of Eastern Bengal there seems to be a disposition among the raiyats to combine in something like Leagues and unions'.

রাজনৈতিক চেতনা

আঠারো-উনিশ শতকের বিদ্রোহকে কি রাজনৈতিক ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা যায়? অপর কথায়, বিদ্রোহী কৃষকরা কি রাজনৈতিক-ভাবে সচেতন ছিল? বিদ্রোহের উদ্দেশ্য, নেতৃত্ব ও সংগঠন আলোচনার পর এ প্রশ্ন উত্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার উপরও প্রশ্ন উঠতে পারে। ইদানীং দক্ষিণ এশিয়ার কৃষক গবেষণায় প্রশ্ন উঠছে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগের কৃষক বিদ্রোহগুলি আদৌ রাজনৈতিক ছিল কিনা। এ সন্দেহের প্রধান কারণ রাজনৈতিক চেতনা প্রসংগ। নীতি ও লক্ষ্য বিহীন বিদ্রোহ, হবসবমের ভাষায় রাজনৈতিক চেতনার পূর্বাভাষ মাত্র।[৩৪] হবসবমের অনুকরণে অনেকে এখানকার প্রাক্ধনতান্ত্রিক কৃষক বিদ্রোহকে প্রাক্-

রাজনৈতিক বলে আখ্যায়িত করার পক্ষপাতি। রণজিৎ গুহ (১৯৮৩) হবসবম এবং তাঁর অনুসারীদের চ্যালেঞ্জ করে অভিমত দেন যে, "গ্রামীণ মানুষের সশস্ত্র বিদ্রোহে এমন কোন্ উপাদান নেই যা রাজনৈতিক নয়।"[৩৫]

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা গুহের অভিমতের পরিপন্থী নয়। পরগণা নিরিখ ও দস্তুর সংরক্ষণে এবং পরে খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কৃষকরা যে চেতনার পরিচয় দেয় তা যে কোন সংজ্ঞায় পুরোপুরি রাজনৈতিক। তবে কৃষক বিদ্রোহকে 'রাজনৈতিক' প্রমাণ করার জন্য তিনি যে Domination-Subordination—Resistance তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন সে তত্ত্ব বোধ হয় তর্কাতীত নয়। সাধারণ মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে তিনি যুক্তি দেন যে, সমাজে একদিকে যেমন রয়েছে শোষণ ভিত্তিক শাশ্বত শাসক-শাসিতের সম্পর্ক, তেমনি অপরদিকে রয়েছে অবনতের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। তিনি মনে করেন শোষকশ্রেণীর আধিপত্যের পাশাপাশি রয়েছে চাষীশ্রেণীর (গুহের 'subaltern') শোষণ সচেতনতা যার বলে এরা সব সময়ই চেষ্টা করেছে 'গ্রামীণ বিশ্বকে যুগপৎ উল্টিয়ে দিতে।'[৩৬]

গুহের Domination—Subordination—Resistance তত্ত্বের পূর্বশর্ত শ্রেণী চেতনা। চাষীরা ("subaltern") কতটুকু শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এ সম্পর্কে আমাদের কাছে তত্ত্বালোচনা ছাড়া বাস্তব কোন সন্তোষজনক তথ্য নেই। মুঘল আমলে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে স্তরভেদ থাকলেও শ্রেণীচেতনা জাগেনি।[৩৭] ঔপনিবেশিক শাসনাধীনেও উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত কৃষককুলের মধ্যে শ্রেণীচেতনা লক্ষ্য করা যায় না। তখনও কৃষকরা ধর্ম, বর্ণ, সামাজিক বিধিনিষেধে অনুশাসিত, তখনও তাঁরা উচ্চ শ্রেণীর কাছে বিচার প্রার্থী। তারা সময় সময় বিদ্রোহ করেছে প্রার্থিত বিচার না পেয়ে, শোষণ ও শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় যারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছে তারা সম্মিলিত হয়ে বিদ্রোহ করেছে সনাতন অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাথমিক পর্বে বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ ও পরবর্তীকালে খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যারা সংগঠন করেছিল তাদের মধ্যে ছিল উৎখাত জমিদার-তালুকদার, মধ্যস্বত্বশ্রেণী, কৃষক, তাঁতী, মুলঙ্গী, মাঝি সবাই, এবং এসব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় হয় ধর্মীয় নেতাগণ বা বঞ্চিত বা উচ্চাভিলাষী অকৃষক উচ্চ শ্রেণীর লোক, বা উপজাতীয় প্রধানগণ। যেমন সন্দ্বীপ রায়ত

বিদ্রোহের (১৭৬৪) একচ্ছত্র নেতা ছিলেন আবু তোরাব চৌধুরী যিনি ছিলেন একজন উৎখাত হয়ে যাওয়া জমিদার। তেমনি রংপুর বিদ্রোহের (১৭৮৩) সংগঠনে ছিল উৎখাত জমিদারবৃন্দ। চাকমা বিদ্রোহ সহ প্রতিটি উপজাতী জুমীয়াদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন উপজাতীয় প্রধানগণ।

মজনু শাহ্ (উত্তরবঙ্গ, ১৭৬০-১৭৮৭), কালু ফকীর (কুমিল্লা, ১৭৮৭), বলাকী শাহ (বাকেরগঞ্জ, ১৭৯২), মির্জা মোহম্মদ রেজা বেগ (সিলেট, ১৭৯৯), হেমায়েত শাহ্ (ঢাকা, ১৮০০), টিপু শাহ্ (ময়মনসিংহ, ১৮২৪-৩৩), তিতুমীর (বারাসত, ১৮৩১),—এরা সবাই বিদ্রোহে জড়িত হয়েছিলেন উদ্ধারকর্ত্তা হিসেবে এবং এরা সবাই পীর-মুরিদ সম্পর্ককে সেনাপতি-যোদ্ধার সম্পর্কে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ সম্পর্কে শ্রেণী-চেতনা অচিন্তনীয়। খানকার মুরিদ হিসেবে জমিদার, তালুকদার, ব্যবসায়ী, মহাজন, কৃষক, জেলে, তাঁতী—সবাইকে উদাত্ত আহ্বান করা হয় 'ফিরিঙী' শাসনকে উৎখাতকল্পে বিদ্রোহে যোগদান করার জন্য। পাগল টিপু শাহ্র সমরসর্দার—বুড়া সরকার বুচা রাজবংশী, নিধু মণ্ডল, টিলুক পাতের, শংকর হাত্রী, ডুকু জোয়ারদার, প্রভৃতিরা ছিলেন সবাই জমিদার বা উচ্চশ্রেণীর সমাজপতি।[৩৮]

সনাতন ব্যবস্থার ধ্বংসস্তুপের উপর ক্রমশ গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো। এ ধ্বংসলীলার ভুক্তভুগীরা সবাই একত্রিত হয়ে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। এখানে Domination-Subordination-Resistance তত্ত্ব বিশেষভাবে অকেজো এ জন্য যে, গুহের প্রতিরোধকারীরা সবাই 'subaltern' বা সাধারণ চাষী শ্রেণী। শ্রেণীসচেতন কৃষকরা অন্য শ্রেণীর সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে উচ্চশ্রেণী বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এমন কোন তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে গতানুগতিক তথ্যের উপর গুহের আস্থা নেই। তিনি প্রাপ্ত তথ্যের উল্টো অর্থ করে সত্যে পেঁছাতে চান। তিনি মনে করেন যে, আয়নায় যেমন বস্তুর প্রতিচ্ছবি উল্টোভাবে প্রতিফলিত হয়, তেমনি ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের দলিলে কৃষকবিদ্রোহ উল্টোভাবে বিধৃত হয়েছে, অতএব কৃষকরা কিভাবে তাদের "গ্রামীণ বিশ্বকে উল্টিয়ে দিতে চেয়েছে" তা জানতে হলে ঐ দলিলগুলোকেও অবশ্য উল্টিয়ে দিতে হবে।[৩৯] ইপ্সিত লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য 'দলিল উল্টানোর' প্রস্তাব অবৈজ্ঞানিক, এবং সে কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

আঠারো-উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীরা অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল, কিন্তু শ্রেণীগতভাবে নয়। সনাতন রাষ্ট্রকাঠামোর ধ্বংসস্তুপের উপর ঔপনি-

বেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগীরা বিদ্রোহ করে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পিষ্ট ছিল কৃষকশ্রেণী এবং কৃষকরাই প্রতিটি বিদ্রোহের সূত্রপাত করে এবং বিদ্রোহের ফৌজ গঠন করে কৃষকরাই। কিন্তু বিদ্রোহের নেতৃত্ব আসে ভুক্তভোগী উচ্চশ্রেণী থেকে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ ঔপনিবেশিক শাসনকে উৎখাত করে সনাতন ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। পরবর্তীকালে বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধির প্রবণতা প্রতিরোধ করা।

তথ্য নির্দেশ

১. Kamrunnesa Islam, *Aspects of Economic History of Bengal, C.400-1200 A.D.* Dhaka, 1984.

২. রাম শরন শর্মা, "ভারতের সামন্ততন্ত্র", কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ ২২৬-২৭।

৩. কর, খাজনা, রাজস্ব, জমা প্রভৃতি শব্দ সব সময় এক অর্থ বহন করেনা। তবে এ প্রবন্ধে শব্দগুলি সমার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, Dhaka, 1963, Chapter III.

৫. মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠালগ্নে কিছু উপজাতীয় প্রতিরোধ ছাড়া কোন সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহ বাংলাদেশে হয়নি। দ্রষ্টব্য, গৌতম ভদ্র, "মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ", কলিকাতা ১৯৮৩।

৬. ঔপনিবেশিক শাসনামলে মোট কতগুলি কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল এর প্রামাণিক তালিকা এখনও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন নি। তবে শশীভূষণ চৌধুরী (১৯৫৫) ও সুপ্রকাশ রায়ের (১৯৬৬) হিসেবে ১৭৬০ থেকে ১৮৯৯ সালে পর্যন্ত বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা ছিল প্রায় একশতের কাছাকাছি। কিন্তু ইদানীংকালে গবেষণার উপাদান-উপকরণ আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতিমধ্যেই আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহের সন্ধান পেয়েছি যা চৌধুরী বা রায়ের গ্রন্থে স্থান পায়নি। এসব বিদ্রোহের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হলে কৃষক বিদ্রোহের সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই।

৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য, সিরাজুল ইসলাম, "বাংলার ইতিহাস ঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ১৭৫৭-১৮৫৭", ঢাকা, ১৯৮৪।

৮. এস, বি, চৌধুরী (১৯৫৫) ও সুপ্রকাশ রায়ের (১৯৬৬) গ্রন্থে প্রায় ১৮০টি কৃষক বিদ্রোহের বিবরণ রয়েছে। তবে অত্যাধুনিক গবেষণায় আরও অনেক বিদ্রোহের তথ্য আবিস্কৃত হয়েছে যা ঐ দুই গ্রন্থে স্থান পায়নি।

৯. এ বিষয়ে সবিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন R. Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, Delhi, 1983.

১০. *Ibid.*

১১. *Proceedings of the Committee of Circuit of Dacca*, (3 October-28 November 1772), Vol. IV, pp. 100-1, 115.

১২. Jonathan Duncan's Inquiry Into Disturbance in Sandip, *Bengal Revenue Proceedings*, 1 August 1780, Range 50, Vol, 26.

১৩. মুঘল জমিদারকে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী বলা চলেনা, কারণ হিন্দু যুগের সামন্ত, মহত্তর, করপতি, বা মধ্যযুগীয় ইউরোপের সামন্ত প্রভুর মত মুঘল জমিদারের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিলনা। ভূমি বন্দোবস্ত, রায়ত প্রদেয় খাজনার হার হ্রাস বৃদ্ধি, কর মওকুফ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতো সরকার। জমিদারের দায়িত্ব ছিল শুধু সরকারী নীতি কার্যকর করা।

১৪. *Bengal Revenue Proceedings* এর প্রতি খণ্ডে একটি আলাদা অধ্যায় রয়েছে রায়তের আরজী নিয়ে।

১৫. 'Patterson Commission Report into Rangpur Insurrection', *Bengal Revenue Consultations*, 31 March 1784, Range-50, Vol. 51.

১৬. ঐ।

১৭. *Bengal Revenue Consultations*, 10 February 1792, No. 6.

১৮. ঐ।

১৯. জংগল কেটে পরিষ্কার করে খাদ্য শস্য, ফলমূল, শাকশব্জির বীজ একই সংগে একই ভূমিতে ছিটিয়ে দেয়া হতো। দুই তিন বৎসর পর জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা চলে গেলে চাষীরা ঐ জমি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে জংগল পরিষ্কার করে আবার একই কায়দায় চাষাবাদ করতো।

২০. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, শশীভূষণ চৌধুরী, *Civil Disturbance During the British Rule in India (1765-1857)*, Calcutta, 1955 ; E. Gait, *A History of Assam*, Calcutta, 1967 ; Alexander Mackenzie, *History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of the North-East Frontier of Bengal*, Calcutta, 1884 ; ধীরেন্দ্রনাথ বকশী, 'সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস' কলকাতা, ১৯৭৬, J. C. Jha, *Kol Insurection in Chota-Nagpur*, Calcutta, 1964 ; Sirajul Islam, 'Tribal Resistance in Chittagong Hill Tracts (1776-87)', in N.R. Ray etal, *Challenge : A Saga of India's Struggle for Freedom*, Delhi 1984 ; Nikhiles Guha, The Khasis and the English in *Challenge*.

২১. Collector of Tipperah to Chief of Dacca, April 24, 1787, *Comilla District Records*, Dhaka Secretariat Record Room.

২২. B.C. Allen, *Assam District Gazetters—Sylhet*, Calcutta, 1905, pp. 39-41.

২৩. *Criminal and Judicial Proceedings*, 23 April 1801, No. 21, (India Office Library).

২৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, Muin-ud-din Ahmad Khan, *History of the Fara'idi Movement in Bengal, 1818-1906*, Karachi, 1965.

২৫. দেখুন Sunil Sen, *Peasant Movements in India : Mid-Nineteenth and Twentieth Centuries*, Calcutta, 1982.

২৬. স্থানীয় বিদ্রোহ কিভাবে চারিপাশে বিস্তার লাভ করতো, এবং বিদ্রোহ এক বিশেষ আঞ্চলিক পরিধি লাভের পর তা ঐ অঞ্চলে কিভাবে আটকা পড়ে থাকতো—এ সম্পর্কে শক্তিশালী তত্ত্বালোচনা রয়েছে রণজিৎ গুহের গ্রন্থে। দেখুন, Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* Delhi, 1983, Chapters 6-7.

২৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য, Willem van Schendel, *Madmen of Mymensingh : Peasant Resistance and the Colonial Process in Eastern India, 1824-1833*, University of Amsterdam, 1984, (Working Paper No. 47).

২৮. দেখুন, সিরাজুল ইসলাম, 'ঔপনিবেশিক শাসন ও গ্রামীণ পরিবর্তন', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ২য় খণ্ড পৌষ ১৩৯১।

২৯. মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের জন্য দ্রষ্টব্য সিরাজুল ইসলাম, *Bengal Land Tenure : Origins and Growth of Landed Intermediate Classes in 19th Century of Bengal*, Rotterdam, 1984.

৩০. Rajat and Ratna Ray, 'Zamindars and Jotedars : A Study of Rural Politics in Bengal', *Modern Asian Studies*, Vol. 9. 1. 1975.

৩১. *Bengal Administration Report*, 1872-73, pp. 29-31, বিস্তারিত বিবরণের জন্য Kalyan Kumar Sen Gupta, *Pabna Disturbances and the Politics of Rent, 1873-1885*, New Delhi, 1974.

৩২. *Government of Bengal Proceedings*, 12 March 1872, (Revenue Department), pp. 1-7, (Dhaka Secretariat Records).

৩৩. Commissioner of Dacca Division to Government, 23 May 1870, *Government Proceedings* (General Department), August 1870, p. 49.

৩৪. *Report of the Government of Bengal on the Proposed amendment of Landlord and Tenant*, Vol. 1 Calcutta, 1881, p. 26.
৩৫. E. J. Hobsbawm, *Primitive Rebels*, Manchester, 1959.
৩৬. Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, Delhi, 1983, p. 6.
৩৭. *Ibid*, pp 333-6.
৩৮. Irfan Habib, 'Forms of Class Struggle in Mughal India', *Proceedings, Indian History Congress*, Bombay 1980.
৩৯. *Bengal Criminal Judicial Proceedings*, 6 July 1826, No. 1
৪০. R. Guha, *Elementary Aspects*, p. 333.

রতন লাল চক্রবর্ত্তী

ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩—১৮০০)

বাংলায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে উদ্ভূত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অত্যাচার এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে ফকীর-সন্যাসীদের বিদ্রোহ ছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ। কোম্পানীর নথি-পত্র, সাহিত্য কর্ম, সমসাময়িক রচনা ও পরবর্তীকালের গবেষণায় ফকীর-সন্যাসীদের বিদ্রোহ আলোচনায় দু'টি ধারা স্পষ্টতঃ লক্ষণীয়।[১] সরকারী নথিপত্র, সমসাময়িক সাহিত্যকর্ম ও অন্যান্য রচনাসহ কতিপয় গবেষণা কর্ম ফকীর-সন্যাসীদের কার্যাবলীকে আখ্যায়িত করেছে 'ডাকাত' বা 'দুস্কৃতকারী'দের কার্যাবলীর সমপর্যায়ের। অন্যদল এই বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের মাধ্যমে অতি গুরুত্ব সহকারে অতিশয়োক্তি করেছেন। ফলে বাংলার এই প্রথম বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস অতিমূল্যায়ন ও ঊনমূল্যায়নের সম্মুখীন হয়েছে।

ভারত উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ ও তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ফকীর-সন্যাসীদের কার্যাবলী ও তৎপরতা ডাকাত বা দুস্কৃতিকারীদের পর্যায়ভুক্ত নয়। অন্যদিকে তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই বিদ্রোহ শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম নয় এবং শক্তিশালী কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে ফকীর-সন্যাসীদের বিদ্রোহ ও অভিযোগ সমূহ বীর আখ্যানে পূর্ণও নয়। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ হিসেবেই এই বিদ্রোহ তার নিজস্ব গুরুত্ব বহন করে। বর্তমান প্রবন্ধে ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয়, বিদ্রোহের কারণ, ফকীর-সন্যাসীদের মধ্যকার ঐক্য ও বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলায় কোম্পানীর শাসন প্রসূত অর্থনৈতিক শোষণ সামাজিক উৎপীড়ণের বিরুদ্ধে যে ফকীর ও সন্যাসীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, তারা ছিলেন বাংলারই মানুষ। বর্তমান প্রবন্ধের ফকীরগন ছিলেন সূফী সম্প্রদায়ের মাদারীয়া শ্রেণী এবং এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন

সিরিয়া হতে আগত সূফী সাধক বদিউদ্দিন শাহ-ই-মাদার।[২] বিভিন্ন গ্রন্থে শাহ বদিউদ্দীন কুতুব-উল মাদারকে একজন সূফী সাধক ও পর্যটক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যিনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকে ভারতে এসেছিলেন এবং বহুদিন উত্তর ভারতে তাঁর সূফী মতবাদ প্রচারের পর-১৪৩৬ সালে অযোধ্যার কানপুর জেলার মাখনপুরে মৃত্যুবরণ করেন।[৩] শাহ্ মাদারের সূফী মতবাদ বাংলায় প্রসার লাভ করেছিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শাহ্ সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানা।[৪] সম্রাট শাহ্জাহানের পুত্র তথা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার শাহ্ শুজা ১৬৫৮ সালে মাদারীয়া সূফী নেতা শাহ্ সুলতান হাসান নুরিয়া বুরহানাকে বিশেষ অধিকার সম্বলিত একখানা সনদ দিয়েছিলেন। এই সনদে উল্লিখিত অধিকার সমূহের প্রকৃতি এই মাদারীয়া সূফী সম্প্রদায়ের প্রবল প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা প্রমাণ করে। দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ থানার বলিয়াদিঘীতে হাসান শাহ সুরিয়া বুরহানার আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে কিংবদন্তী রয়েছে।[৫] বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদারীয়া সূফী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেমন মাদার বাঁশও ঝান্ডা মাদার ইত্যাদি।[৬] কোন কোন অঞ্চলে শাহ্ জিন্দামাদার নামেও পরিচিত।[৭] সূফী সম্প্রদায়ের প্রায় সকল ফকীর 'শাহ্' উপাধি ধারণ করতেন।[৮] এবং খুব সম্ভবতঃ এটা ছিল সূফী অনুসারীদের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত রেওয়াজ। যাই হোক মাদারীয়া সূফি সম্প্রদায়ের বেশকিছু আচরণ ছিল হিন্দু যোগী ও সন্যাসীদের মতো এবং তারা রোজা ও নামাজসহ ইসলামের বহু বিধানই মেনে চলতেন না।[৯] মৌলভী আবদুল ওয়ালী তাঁর প্রবন্ধে ফার্সী লিপি পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছেন যে এই সূফী ফকিরদের অস্তিত্ব ছিল প্রাচীন সূফীবাদ ও হিন্দুযোগী আচার-আচরণের মিশ্রণের মধ্যে।[১০] এছাড়া এই ফকীর সম্প্রদায় যে 'বুরহানা' উপাধি গ্রহণ করতেন তার অভিধানিক অর্থ হল 'নগ্ন' এবং এই মাদারীয়া সূফী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ফকীরই ছিলেন নগ্নপ্রায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মজনু শাহ্ বুরহানা। জনাব এম. এম. হক মন্তব্য করেছেন যে মজনু শাহ্ ও তাঁর অনুসারীগণ মাদারীয়া শ্রেণীর সূফী ফকীর হলেও 'বুরহানা' ছিলেন না।[১১] প্রমাণিক দিক লক্ষ্য করে জনাব হক বলেছেন যে কেবলমাত্র রংপুর জেলার একখানা সরকারী দলিলের উপর ভিত্তি করে যামিনী মোহন ঘোষ ফকীর নেতা মজনু শাহ্‌কে 'বুরহানা' নামে অভিহিত করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে উল্লিখিত সরকারী দলিলটি

ছাড়াও আরো অনেক সরকারী দলিল রয়েছে যেখানে মজনু শাহ্‌কে সরাসরি 'বুরহানা' হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১২] এ ছাড়া পঞ্চানন দাসের কবিতায় মজনু শাহ্‌কে 'বারণা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা স্বতঃই প্রমাণ করে যে মজনু শাহ্ ছিলেন তৎকালীন বুরহানা নেতা।[১৩]

অন্যদিকে আলোচ্য প্রবন্ধের সন্যাসীগণ ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু যোগী। মহাভারতে বৈদান্তিক সন্যাসীদের 'একদন্ডী' ও 'ত্রিদন্ডী' এই দুই নামে উল্লেখ করা হয়েছে। একদন্ডী সন্যাসীগণ একটি দন্ড ব্যবহার করতেন, অন্যদিকে ত্রিদন্ডী সন্যাসীগণ ত্রিদন্ডী বা ত্রিশূল ব্যবহার করতেন।[১৪] খৃষ্টীয় আট শতকে বেদান্ত দর্শনের দিকপাল শংকরাচার্য হিন্দু একদন্ডী সন্যাসবাদকে দশটি পৃথক শাখায় বিভক্ত করেন যা 'দশনামী সন্যাসবাদ' নামে পরিচিত। এই দশটি শাখার মধ্যে 'গিরি' বা 'পুরী' নামে দু'টি শাখা ছিল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বসতি ছিল। সুফী ফকীরদের মত সন্যাসীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ শাখা অনুযায়ী তাদের নামের পেছনে 'গিরী' বা 'পুরী' উপাধি গ্রহণ করতেন।[১৫] সন্যাসীদের অবস্থান ও জীবিকা নির্বাহের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সরকারী বিবরণীতেও আছে।[১৬]

সমসাময়িক উৎসসমূহে এবং সরকারী দলিল দস্তাবেজে ফকীর ও সন্যাসীদের এক করে দেখানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কেবলমাত্র 'ফকীর' অথবা 'সন্যাসী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর কারণ ছিল ফকীর ও সন্যাসীদের মধ্যে আচরণগত সাদৃশ্য। মাদারীরা সুফী ফকীরেরা হিন্দু সন্যাসীদের মতো প্রায়শঃই নগ্ন বা অর্ধনগ্ন থাকতেন, চুল জটার মত করে বাঁধতেন এবং গায়ে ছাই মাখতেন।[১৭] হিন্দুযোগী সন্যাসী ও মুসলমান সুফী ও ফকীরদের মধ্যে আচরণগত সাদৃশ্য সম্পর্কে 'দাবিস্তান-উল-মাযাহিব' গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে যে এই মুসলমান ফকীরেরা পূর্বে ছিলেন একদল হিন্দুযোগী যারা প্রথমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং পরে সুফী সম্প্রদায়ভূক্ত হন। মুসলমান হলেও এই ফকীরেরা তাদের পূর্বের যোগসাধন প্রণালী ও আচরণ অব্যাহত রাখেন।[১৮] প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় ইসলাম ধর্ম ও সুফীবাদ পীরপূজা ও সন্যাস জীবনের প্রতি অধিকতর প্রভাবান্বিত হয় এবং এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী পর্যায়ের সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। সুফী ফকীরদের আচার-অনুষ্ঠান বৈদান্তিক যোগী সন্যাসীদের মতো ছিল বলে তাদের প্রায়ই অভিন্ন মনে করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।[১৯] এছাড়া পৃথিবী সম্পর্কে বেদান্ত দর্শনের নৈরাশ্যবাদী চিন্তাধারা সুফী-

বাদকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছে বলে বৈদান্তিক সন্যাসীদের সাথে সুফী ফকীরদের ঐক্যের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।[২০] সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেনঃ "অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুফীবাদ ভারতে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে এক সেতুবন্ধন রচনা করেছে। কেননা বেদান্ত দর্শন ও সুফীবাদের মধ্যে তত্ত্বগত সাদৃশ্যের জন্য হিন্দু-মুসলমান সাধকেরা একে অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করেন।"[২১] এছাড়া বৈদিক ঋষিদের শিক্ষার সাথে সুফী সাধকদের শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধায় হিন্দু সম্প্রদায়ের এক অংশ শাহ্ মাদারের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন।[২২] শাহ্-মাদারের প্রধান আস্তানা ছিল কানপুর জেলার মাখনপুরে। সেখানে অবস্থানরত হিন্দু অধিবাসী ও যোগী সন্যাসীগণ শাহ্মাদারকে তাঁদের রামায়ণে বর্ণিত ধর্মীয় নায়ক 'লক্ষণ' মনে করে যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, এবং তাদের এক অংশ শাহ্মাদারের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।[২৩] এই ফকীর ও সন্যাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল খুবই স্বাভাবিক এবং ভ্রাতৃত্ববোধ তাদের ঐক্যের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং জনাব মুহম্মদ আবু তালিবের বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া সম্ভব নয় যেঃ "আচার-আচরণ, ভক্তি বিশ্বাসে হিন্দু মুসলমান ফকীরে পার্থক্য সুস্পষ্ট।"[২৪] প্রকৃতপক্ষে ফকীর ও সন্যাসীদের মধ্যে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য তথা ধর্মীয় ও সামাজিক সম্মিলনের প্রভাব। সন্যাসী-দের অবস্থান ও তাদের বসবাস সম্পর্কে যামিনী মোহন ঘোষ বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং সরকারী বিবরণীতেও ফকীর সন্যাসীদের স্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। সুতরাং রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য মেনে নেয়া যায় না যে"...বিহার ও মধ্য প্রদেশ হইতে আগত একদল নাগা সন্যাসী উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে লুঠ-তরাজ করিয়া ফিরিত।"[২৫] কেননা রমেশ চন্দ্র মজুমদারের এই তথ্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে অবস্থানরত সন্যাসীগণ ছিলেন কারা? প্রকৃতপক্ষে সন্যাসীদের মধ্যে একদল মহাজনী ব্যবসা করতেন, আবার অন্য একদল, ধর্মীয় আখড়া রক্ষণাবেক্ষণ ও ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অন্য-দিকে ফকীরদের সম্পর্কে ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকাননের বর্ণনা হতে জানা যায় যে রংপুর জেলায় বহুসংখ্যক মাদারীয়া সুফী স্থানীয় অধিবাসী হিসেবে বাস করতেন এবং তাদের মধ্যে কারো কারো আচরণ ছিল হিন্দু সন্যাসীদের মতো।[২৬] বুকাননের বিবরণী হতে আরো জানা যায় যে ফকীরদের অধিকাংশই বিবাহিত এবং লাখেরাজ সম্পত্তির মালিক।[২৭] সুতরাং ফকীর সন্যাসীগণ ভারতের উত্তর প্রদেশ হতে

বাংলায় এসে বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা চালিয়েছেন, উপরোক্ত তথ্য সমূহ এই ধারণার অসারতা প্রমাণ করে। এছাড়া ব্রগটন মারাঠা শিবির হতে ফকীর ও সন্যাসীদের সম্পর্কে জানিয়েছেনঃ "ফকীর-সন্যাসীরা ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি দল।"[২৮] ব্রগটনের এই তথ্য ফকীর সন্যাসীদের সম্পর্কে 'যাযাবর' ধারণার অসারতা প্রমাণ করে এবং নির্দেশ করে যে এই দল ছিল একটি তীর্থ যাত্রী দল। তাই সন্দেহাতীত ভাবেই স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে ফকীর সন্যাসীগণ ছিলেন বাংলারই অধিবাসী। ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে তাদের জীবন শুরু হলেও কালক্রমে তাদের জীবন পদ্ধতি স্বাভাবিক ও স্থায়ী বসতি লাভ করে। যদিও ধর্মের অনুশাসনের দিক হতে ফকীর-সন্যাসীদের মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কৃতিগত ঐক্য ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ফকীর-সন্যাসী-দের মধ্যে মিলনের সাধারণ ক্ষেত্র তৈরী করে এবং তারা একই পতাকা তলে সমবেত হন। এ সময় ফকীর সন্যাসীদের সাথে অগ্রসর হয়েছিলেন "নিঃস্ব কৃষক, সম্পত্তি ভ্রষ্ট জমিদার ও বেকার সৈন্যদল।"[২৯] বৃটিশ ভারতের সরকারী ইতিহাস প্রণেতা ও প্রধান তথ্য সংগ্রহকারী ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার লিখেছেন যে সন্যাসী বিদ্রোহের সন্যাসীরা ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের বিয়োজিত সৈন্যবাহিনীর বেকার সৈন্যদল ও বাংলার ভূমিহীন কৃষক এবং এক সময় সন্যাসীদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত উঠেছিল।[৩০] প্রকৃতপক্ষে বেকার সৈন্য ও ভূমিহীন কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের শেষ উপায় হিসেবে ফকীর সন্যাসী বিদ্রোহে যোগদান করা অসম্ভব কিছু ছিল না। তাই হান্টার সাহেবের অভিমত সত্য হিসেবে গ্রহণ করলে দেখা যায় যে ফকীর-সন্যাসীগণ যাযাবর বা পেশাদার দস্যু ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী, যাদের ভূমিকা ছিল বাংলায় কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

কিন্তু কেবলমাত্র তত্ত্বগত ও আচরণগত সাদৃশ্যের জন্যই সুফী ফকীর ও হিন্দু যোগী সন্যাসীরা একত্রে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় হিন্দু-মুসলমান দের সংস্কৃতিগত ঐক্য তাদের একত্র হবার প্রেরণা যুগিয়েছে একথা সম্পূর্ণভাবে সঠিক বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাংলার ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহের পেছনে ছিল কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ এবং যা ছিল তৎকালীন বাংলায় কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারের

বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। জনাব মুহম্মদ আবু তালিব লিখেছেন যে "লাখিরাজ সম্পত্তির বাজেয়াফ্‌তির পালা" ফকীর সন্যাসী-দের বিদ্রোহী করে তোলে।[৩১] লাখিরাজ সম্পত্তি পুনরাধিকার ফকীর সন্যাসী বিদ্রোহের শেষের দিকের একটি কারণ হিসেবে কাজ করে। কেননা লাখিরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সচেতন হলেও ১৭৯৩ সালের উনিশ ও সাঁইত্রিশ নম্বর রেগুলেশন প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত লাখিরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে তেমন কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না।[৩২] কিন্তু বাংলায় ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়ে ছিল ১৭৬০ সাল হতেই। এছাড়া যদিও মুঘল সরকার ও জমিদার শ্রেণী মদদ্-ই মাস, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ও পীরপাল প্রভৃতি লাখিরাজ দিতেন, কিন্তু সেখানে বাংলার প্রত্যেক ফকীর-সন্যাসীই যে তার অধিকারী ছিলেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ফকীর ও সন্যাসীদের কার্যকলাপ ছিল মুক্ত ও স্বাধীন। কিন্তু কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই তাদের মুক্ত ও স্বাধীন গতিবিধি ও কার্যকলাপে বাধা আরোপিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ব্যাহত হতে থাকে ফকীর-সন্যাসীদের ধর্মাধিষ্ঠানে যাতায়াতের অবাধ স্বাধীনতা। ধর্মস্থান বা তীর্থস্থান পর্যটন ভারত উপমহাদেশের একটি অতি প্রাচীন সামাজিক ও আত্মিক অধিকার। হিন্দু সন্যাসীদের কুম্ভ মেলায় যোগদান, গঙ্গা ও করতোয়ায় স্নান, অশোক অষ্টমীতে ব্রহ্ম নদে স্নান ও বগুড়ার বারুনী উৎসবে যোগদান ছিল পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। অন্যদিকে পূর্ণিয়ার নেক সর্দারের দরগা, দিনাজপুরের পীর বদরউদ্দিনের মাজার, মালদার আদিনা মসজিদ, সৈয়দ মখদুম শাহ্ জালাল তাবরিজির দরগা, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও কানপুরের মাজার জিয়ারত ইত্যাদি ছিল ফকীরদের পুণ্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কোম্পানীর কর্মচারীগণ ফকীর-সন্যাসীদের এই তীর্থ স্থান পরিদর্শনের বিষয় সন্দেহের চোখে দেখেছেন। জরিপ কর্মের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব মেজর জেমস রেনেল মহাস্থান দরগা পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করেন যে এই সমস্ত দরগা প্রকারান্তরে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল।[৩৩] সম্ভবতঃ কোম্পানীর বিরুদ্ধে ফকীর-সন্যাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে এই সমস্ত তীর্থস্থান পরবর্তীকালে অস্ত্র লেন দেনের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। যাইহোক সরকারী নথিপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে ফকীর সন্যাসীগণ প্রতি বছর তীর্থব্যাপদেশে ভারত ও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করেন। ১৭৭২ সালে ফকীর নেতা মজনু শাহ নাটোরের রাণী ভবানীর কাছে লিখিত চিঠিতে জানিয়েছেন যে ইংরেজ

কোম্পানী তাঁদের তীর্থ যাত্রাকে বাধা দিচ্ছে।[৩৪] প্রকৃতপক্ষে কোম্পানী প্রশাসন প্রথমে ফকীর-সন্ন্যাসীদের তীর্থ যাত্রায় বাধা দেয় এবং পরে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞাকে সুদৃঢ় করে।[৩৫] এই ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচারের সাথে সংযোজন ঘটে ফকীর-সন্ন্যাসীদের অর্থনৈতিক অভিযোগের। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ফকীর-সন্ন্যাসী-গণ ভিক্ষা বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং কালক্রমে এই ভিক্ষাবৃত্তি তাদের অধিকারে পরিণত হয়। বাংলায় বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা হবার পর একদিকে রাজস্ব আদায়ে অত্যাচার ও অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির ফলে বাংলার গ্রাম্য জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুর্দশা। এরই ফলে চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম করেই গ্রামবাসীগণ ফকীর-সন্ন্যাসীদের অর্থ সাহায্য করতে অসমর্থ হয়। দিনাজপুরের কালেক্টর হ্যাচ স্বীকার করেছেন যে, গ্রামবাসী ফকীর-সন্ন্যাসীদের অর্থ সাহায্য করতেন, যা পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট দাবীতে পরিণত হয়। ১৭৯৩ সালে লিখিত হ্যাচের চিঠিতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে ঃ "নিম্ন শ্রেণীর রায়তদের অবলুপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ফকীর-সন্ন্যাসীদের দাবী অগ্রাহ্য হয় এবং তারা জমিদার-দের বাড়ী, কাচারী ও কোম্পানীর কুঠী আক্রমণ করেন।"[৩৬]

১৭৬০ সালে ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। দুর্ভিক্ষের পূর্বে এই আক্রমণের তীব্রতা তেমন ব্যাপক না হলেও দুর্ভিক্ষের পরে উদ্ভূত মারাত্মক অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ফকীর-সন্ন্যাসীদের আক্রমণের তীব্রতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল কোম্পানীর কুঠি, জমিদারদের কাচারী ও নায়েব গোমস্তার বাড়ী। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার পর যারা রাজস্ব আদায়ে ও বিভিন্ন পর্যায়ে কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারাই ছিলেন ফকীর-সন্ন্যাসীদের আক্র-মণের মূল লক্ষ্য। ফকীর-সন্ন্যাসীগণ গ্রামবাসীদের নিকট হতে তাদের চিরাচরিত অর্থ আদায়ে অসমর্থ হন এবং এজন্য কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে তাঁদের কুঠি আক্রমণ করেন। ফকীর-সন্ন্যাসীদের এই বিদ্রোহের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন নিঃস্ব কৃষক, সম্পত্তিচ্যুত জমিদার ও বেকার সৈন্যদল। পরোক্ষভাবে ফকীর-সন্ন্যাসীদের অত্যাচারী মনে হলেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে অধিকতর অত্যাচারী মনে করাই ছিল স্বাভাবিক এবং ফকীর-সন্ন্যাসীদের সাথে যোগদান করে তাঁদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা আরো স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে কোম্পানীর কুঠি, জমিদারদের কাচারী ও নায়েব গোমস্তার বাড়ী আক্রমণ ছাড়াও কোম্পানীর রপ্তানী বাণিজ্যের সহযোগী দেশীয়

বানিয়াদের নৌকা অক্রমণ, সৈন্য বাহিনীর রসদ পরিবহন বন্ধ করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা ইত্যাদিও ছিল ফকীর-সন্যাসীদের কোম্পানীর বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা। ফকীর-সন্যাসীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল তরবারী, বর্শা ও গাদা বন্দুক, লাঠি ইত্যাদি। ফকীরদের মধ্যে কেবল-মাত্র মজনু শাহ্ সহ কয়েকজন নেতাই ঘোড়ায় চড়তেন। ঘোড়ার এই ব্যবহার বিদ্রোহী দলের নেতৃত্বের প্রতি ধারণা ও নেতৃত্বের বিষয়টিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। অকস্মাৎ আক্রমণ করে কোম্পানীকে বিব্রত করে তোলাই ছিল তাদের রণ কৌশলের একটি প্রধান অংশ। কোম্পনীর সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধের পর অথবা যুদ্ধে পরাজয় ঘটলে বা কোম্পানীর সৈন্যদল কর্তৃক তাড়িত হলে ফকীর-সন্যাসীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দ্রুত ঐ অঞ্চল ত্যাগ করতেন এবং পরে পুনরায় একত্র হতেন। মজনু শাহ্ প্রয়োজন না হলে কোম্পানীর সৈন্যদলের সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলতেন।[৩৭] যদিও ফকীর-সন্যাসীদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা, সমাবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু তাদের বিদ্রোহের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও দীর্ঘকালীন বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা অব্যাহত রাখা ফকীর-সন্যাসীদের পরিকল্পনা, সমাবেশ ও তৎপরতা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে দৃঢ় করে। কোম্পানীর সৈন্যদল সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ফকীর সন্যাসীদের গুপ্তচর ছিল এবং এই গুপ্তচর কাজে নিয়োজিত ছিলেন গ্রামের সাধারণ মানুষ।[৩৮] ১৭৬৩ সাল হতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ফকীর-সন্যাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ চলতে থাকে। এই বিদ্রোহ সম্প্রসারিত হয়েছিল ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদা ও পুর্ণিয়া জেলায়। তবে সমগ্র উত্তরবঙ্গ ছিল ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র। আক্রমণের তীব্রতা এতই বেশী ছিল যে কোম্পানীকে বাংলার প্রতিটি জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হয়। ফকীর সন্যাসী বিদ্রোহে প্রধান নেতা ছিলেন মজনু শাহ্ ও ভবানী পাঠক। ১৭৮৭ সালে কানপুর জেলায় মাখন-পুরে মজনু শাহ্ এর মৃত্যু হলে পরবর্তীকালে মুসা শাহ্ চেরাগ আলী শাহ্ ও পরাগল শাহ্ প্রমুখ ফকীর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।

এই আলোচনার পর একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহের উদ্দেশ্য কি? এটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। ফকীর-সন্যাসীদের অভিযোগ ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়ণ। কিন্তু এই উৎপীড়ণের অবসান কল্পে তাঁরা বিদ্রোহের যে পথ অবলম্বন করেন, সেখানে একটি সম্ভাব্য উদ্দেশ্য হতে পারে কোম্পানীর শাসনের অবসান। কিন্তু

সমসাময়িক উৎস সমূহ এমনকি রানী ভবানীর নিকট লিখিত মজনু শাহের চিঠিতেও এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। কোম্পানীর শাসন প্রসূত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের অবসান ব্যতীত এই বিদ্রোহের অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় না। কোম্পানীর শাসন তারা চায় না, কিন্তু পূর্বতন শাসন ব্যবস্থা বা নতুন কোন শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্পর্কে তাদের কোন বক্তব্য নেই। অর্থাৎ সমকালীন রংপুর কৃষক বিদ্রোহের (১৭৮৪) মত এই বিদ্রোহের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। একে কেবলমাত্র কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। ১৮০০ সালের পর এই বিদ্রোহ ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে যায়।

আঠরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিচালিত এই আন্দোলনে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলেই ছিল ফকীর সন্যাসীদের তৎপরতা। বাংলা ব্যতীত বিহারেও তাদের বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা সম্প্রসারিত হয়। মালদা, নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শীদাবাদ ইত্যাদি জেলাগুলো ফকীর সন্যাসী আক্রমনের উল্লেখযোগ্য স্থান হলেও বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গে এদের আক্রমণের তীব্রতা ছিল মাত্রাতিরিক্ত।

১৭৬৩ সালে সর্ব প্রথম বাখরগঞ্জে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কুঠী ফকীর সন্যাসী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সন্যাসীগণ তথাকার ফ্যাক্টরী প্রধান কেলীকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। একই বছর ফকীরগণ ঢাকা ফ্যাক্টরী আক্রমন করেন এবং পরিশেষে তা দখল করেন। এই আক্রমণের তীব্রতা এত বেশী ছিল যে ঢাকার ফ্যাক্টরী প্রধান লেষ্টার তাঁর কর্মস্থল পরিত্যাগ করে পালিয়ে যান। শেষে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট ফকীরদের হাত হতে ঢাকা ফ্যাক্টরীকে পুনরুদ্ধার করেন এবং বন্দী ফকীরদের বলপূর্বক শ্রমে বাধ্য করেন।[৩৯] একই বছর সন্যাসীগন রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় কোম্পানীর ফ্যাক্টরী আক্রমণ করে ঐ ফ্যাক্টরী প্রধান বেনেটকে গ্রেপ্তার করে। বন্দী হিসেবে বেনেটকে পাটনায় প্রেরণ করা হলে সেখানেই তাকে হত্যা করা হয়।[৪০] উত্তরবঙ্গে ফকীর সন্যাসী তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য ১৭৬৭ সালে ক্যাপ্টন ডি ম্যাকেঞ্জিকে সৈন্য সহ রংপুরে প্রেরণ করা হয়। এ সময় সন্যাসীগণ মালদহের রেসিডেন্ট বারওয়েল কর্তৃক প্রেরিত এজেন্ট মার্টেলকে হত্যা করে। ক্যাপ্টেন ডি ম্যাকেঞ্জি এই সন্যাসী দলের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রচেষ্টা গ্রহন করলে সন্যাসীদল নেপালের দিকে অগ্রসর হয়।

১৭৭১ সালের দিকে ক্যাপ্টেন জেমস রেনেল ছিলেন পাবনা অঞ্চলে

জরিপকার্যে রত। তিনি পাবনার সিরাজগঞ্জের নিকটস্থ স্থানে বেলকুচি হতে জানান যে ফকীরগণ সংখ্যায় অনেক এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র-সহ এই জেলার বিভিন্ন স্থানে সমবেত হচ্ছে। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এই তথ্য অবগত হয়ে রাজশাহী ও দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করেন।

১৭৭১ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়, যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। মন্বন্তর ও মন্বন্তর পরবর্তী পরিস্থিতিতে জনজীবনে যে সীমাহীন দুর্দশা লক্ষ্য করা যায় তার ফলশ্রুতি ছিল ফকীর সন্যাসী আন্দোলনের ব্যাপকতায়। এ সময় বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় ফকীর সন্যাসী আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। ফকীরগণ বগুড়ার মহাস্থানগড়ে সমবেত হতেন তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য। ক্যাপ্টেন জেমস্ রেনেলের বর্ণনা হতে জানা যায় যে ১৭৭১ সালে লেফটেন্যান্ট ফেলথামের নেতৃত্বে একদল কোম্পানীর সৈন্য ঘোড়াঘাট ও গোবিন্দগঞ্জের পথে ফকীর সন্যাসীদের আক্রমণ করেন। হঠাৎ আক্রমণে ফকীর সন্যাসীগণ পরাজিত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পলায়ন করেন। এ সময় অশ্বপৃষ্ঠে মজনু শাহ শতাধিক নিরস্ত্র ও আহত অনুসারী নিয়ে মহাস্থানের দিকে অগ্রসর হন। এই ঘটনার পর মহাস্থানগড় এলাকায় স্থায়ীভাবে কোম্পানীর সৈন্য মোতায়েনের প্রয়োজন হয়।[৪১]

রাজশাহী জেলায় ফকীর সন্যাসীদের তৎপরতার প্রচন্ডতা লক্ষ্য করা যায় ১৭৭২ সালে, যখন মজনু শাহ সশস্ত্র অনুচর নিয়ে উত্তর বঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত। রাজশাহীতে অবস্থানরত কোম্পানীর সুপারভাইজারের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী কয়েকশ সশস্ত্র অনুচরসহ ফকীর নেতা কোম্পানীর আদায়কৃত খাজনার অর্থ নিয়ে যায়, এমনকি তাদের পক্ষে পরগণার কাচারী দখল করে রাখাও অসম্ভব নয়। নাটোরে অবস্থানরত কোম্পানীর সুপারভাইজরের পত্রানুযায়ী ফকীর দল ছিল তলোয়ার, বর্শা, গাদা বন্দুক ও কামানে সজ্জিত। একই বছর রংপুরে সন্যাসী-দের বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার তথ্য প্রদান করেন রংপুরের সুপারভাইজার পার্লিং, যিনি এই ঘটনার কয়েক মাস অব্যবহিত পরই সন্যাসীদের হাতে নিহত হন।

১৭৭৩ সালে পুনরায় উত্তর বঙ্গের বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুরে ফকীর সন্যাসী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বগুড়া জেলায় কোম্পানীর সুপারভাইজার নিযুক্ত হয়ে আসেন গ্লাডউইন, যিনি ফকীর সন্যাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এই অঞ্চলে কোম্পানীর সৈন্য

সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। কিন্তু কোম্পানীর পক্ষ হতে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে তিনি হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত লেফ-টেন্যান্ট রবার্টসনের নেতৃত্বে কোম্পানীর একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয় যাদের সাথে ফকীর সন্ন্যাসীদের তীব্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ সম্পর্কে গ্লাডউইনের বিবরণ ছিল ঃ "গতরাত ন'টায় নিজের ক্যাম্প হতে রওয়ানা হয়ে প্রায় নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর আজ সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমরা ফকীর মজনুর শিবিরের নিকট উপস্থিত হলাম। আমাদের আগমন সম্পর্কে তাদের কাছে ছিল না কোন পূর্বাভাষ। এ জন্যই তারা প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে অবস্থান করছিল। সংখ্যায় ফকীর সন্ন্যাসীগণ তিন শতাধিক হলেও তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতই শিথিল ছিল যে তাদের বিশগজের মধ্যেও আমাদের উপস্থিতি তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। আমাদের দর্শন মাত্রই তারা অস্ত্রহাতে আমাদের আক্রমণে উদ্যত হল এবং এ সময়ই আমরা আমাদের সৈন্যদের গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিলাম। ফকীর সন্ন্যাসী দল পেছনের জঙ্গলে আশ্রয় নিল এবং আমাদের প্রতি পাল্টা গুলী বর্ষণ শুরু করল। এই গুলি বর্ষণে আমাদের কয়েকজন সৈন্য আহত হয় এবং আমার পায়েও একটা গুলী লাগে। আমরা ভাবতে পারিনি যে অপ্রস্তুত ফকীর সন্ন্যাসীগণ এরূপ অতর্কিত আক্র-মণের পরও আমাদের রুখে দাঁড়াতে পারবে। প্রায় আধ ঘন্টা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এই ফকীর দল স্থান ত্যাগ করে। তাদের নেতা মজনু শাহও অশ্বপৃষ্ঠে পলায়নে সমর্থ হয়।"[৪২]

ময়মনসিংহের আলাপসিংহ পরগনায় ১৭৮২ সালের দিকে ফকীর সন্ন্যাসীদের তৎপরতা তীব্র আকার ধারণ করে। এ সময় পুখরিয়া নামক স্থানে মজনুর সাথে কোম্পানীর সৈন্যদলের এক সংঘর্ষ হয় এবং মজনু শাহ্ শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মধুপুর জঙ্গলে পালিয়ে যান। ১৭৮৫ সালের দিকে মজনু শাহ পুনরায় মহাস্থান গড়ের দিকে অগ্রসর হন। এ সময় কোম্পানীর সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটে। পরবর্তী বছর ফকীরগণ স্বতন্ত্র দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত হন। মজনুশাহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ জেলা সংলগ্ন অঞ্চল এবং অন্যদিকে মুসা শাহের নেতৃত্বে উত্তর বঙ্গে কোম্পানী বিরোধী বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা শুরু করেন। এই দ্বিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল সম্ভবতঃ কোম্পানীর শক্তি ও ক্ষমতাকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত করে তোলা। ১৭৮৬ সালে মজনু শাহের সাথে কোম্পানীর সৈন্যদলের পর পর দু'টি মারাত্মক সংঘর্ষ

হয়। এ সময় লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের সাথে কালেশ্বর এলাকায় সংঘর্ষে মজনু শাহ তাঁর বহুসংখ্যক অনুসারী হারান। তাঁর আহত অনুচরদের একাংশকে ডুলি যোগে মেওয়াট নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে মজনু শাহ নিজে কোন অভিযান পরিচালনা করেন নি। সম্ভবতঃ ১৭৮৭ সালে কানপুর জেলার মাখনপুরে মজনু শাহ মৃত্যুবরণ করেন।

মজনুশাহের উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, পরাগল শাহ, সোবাহান শাহ, মাদার বক্স, জরিশাহ, করিম শাহ প্রমুখ যারা অনেকেই ছিলেন মজনুশাহের আত্মীয়। ফকীর সন্যাসী আন্দোলনের পুরোধা মজনুশাহ লোকান্তরিত হবার পরও তাঁর সুযোগ্য উত্তর সূরীগণ পুরো আঠারো শতক পর্যন্ত এই আন্দোলন অসব্যাহত রাখেন। তবে ক্রমশঃ এই আন্দোলনের গতি হয়ে পড়ে স্তিমিত। বাংলাদেশে ফকীর-সন্যাসী আন্দোলন দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে এবং প্রায় সমগ্র অঞ্চল জুড়ে প্রসার লাভ করেছিল, কিন্তু স্বল্প পরিসরের প্রবন্ধে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়।

ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহে বাংলার একটি শ্রেণী ফকীর-সন্যাসীদের বিরোধিতা করেছেন, যারা ছিলেন মূলতঃ যুগান্তর যুগের উঠতি পুঁজিপতি, প্রকৃতপক্ষে তখন বাংলায় কান্তবাবু, দেবী সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, রামকান্ত রায়, দুলাল রায় ও জয় নারায়ণ ঘোষালের মত বেনিয়া ও মুৎসুদ্দির অভাব ছিল না এবং ফকীর-সন্যাসী-বিদ্রোহ ছিল তৎকালীন উঠতি পুঁজিপতি বেনিয়া ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে। কেননা কোম্পানীর সুসংহত শাসন ও শৃংখলা তাদের স্বার্থের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক ছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর বিরোধিতার পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। অন্যদিকে এই বিদ্রোহে কতিপয় জমিদার ও তাদের কর্মচারীদের সাহায্য দানের প্রমাণও বিরল নয়।[৪৩] কোম্পানীর নতুন শাসন পদ্ধতি কেবলমাত্র ফকীর-সন্যাসীদেরকেই বিদ্রোহী করে তোলেনি, সাধারণ কৃষক জমিদার ও বেকার সৈন্যদলকে বিদ্রোহী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অবশ্য এই জমিদারদের একটা অংশ ছিল পূর্বতন জমিদার যারা কোম্পানীর রাজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভূমির রাজস্ব আদায়ের অধিকার চ্যুত হন। অন্য অংশটি ছিল উদ্ভূত অর্থনৈতিক অবস্থায় বিক্ষুব্ধ। এছাড়া ফকীর-সন্যাসীদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তাদের নিশ্চিত আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এমন মনে করেও কতিপয় জমিদার ফকীর-সন্যাসীদের পক্ষ অবলম্বন করে। এখানে জমিদারদের ভূমিকা ছিল কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ও সৈন্যদলকে বিদ্রোহী ফকীর-সন্যাসী-দের বিরুদ্ধে সাহায্য না করার মধ্যেই সীমিত। লক্ষ্য করা যায় যে

ফকীর-সন্যাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাকারী কোম্পানীর সৈন্যাধ্যক্ষ প্রায়ই তাদের কর্ম-তৎপরতায় জমিদারদের অসহযোগিতা সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন।[৪৪] এই পরিস্থিতিতে কোম্পানীকে জমিদারদের অবশ্য করণীয় কর্তব্যসমূহ ও শাস্তিযোগ্য কার্যাবলী সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করতে হয়। ১৭৮৩ সালের ১২ই আগষ্ট স্বপরিষদ গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রণীত রেগুলেশনে বলা হয় যে জমিদারগণ তাদের নিজেদের এলাকায় কোন ডাকাত বা দুস্কৃতিকারী যদি আশ্রয় দেন, অথবা দুস্কৃতিকারীর অবস্থান সম্পর্কে কোন সংবাদ কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই অবগত না করান তা হলে সেসব জমিদারকে বিচারের জন্য ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করা হবে।[৪৫] কিন্তু এই রেগুলেশনটি যে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়নি, তা কোম্পানীর কর্মচারীদের সংশয় ও অন্যান্য বক্তব্য হতে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। ১৭৮৮ সালে নিয়ামতপুরে মুসা শাহ্ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে কোম্পানীর সৈন্যদলের এক সংঘর্ষের পর ফকীরগণ শৈলবর্ষের দিকে অগ্রসর হলে দিনাজপুরের কালেক্টর রংপুরের কালেক্টরের মাধ্যমে রংপুর এলাকায় ফকীরদের আশ্রয় না দেয়া এবং ফকীরদের বাধা প্রদান ও গ্রেপ্তারের জন্য জমিদারদের সাহায্য কামনা করেন।[৪৬] জমিদার শ্রেণী ব্যতীত ফকীর-সন্যাসীগণ স্থানীয় জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেন। রকতুল্লাহ্ প্রদত্ত বিবরণীতে কিন্তু দেওয়ান কর্তৃক পরাগ আলী ও অন্যান্য ফকীরদের সাহায্য দান স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রমাণ করে যে ফকীর-সন্যাসীগণ স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য ও লাভ করেন। ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহে স্থানীয় জনগণের ভূমিকার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে কোম্পানীর কর্মচারীগণও ব্যর্থ হয়েছেন। কখনও কখনও গ্রামবাসীদের নিস্ক্রিয়তা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছেন কোম্পানীর কর্মচারীগণ। রাজশাহীতে এক সংঘর্ষের সময় গ্রামবাসী কোম্পানীর জমাদার বা গুপ্তচর কাউকেই সাহায্য করেনি; অন্যদিকে তারা ফকীরদের কোন প্রকার বাধা প্রদানও করেনি।[৪৭] প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাসীদের এই নিস্ক্রিয় ভূমিকা প্রকারান্তরে ফকীরদের প্রতি সহযোগিতা মূলক। এ তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সাধারণ জনগণ তথা গ্রামবাসী ফকীর-সন্যাসীদের বিরুদ্ধে কোম্পানীকে কোন প্রকার সাহায্য করেনি, অধিকন্তু কোম্পানীর সৈন্যদলের সাথে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে গ্রামবাসীগণ ফকীর-সন্যাসীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দিনাজপুরের কালেক্টর লিখেছেন যে গ্রামবাসী বিপদের সময় ফকীর-সন্যাসীদের আশ্রয় প্রদান করে। গ্রামবাসীগণ এই তৎপরতা হতে বিরত না হলে

ফকীর-সন্যাসীদের আক্রমণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা সম্ভব হবে না।[৪৮] ফকীর-সন্যাসীদের সাথে গ্রামবাসীদের একাত্ম হয়ে যাবার তথ্য যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, তেমনি, এই তথ্য নিঃসন্দেহে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করে। এদেশের বৃহত্তম সমাজে ফকীর-সন্যাসী একটি সম্প্রদায়। দেশের চরম আর্থিক দুর্দশা ও শাসনের যাঁতাকলে ফকীর-সন্যাসীদের স্বার্থ ও তাদের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের স্বার্থে সাধারণ জনগণের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অভিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহে নিয়োজিত বিশুদ্ধ সৈন্যদলের সাথে, সাধারণ জনগণের অংশ গ্রহণের বিষয়টি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক।

ফকীর-সন্যাসীদের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন মজনু শাহ্। পঞ্চানন দাসের 'মজনুর কবিতা'র অন্তরালে মজনু শাহের যে প্রভাব ও প্রতিপত্তির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তাও মজনুকে ফকীর দলের নেতা হিসেবে উপস্থাপন করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মজনু শাহ্ ছিলেন শাহ্ সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানার উত্তরকালীন মাদারীয়া সুফী সম্প্রদায়ের নেতা। বাংলায় কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠা একদিকে তাঁর অপ্রতিহত গতিকে রুদ্ধ করতে পারে, অন্যদিকে তাঁর সুফী নেতৃত্বের সামাজিক মর্যাদায়ও আঘাত হানতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় তাঁর প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল না। বাংলার ইতিহাসে বিভিন্ন প্রকৃতির আন্দোলনে ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্ব প্রদানের তথ্য সর্বজনবিদিত। সম্ভবতঃ মজনু শাহ্ ছিলেন এই নেতৃত্বের পথিকৃত। অন্যদিকে সন্যাসীদেরও এই বিদ্রোহে একাত্মতা প্রকাশ করার পক্ষে কোন বাধা ছিলনা। কেননা ফকীর সন্যাসীগণ উভয়েই ছিলেন তৎকালীন কোম্পানীর শাসন প্রসূত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারের শিকার এবং উভয়েরই মূল লক্ষ্য ছিল এক। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ যেমন ফকীর-সন্যাসীদের সাধারণ শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতেন ফকীর সন্যাসীগণও তেমনি কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে শত্রু হিসেবে মনে করতেন। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দু'টি সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সন্যাসীদেরও পক্ষে ফকীর নেতা মজনু শাহের নেতৃত্ব মেনে নেয়া অসম্ভব ছিলনা। নেতৃত্বের প্রশ্ন ফকীর সন্যাসী বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় নি। সম্ভবতঃ যে অঞ্চলে ফকীর-সন্যাসীদের মধ্যে শক্তি ও সামর্থের তুলনায় যারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, তারাই সে অঞ্চলের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ফকীরেরা বা সন্যাসীগণ কখনও এককভাবে এবং কখনও যৌথভাবে অথবা কখনও

উভয় দলই কোন উল্লেখযোগ্য নেতা ছাড়াই বিদ্রোহ পরিচালনা করছেন। প্রকৃতপক্ষে এর কারণ ছিল তাদের মধ্যকার আদর্শগত ঐক্য। অবশ্য ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহের মধ্যে উভয় সম্প্রদায় কখনও কখনও আত্ম বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন। এই তথ্যটি বর্তমান প্রবন্ধের পরিমন্ডলে বিবেচনা করলে বলতে হয় যে তাদের মধ্যকার আত্মকলহ সম্ভবতঃ নেতৃত্বের কোন্দল বা ভুল বুঝাবুঝিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহের পরবর্তী নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী ও রাজবল্লভ প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাম নিয়ে 'আনন্দ মঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসদ্বয়ে যে কাহিনীর অবতারণা করেছেন তার তেমন কোন ইতিহাসগত ভিত্তি নেই, একথা যদুনাথ সরকার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[৪৯] উপরোক্ত উপন্যাসদ্বয়ে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও ভবানী পাঠকের কর্মতৎপরতা তাকে ফকীর সন্যাসীদের নেতা হিসেবে উপস্থাপন করে। ভবানী পাঠক একজন ভোজপুরী ব্রাহ্মণ এবং সরকারী নথিপত্র ভবানী পাঠককে ডাকাত হিসেবে অভিহিত করে।[৫০] লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের বিবরণ অনুযায়ী দেবী চৌধুরাণী একজন ছোট জমিদার, যার সাথে ভবানী পাঠকের যোগাযোগ রয়েছে এবং ভবানী পাঠকের সাথে মজনু শাহের যোগাযোগ রয়েছে।[৫১] ভবানী পাঠক কেবল মাত্র কোম্পানীর রপ্তানী বাণিজ্যের সহায়ক দেশীয় বণিকদের গাঁজা ও আফিমের নৌকাই লুঠ করছেন না, তিনি ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহ প্রতিহত করার জন্য নিয়োজিত লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের সৈন্যদলের রসদ যোগানোর নৌকাও লুঠ করেছেন। অধিকন্তু ভবানী পাঠক কোম্পানীর গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও সরাসরিভাবে অগ্রাহ্য করেছেন।[৫২] তবে ভবানী পাঠককে দেবী চৌধুরাণী বা মজনু শাহের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কোন বিদ্রোহ পরিচালনা করতে দেখা যায় না। তাই ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর সাথে ফকীর-সন্যাসীদের সম্পর্ক কিছুটা অস্পষ্ট হলেও একথা বলা যায় যে ভবানী পাঠক ছিলেন কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী একজন নেতা।

ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। একজন গবেষক একে 'দস্যু', 'ডাকাত' ও 'দুস্কৃতকারী'দের তৎপরতা হিসেবে অভিহিত করতে উদ্যোগী। অন্য লেখক ও গবেষকগণ এই বিদ্রোহকে এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত বলে মনে করেন। যাঁরা একে 'ডাকাত' ও 'দুস্কৃতকারী'দের তৎপরতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তাঁরা সরাসরি ও নির্বিচারে সরকারী নথিপত্রের ভাষাকে সত্য

হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৫৩] অন্যদিকে যাঁরা ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁরা কোম্পানীর দলিল পত্রে উল্লিখিত 'ডাকাত' ও 'দুস্কৃতিকারী' ইত্যাদি শব্দের সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[৫৪] ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দলিল পত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যার পরিবর্তনের বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন অধ্যাপক রণজিৎ গুহ। তিনি দলিলপত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন শব্দের সঠিক অর্থের জন্য স্বনির্বাচিত শব্দ গ্রহণ করেছেন এবং গবেষকদের পরামর্শ দিয়েছেন দলিল ওল্টানোর। কিন্তু বাংলায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আমলের প্রত্যেকটি দলিল উল্টিয়ে অধ্যাপক গুহের নির্দেশিত পথে ও পদ্ধতিতে এ দেশের ইতিহাস রচনা করলে ঐ শতাব্দীগুলোতে এ দেশকে একটা স্বর্গরাজ্য বলে মনে হবে, যেখানে 'দস্যু' বা 'ডাকাত'দের তৎপরতা বলে কিছু ছিল না। দলিল ওল্টানোর এই প্রস্তাবটিকে এদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে অত্যন্ত বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।[৫৫] যা হোক, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নথিপত্রে উল্লিখিত তথ্য সঠিক হিসেবে গ্রহণ করার প্রচলিত পদ্ধতি এবং কোম্পানীর দলিলপত্রে প্রদত্ত তথ্য ওল্টানোর প্রস্তাবিত পদ্ধতি উভয়কে বাদ দিয়েও সত্যানুসন্ধান ও সত্য-নিষ্ঠ ইতিহাস চর্চা সম্ভব। কোম্পানীর নথিপত্রে প্রদত্ত তথ্যের তুলনামূলক ব্যাখ্যার পদ্ধতি সম্ভবত এই জটিলতার নিরসন করতে সাহায্য করবে। কোম্পানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে 'ডাকাত'দেরই এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ ও ১৭৭৩ সালে 'ডাকাত'দের সম্পর্কে দু'টি বক্তব্য রেখেছেন, যা পরস্পর বিরোধী তথ্য বহন করে। ১৭৭৩ সালে তিনি লিখেছেন বাংলার ডাকাতেরা সমাজের বিরুদ্ধে প্রায় ঘোষিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।[৫৬] কিন্তু ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস পুনরায় লিখেছেন যে বাংলার ডাকাতেরা ইংলন্ডের মত জরুরী প্রয়োজনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় রত নয়। সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বাংলার ডাকাতগণ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত।[৫৭] ডাকাতদের সম্পর্কে কোম্পানীর একজন কর্মকর্তার এই দু'টো বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে ওয়ারেন হেষ্টিংস ডাকাতদের একবার সরকারের বিরুদ্ধে এবং একবার সমাজের বিরুদ্ধে প্রায় ঘোষিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই সরকারটি হল একটি বিদেশী বণিকদল যাঁরা এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বহির্ভূত জনসমষ্টি। অন্যদিকে ডাকাতগণ যে সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত তারা সে সমাজেরই একটি অংশ—এ তথ্যটি স্ববিরোধী। এক্ষেত্রে কোম্পানীর

দলিল না উল্টালেও সহজেই অনুধাবন করা যায় যে ডাকাত হিসেবে আখ্যায়িত এই জনগণের তৎপরতা হচ্ছে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে সমাজের একটি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহকে এই দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করাই খুব সম্ভবতঃ সমীচীন হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহের উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। তবে এই বিদ্রোহে স্থানীয় সাধারণ জনগণ, জমিদার ও বেকার সৈন্য দলের অংশগ্রহণ স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে বাংলায় ইণ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহ ছিল কোম্পানীর শাসন বিরোধী একটি সশস্ত্র প্রতিক্রিয়া।

বাংলায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার লগ্নে উদ্ভূত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ণে একটি স্থানীয় প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফকীর-সন্যাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। বাংলার প্রত্যেকটি অঞ্চলে এই বিদ্রোহের প্রসার না ঘটলেও এর ব্যাপ্তি ছিল অনেক। একটি বিশেষ যুগে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ফকীর-সন্যাসী সম্প্রদায় এই বিদ্রোহের পুরোগামী থাকলেও স্থানীয় সাধারণ জনগণ, জমিদার ও বেকার সৈন্যদলের সম্মিলন হয়েছিল এই বিদ্রোহে। ১৭৬৩ সাল হতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এই সশস্ত্র বিদ্রোহ চলতে থাকে এবং কোম্পানীর প্রশাসনও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিদ্রোহ স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। কোম্পানী সরকারের তুলনায় অনেক কম শক্তিশালী ফকীর-সন্যাসীদের কোম্পানীর তৎকালীন উন্নততর রণকৌশল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির নিকট পরাজয় ছিল স্বাভাবিক। অন্যদিকে ফকীর-সন্যাসীদেরও যথোপযুক্ত ও শক্তিশালী সংগঠনের অভাব এবং পরবর্তীকালের নেতৃত্বের অভাব তাদের পরাজয় ও বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে যাবার প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে। যাই হোক, বাংলায় কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে ফকীর-সন্যাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রথম প্রতিবাদের পরিচয়ে পরিচিত।

পরিশিষ্ট

Extract of a letter from the Collector of Dinajpur, 22June, 1788.

"It would appear that during the pursuit by the Detachment the Inhabitants of these Villages made away with the Baggage which Mussa Saw had abandoned ; I have therefore

to request you call upon the Chief Officers of these villages to account for the articles if as surmised, they should have been detained, and cause them to be sent to Dinagepore, in order to their being made over to the Detachment, to whom right, Booty of this description, belongs.

"It has been further represented that the people, in this and the neighbouring villages, withheld their assistance at the moment, when, if it had been afforded, in all probability this Marauder would have been captured. The alertness of the villagers to seize (if what is asserted be found true) upon what did not belong to them, manifestly shews (sic), that were Timidity is not solely the cause of their flying. or remaining inactive, as in their custom, upon these occassions.

"The *Fakeers* never fail to leave spies when they are pursued, and from them, receive information of all occurances which take place in consequence of their flight. It is therefore much to be apprehended that the villagers on these Events become Partisans of the Fakeers, and restore to them in the house of safety. What they took charge of at the moment of their Danger ; and this may be a subject worthy of investigation, in as much that if shelter, be proved to be connived at by the villagers, in respect to the persons of the Fakeers or the Articles, they may of necessity upon occasions of pursuit be obliged to abandon, all attempts to clear the Districts of these Free-booters will be fruitless."

Bangladesh Secretariat Records, Dinajpur District. Register of Letters Sent to the Board of Revenue, Vol. 334, pp. 302-303.

তথ্য নির্দেশ

১. ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত ও তথ্যবহুল রচনার তালিকা নিম্নরূপ ঃ

Jamini Mohan Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal*, Calcutta, 1930 ; A. N. Chandra, *The Sannyasi Rebellion*, Calcutta, 1977 ; সুপ্রকাশ রায়, "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ

ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'', কলিকাতা, ১৯৮০ ; সুপ্রকাশ রায়, ''মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক''. কলিকাতা ১৯৮০ ; নরহরি কবিরাজ, ''স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা'' ঢাকা, ১৯৭৭ ; আবু জাফর, ''স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস'', ঢাকা, ১৯৭১ ; মুহম্মদ আবু তালিব, ''ফকীর নেতা মজনু শাহ'' ঢাকা, ১৯৬৯ ; অরুন কুমার মজুমদার, ''ইতিহাসের বালু-বেলায়'', কলিকাতা, ১৯৭৪ ; রতন লাল চক্রবর্তী ; 'ফকীর-সন্যাসী আন্দোলনের কয়েকটি দিক', ''ইতিহাস সমিতি পত্রিকা''. তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ১৩৮১-৮২ ।

২. J. Spencer Triminghum, *The Sufi Orders in Islam*, Oxford, 1971, p. 97 ; *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, New-York, vol.xi. (n. d) p. 70 ; also John A. Subhan, *Sufism : Its Saints and Shrines*, Lucknow, 1938, pp. 302-306.

৩. For details, see, Khaja Khar, 'Sufi Orders in the Deccan', *The Moslem World*, vol. 18, 1928, p. 283.

৪. Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufiism in Bengal*, Dacca, 1975, p. 151.

৫. Maulavi Abdul Wali, 'Notes on the Fakirs of Baliya Deghi in Dinajpore', *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, 1903, pp. 61-65 ; M. N. Haq, 'Shah Badi-al din and his Tarigh in Bengal', *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*. vol. 12, 1967, pp. 95-110.

৬. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, London, 1883, pp. 62-63 ; also Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal*, Dacca, 1959, pp. 114 and 170.

৭. W. Crooke, *The Popular Religion and Folklore of Northern India*, London, 1896, vol. I, p. 216.

৮. Seid Ghulam Hossain Khan, *Seir Mutakherin*, Calcutta, 1902, vol. I, p.244.

৯. Mohammad Yasin, *A Social History of Islamic India* Lucknow, 1958, pp. 80-81.

১০. Maulavi Abdul Wali, 'Notes on the Fakirs of Baliya Dighi in Dinajpur', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1903, pp. 62-63.

১১. M. M. Haq, 'Shah Badi-al-din and his Tarigah in Bengal', *Journal of the Asiatic Society of Pakistan* vol. 12, 1967, p. 109.

১২. Letters from Charles Grant to Augustus Clevand and Gilbert Ironside, 6th and 8th March, 1783, Revenue Department Consultation No. 14, 8th April, 1783 and Public Department Original Consultation Nos. 13 and 15, 15th March, 1733, quoted in Jamini Mohan Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal*, p. 80.

১৩. পঞ্চানন দাসের কবিতার প্রথমেই বলা হয় ঃ

> "শুন তবে একভাবে নৌতন রচনা।
> বাঙ্গলা নাশের হেতু মজনু বারনা ॥"

উদ্ধৃত, Jamini Mohan Ghosh *Sannyasi and Fakir Raiders*, পরিশিষ্ট।

১৪. J. N. Fraquhar, *The Crown of Hinduism*, Delhi 1971, p, 265.

১৫. J. N. Fraquhar, 'The Organization of Sannyasis in the Vedanta', *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 1925, p. 432.

১৬. For details see, E. G. Glazier, *A Report on the District of Rangpore*, Calcutta, 1873, pp. 88-89.

১৭. Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, Dacca, 1961. p, 20.

১৮. Muhammad Mohsan Fami, *Dabistan-ul-Mazahib*, (Shea and Troyer, MDCCCLXXXIV), quoted in Mohammad Yasin, *A Social History*, p. 80.

১৯. Jagadish Narayan Sarkar, *Islam in Bengal*, Calcutta, 1972, p. 37.; A. R. Mallick, *British Policy*, pp, 10-11.

২০. Muhammad Enamul Haq, *Sufism in Bengal*, p. 130.

২১. Suniti Kumar Chatterjee, 'The Eighteenth Century in India', in Muhammad Enamul Haq (ed.), *Muhammad Shahidullah Felicitation Volume*, Dacca, 1966, p. 126.

২২. Syed Muhammad Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka*, Dacca, 1966, p. 291.

২৩. *Imperial Gazetteer of India*, Makhanpur, p. 43.

২৪. মুহম্মদ আবু তালিব, "ফকীর নেতা মজনু শাহ" ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৬৬।

২৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ২২।

২৬. Montgomery Martin, *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* London, vol. III, p. 515.

২৭. হ্যামিলটন বুকানন তাঁর বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেন: "Next by far the greater part of *Fakirs* are married. Many of them also have endowments, with both their own support (*Lakeraj*), and for supplying the monument of a Saint with a lamp (*Cheragi*), and with a Couopy (*Pirpal*)." Buchanan Hamilton. *Account of Rangpur, India Office Library and Records*. MSS Eur. D. 74, 1810 Book—I, p. 76. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মাইক্রোফিল্ম আকারে সংরক্ষিত।)

২৮. Broughton's Letter from Maratha Camp, quoted in Jamini Mohan Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders*, p. 10.

২৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", পৃঃ ২২।

৩০. W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, London, 1868, pp. 70-71.

৩১. মুহম্মদ আবু তালিব, "ফকীর নেতা মজনু শাহ", পৃঃ ৪৮।

৩২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Azizur Rahman Mallick, *The British Policy and the Muslims of Bengal*, pp. 36-46.

৩৩. জেমস রেনেল নিজেই লেখেন: "The dirgah there affords a pretence to the faquirs to assemble, and at the fair which is hold in December they are furnished with arms of all kinds, and commonly sally forth these 2000 strong" James Rennel to Samuel Middleton, Comptrolling Council of Revenue, Seergunge, 1 march, 1777, in W. K. Firminger. 'Two Letters of Major James Rennell', *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, vol. ix, 1913, pp. 173-75.

৩৪. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. viii. London, 1877, p. 20.

৩৫. Letter from the Committee of Circuit, 31 December 1772, quoted in Jamini Mohan Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders* p. 51

৩৬. Re[illegible] [illegible]ment Original Consultation. No 27, 29 October, 1793, quoted in Jamini Mohan Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders*, pp. 22-23.

৩৭. Richard Goodlad to Ensign Colby, 12 April, 1783, *Bang-*

"... a race of outlaws who live, from father to son, in a state of warfare against society, plundering and burning villages and murdering the inhabitants". Letter from Warren Hastings, 8 July, 1773, quoted in W. R. Gourlay, *A Contribution Towards A History of the Police in Bengal.* (Calcutta, 1916), p. 27.

৫৭. ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছিলেন : "... they (the dacoits of Bengal) are all therefore alike criminal, wretches who have placed themselves in a state of declared war with government, and are therefore wholly excluded from every benefit of its laws." Letter from Warren Hastings, quoted in *Report from the Select Committee af the House of Commons on the Affairs of the East India Company*, 16th August, 1832, London, January, 1833, p .35

রতন লাল চক্রবর্ত্তী

রংপুর কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩)

রংপুর ছিল কৃষক বিদ্রোহের উর্বর ভূমি এবং কৃষক সচেতনতার ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকায় ভাস্বর। 'ঘোড়াঘাট সরকারের পাঠান বিদ্রোহ',[১] একটি রাজনৈতিক প্রকৃতির হলেও মীরকাশিমের শাসনামলে রাজস্ব বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে রংপুরের কাজীরহাট বিদ্রোহে[২] কৃষক আন্দোলনের যে সূচনা হয়েছিল, ঔপনিবেশিক শাসনামলে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। মীরজাফরের শাসনামলে ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের ফলে প্রচুর পরিমাণ খাজনা হ্রাস; ১৭৮৩ সাল হতে প্রায় একদশক পর্যন্ত কৃষক বিদ্রোহ;[৩] উনিশ শতাব্দীর শেষার্ধে নীল চাষ ও জমিদারীর প্রথার বিরুদ্ধে প্রজা অসন্তোষ বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কৃষি বাণিজ্যে অনুমোদিত আদায় ও শোষণ[৪] এবং হাটতোলা আন্দোলন[৫] (১৯৩৭-৪০); সর্বোপরি এই শতকের চার দশকের তেভাগা আন্দোলন[৬] প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের তথ্য তুলে ধরে। ১৭৮৩ সালের রংপুর কৃষক বিদ্রোহ ছিল এই অঞ্চলের প্রথম সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম।

মুসলমান শাসনের পূর্বে রংপুর ছিল কোচবিহার রাজের অধীনে। ১৬৮৭ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় রংপুর মুঘলদের অধিকারভুক্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দখলী ভূম্যধিকারীকে চৌধুরী হিসেবে ভূমি বন্দোবস্ত দেবার প্রাচীন নীতি অনুসৃত হয়। রংপুরে এই ভূমি ব্যবস্থা ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত- অব্যাহত থাকে, যেখানে চৌধুরীদের ভূমিকা ছিল তহশীলদারদের মতো কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যেই সীমিত।[৭] ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলার দেওয়ানী লাভ হতে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত রংপুরের রাজস্ব নীতি ও ভূমি ব্যবস্থা কোম্পানীর তৎকালীন রাজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত রংপুরেও প্রমাণিত হয় ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার জন্য অন্যান্য কারণ ব্যতীত রংপুরে 'শারাফ'[৮]

নামে স্থানীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীদের অবলুপ্তি এবং 'নাকাদ' বা রেশম শ্রমিকদের রাজস্ব প্রদান হতে অব্যাহতি ইত্যাদি অবস্থাও দায়ী ছিল।

রংপুরে কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যর্থতার সাথে সমসাময়িক কৃষক বিদ্রোহের অনিবার্য যোগসূত্র রয়েছে এবং এজন্যই কৃষি অর্থ-নীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত উপরোক্ত অবস্থা দু'টির বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমতঃ শারাফ শ্রেণীর অবলুপ্তি কৃষক সম্প্রদায়ের মুদ্রা সম্পর্কিত বিভ্রান্তি এবং পরিবর্তিত মুদ্রানীতি কৃষকদের আর্থিক ক্ষতির প্রধান কারণ ছিল[৯] কোম্পানীর বাংলার। ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী সরকারকে রাজস্ব প্রদানের কিস্তির ১৫-২০ দিন পূর্বে শারাফগণ জমিদারের পক্ষে পরবর্তী বিল প্রদান করতেন। এই অর্থ পরিশোধের সময় হলে শারাফগণ স্হানীয়ভাবে বহুল প্রচলিত নারায়নী মুদ্রা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীলমোহরকৃত মোড়কে জমা দিতেন এবং পরবর্তী সময়ে বাণিজ্যের জন্য প্রচলিত ফরাসী আর্কট মুদ্রায় উপরোক্ত নারায়নী মুদ্রার সমমূল্যে অর্থ প্রদান করলে পূর্বের সীলমোহরকৃত নারায়নী মুদ্রার মোড়ক ফেরৎ নিতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নারায়নী মুদ্রা ছিল স্হানীয়ভাবে বহুল প্রচলিত এবং ফরাসী আর্কট মুদ্রার চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। শারাফদের সরকারী ভাবে বিলোপ ঘোষণা করা হলে নারায়নী ও ফরাসী আর্কট মুদ্রার বিনিময় কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং কৃষক সম্প্রদায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন।[১০] দ্বিতীয়ত, নাকাদ বা রেশম শ্রমিকদের সেস্ ইত্যাদি রাজস্ব প্রদান হতে অব্যাহতি দেওয়া হলে বহুসংখ্যক কৃষি শ্রমিক চাতুরীর মধ্যমে নাকাদ হিসেবে আত্মপরিচয় প্রদান করেন। ফলে অবস্হানরত রায়তদের ওপর খাজনার চাপ বেশী পড়ে।

১৭৭২ সাল হতে ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় রংপুরেও পাঁচশালা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় এবং ১৭৭৮ সাল হতে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত সেখানে বাৎসরিক বন্দোবস্ত দেবার নীতি অনুসৃত হয়। উল্লেখ্য যে উপরোক্ত সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে জমি-দারদের প্রত্যক্ষ ভূমি বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতি পরি-বর্তনের মাধ্যমে ১৭৮১ সালে কামালউদ্দিন হোসেন নামে জনৈক ব্যক্তিকে দু'বছরের জন্য রংপুরের জমিদারী ইজারা দেওয়া হয়। দেবী সিংহ ছিলেন এই বন্দোবস্তের প্রধান প্রতিভূ এবং প্রকারান্তরে কার্যতঃ ইজারাদার।[১১] পরবর্তী বছর দেবী সিংহ পুনরায় অধিক বর্ধিত সদর জমায় জমিদারী সমূহ বন্দোবস্ত দেন। ফলে রাজস্বের খুব বড় একটি অংশ অনাদায়ী থাকে। যদিও সরকারী নথিপত্রে বলা হয়েছে যে জমিদারী পরিচালনায়

অব্যবস্থা এবং বহিস্কৃত ও হতাশাগ্রস্ত জমিদারদের প্ররোচনায় রংপুরের কৃষকদের একাংশ এই বছর (১৭৮১) রাজস্ব প্রদান হতে বিরত থাকেন, কিন্তু সম্ভবতঃ জমা বৃদ্ধির বিষয়টিই ছিল কৃষকদের রাজস্ব প্রদান না করার একমাত্র কারণ। কেননা রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে জমিদার ও কৃষক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন।" উল্লেখ্য যে দেবীসিংহের নতুন ভূমি ব্যবস্থা জমিদারদের স্বাধীন মর্যাদায় আঘাত হানে। কোম্পানীর সাথে প্রত্যক্ষ বন্দোবস্ত গ্রহণের পূর্বে জমিদারদের অবস্থা ও পদমর্যাদা যাই থাকুক না কেন, ১৭৭২ সালে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাঁরা কম বেশী স্বাধীনতা লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেবী সিংহের তত্ত্বাবধানে ভূমি বন্দোবস্ত ছিল অনেকাংশে পরাধীনতা যা জমিদারগণ মেনে নিতে পারেন নি এবং প্রধূমিত কৃষক অসন্তোষকে বিদ্রোহে পরিণত করার ইন্ধন যোগান।[১২] সমসাময়িক সরকারী বিবরণী রংপুরের জমিদারদের অকর্মণ্যতা ও গোমস্তার উপর নির্ভরশীলতাকে রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছে। কেননা গোমস্তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি কৃষককে উৎপীড়ন, অত্যাচার ও শোষণের প্রধান সহায়ক হয়। অন্যদিকে 'শারাফ' পদ্ধতির অবসান কৃষক সম্প্রদায়কে দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রথমতঃ শারাফ পদ্ধতির অবসানের ফলে জমিদারকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব প্রদান করতে হয়। জমিদার রাজস্ব প্রদানে অপারগ হয়ে কৃষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করেন এবং কৃষকগণ এই অসময়োচিত ও অবৈধ চাপের মুখে অসুবিধাজনক শর্তে তাদের ফসলাদি বিক্রয় করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়তঃ সিক্কা টাকার তুলনায় নারায়নী মুদ্রার মূল্যমান মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়, এমনকি শতকরা ১৫-২০ ভাগ বাটা দিতে হয়।[১৩] প্রচলিত মুদ্রার বাটা এবং ওজন ঘাটতি রংপুরের কৃষকদের অসন্তোষের একটা বড় কারণ হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। ১৭৮১ সালে দেবী সিংহ কর্তৃক জমিদারদের খাজনা হতে বাটা এবং ওজন ঘাটতির সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ[১৪]

খাত	টাকা	আনা	গন্ডা	কৌশিক
বাটা	৭২,৩৫৪	৫	১০	৩
ওজন ঘাটতি	২৪,৯০০	৯	৫	০
মোট	৯৭,২৫৪	১৪	১৫	৩

সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে প্রচলিত নারায়নী মুদ্রাকে আর্কট মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে মাত্রাতিরিক্ত বাটা ও মুদ্রার ওজন ঘাটতির জন্য প্রচুর অর্থদাবী জমিদার ও কৃষক উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১৭৮৩ সালের রংপুর কৃষক বিদ্রোহের কারণ ছিল কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রসূত অসন্তোষ ও অত্যাচার। এই বিদ্রোহে কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে প্রাক্তন ও নতুন উভয় জমিদার শ্রেণী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং কোম্পানীর রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রতি উভয় শ্রেণীর অসন্তোষ থাকাই স্বাভাবিক এবং কখনও কখনও বিষয়টি একে অন্যকে অধিক্রমণ করে। জমিদারদের অভিযোগের মধ্যে প্রধান ছিলঃ ক. মাত্রাতিরিক্ত জমা বৃদ্ধি; খ. বর্ধিত জমার ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণে জমিদারদের বাধ্যকরণ এবং রাজস্ব বাকী পড়লে একই পদ্ধতিতে ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণে বাধ্যকরণ। প্রয়োজনে জমিদারদের কাচারীতে আবদ্ধ রেখে ভিন্ন ব্যক্তি বা আমলা নিয়োগের মাধ্যমে আটককৃত জমিদারদের রাজস্ব আদায়; গ. সদর জমার উপর অননুমোদিত কর আরোপ সহ বিভিন্ন অবৈধ উপকর ধার্যকরণ; ঘ. মুদ্রা সম্পর্কিত জটিলতা; ঙ. বলপূর্বক ভূমি বিক্রয় ও হস্তান্তরে বাধ্যকরণ এবং জমিদারী, তালুক ও খামার ভূমি হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় পদ্ধতি; চ. রাজস্ব আদায়ে শারীরিক অত্যাচার।[১৫]

লক্ষ্য করা যায় যে রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয়টি ছিল একটা সাধারণ অসন্তোষ। ১৭৮০ সালে ডিহি জুমতালের সদর জমা ছিল ২৯২২৫-৭-৮-২ টাকা, কিন্তু ১৭৮১ সালে এই অঞ্চলের সদর জমা পুনর্নির্ধারিত হয় ৩২৭৫৫-৭-৮-২ টাকা। রাজস্ব বৃদ্ধি ও একই সময় বিভিন্ন কর ও উপকর আরোপ অবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে। বিষয়টি নিম্নে প্রদত্ত সারণী হতে ভালভাবে অনুধাবন করা যায়।

১৭৮২ সালে কাজীর হাট তালুকের রাজস্ব বন্দোবস্তের পূর্ণ বিবরণ[১৬]

১৭৮১ সালের জমা	৯২৭-১৩-২-২	
রায়তদের স্থান ত্যাগের জন্য হ্রাস	৩১- ৯-০-২	
	৮৯৬-১৩-২-০	=৮৯৬-১৩-২-০
কর্তনী ও হুন্ডি বাবদ	৯১-৪-১০-০	
উৎপাদন বৃদ্ধিজনিত কর	২০৭-০ -০-০	=২৯৮-৪-১০-০
		১১৯৫-১-১২-০
রায়তদের দাবীর ফলে হ্রাস	২৮-০-১০-০	= ২৮-০-১০-০
	সর্বমোট	=১১৬৭-১-২-০ টাঃ

উপরোক্ত সারণী হতে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে কাজীর হাট তালুকের রাজস্ব প্রশাসনের ক্ষেত্রে ইজারাদার ৫৯-৯-১২-০ পরিমাণ অর্থ কৃষকদের সুবিধার্থে হ্রাস করলেও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন

খাতে বর্ধিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৯৮-৪-১০-০ টাকা। সুতরাং বর্ধিত রাজস্ব দাবী ছাড়াও বিভিন্ন কর ও উপকর আরোপ এবং এ সব অর্থ আদায়ের জন্য অত্যাচারের আশ্রয় নেওয়াই ছিল ১৭৮৩ সালের রংপুর কৃষক বিদ্রোহের কারণ।

খাজনার টাকা প্রতি ১/২ টাকা দেরিণভিল্লা ছিল জমিদারদের বাৎসরিক কর হ্রাসের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে আরোপিত একটা উপকর এবং এই উপকর ছিল কৃষকদের একটা সাধারণ অসন্তোষ। জমিদারগণ বছর শেষে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু অর্থ হ্রাস করে কৃষকদের চাষাবাদে অনুপ্রেরণা দেন, পক্ষান্তরে 'দেরিণভিল্লা' নামক উপকর আরোপের মাধ্যমে পূর্বোক্ত খাজনা হ্রাসের ক্ষতিপূরণ করেন। অবশ্য এই দেরিণভিল্লা উপকর ইজারাদারগণ ও কালেক্টারের অনুমোদন ক্রমেই জমিদারগণ কৃষকদের নিকট হতে আদায় করতেন।[১৭] বিষয়টি আরো একটু ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে যে জমিদারগণ এক হাতে কৃষকদের নিকট প্রাপ্য খাজনার কিছু অংশ হ্রাস করে বদান্যতা প্রদর্শন ও কৃষকদের চাষাবাদে উৎসাহিত করেন এবং অন্য হাতে উপরোক্ত 'দেরিণ ভিল্লা' শিরোনামে উপকর ধার্য করে রাজস্ব হ্রাসকরণ জনিত অর্থক্ষতি পূরণ করেন। তবে সদর জমার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে এই উপকর রায়তদের নিকট খুবই অত্যাচারী বলে মনে হয়।[১৮]

দেরিণভিল্লা উপকর ব্যতীত এমন অনেক অননুমোদিত উপকর ও অবৈধ আদায় প্রচলিত ছিল যা কৃষকদের জীবনে দুর্দশার জন্ম দেয়। প্রথমত, রুসম নামে একটা উপকর চালু ছিল যা হলো কতগুলো উপকরের সাধারণ নাম সূচক। যদিও এই রুসম আদায় অননুমোদিত ছিল না, তবে বর্ধিত সদর জমার উপর অতিরিক্ত রুসম ধার্য করা হতো। দ্বিতীয়ত; কলকাতায় হুন্ডির মাধ্যমে রাজস্ব প্রেরণের জন্য এই খাতে আদায়কৃত অর্থের নাম ছিল হুন্ডিয়ান। ১৭৮১ সালে দেবী সিংহ এই খাতে অর্থ আদায় করলেও এই সময় সরকারীভাবে নিয়ম করা হয় যে রাজস্ব কলকাতায় প্রেরণ না করে স্থানীয় ভাবে রংপুরে প্রদান করতে হবে। দেবী সিংহ হুন্ডির জন্য আদায়কৃত অর্থের দাবী পরিত্যাগ করলেও জমিদারদের নিকট হতে দাবীকৃত মোট অর্থ হতে হুন্ডিয়ান শিরোনামের সমপরিমাণ অর্থ বাদ দেন নি। অধিকন্তু এই সব অবৈধ অর্থ-দাবী একত্র করে 'মুস্তাগারী রুসম' শিরোনামে আসল জমার উপর শতকরা ২ হতে ৮ হারে জমিদারদের নিকট অর্থ দাবী করেন।[১৯] তৃতীয়ত, ফেরারী ভূস্বামীদের অত্যাচার হতে অব্যাহতি পাবার জন্য রায়তদের পলায়নের ফলে অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ তথায় অবস্থানরত রায়তদের

উপর অননুমোদিত ভাবে আরোপের প্রথাই ছিল ফেরারী। ফেরারী আদায় ছিল রায়তদের সর্বজনীন অভিযোগ।[২০] এছাড়া 'সেবানি রোজ-নামটি' শিরোনামে একপ্রকার অবৈধ আদায় ছিল, যা ইজারাদারদের দৈনন্দিন আয়ের খাতে অন্তর্ভুক্ত হতো না। রায়ত কোন ব্যক্তিকে অর্থ ধার প্রদানে রাজী করতে পারলে তাকে টাকা প্রতি প্রতিদিন পাঁচ গন্ডা সুদ জমিদারকে দিতে হতো।[২১] এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার চাঁদা, ফরমাইস, পিয়ন খরচ, কারবারী, ইনাম, ডাকখরচ, হাঙ্গামা খরচ, দান খরচ, ফাওতি, সিজুয়াল খরচ, সাগরেদ পোষা, দাখিল দেওয়ানী চৌকিবন্দী, আবাদ-কামী, মেহমানী, নজরানা বা সেলামী ইত্যাদি হিসেবে, অর্থ আদায় এবং সিধা হিসেবে ধান চাল আদায় প্রচলিত ছিল।[২২] মৃত জমিদারদের পারলৌকিক ক্রিয়া তথা শ্রাদ্ধের জন্য কৃষকদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হতো।[২৩]

একদিকে জমিদারদের বর্ধিত হারে রাজস্ব দাবী, জমিদার ও গোমস্তা-দের বিভিন্ন অননুমোদিত ও অবৈধ উপকর দাবী, অন্যদিকে কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা মারাত্মক ও এক অসহ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আফিম উৎপাদনের জন্য গৃহীত অগ্রিম অর্থ পরিশোধের পর কৃষক নিঃস্ব হয়ে যায়। সম্ভবত, আফিমের উৎপাদন ব্যয় ও বাজার দরের মধ্যে সৃষ্ট অসামঞ্জস্যতা উপরোক্ত অবস্থার জন্য দায়ী ছিল। এই অবস্থায় অধিকাংশ কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত তামাকের বাজারদর মারাত্মক ভাবে কমে গেলে কৃষি অর্থনীতি ও সমগ্র বাজার ব্যবস্থায় মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে উৎপাদিত ফসলাদি ও গবাদি পশুর মূল্য পূর্বের তুলনায় অনেক কমে যায়।[২৪] কৃষি অর্থনীতির এই মৌলিক সমস্যাটি কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এই অবস্থায় জীবিকা নির্বাহ ও বর্ধিত রাজস্ব দাবী পূরণে কৃষক হয়ে পড়ে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব এবং প্রাণ বাঁচানোর জন্য জমি-জমা, চাষাবাদের প্রযুক্তিসহ স্ত্রী পুত্র-কন্যা বিক্রয় করে দিতে কৃষক বাধ্য হন।[২৫] উপরোক্ত পরি-স্থিতিতে রাজস্ব আদায়ের জন্য রায়তদের ভূমি দখল করে অর্ধেক মূল্যে বিক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম বাজারে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের সহায়ক হয়। এরই ফলে কৃষক তাঁর উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা দেবী সিংহের বর্ধিত রাজস্ব দাবী মেটাতে পারছিলেন না। ফলে রায়তদের দলবদ্ধভাবে স্থানত্যাগ ছিল খুবই স্বাভাবিক যা কৃষি উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১৭৮১ সালে হররাম ছিলেন দেবী সিংহের রংপুরের রাজস্ব প্রশা-সনের প্রধান এজেন্ট। কিন্তু ১৭৮২ সালে অবাধ্যতার অভিযোগে হররামকে

অপসারণ ও গ্রেপ্তার করে তথায় সূর্যনারায়নকে রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সূর্যনারায়ণের মাধ্যমে ১৭৮২ সালের রাজস্ব আদায় প্রায় অসম্ভব মনে করে দেবী সিংহ একটা চাকুরীর আশ্রয় নেন। তিনি আপাততঃ ১৭৮১ সালে বর্ধিত রাজস্ব জমার একটি অংশ হ্রাস করেন, কিন্তু খুব শীঘ্রই রাজস্ব ব্যবকলনের ফলে সৃষ্ট ঘাটতি পূরণের জন্য বেশ কিছু নতুন আবওয়াব বা উপকর ধার্য করেন। সূর্যনারায়ণ দেবী সিংহের এই রাজস্ব ব্যবকলনের অজুহাত প্রদর্শন করে প্রস্তাব করেন যে দেবী সিংহের রাজস্ব হ্রাসের জন্য জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিৎ। এরই ফলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চাঁদা দেবার প্রথা 'মেহমানী' নামে একপ্রকার স্থায়ী ও বাধ্যতামূলক উপকর আত্মপ্রকাশ করে এবং রাজস্ব ব্যবকলনের ফলে সৃষ্ট ঘাটতি পূরণ হয়।[২৫] একই সাথে পুরানো বছরের আবওয়াব নতুন বছরের সাথে যুক্ত হয়। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে কৃষকদের বিদ্রোহ ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না।

রাজস্ব ও অন্যান্য দাবী আদায়ের জন্য কৃষকদের উপর যে অবর্ণনীয় অমানবিক অত্যাচারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল তা ছিল বিদ্রোহের আশু ও প্রত্যক্ষ কারণ। এই অত্যাচারের পদ্ধতিগুলো ছিল স্থানীয় ও অদ্ভুত প্রকৃতির। যেমনঃ ১. আঙগুলগুলো একত্র বেঁধে কর সংযোগস্থলে কীলকাকার বস্তু প্রবিষ্ট করানো; ২. বিছিট্রি বা বিছুটি বৃক্ষের শাখা দ্বারা প্রহার। উল্লেখ্য যে বিছুটি বৃক্ষশাখার প্রহার গুনগতভাবে শরীরে মারাত্মক দহন ও অঙ্গস্ফিতিজনিত জ্বালা সৃষ্টি করে.[২৭] ৩. কন্টকাকীর্ন শাখা দ্বারা প্রহার; ৪. পিতা ও পুত্র উভয়কে একত্র বেঁধে প্রহার; ৫. নখ উঠে না আসা পর্যন্ত পদতলে বেত্রাঘাত; ৬. পিতার নিকট বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁর সন্তানদের প্রহার; ৭. কৃষকদের গৃহ ভস্মীভূত করা এবং তাঁর পূর্ণবর্ধিত ফসল হাতী দিয়ে খাওয়ানো;[২৮] ৮. হিন্দুদের জাতি নাশ করার জন্য তাদের ষাঁড় ও গাধার উপর চাপানো এবং আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে জনসমক্ষে পরিভ্রমণে বাধ্য করা;[২৯] ৯. স্ত্রীলোকদের সম্মান ও জাতি নষ্ট করার জন্য তাদেরকে সাধারণ কাচারীতে অবরুদ্ধ রাখা তাদের বাঁধা অবস্থায় পায়ে বেড়ি পরানো চাবুক মারা, বস্ত্র অপহরণের মাধ্যমে নগ্ন করা। দ্বিখন্ডিত বাঁশের মধ্যে স্ত্রীলোকদের স্তনের বোটা রেখে চাপ প্রয়োগ এবং এই অবস্থায় টেনে নীচে নামানো। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের গোপন অঙ্গে আলোকিত মশাল প্রবিষ্ট করানো এবং সতীত্ব হরণ।[৩০] কৃষক সম্প্রদায়ের উপর রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সীমাহীন অত্যাচার করা হয়েছিল তার বর্ণনা অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ করতে সমর্থ যে এ ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ছিল তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য একমাত্র পথ যা

তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৩১]

রণজিৎ গুহ তাঁর **Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India** গ্রন্থে বিদ্রোহ-সংগঠনের চারটি মৌলিক বিষয় নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। এই বিষয়গুলো হলো মন্ত্রণা, পরিকল্পনা, সমাবেশ ও আক্রমণ।[৩২] রংপুর কৃষক বিদ্রোহেও এই চারটি বিষয় পরিষ্কারভাবেই লক্ষ্য করা যায়। শ্রী গুহ লিখেছেন, অত্যাচার হতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রাথমিক সম্মেলনে জনগণের অভিযোগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এই অবস্থা একদিকে জনগণকে আসন্ন তৎপরতার জন্য প্রস্তুত করে তোলে এবং অন্যদিকে তাদেরকে ভবিষ্যত কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। রংপুরের কৃষক বিদ্রোহে-অত্যাচারিত কৃষকগণ প্রথমে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'ঢিং' করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং পরে স্থানীয় প্রভাবশালী বসনিয়া বা গ্রাম প্রধান ও পূর্বের ইজারাদারদের সাথে পরামর্শ বা মন্ত্রণা করে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৩৩] পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য বসনিয়া ও সাধারণ কৃষকদের এই বিদ্রোহে একীভূত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এই বিদ্রোহে বসনিয়াদের অংশগ্রহণ অনেকটা স্বেচ্ছাধীন রেখে বিদ্রোহীদের পক্ষ হতে বক্তব্য পেশ করা হয় যে কৃষকদের উপর আস্থাবান হলে বসনিয়াগণ 'ঢিং' এ যোগদান করতে পারেন।[৩৪] অন্যদিকে এই বিদ্রোহে সাধারণ কৃষকদের যোগদানের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বামনডাঙ্গা, কাজীর হাট এলাকায় ঘোষণা করা হয় যে, যে সব কৃষক 'ঢিং' এ-যোগদান করেন নি বা যোগদানে অক্ষমতা জানিয়েছেন তাদের গৃহাদি ভস্মীভূত করা হবে। এভাবে বেশ কয়েকটি গ্রামের কৃষকদের বিদ্রোহে যোগদানে বাধ্যকরণ এবং বিদ্রোহীদের নেতা 'নবাব'দের নজরানা প্রদানে বাধ্য করতে লক্ষ্য করা যায়।[৩৫] তবে বসনিয়াদের বিদ্রোহে যোগদানে চাপ প্রয়োগের তথ্য সারবত্তাহীন, কেননা কোম্পানীর বিচার হতে অব্যাহতি লাভের সাধারণ উপায় হিসেবে বসনিয়াগণ কর্তৃক এসব তথ্য উপস্থাপিত। লক্ষ্যণীয় যে বিদ্রোহে যোগদানের আহবান কোন কোন ক্ষেত্রে বসনিয়া বা 'নবাব'দের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।[৩৬] সম্ভবতঃ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর গ্রাম-প্রধান বা বসনিয়াদের প্রভাবের প্রকৃতি অনুধাবন করেই বিদ্রোহী কৃষকগণ এই পথ অবলম্বন করেছিলেন।

১৭৮৩ সালের জানুয়ারী মাস হতেই রংপুরের কৃষকগণ বিদ্রোহের জন্য ঐক্যবদ্ধ হন এবং রংপুরের কালেক্টর রিচার্ড গুড ল্যাড এ তথ্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবগত করান। এ সময় কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন মূলতঃ দেবী সিংহের বিরুদ্ধে, যদিও পরবর্তীকালে এই ক্ষোভ

কোম্পানীর প্রশাসন পর্যন্ত—সম্প্রসারিত হয়। প্রধূমিত কৃষক অসন্তোষের পটভূমিতেও রিচার্ড গুডল্যাডের সুপারিশ ছিল ইজারাদারদের সরকারী সাহায্য প্রদান করে রাজস্ব আদায়ের পক্ষে, যা ছিল প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে ঘি দেয়ার সামিল। যাই হোক, রংপুরে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৭৮৩ সালের শুরুতে বামনডাঙ্গা ও টেপা পরগণার যথাক্রমে বিদলাতুর ও কোরনার সোনা গ্রামে। একটি যৌথ পরিকল্পনার মাধ্যমে এই দুই অংশের কৃষকগণ সমবেতভাবে কাইমারীর দিকে অগ্রসর হন। এ সময় তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন ধীরাজনারায়ণ, যাকে বিদ্রোহী কৃষকগণ 'নবাব' মনোনীত করেন। নেতার প্রতি আনুগত্যের সনাতন পদ্ধতির অনুকরণ করে বিভিন্ন স্থান হতে আগত বহুসংখ্যক কৃষক তাদের নেতা ধীরাজনারায়ণ ও কেনা সরকারকে নজরানা ও উপহার প্রদান করেন এবং ইজারাদারদের কোন প্রকার রাজস্ব প্রদান না করার শপথ নেন।[৩৭] বিদ্রোহী কৃষকদের একটি অংশ শালমারী ও কাকিনা পরগণায় পৌঁছেন এবং সেখানে রাজস্ব প্রদান না করার জন্য আটককৃত কৃষকদের মুক্ত করেন। একই সাথে তারা ইজারাদারদের কাচারীর আমলাকে অপহরণ করে কাজীর হাটের বালগঙ্গে সমবেত বিদ্রোহী কৃষকদের নিকট নিয়ে আসেন। পরবর্তী পর্যায়ে কৃষকগণ কাজীর হাট পরগণার কিশোরগঞ্জ কাচারী আক্রমণ করেন যেখানে তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায়ে অত্যাচারী শেখ মুহম্মদ মোল্লা। কেননা শেখ মুহম্মদ মোল্লা বর্ধিত হারে খাজনা প্রদানের অঙ্গীকার স্বরূপ কৃষকদের বর্ধিত কিস্তিবন্দিতে স্বাক্ষর প্রদানে বাধ্য করেন এবং এই খাজনা আদায়ের জন্য অমানুষিক অত্যাচার করেন। এছাড়া শেখ মুহম্মদ মোল্লা রাজস্ব প্রদানে অক্ষম জমিদারদের কাচারীতে অবরুদ্ধ করে ভিন্ন ব্যাক্তি নিয়োগ করে অবৈধভাবে অত্যাচার চালিয়ে রাজস্ব আদায় করেন। ফলে ভূস্বামীগণও তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হন। যাই হোক, ভীত ও সন্ত্রস্ত শেখ মুহাম্মদ মোল্লা পূর্বেই এই ঘটনা সংঘটনের তথ্য অবগত হয়ে রামকান্ত ও শ্যাম চৌধুরীকে তাঁর কাচারীর দায়িত্ব প্রদান করে কিশোরগঞ্জ পরিত্যাগ পূর্বক রংপুরে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্যদিকে বিদ্রোহী কৃষকগণ শেখ মুহম্মদ মোল্লাকে না পেয়ে তাঁর কাচারী ভস্মীভূত করেন, রামকান্ত ও শ্যাম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেন এবং এই কাচারীতে আটককৃত জমিদার ও কৃষকদের মুক্তি প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে কিশোরগঞ্জ কাচারী আক্রমণ ছিল কৃষকদের বৃহত্তর আক্রমণের ইঙ্গিতবহ।

বিদ্রোহী কৃষকদের পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য ছিল কাজীর হাটের কালিকাপুরের গোবিন্দরামের কাচারী আক্রমণ—যেখানে নৃশংস ও পৈচাশিক অত্যাচারে পারদর্শী গোমস্তা গোরমোহন অবস্থান করেন। প্রায় দশ হতে বারো

হাজার বিদ্রোহী কৃষক কোটালিয়ায় সমবেত হয়ে ডিমলা অভিমুখে অগ্রসর হন। এই সময় পার্শ্ববর্তী সারাধোবী ও সুন্দকরেনা অঞ্চলের কৃষকগণ বিদ্রোহী কৃষকদের সাথে যোগদান করেন। নবাব ধীরাজনারায়ণ এক খানা পাল্কীতে বিদ্রোহীদের অনুবর্তী হন। অন্যদিকে গৌরমোহন চৌধুরী তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য ষাট জন বরকন্দাজ নিযুক্ত করেন এবং পার্শ্ববর্তী বাজার হতে বিদ্রোহী, কৃষকদের সাথে যোগাযোগের সন্দেহে চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনা কৃষকদের অত্যন্ত উত্তেজিত করে তোলে এবং আটককৃত চারব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা ডিমলা অভিমুখে যাত্রা করেন। গৌরমোহনের নির্দেশে প্রহরারত বরকন্দাজগণ বিদ্রোহী কৃষকদের প্রতিহত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। যাই হোক ডিমলা কাচারী আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে বিদ্রোহী কৃষকগণ এই ঘটনার বিচার দাবী করেন এবং বরকন্দাজগণ আস্থাসূচক বাক্যে কৃষকদের বিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাদের অস্ত্র পরিত্যাগে বাধ্য করেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নিরস্ত্র কৃষকদের ওপর গৌর মোহন চৌধুরীর বরকন্দাজদের গুলি বর্ষণ অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। বরকন্দাজদের গুলি বর্ষণে তিনজন কৃষক নিহত এবং ছয়জন আহত হন। ঘটনার আকস্মিকতায় কৃষকগণ প্রথমে হতবিহ্বল হন। কিন্তু পরে সমবেত সমস্ত বিদ্রোহী কৃষকগণ বরকন্দাজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একজন বরকন্দাজকে হত্যা করেন। কৃষকগণ ডিমলা কাচারী আক্রমণ করে গোমস্তা গৌরমোহন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে নবাব ধীরাজ-নারায়ণের নিকট নিয়ে আসেন এবং তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষকগণ ভবানীগঞ্জে কোম্পানীর ধানের গোলা লুঠ করেন।[৩৮]

পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে কালেক্টর রিচার্ড গুডল্যাড কৃষকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। এ পর্যায়ে কৃষকগণ কালেক্টরের নিকট চারটি দাবী উত্থাপন করেণ।[৩৯]

প্রথমতঃ, দেরিন ভিক্লা উপকর প্রথার অবসান;
দ্বিতীয়তঃ, রাজস্ব প্রদানে নারায়ণী মুদ্রা গ্রহণ;
তৃতীয়তঃ, কর্তণী ও হুন্ডিয়ান নামক অবৈধ উপকর আরোপ বন্ধ করা;
চতুর্থতঃ, কিস্তি রশিদ হতে ফেরারী নামক আরোপিত উপকর ব্যবকলন।

এছাড়া বিদ্রোহী কৃষকগণ দু'বছরের জন্য রাজস্ব স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন। রিচার্ড গুডল্যাড কৃষকদের অন্যান্য শর্তাবলী মেনে নিলেও দু'বছরের খাজনা আদায় স্থগিত রাখার দাবীটি অনুমোদন করেননি।[৪০] এতদ্সত্ত্বেও বিদ্রোহী কৃষকদের নেতা নবাব ধীরাজনারায়ণ কালেক্টরের গৃহীত পূর্বোক্ত শর্তানুযায়ী কৃষকদের স্বগ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য করেন।

কিন্তু কালেক্টরের কথায় ও কাজে এই শর্তাবলীর প্রতিফলন না ঘটলে পুনরায় বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়। রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত পূর্বে প্রত্যাহৃত ব্যক্তিদের পুনরায় নিয়োগ করা হয়, যারা পুনরায় অবৈধ উপকর সমূহ আদায়ের চেষ্টা করেন। শেখ মুহম্মদ মোল্লা কাজীর হাট, রাম দুলাল ভট্টাচার্য কাকিনা ও গোকুল মেহতা পরগণায় পুনরায় রাজস্ব আদায়ের জন্য নিয়োজিত হন। ফলে কৃষকগণ রিচার্ড গুডল্যাডের প্রতি তথা কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়তার প্রতি তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং মনে করেন যে আবেদন নয়, শক্তিই তাদের সম্বল।

ফলে পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহ আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। বিদ্রোহী কৃষকগণ কাকিনা ও টেপাকে কেন্দ্র করে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। রাম দুলাল ভট্টাচার্য কাকিনায় পুরানো হারে রায়তদের নিকট হতে রাজস্ব আদায়ের জন্য সীমাহীন আশ্রয় নেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রায়তদের অপহরণসহ তাদের গৃহাদি ভস্মীভূত ও তাদের স্ত্রীলোকদের অসম্মান করা হয়। রাম দুলাল ভট্টাচার্যের এই তৎপরতায় ক্ষিপ্ত তিন-চার হাজার কৃষক ঐক্যবদ্ধভাবে কাকিনা কাচারী আক্রমণ করেন। এই সময় রাম দুলালের সাহায্যের জন্য প্রেরিত কোম্পানীর একদল সৈন্যের সাথে বিদ্রোহী কৃষকদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এবং কৃষকগণ পরাজিত হয়ে পশ্চাদাপসারণ করেন। সংঘর্ষে ধৃত বিদ্রোহী কৃষকদের সতর্ক ও কড়া প্রহরাধীনে রংপুর প্রেরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হলে পথিমধ্যে কয়েক হাজার কৃষক প্রহরীদের আক্রমণ করে বন্দী বিদ্রোহী কৃষকদের মুক্ত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে সুতাবাড়ীর হাটের নিকটে প্রায় দশ হাজার কৃষক সমবেত হয়ে ফরমান বাড়ী কাচারী আক্রমণ করেন, যেখানে রাম দুলাল ভট্টাচার্য অবস্থান করছিলেন। এ সময় ইজারাদারের প্রতিনিধি মাণিক চাঁদ বিদ্রোহী কৃষকদের দাবী মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দিলে বিদ্রোহ আর অধিক প্রসারিত হয়নি।[৪১]

অনুরূপভাবে গোকুল মেহতা বেশ কিছু অশ্বারোহী সৈন্য ও বরকন্দাজ-সহ টেপায় রাজস্ব আদায়ে ব্যাপৃত হলে সেখানেও তীব্র প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। টেপার কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল যে গোকুল মেহতা কৃষকদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিতে পারেন। এই অবস্থায় কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হন এবং শেখ কেনা সরকারকে 'নবাব' ও রাম প্রসাদকে 'সর্দার' বা 'দেওয়ান' নিযুক্ত করেন। ১৭৮৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী টেপার বাজারের নিকট উভয় পক্ষই সশস্ত্রভাবে সমবেত হন। কৃষকদের বক্তব্য ছিল যে তারা ন্যায্য বিচার চান, যুদ্ধ চান না। গোকুল মেহতা অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগের শর্তে ন্যায্য বিচারের প্রতিশ্রুতি দিলে কৃষকগণ তা প্রতি-

পালন করেন। কিন্তু এই অবস্থায় গোকুল মেহতার নির্দেশে অশ্বারোহী ও বরকন্দাজগণ কৃষকদের উপর গুলী বর্ষণ করলে দু'জন কৃষক আহত হন। ফলে পরিস্থিতি এত ভয়াবহ হয়ে পড়ে যে বিদ্রোহী কৃষকগণ গোকুল মেহতাকে ঘিরে ধরে এবং সেখানেই হত্যা করে। এই সংঘর্ষে গোকুল মেহতার জমাদারসহ ৭/৮ জন বরকন্দাজ বিদ্রোহী কৃষকদের নিকট ধরা পড়ে।

রংপুরের এই কৃষক বিদ্রোহ দিনাজপুরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বোদা, মুরপুর, আলানছড়ি, বড়গঞ্জ ও ডিহি-জামতা প্রভৃতি স্থানে কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়।[৪২] এ সব অঞ্চলেও দেবী সিংহের অত্যাচার বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষও এই বিদ্রোহ দমনের জন্য খুব দৃঢ় মনোভাব পোষণ করেন এবং এরই ফলশ্রুতিতে কৃষকদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। বোদা থানায় নিয়োজিত ইজারাদারদের পরিদর্শক মুহম্মদ তকীর নিকট প্রেরিত রিচার্ড গুডল্যাডের পত্রে এই কৃষক বিদ্রোহের প্রতি কোম্পানীর নিপীড়ণমূলক নীতির প্রচ্ছন্ন ঈঙ্গিত রয়েছে।[৪৩]

অন্যদিকে গোকুল মেহতার হত্যার মধ্য দিয়ে কৃষক বিদ্রোহের যে রূপ প্রকাশ পায়, তা' অতি শীঘ্রই বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে সমগ্র রংপুর পরিব্যাপ্ত করে। কালাপানিতে নিযুক্ত লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনালেডর নিকট গুডল্যাড লেখেনঃ "আপনার দ্বারা শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত দেশটি পুনরায় বিদ্রোহের সম্মুখীন।"[৪৪] এই চিঠিতে লক্ষ্য করা যায় কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এ দেশ সম্পর্কে বিস্ময়, ভয়, অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি এতই জটিল ও মারাত্মক মনে করেন যে কোম্পানীর কর্মচারীদের রংপুর অবস্থান অসম্ভব বলে বিবেচনা করেন। এই পরিস্থিতিতে কালেক্টর রিচার্ড গুডল্যাড জনগণের নিরাপত্তার নামে প্রচন্ড অত্যাচার ও নিগ্রহাত্মক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্রোহ প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। কোম্পানীর স্থানীয় প্রশাসন মনে করেন যে 'বসনিয়াগণ' বা গ্রাম প্রধানগণ এই বিদ্রোহের পুরোধা—এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমেই বিদ্রোহ দমন সম্ভব। এমন কি পূর্বে যে সব বসনিয়া বশ্যতা স্বীকার করে এবং পরে পুনরায় বিদ্রোহীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তাদের গ্রেপ্তার করে এবং তাদের মধ্যে দু' একজনকে জনসমক্ষে ফাঁসী দিয়ে জনসাধারণের মনে ভয়, ভীতি ও ত্রাস সঞ্চারের লক্ষ্যে মনোভাব প্রকাশ করা হয়।[৪৫]

গোকুল মেহতার হত্যার পর বিদ্রোহী কৃষকগণ রণকৌশল পরিবর্তন করে সমগ্র দলটিকে ছয়টি উপদলে বিভক্ত করে রংপুরের বিভিন্ন স্থানে সমবেত হন। তাদের সাথে যুক্ত হয় কোচবিহারের একদল কৃষক।

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দিনাজপুরে রংপুরের বিদ্রোহী কৃষকগণ যাতে প্রবেশ না করতে পারে সে জন্য লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়।[৪৬] বিভিন্ন স্থানে সৈন্য প্রেরণ ছাড়াও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে প্রয়োজন বোধে বিদ্রোহী কৃষকদের একাংশকে আটক করা, তাদের গৃহাদি ভস্মীভূত করা, এমন কি গুলী বর্ষণ করাও যেতে পারে। মোগল হাটে কয়েক শ' ধনুর্ধর কৃষক কোম্পানী প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত সুবাদার ও জমাদারকে আক্রমণ করেন। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন নূরুল দীন, যিনি 'নবাব' উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর দেওয়ান ছিলেন দয়াশীল। এই সংঘর্ষে নূরলদীনকে আহত অবস্থায় বন্দী করা হয়। অন্যদিকে দেওয়ান দয়াশীল অন্যান্য বিদ্রোহী কৃষকের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। অবশ্য পরে নূরলদীনও মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৪৭]

রংপুর কৃষক বিদ্রোহের সর্বশেষ ঘটনা ছিল ১৭৮৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী পাটগঞ্জের যুদ্ধ। লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে প্রেরিত সৈন্যদল বরকন্দাজের ছদ্মবেশে এবং লুক্কায়িত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহী কৃষকদের সমবর্তী হন। কৃষকগণ সহজেই বরকন্দাজদের গ্রহণ করেন। কিন্তু ছদ্মবেশী বরকন্দাজগণ অপ্রস্তুত কৃষকদের উপর চরম অত্যাচার চালান। এসময় ম্যাকডোনাল্ড নিজে রংপুরের পশ্চিমাঞ্চলে একদল বিদ্রোহী কৃষকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সংঘর্ষে ২৮ জন বিদ্রোহী কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন নেতৃস্থানীয়। ম্যাকডোনাল্ড কৃষকদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেন এবং বিদ্রোহে লিপ্ত হলে গুলী বর্ষনের হুমকী দেন। কালাপানির বাজারে কৃষকদের বিদ্রোহী এবং গুপ্তচর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে জনসমক্ষে ফাঁসী দেওয়া হয়।[৪৮] অনুরূপভাবে একজন বৈরাগীকেও ফাঁসী দেওয়া হয়। ম্যাকডোনাল্ডের তৎপরতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী কৃষক শক্তিকে অনেকটা দুর্বল করে দেয়। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহী কৃষকদের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মোগল হাটের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে ষাটজন কৃষক নিহত হন এবং ৫৬ জন বিদ্রোহী কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয় যাদের সকলেই ছিলেন মারাত্মকভাবে আহত। এই পরিস্থিতিতে রংপুরে সৈন্য শক্তি বৃদ্ধি করে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ অবস্থা আয়ত্বে আনেন।[৪৯]

রংপুর কৃষক সংগ্রামে বিদ্রোহী কৃষকগণ আপন গন্ডি, সামর্থ্য ও পদ্ধতিতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং তাদের এই স্বরাজ ছিল স্থানীয় উপাদান সমৃদ্ধ ও স্থানীয় প্রকৃতির। তবে প্রশাসনিক তৎপরতার

অনেকাংশেই কৃষকদের পরিচিত প্রশাসনিক সংগঠন ও কার্যাবলীর অনুকরণ লক্ষ্যণীয়। রংপুরের বিদ্রোহী কৃষকগণ কর্তৃক গঠিত নিয়মিত সরকারে মোঘল সরকার কাঠামোর অনুরূপ নবাব ও দেওয়ান সহ সরকার সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীও নিয়োজিত ছিলেন। রংপুরে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীকে স্থানীয় ভাষায় 'ঢিং' বলা হত।[৫০] এই বিদ্রোহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের জন্য 'ঢিংখরচ' নামে একটা কর রংপুরের বিদ্রোহ সমর্থকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[৫০ক] বিদ্রোহী সরকার পরিচালনার জন্য পাইক ও গুপ্তচর পর্যন্ত নিযুক্ত হতো। এই সরকারের পক্ষে বিভিন্ন সময় প্রদত্ত ঘোষণায় কোম্পানী ও তার সহযোগীদের রাজস্ব প্রদানে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠনের মত স্থানীয় সংগঠন ও বিদ্রোহী কৃষকদের ছিল, তবে তা ছিল কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রতিরূপ ক্ষুদ্রকায়।

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিদ্রোহী কৃষকগণ যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন নিঃসন্দেহে তা ছিল স্থানীয় প্রকৃতির। টমটম বাজিয়ে ঘোষণা প্রদানও কাড়া বা আনদ্ধ বাধ্য যন্ত্র বাজিয়ে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা হতো।[৫১] তাদের যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে ছিল তরবারী, তীর ধনুক, লোহার বল্লম, গদা, ঢাল, বংশদন্ড, গাইতি ও কাস্তেসহ চাষাবাদের যন্ত্রাদি।[৫১ক] তৎকালীন অনুন্নত যোগাযোগের সময় বিদ্রোহী কৃষকগণ পদব্রজে অগ্রসর হলেও নবাব ধীরাজনারায়ণকে একখানা পালকী ও দেওয়ান বানেশ্বর প্রমানিককে একখানা খাটিয়া প্রদান মূলতঃ বিদ্রোহীদের সংগঠনের দৃঢ়তা ও নেতাকে সাধারণ ব্যক্তির উপরে মর্যাদা দেওয়ার মনোভাব প্রকাশ করে।[৫২] অবশ্য বিদ্রোহী কৃষকদের একাংশ অশ্বারোহীও ছিলেন। রংপুরের কৃষকদের এই সংগ্রামে গৃহীত রণনৈতিক কৌশলের দিকটিও লক্ষ্যণীয়। বিদ্রোহীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্নভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বিদ্রোহী কৃষকদের বিদ্রোহের দিন ধার্যকরণে শাস্ত্র গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং বিজয় অর্জনের জন্য শুভদিনের প্রয়োজনীয়তার উপর আস্থা স্থাপন।[৫৩] রণনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে কূট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণের প্রবণতাও এই বিদ্রোহে লক্ষ্যণীয়। কাজীর হাট কাকিনা ও টেপার কৃষকগণ একদিকে রংপুরের কালেক্টর রির্চাড গুডল্যাডের নিকট তাদের অভিযোগের বিচার প্রার্থনা করেন অন্যদিকে বিদ্রোহীগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় প্রবৃত্ত হন। কালেক্টর গুডল্যাড পরবর্তী সময় অনুধাবন করেছিলেন যে বিদ্রোহী কৃষকগণের অভিযোগের বিচার প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল পর্যাপ্ত সমাবেশের জন্য সময় গ্রহণ।[৫৪] বলা যেতে পারে যে বিদ্রোহের প্রারম্ভে অভিযোগের বিচার কৃষকদের অভিন্ন উদ্দেশ্য হলেও শেষ পর্যন্ত অত্যাচারীর বিনাশ সাধনই

তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলার বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃত্বে বাংলা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের নেতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও রংপুর কৃষক বিদ্রোহে ও মজনু-শাহ্, পাগলপন্থী আন্দোলনে টিপুশাহ্ পাগল ইত্যাদি বাংলার আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিল বাইরের। বাংলার কৃষক বিদ্রোহের সাথে এসব আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য এখানেই যে কৃষক বিদ্রোহের কারণ সর্বাংশে স্থানীয় এবং এর নেতৃত্বও স্থানীয়।

রংপুর কৃষক বিদ্রোহের নেতাগণ সবাই ছিলেন রংপুরের অধিবাসী এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। এই বিদ্রোহের নেতাগণ সবাই ছিলেন বসনিয়া। রংপুরে গ্রাম প্রধানকে বসনিয়া বলা হতো এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর প্রভাব ও গ্রাম্য সমাজে তাঁর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক।[৫৫] রংপুর কৃষক বিদ্রোহে ডিমলা কাচারী আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ধীরাজ-নারায়ণ ঠাকুর, যিনি ছিলেন টেপা পরগণার অধিবাসী এবং বিদ্রোহের পূর্বে একজন ভূস্বামী হিসেবে কোম্পানীকে প্রত্যক্ষভাবে খাজনা প্রদান করতেন। ধীরাজনারায়ণের পিতা ডালিম নারায়ণও ছিলেন একজন ভূস্বামী। অন্যদিকে টেপার কৃষক বিদ্রোহের নেতা শেখ কেনা সরকার ও রামপ্রসাদ সর্দার উভয়েই যথাক্রমে ছিলেন বিদ্রোহী কৃষকদের মনোনীত নবাব ও সর্দার। সর্বোপরি মোঘল হাটের যুদ্ধের নেতা নুরলদীন ছিলেন সুতানা তালুকের বসনিয়া।[৫৬]

এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নেতা মনোনয়ন ও নেতৃত্বের প্রকৃতি। রংপুর কৃষক বিদ্রোহে ধীরাজনারায়ণ, কেনা সরকার, রামপ্রসাদ সর্দার, নুরলদীন, দয়াশীল, ভুদারো বসনিয়া, বুড়ো বসনিয়া, শেখ হাবসী, শেখ কাবিল, রহমত, আলী-বর্দী, দয়ারাম দাস, হর নারায়ণ দাস, রম দাস, বানেশ্বর দাস ও ইসরাইল খান প্রমুখ স্থানীয় বসনিয়াদের নেতৃত্ব লক্ষ্য করা গেলেও ধীরাজনারায়ণ শেখ কেনা সরকার ও নুরলদীন ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা ও বিদ্রোহীদের মনোনীত 'নবাব'। অবশ্য নুরলদীনের ভূমিকা একটু স্বতন্ত্র ছিল, যা পড়ে আলোচিত হবে। তবে সমস্ত নথিপত্র ও উপাত্ত যা ঈঙ্গিত করে তা হলো এই যে রংপুর বিদ্রোহে কৃষকগণই ছিলেন চালিকা শক্তি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে বিদ্রোহী কৃষকগণ নেতা মনোনয়ন করেন এবং তাকে 'নবাব' উপাধি প্রদান করেন। তবে নেতা নির্বাচনে তারা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী 'বসনিয়া' তথা গ্রাম প্রধানকে প্রাধান্য দেন। ধীরাজ নারায়ণের পিতা ডালিম নারায়ণও ইতিপূর্বে গ্রাম প্রধান ছিলেন এবং কৃষক অসন্তোষ ও কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে-

ছিলেন।[৫৭] প্রাচীন রীতি-নীতির প্রতি অন্যান্য নেতাদের আনুগত্য এতই প্রবল ছিল যে তাঁরাও ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ধীরাজ নারায়ণকে নবাব হিসেবে স্বীকার করে নেন।[৫৮] পরবর্তী প্রধান নেতা শেখ কেনা সরকারও এক সময় বিদ্রোহী কৃষকদের নবাব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নূরলদীনের ভূমিকা। নূরলদীন একজন বসনিয়া হলেও তিনি ছিলেন নবাব এবং স্বাধীনতার সনদ বিজয় (Scripture of independence) নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন বিদ্রোহী কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে। সরকারী বিবরণীতে বলা হয়েছে ঃ "সম্মানিত নবাব উপাধি ধারণ করে রাজমুকুট শোভিত নূরলদীন স্বাধীনতার সনদ নিয়ে আবির্ভূত হন।"[৫৯]

রংপুরের কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বের প্রকৃতি ছিল প্রকৃতপক্ষে কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট। একদিকে বিদ্রোহী কৃষকগণ রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বের ইজারাদারদের চান, এক্ষেত্রে ইজারাদারী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দিতেও বিদ্রোহী কৃষকগণ সম্মত।[৬০] সম্ভবতঃ বসনিয়া হিসেবে পূর্বের ইজারাদারদের সাথে কৃষকদের সুসম্পর্ক ছিল। এবং বসনিয়াও কৃষকদের অবস্থা ও স্থানীয় অবস্হা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অন্যদিকে বিদ্রোহী কৃষকগণ বসনিয়াদের নবাব ঘোষণা করে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ এই বিদ্রোহে 'নবাব' উপাধি ধারণ ছিল অনেকটাই প্রতীক মূলক অর্থাৎ 'নবাব' উপাধি ছিল নেতৃত্বের প্রতীক। নবাবদের কৃষক সম্প্রদায় তাদের সমাজের খুব ঘনিষ্ঠ ও প্রভাব-শালী ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন; যদিও এই বিদ্রোহের চালিকা শক্তি ছিলেন কৃষকেরাই সম্ভবতঃ সাংগঠনিক সুবিধা, কেন্দ্রীভূত শক্তি অর্জন ও বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য তারা 'নবাব' নির্বাচন করে নেতৃত্ব গঠন করেন। রংপুর কৃষকদের নেতৃত্ব গঠনের এই চেতনা সঠিক ভাবেই স্হানীর এবং বাংলার অন্য কোন অঞ্চলের সাথে এর মিল নেই। তবে বিদ্রোহের নেতা 'নবাব'কে বাধ্যতামূলকভাবে নজরানা প্রদানের বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ কৃষকগণ আপন মনোজগতের সীমিত গন্ডিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ পেতে চান, এই আত্মনিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের পূর্বাবস্হা প্রতিষ্ঠার চেতনা সমন্বিত। সেক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য তারা নির্বাচিত নবাবকে নজরানা প্রদান করে একদিকে আনুগত্য অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক অনুসরণের উদাহরণ অনুকরণ করেন।

১৭৬০ সাল হতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন আন্দোলনে ধর্ম ও ধর্মীয় চেতনা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফকীর-সন্যাসী আন্দোলনে ধর্মীয় অনুভূতি কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।[৬১]

১৭৯৯ সালে সিলেটের বিদ্রোহী আগামুহম্মদ রেজা প্রকারান্তরে নিজকে ধর্মীয় নেতা হিসেবে আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন।[৬২] ময়মনসিংহের টিপু শাহ্, জরিপ শাহ্ ও করম শাহের নেতৃত্বে পাগলপন্থী আন্দোলনেও ধর্মীয় প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য।[৬৩] বাখরগঞ্জে বলাকী শাহ্ও ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা এবং ধর্ম সেখানে চৈতন্য উদয়ের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।[৬৪] সাঁওতালদের বিদ্রোহ তথা 'হুল' এ ধর্ম ছিল প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ যেখানে ঈশ্বর নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করবেন বলে প্রচার করা হয়।[৬৫] ধর্মীয় অনুভূতি আর যাই করুক না কেন উপরোক্ত আন্দোলন এক্ষেত্রে নেতৃত্ব গঠন ও চেতনা আনয়নে কমবেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু রংপুর কৃষক বিদ্রোহে ধর্ম একটি ভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে—যা গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ রংপুর কৃষক বিদ্রোহের একটা ক্ষেত্রে ধর্ম কৃষকদের উৎসাহ উদ্দীপনার ধারক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু অন্যত্র ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা, দোহাই বা ভয় কৃষকদের শত্রু নিধন হতে প্রতি-নিবৃত্ত করতে পারেনি। ডিমলার গৌর মোহনের প্রতারণামূলক কার্যতৎপরতার ফলশ্রুতিতে কৃষকগণ ডিমলা আক্রমণের প্রস্তুতি নেন এবং এক্ষেত্রে মনোনীত নবাব ধীরাজনারায়ণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। ধীরাজ নারায়ণ বিদ্রোহী কৃষকদের প্রথমেই কাচারী আক্রমণ না করে ন্যায় বিচারের দাবী উত্থাপনের নির্দেশ দেন। কৃষকের ন্যায় বিচারের দাবী উপেক্ষিত হলে তারা বিদ্রোহ করতে পারেন এই মর্মে ধীরাজনারায়ণের একটি বক্তব্যে বিদ্রোহী কৃষকগণ সোল্লাসে "হরি, হরি-আল্লাহ্, আল্লাহ্" বলে চিৎকার করে উঠেন।[৬৬] কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে গৌর মোহনের কাচারী আক্রমণ করে তাকে গ্রেপ্তার করে ধীরাজ নারায়ণের নিকট নিয়ে আসা হয়। তখন নবাব ধীরাজ নারায়ণ ও কেনা সরকার বিদ্রোহী কৃষকদের গৌরমোহনকে হত্যার সিদ্ধান্ত পরিহার করতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হলে তাদের ধর্মীয় ভীতি প্রদর্শন করেন। নেতাদের পক্ষ হতে বলা হয় যে গৌরমোহন চৌধুরী একজন ব্রাহ্মণ সুতরাং অবধ্য।[৬৭] কিন্তু বিদ্রোহী কৃষকগণ ধর্মের দোহাই ও নেতার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গৌরমোহন কি জনসমক্ষে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। পরবর্তী সময় রংপুর কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে বিভিন্ন ব্যক্তি বলেন যে বিদ্রোহী কৃষকদের আদৌ ধর্ম ভয় ছিলনা।[৬৮] রংপুর কৃষক বিদ্রোহে অনুভূতির বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ঈশ্বরের নাম নিয়ে সোল্লাসে চিৎকার ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও উৎসাহেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ব্রাহ্মণকে হত্যার পাপভয় ও নেতার নিষেধাজ্ঞা বিদ্রোহীদের শত্রুদমন হতে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নি। সম্ভবতঃ শত্রুর পরিচয় ও শত্রুকে চিহ্নিত করতে বিদ্রোহী কৃষকগণ

খুব সহজেই পেরেছিলেন এবং একই সাথে পারলৌকিক জীবনে দুঃখকষ্ট ভোগের ভয়ের চেয়ে বাস্তব জীবনের অত্যাচার তাদের কাছে অধিকতর দুর্ভোগজনক বলে মনে হয়েছিল। ফলে নেতার নিষেধাজ্ঞা বা ধর্মীয় ভীতি তাদের হত্যাকান্ড হতে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি।

উপরোক্ত আলোচনার সাথে সম্পর্কিত নয়, অথচ সামগ্রিকভাবে রংপুর কৃষক বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ত একটা বিষয় গবেষণার স্বার্থেই উল্লেখ করতে হয়। মার্কসবাদী লেখক নরহরি কবিরাজ রংপুর কৃষক বিদ্রোহের উপর রচিত তাঁর গবেষণা গ্রন্থে রংপুর কৃষক বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের তথ্য তুলে ধরেছেন।[৬৯] নরহরি কবিরাজের এই তথ্যটি আলোচনার অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ রংপুরে বিদ্রোহী কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সহজাত প্রক্রিয়ায়, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। দ্বিতীয়তঃ, নরহরি কবিরাজের এই তথ্য মেনে নিলেও একটা প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন, তা হলো—অষ্টাদশ শতাব্দীর আট দশকে রংপুরের হিন্দু-মুসলমান কি তাদের হিন্দু-মুসলমান হিসেবে স্বতন্ত্র ভাবতেন? যদি তারা তা না ভেবে থাকেন তাহলে এই বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের তথ্য উদ্ভাবন অপ্রয়োজনীয় এবং কতকাংশে উদ্দেশ্যমূলক। অন্যদিকে নরহরি কবিরাজের একটি মন্তব্য তাঁর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রস্তাবের বিরোধী। তিনি লিখেছেন ঃ "In fact the village people participated in the revolt irrespective of their Caste, Community and Creed. Neither Caste distinction nor Communal differences obstructed the march of events."[৭০] এই বক্তব্যে নরহরি কবিরাজ রংপুর কৃষক বিদ্রোহকে একটা শ্রেণী সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যেখানে জাতি ও সম্প্রদায়ের কোন ভূমিকা ছিলনা। তাঁর এই বক্তব্য সমর্থনযোগ্যকিন্তু এই বক্তব্য নরহরি কবিরাজের পূর্বোক্ত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তত্ত্বের বিরোধী। কেননা ঐক্য বলতে বুঝায় মতৈক্য, আর মতৈক্যে থাকে চেতনা। রংপুর কৃষক বিদ্রোহে যখন কোন সম্প্রদায়গত চেতনা ছিল না, তখন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্ন অবাস্তব। সরকার গঠনে হিন্দু-মুসলমান অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় আয়োজনের ফলশ্রুতি, যেখানে যে বসনিয়া প্রভাবশালী সেখানেই তিনিই 'নবাব' বা 'দেওয়ান' হয়েছেন—ধর্মের ভিত্তিতে বা ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার জন্য নয়।

রণজিৎগুহ 'অতিদেশ' শিরোনামে বিদ্রোহীদের আচরণের প্রকৃতি সম্পর্কে যে নতুন বিশ্লেষণের দিগন্ত উন্মোচন করেছেন তার কিছু উদাহরণ রংপুর কৃষক বিদ্রোহেও লক্ষ্য করা যায়। বিদ্রোহী কৃষকদের প্রধান শত্রু

দেবী সিংহ ও তাঁর সহযোগীগণ। কিন্তু বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কেবলমাত্র উপরোক্ত শত্রুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্রমশঃ তাদের আক্রমণ সম্প্রসারিত হয়েছে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি। ফলে একদিকে রাজস্ব আদায়ে অত্যাচারী ইজারাদারদের বিদ্রোহী কৃষকগণ আক্রমণ করেন অন্যদিকে রংপুরে কোম্পানীর খাদ্য গুদাম আক্রমণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। রণজিৎগুহ বিদ্রোহীদের এই তৎপরতাকে নেতিবাচক চৈতন্য ও অতিদেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৭১] কিন্তু রংপুরের বিদ্রোহী কৃষকগণ আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে ইংরেজ শাসনকে তাদের দুর্গতির জন্য দায়ী করেন এবং ইংরেজ কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন।[৭২] দেবী সিংহ ও তাঁর সহযোগীগণ যে কোম্পানীর সমর্থন পুস্ট সম্ভবত; তা বিদ্রোহীগণ খুব সহজেই অনুধাবন করেন এবং কোম্পানীর প্রশাসনিক ও অন্যান্য স্বার্থবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হন।

রংপুরের বিদ্রোহী বসনিয়াদের একাংশ ছিলেন প্রাক্তন জমিদার এবং দেবী সিংহের পরোক্ষভাবে ইজারাদারী গ্রহণের ফলশ্রুতিতে অধিকারচ্যুত। এছাড়া অন্য জমিদার দল ছিলেন দেবী সিংহের রাজস্ব আদায় নীতিতে অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত।[৭৩] লক্ষ্য করা যায় যে প্রথম পর্যায়ের জমিদারগণ এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ করেন। শেষোক্ত জমিদারগণও এই কৃষক বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিলেন। জমিদারদের প্রত্যক্ষ সমর্থনের বিষয়টি উল্লেখকরে দেবী সিংহ রংপুর কষক বিদ্রোহের গুরুত্বকে অবমূল্যায়নের চেষ্টা করেন।[৭৪] এই বিদ্রোহে উভয় দল জমিদারদের অংশ গ্রহণের ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে ১৭৮৩ সালের রংপুর কৃষক বিদ্রোহ কি কৃষকদের স্বতঃস্ফুর্ত তৎপরতা না জমিদারদের স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্ররোচিত একটা ঘটনা। রণজিৎ গুহ অত্যন্ত সঠিকভাবেই একটি বক্তব্য রেখেছেন যে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীতে সব সময়ই প্রকাশ করা হয় যে এ সব বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র গ্রামীণ শিক্ষিত শ্রেণীর (rural elite) মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যেখানে কৃষক সম্প্রদায় কেবলমাত্র একটি সাধিত্র হিসেবে কাজ করে।[৭৫] উল্লেখ্য যে দেবী সিংহের বক্তব্য ও তথ্যাদি উপস্থাপন ছিল কেবলমাত্র আত্মপক্ষ সমর্থন ও স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই, প্রকৃতপক্ষে ১৭৮৩ সালের রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণভাবে কৃষকদের দ্বারা উৎসাহিত এবং বিদ্রোহী কৃষকগণই সেখানে প্রাধান চালিকা শক্তি।[৭৬] লক্ষ্য করা যায় যে বিদ্রোহী কৃষকগণ ছিলেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের নেতা বা নবাবকে মনোনীত বা নির্বাচিত করেছেন এবং নেতাকে প্রয়োজনীয় সম্মান প্রদশন করে সমগ্র বিদ্রোহটি নিজেরাই পরিচালনা করেছেন। বসনিয়াদের ভূমিকা

ও প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও বিদ্রোহটি ছিল কৃষকদের নিজস্ব চেতনায় গড়া। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ধীরাজ-নারায়ণ ও কেনা সরকারের নেতৃত্ব গৌরমোহন চৌধুরীকে কোন ক্রমেই বিদ্রোহের রোষানল হতে রক্ষা করতে পারেন নি। কোম্পানীর কর্মচারী প্যাটারসণ রংপুরের এই বিদ্রোহকে সাধারণ জনগণের বিদ্রোহ হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৭৭] কোম্পানীর নথিপত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদিও এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তর করে যে রংপুর বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে কৃষকদেরই সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জমিদারদের অংশ গ্রহণ ছিল, বসনিয়াদের নেতৃত্বে প্রদান যা কৃষকদের সাথে অভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। জমিদার, বসনিয়া ও কৃষক অর্থনৈতিক ভাবে শ্রেণী দু'টির শক্তি ও স্বার্থ এক নয়, কিন্তু ১৭৮১ সালের বিদ্রোহে এই শ্রেণী দু'টির ঐক্য হয়েছিল দেবী সিংহের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে শোষক ও শোষিতের ভিত্তিতে যেখানে চালিকা শক্তি কৃষক সম্প্রদায়কে সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে দেবী সিংহ বিরোধী প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পথ খুঁজে পান জমিদার ও বসনিয়াগণ। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে রংপুরের এই বিদ্রোহকে শ্রেণী সংগ্রাম বলা চলে। তবে এই শ্রেণী সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে বর্তমান কালের চেতনায় নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সীমিত গন্ডিতে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্বার্থবাদী ও নিপীড়ত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ চেতনায় ভাস্বর।

রংপুরে কৃষক বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ঐ সময়ের জন্য রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকে। কেননা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে এই বিদ্রোহাত্মক পরিস্থিতিতে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা বৃথা এবং এই প্রয়াস আরো নতুন কোন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টির সহায়ক হবে। সুতরাং ইজারাদারদেরও রাজস্ব প্রদান হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৭৮] এই বিদ্রোহের ফলে রংপুরের ভূমি জরিপ স্থগিত থাকে, কেননা এ ধরনের কোন তৎপরতা চাষাবাদে বিঘ্নসহ যে কোন বিশৃংঙ্খলার কারণ হতে পারে। সরকার কৃষকদের এই বিদ্রোহের মাধ্যমে এদেশীয় ভূমি প্রশাসন সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা অনুভব করেন এবং এক বছর মেয়াদী ভূমি বন্দোবস্তের নীতি গ্রহণ করেন। কাজীর হাট পরগণার ইজারা কোন এক ব্যক্তিকে প্রদান না করে, পরগণাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ভূমি বন্দোবস্ত দেন এবং এই পরগণার রাজস্ব সংগ্রহ পরিদর্শনের দায়িত্ব সরাসরিভাবে রংপুরের কালেক্টর রিচার্ড গুড-ল্যাডের উপর অর্পিত হয়।[৭৯] কোম্পানী কর্তৃপক্ষ রংপুর কৃষক বিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা লক্ষ্য করে সন্দিহান হয়ে পড়েন। অন্যদিকে কোম্পানীর প্রণীত আইনের প্রতি দেশীয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহযোগিতার প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়। এই পর্যায়ে কোম্পানী ১৭৮৩

সালের রেগুলেশন প্রণয়নে উদ্যোগী হন। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল স্হানীয় জনগণকে কোম্পানীর আইনের ভয় প্রদর্শন করে সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য করা। তাই ১৭৮৩ সালের রেগুলেশনে বলা হল যে অজ্ঞাত সারে অবাধ্য হলে অথবা অবজ্ঞা সহকারে কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে তাদের বিচার জনসমক্ষে করা হবে।[৮০]

অন্যদিকে বিদ্রোহের অপরাধে বিদ্রোহের হোতাদের বিভিন্ন রকম শাস্তি প্রদান করা হয়। ধীরাজ নারায়ণ রাজীব সর্দার, শেখ কেনা সরকার, কানিরাম, গোপাল, হররাম প্রভৃতিকে রংপুর ও দিনাজপুর জিলা হতে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে এদের সবপ্রকার সরকারী চাকুরীর অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। অধিকন্তু বলা হয় যে রংপুর বা দিনাজপুর জেলায় ভবিষ্যতে তারা কোনদিন প্রবেশ করলে শাস্তি প্রদানের জন্য তাদেরকে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করা হবে। অবশ্য খুব শীঘ্রই ধীরাজনারায়ণকে কর্তৃপক্ষর ইচ্ছানুযায়ী মুক্তি প্রদান করে কলকাতা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়।[৮১] সম্ভবত এ কাজটি ছিল রংপুর বিদ্রোহের দ্বিতীয় তদন্ত কমিশনের তৎপরতার একটি বিশেষ দিক।

রংপুর কৃষক বিদ্রোহের প্রতি সরকার এক দ্বৈত মনোভাব ও নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমে কোম্পানী সমঝোতামূলক নীতি গ্রহণ করলেও বিদ্রোহ দমনে তাদের ব্যর্থতায় পরবর্তীতে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করেন। বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও ক্ষিপ্রতা এত বেশী ছিল যে কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রংপুর অবস্হান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সময় রংপুরের স্হানীয় কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায়ে নিপীড়ন ও অত্যাচারকে বিদ্রোহের প্রধান কারণ মনে না করে কোম্পানীর নমনীয় নীতিকে 'বিদ্রোহের প্রধান কারণ বলে বিবেচনা করেন এবং দমন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেন। অন্যদিকে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেন যে পুনরায় উত্তেজনার সহায়ক হয় এমন কার্যক্রম হতে যেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিরত থাকেন। এজন্য রাজস্ব অনাদায়ের জন্য কোন ইজারাদারের ভূমি বিক্রয়ের পূর্বে ইজারাদার ও কৃষকের মধ্যে দেনা-পাওনার পূর্ণ হিসাব নিকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৮২] একই সাথে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃংখলা পুণঃ প্রতিষ্ঠার জন্যও রায়তদের মধ্যে রাজস্ব বিষয়ে অসন্তোষ দূরীকরণের জন্য বারংবার কালেক্টরের জেলা পরিদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৮৩] গ্রাম প্রধান বা বসনিয়া যারা এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের প্রতি অতি সতর্ক ও সচেতন থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রয়োজন বোধে বসনিয়াদের গ্রেপ্তার ও জনসমক্ষে ফাঁসি দানের নির্দেশও থাকে।[৮৪] অন্যদিকে বিদ্রোহী কৃষকদের অভিযোগ মেনে নিয়ে তাদের শান্ত করার

নীতি গ্রহণও লক্ষ্য করা যায়।

১৭৮৩ সালের রংপুর বিদ্রোহ সম্পর্কে সমসাময়িক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দু'টি দল লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে ১৭৮৩ সালে প্যাটারসন তদন্ত অনুষ্ঠানে রত হয়ে ইজারাদার দেবী সিংহ ও কালেক্টর রিচার্ড গুডল্যাডের তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হন।[৮৫] এতদ্সত্বেও প্যাটারসন রংপুরের রায়তদের সাক্ষ্য ও প্রদত্ত তথ্য গ্রহণ করে যে বিবরণী কোম্পানীর কমিটি অব রেভিনিউ এর নিকট পেশ করেন তা "ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ" বিধায় কর্তৃপক্ষ বিবরণীটি বর্জন করেন। সম্ভবতঃ প্যাটারসনের বিবরণীটি ছিল কমিটি অব রেভিনিউ এর স্বার্থ বিরোধী এবং সংগত কারণেই অপছন্দ। পরবর্তী সময়ে (১৭৮৪-৮৫) প্রেরিত রংপুর কমিশনের তদন্ত ও সাক্ষ্য ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ১৭৮৬ সালে রংপুর কমিশন যে বিবরণী সুপ্রীম কাউন্সিলে পেশ করে সেখানে প্যাটারসন কর্তৃক রিচার্ড গুডল্যা-ডের প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন এবং শেষ পর্যন্ত গুডল্যাডের পক্ষে বিভিন্ন সাক্ষ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে রংপুর কমিশনে জমিদার ও কৃষক সম্প্রদায়ের উপর দেবী সিংহের অত্যাচার ও নিপীড়নের যে সব তথ্য পাওয়া যায়, সেখানেই প্যাটারসনের বিবরণীর সত্য নিষ্ঠা অনুধাবন করা যায়। বলা যেতে পারে যে রংপুর কমিশন কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে যতটা অনুসন্ধান করেছেন, তার চেয়ে বেশী অনুসন্ধান করেছেন প্যাটারসনের তৎপরতা সম্পর্কে। দু'টি কমিশন গঠন ও কমিশনের তৎপরতা শুরু করার মধ্যে প্রকৃত ঘটনা অনেকটা বিকৃত হয়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য তৈরী করা হয়। এমন কি এসব তথ্যও রংপুর কমিশনে প্রকাশ পেয়েছিল যে কৃষকদের বিদ্রোহী নেতা নবাব ধীরাজনারায়ণ উৎকোচ গ্রহণ করেন এবং দেবী সিংহকে সমর্থন করে মুক্তিলাভ করেন।[৮৬] পরবর্তী কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দান কালে হস্তরেখাবিদ্ তোলারাম পন্ডিত ধীরাজনারায়ণের কারাগারে থাকাকালীন বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন যে জমিদারগণই এই বিদ্রোহের হোতা।[৮৭] যাই হোক পরবর্তী তদন্ত কমিশনের বদৌলতে দেবী সিংহ বেকসুর খালাস পেয়ে যান। অবশ্য গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সম্মতিতে কমিটি অব রেভিনিউ কর্তৃক মনোনীত দেবী সিংহ বর্ধিত হারে রাজস্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে রংপুরের ইজারা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং প্যাটারসন যতই সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করুন না কেন দেবী সিংহ শাস্তি যোগ্য হতেই পারেন না।[৮৮]

রংপুরের এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসন পূর্বের প্রশাসনিক বিশেষতঃ রাজস্ব নীতিকে পরি-

বর্তন করে যে নতুন নীতির প্রবর্তন করে তা মূলতঃ প্রত্যক্ষ আঘাত হেনেছিল এদেশের জনগণের দীর্ঘ প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর। ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে 'আসল তুমার জমা'র অভাবনীয় পরিবর্তন ও মাত্রাতিরিক্ত পরিমান বৃদ্ধি ছিল সাধারণ কৃষকের নিকট অকল্পনীয়। ফিলিপ ফ্রান্সিস নিজেই বক্তব্য রেখেছেন যে এদেশে মোঘল আমলে নির্ধারিত নির্দিষ্ট আসল জমার পরিমাণ ছিল কোম্পানীর আমলের তুলনায় অনেক কম এবং গ্রহণযোগ্য। এই অবস্থায় কোম্পানীর দেশীয় সহযোগীদের অর্থ আদায়ের লিপ্সা এবং এজন্য গৃহীত বিভিন্ন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা কৃষকদের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা বিপন্ন করে তোলে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র কোম্পানীর স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে ছিলনা, এই বিদ্রোহ ছিল কোম্পানীর প্রশাসনেরও বিরুদ্ধে। ১৭৮৩ সালের রংপুর বিদ্রোহ ছিল কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রথম ঐক্যবদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ও সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে তারা কোম্পানী সরকারকে নতুন নীতি নির্ধারণে ও রাজস্ব নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করেছিলেন। সুতরাং রংপুর কৃষক বিদ্রোহকে বাংলার পরবর্তী কৃষক আন্দোলনের পথ প্রদর্শক বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. মেহরাব আলী, 'ঘোড়াঘাট সরকারের পাঠান বিদ্রোহ', "ইতিহাস", তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৩৮-৫২।

২. E. G. Glazier, *Further Notes on the Rungpore Records*, vol, II, Calcutta, 1876, pp. XXXIX-LX.

৩. Sub-Divisional Collector of Rangpur to Collector of Rangpur, 17 July, 1873, *Bangladesh Secretariat Records* (hereafter referred as *B. S. R.*), *Rangpur District*, Letter Sent, vol. 511, Letter No, 77, pp. 87-91.

৪. রতন লাল চক্রবর্তী', 'কৃষিজ পণ্য বাণিজ্যে শোষণ ও বাংলার কৃষক সম্প্রদায়, ১৯৩৭-৪০', "ইতিহাস সমিতি পত্রিকা", দশম সংখ্যা', ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৮৪-১২০।

৫. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, "কৃষক সভার ইতিহাস", কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬।

৬. Adrienne Cooper, *Share Cropping and Share Croppers' Struggle in Bengal*, 1930-1950, Unpublished ph. D. Dissertation, University of Sussex, 1984 ; Kamal Siddqiui and Altaf Hossain, 'Tebhaga Movement in Bengal, (1946-47) : An

Assessment', *Studies in Rural History*, Bangladesh Itihas Samiti, 1979, pp. 41 ; সোমনাথ হোর, 'তেভাগার ডাইরী' নির্মাল্য আচার্য (সম্পাদিত), এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

৭. Gopal Chandra Das, *Report on the Statistics of Rungpore*, Calcutta, 1874, paras. 13-14.

৮. শারাফদের কার্য-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন, Irfan Habib, 'Banking in Mughal India', in Tapan Ray Chowdhury (ed.), *Contributions to Indian Economic History*, vol. I, pp. 2-3 ; J. C. Jain, *Indigenous Banking in India*, Calcutta, 1929, pp. 27-35.

৯. কোম্পানীর শাসনকালে প্রতিটি অঞ্চলের কৃষকদের মুদ্রা সম্পর্কিত জটিল অবস্থা সম্মুখীন হতে হতো। Collector of Mymensingh to President and Members of the Board of Revenue, *B. S. R.*, *Mymensingh District*, 14 May, 1784, Letter sent, vol. 29, p. 105.

১০. Sub-Divisional Collector to Collector of Rangpur, 17, July, 1873, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Sent, vol. 511, Letter No. 77, pp 82-83.

১১. Edward Wheler for Members of the Commission of Enquiry, *B. S. R.*, *Rangpur District*, 7 March, 1784, Miscellaneous Letter Sent and Received, vol, 416, pp. 3-4 ; also Sirajul Islam, 'Muslim Resistance to Early British Rule in Bengal', Paper presented at the Symposium on Islam in Bangladesh, 24-26 December 1982, Dhaka, (Mimeograph), p. 10.

১২. সরকারী নথিপত্রে বলা হয় ঃ "This was indeed a lesson to show the fallacy and unsoundness of the principle which regulated the attention of the zemindars into a farming sistem (system). The zemindars whatever be the status or their position previous to their admission to the direct management of their lands after having once tested the sweets of independence could not naturally bear with patience the severity of dependance and instigated the ryots to general insurrection." Sub-Divisional Collector of Rangpur to Collector of Rangpur, 17 July, 1873, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Sent, vol. 511, Letter No. 77, pp. 87-88.

১৩. Account of the Silver coins current in District dependant

on the Collectorship of Rangpur, 1787, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Sent and Received, vol. 419, p. 98.

১৪. Report of the Rangpur Commission, quoted in Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal, 1783*, New Delhi, 1972, p. 56.

১৫. Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal, 1783*, pp. 47-48.

১৬. রাজস্ব বন্দোবস্তের পূর্ণ বিবরণ নিম্নোক্ত উৎস হতে নেওয়া হয়েছে। Deposition of Chilaram, 14 March, 1785, *B. S. R. Rangpur District*, Letter Received, vol. 16, pp. 106-107 ; Deposition of Atmaram, 13 May, 1785 ; Deposition of Basoo Sircar, 14 May, 1785 ; Deposition of Zehoor Busneah, 15 May, 1785, *B. S. R. Rangpur District*, Miscellaneous Letter Sent and Received, vol. 417, pp 137-61.

১৭. Fort William Authority to Paterson, 30 September, 1784, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Sent and Received, vol 416, p. 221.

১৮. Collector of Rangpur to President and Members of the Board of Revenue, 24 May, 1788, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Sent, vol. 286, p. 87.

১৯. Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal, 1783*, pp. 56-59.

২০. Deposition of Chilaram, 14 November, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 16, pp. 106-107 ; প্যাটারসনের চিঠিতে বিষয়টি, ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : 'Under the head of firany (ferary) the jumma of absentees was collected by and assessment upon these who remained in settled proportions from each ryot ; the complaints against these were universal from every village.' Letter from Paterson, *Proceedings of Committee of Revenue*, 20 October, 1783, quoted in Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal, 1783*, pp. 59.

২১. মহাজনদের অত্যাচার ও অতিরিক্ত সুদ আদায় সম্পর্কে দেখুন, Translation of a Petition of the Zemindars of Caurgeehaut, 6 October, 1784, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous

Letter Received and Sent, vol. 416, pp. 266-68.

২২. Deposition of Several ryots, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 14, pp. I-187.

২৩. Fort William Authority to Collector of Rangpur, 13 January, 1783, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 10, p. 7.

২৪. Deposition of Atmaram, 13 May, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Sent and Received vol. 417, p. 127.

২৫. রংপুরের বিভিন্ন পরগণার কৃষকগণ এক আবেদনের মাধ্যমে জানান ঃ 'We have nothing left, we have sold our cattle, effects, women and whatever we had, how much longer are we to bear the severity of the collections, we have therefore left our Houses and come forth as *Fakirs*' (কৃষকদের এই আবেদন-পত্রের মূলকপি না পাওয়ায় কোম্পানীর সমসাময়িক কর্মচারীর ইংরেজী অনুবাদ তুলে দিতে হলো।) Petition of the Ryots of Kauiknea, Cargeehaut, Futteepore, Tepah, Munteenna, Odassey, Bamandanga, Purba Bhag, Panga & ca., 1783, *B. S. R*, *Rangpur District*, Letter Sent, vol. 281, p. 35.

২৬. Deposition of Devi Singh, 10 May, 1785, *B. S. R*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Sent and Received, vol. 417, pp. 17-23 ; Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal, 1783*, p. 62.

২৭. Deposition of Zehoor Busneah, 8 May, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter and Received, vol. 417, p. 43.

২৮. Deposition of Shaik Sufdail, 31 March, 1785, *B. S R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 15, p. 308.

২৯. Deposition of Apassoo Pyke, 6 April, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 15, p. 43 ; Deposition of Ram Hari, 1 March, 1785 and deposition Khosaul, 7 March, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 16, pp. 10 and 128 respectively.

৩০. 'Ansoo Mundle an inhabitant of Catsa Coudee, had his house surrounded by Sham Sirdar, who took his unmarried daughter and brought her to the Cutcherree, and kept her

in a house for a month, robbed her of her caste and Honor (sic) and then dismissed her.' Deposition of Munderam, 5 March, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 16, p. 38.

৬১. অত্যাচারের প্রকৃতি সম্পর্কে রায়তদের বক্তব্য ছিল : '...*Sizawals* and *Tassildars* were sent throughout the Mofussil who coming into the country, tied into Bamboos, beat us with *corahs* with Tists and put us to every possible in convenience, our Beards were not left.' Translation of a Letter from the Ryots of Cargeehaut, Futtypore, Kankunia and Tipah, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Sent, vol. 281, pp. 29-30.

৬২ Ranjit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, Delhi, 1983, p. 116.

৬৩. 'The *Busneahs* and principal Riotts of each *talook* therefore met together and entered into a confederacy with Derjenarrain, *Nobob* of the Insurrection.' Deposition of the Ryots regarding the *Dhing*, 10 April, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 15, p. 94.

৬৪. Translation of a letter from the Insurgent to the Busneah, 21 May, 1189, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 417, p. 140.

৬৫. Deposition of the Ryots regarding the *Dhing*, 10 April, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 15, pp. 92-93.

৬৬. এ সম্পর্কে পরবর্তী তদন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়ে শেখ কেনা সরকার বলেন : '. . . gave me a pen and ink, and told me to write to the several *talooks* to bring all the Riotts together.' Cenah Sircar's deposition, 11 May, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent. vol. 417, p. 91.

৬৭. Deposition of several ryots of Soolmary, 10 April, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 15, pp. 92-94.

৬৮. Collector of Rangpur to President & ca., gentlemen of the Committee of Revenue, Fort William, 22 July, 1783, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Sent, vol, 281, pp. 23-28.

৩৯. Petition of the Ryots of Kauknea, Cargeehaut, Futteepore, Tepah, Munteenna, Odassey, Bamandanga, Purub Bang, Panga etc. 22 July, 1783, *B. S. R., Rangpur District*, Letter Sent, vol. 281, p. 35.

৪০. Richard Goodlad to the Ryots of the Pergunnahs of Kaukeneah, Cargeehant & ca., *B. S. R., Rangpur District*, (No date), Letter Sent. vol. 281, pp. 37-38.

৪১. Deposition of Lalla Manick Chund, 13 November, 1784, *B. S. R., Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 413, p. 213.

৪২. Collector of Rangpur to President & ca., Gentlemen of the Committee of Revenue, Fort William, March, 1783, *B. S. R., Rangpur District*, Letter Sent, vol. 281, pp. 24-25.

৪৩. কমিটি অব রেভিনিউ এর নিকট প্রেরিত রিচার্ড গুডল্যাডের পরোয়ানায় বলা হয়ঃ "Whether in Buda or Salbaree where evil disposed persons have raised their hands, immediately attack them and if they appear with arms, you will kill them without apprehensions. . .you will single out some in order to excite terror and expose publicly as examples and in whatever villages these evil disposed people may be, you will set fire to that village and seize and make the whole of them prisoners." Goodlad to Committee of Revenue, 6 February, 1783, quoted in Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal*, 1783, pp. 28-29.

৪৪. Proceedings of the Committee of Revenue, 24 March, 1783, quoted in Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal*, p. 29.

৪৫. Lieutenant Macdonald to Richard Goodlad, 13 February, 1783, *B. S. R., Rangpur District*, Letter Sent, vol. 281, pp. 32-33.

৪৬. Alexander Macdonald to Richard Goodlad, 22 February, 1783, *B. S. R., Rangpur District*, Letter Sent, vol, 281, p. 34.

৪৭. Collector of Rangpur to Committee of Revenue, March, 1783, Government of Bengal, *Bengal District Records, Rangpur*, vol. IV. 1779-1785, Letter Issued, Calcutta, 1921, Letter No. 204, p. 1153.

৪৮. Commanding officer to Collector of Rangpur, *B. S. R., Rangpur District*, Letter Received, vol. 9, Letter No. 209.

৪৯. রংপুরের পরিস্থিতি এতই জটিল হয়ে পড়েছিল যে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত সংখ্যার সৈন্য বাহিনী রংপুরে মোতায়েন করতে বাধ্য হন।

সুবাদার	২	হাবিলদার	১৬	সিপাহী	২০০
জমাদার	১	নায়েক	১৬	ভিস্তি	৪
সহকারী জমাদার	১	ভেরী বাদক	২	লস্কর	২
হাবিলদার মেজর	১	ঢাকী	২	অন্যান্য	৬

Collector of Rangpur to commanding officer, January, 1783, *B. S. R., Rangpur District*, Letter Received, vol, 10, p. 25.

৫০. Deposition of Baboo Doby regarding the insurrection, 14 March, 1785. *B. S. R., Rangpur District*, Letter Received, vol. 16, p. 108.

৫০ক. Collector of Rangpur to Committee of Revenue, March, 1783, *B. S. R., Rangpur District*, Letter Sent, vol. 281, p. 25; রংপুরের নীলফামারী থানার পঞ্চপুকুর ইউনিয়নে 'ডিংডিং পাড়া' নামে একটি গ্রাম এই করটির স্মৃতি আজো বহন করছে। দেখুন, এ, কে, এম, নাসির উদ্দিন, 'নীলফামারীর ইতিহাস', নীলফামারী, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৩৬।

৫১. Deposition of Jankiram alies Daunnu, 14 March, 1785, *B. S. R., Rangpur District*, Letter Received, vol. 16, p. 113.

৫১ক. 'Each of these peasants has a stick or bamboo in his hand, their dress is like that of the ryots or villagers, they are neither *sepahis, fakirs* or night robbers.' Zabanbandi of Boghil Sordar, quoted in Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal*, p. 37.

৫২. Deposition of Kena Sircar, 11 May, 1785, *B. S. R., Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 417, p. 94.

৫৩. 'The next day we set off to Sarabarree and stop'd on the road, when Atmaram said to Keena examine your *Phull* Book and see if it a lucky Day. Keenah said put your finger on the Book, when kenah said it is a lucky Day, we shall be victorious—we then went to Sarabarree." Deposition of Shaike Conah Sircar, 16 May, 1785, *B. S. R., Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent,

vol. 417, p. 167.

৫৪. Collector of Rangpur to Committee of Revenue, March, 1783, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Sent, vol. 281, Appendix 3, p. 31.

৫৫. Deposition of Richard Goodlad, 29 January, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 14, p. 200.

৫৬. Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal*, pp. 26 and 36. উল্লেখ্য যে রতিরাম দাস রচিত 'রঙ্গপুরের জাগের গানে" উল্লিখিত নেতা শিবচন্দ্র ছিলেন একজন জমিদার যিনি রায়তদের উত্তেজিত করার জন্য গ্রেপ্তার হন। তবে ১৭৮৩ সালের রংপুর ডিং এ তার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না।

৫৭. 'Many people assembled together and delivered who should be their chief—they all said in the former insurrection Dalleem Narrain was the chief there is his son by name Derjenarrain borning time this said they sent men who brought him and all the Dhing presented a Rupee as *Nazar* to Derjenarrain and appointed him *Nobob* or the *Dhing* to which he consented." Deposition of Rajib Sardar, 13 May, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 417. pp. 121-27.

৫৮. Shaike Conah Sircar's Deposition, 16 May, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, 417, p. 168.

৫৯. Sub-Divisional Collector to Collector of Rangpur, 17 July, 1873, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Sent, vol. 511, p. 89.

৬০. Deposition of Derjenarrain, 10 May, 1785, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 417, pp. 62-64.

৬১. দেখুন, রতন লাল চক্রবর্ত্তী, 'ফকীর-সন্যাসী আন্দোলনের কয়েকটি দিক' "ইতিহাস সমিতি পত্রিকা", তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮১-৮২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৩-৫৬।

৬২. সিলেটের আগা মুহম্মদ রেজা সম্পর্কে কালেক্টর লেখেন ঃ 'This Agah Mahomed Reza has assumed the character and attributes of a Prophet calling himself Immaum Mehadie.' Collector of Sylhet to Board of Revenue, 10 July, 1799, *B. S. R.*, *Sylhet District*, Letter Sent, vol. 310, p. 203.

৬৩. Jamini Mohan Ghosh, 'Pagal Panthis of Mymensingh', *Bengal Past and Present*, vol. 28, 1924, pp. 42-53.

৬৪. রতন লাল চক্রবর্তী, 'বাখরগঞ্জের প্রথম প্রজা বিদ্রোহ', ১৯৭৯ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত ইতিহাস সমিতির সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ (Mimeograph)।

৬৫. এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য দেখুন, Ranjit Guha 'The Prose of Counter insurgency', *Subaltern Studies : Writings on South Asian History and Society,* Ranjit Guha (ed.), vol. II, Delhi, 1983, pp. 34-38.

৬৬. Deposition of Keena Sircar, 11 May, 1785, *B. S. R., Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 417, p. 95.

৬৭. ধীরাজ নারায়ণের বিবৃতি, 'I put my cloth about my neck and said to the insurgents take care you do not kill him for he is a Brahmin, spare his life and bring him here.'' Deposition of Derjenarrain, 10 May, 1785, *B. S. R., Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 417. p. 69.

৬৮. গোবিন্দ প্রসাদ দাস তাঁর জবানবন্দীতে বলেন : 'Those people in order to hide the murder and plunder they have been guilty of all the insurgents have assembled together—some have been witness others plaintiffs, those to be Ryots and to have no fear of killing a Bramin nor of their faith, what fear can they have of the Khoraun (the Quran) and *Tumbah Toojey ?*' Deposition of Govind Prasaad Dass, 8 May, 1785, *B. S. R., Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 417, p. 95.

৬৯. Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal*, p. 39. নরহরি কবিরাজের তথ্যে কেনা সরকারকে হিন্দু হিসেবে বলা হয়েছে। কিন্তু শেখ কেনা সরকার ছিলেন একজন মুসলমান।

৭০. পূর্বোক্ত।

৭১. Ranjit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, p. 18-76.

৭২. কোম্পানীর জনৈক কর্মচারীর প্রশাসনিক তৎপরতার প্রতি বিদ্রোহী কৃষকদের মনোভাব ও বক্তব্য সম্পর্কে নন্দরামের জবানবন্দী : '. . . We are sent here by order of the Huzzoor and act according to that we have not come to fight, they answered your Master is

now dismissed, we shall not obey your orders, if you have a mind to save your lives, you must immediately go away. On seeing the *Dustuck* they threw it away and abused us, and took the *prisoners* from us, made us repay what we had received as *Roze karach* (daily allowance). and confined us." Translation of the Deposition of Nandaram. 16 June, 1783, *B. S. R., Rangpur District,* Letter Sent, vol. 281, pp. 53-54.

৭৩. সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', কলকাতা, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৮৭-৯০।

৭৪. Letters from the zeminders of Cargeehaut to Cena Sircar, 17 and 21 *Pose,* 1189 B. S., *B. S. R., Rangpur District,* Letter Received, vol. 15, pp. 1-14; Deposition of Devi Singh, 19 May, 1785, *B. S. R., Rangpur District,* Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 417, p. 243.

৭৫. Ranjit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,* p. 80.

৭৬. 'We the Riotts of Bazee Doomreah and Burral Doomreah *&* ca., agreed among ourselves not to pay any Revenue often the end of *Chyte* and raising a Disturbance went to the south ward of Haldabarry. . .' Deposition of several Ryots, 28 *Maug.* 1189, B. S., *B. S. R., Rangpur District,* Letter Received, vol. 15, p. 100.

৭৭. 'It has been already observed that the tax of Dereenvillah was one of the great causes of the Disturbance and people's rising.' Extract from Mr. Paterson's letter of observation, 29 September, 1784, *B. S. R., Rangpur District,* Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 413, pp. 210-11.

৭৮. John Shore to Richard Goodlad, 17 February, 1783, *Bengal District Records, Rangpur,* vol. III, 1783-85, Letter Issued Calcutta, 1920, Letter No. 24, p. 14.

৭৯. Collector of Rangpur to Committee of Revenue, 22 July, 1783, *B. S. R., Ranpgur District,* Letter Sent, vol. 281. pp. 57-62.

৮০. ১৭৮৩ সালের রেগুলেশনের জন্য দেখুন, *B. S. R., Rangpur District,* Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 415, pp. 119-20.

৮১. Letter from Board of Revenue, 29 January, 1789, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 423, pp. 144-45.

৮২. Fort William Authority to Collector of Rangpur, 6 July, 1783, *B. S. R.*, *Rangpur District*. Letter Received, vol. 10, pp. 53-54.

৮৩. Fort William Authority to Collector of Rangpur, 20 February, 1783, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol. 10, p. 43.

৮৪. Richard Goodlad to Lieutenant Macdonald, 13 February, 1783, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Sent, vol. 281, pp. 32-33.

৮৫. প্যাটারসন কমিশনের অনুসন্ধেয় বিষয় সম্পর্কে দেখুন. Samuel Charles to Richard Goodlad, 17 February, 1783, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Letter Received, vol 10, pp. 21-23.

৮৬. Peter Moore to William Cowper, 22 July, 1783, *B. S. R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Sent and Received, vol. 418, p. 113.

৮৭. ধীরাজ নারায়ণের যে বিবৃতিটি পণ্ডিত তোলারামের মাধ্যমে পাওয়া গেছে তা' নিম্নরূপ : "I am confined on account of the insurrection. The zemindars by writings created the insurrection. They also embezzled the Ryots Balances have given Deby Singh a Bad name." Deposition of Toolaram Pandit, 21 May, 1785, *B. S R.*, *Rangpur District*, Miscellaneous Letter Received and Sent, vol. 418, p. 21.

৮৮. Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal*, p. 75.

ভেলাম ফন স্ক্রেন্ডেল

ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৪-১৮৩৩)

দক্ষিণ এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস চর্চার বিষয় হচ্ছে, কিভাবে নতুন শক্তির প্রভাবে স্থানীয় রাজ্য-সমূহে ভাঙ্গন ধরে, কিভাবে শাসকশ্রেণীকে পর্যুদস্ত করা হয়; এবং কিভাবে বৃটিশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ার ফল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন। এ রাষ্ট্র গঠন ছিল এমনি একটি রাজনৈতিক-আইনগত প্রক্রিয়া যার মধ্যে বিশাল যুদ্ধের ভূমিকা খুব গৌণ। নতুন নতুন এলাকা একের পর এক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, প্রণীত হয়েছে নতুন আইন, স্থাপিত হয়েছে নতুন শোষণ ব্যবস্থা।

ঐতিহাসিকগণ জানেন যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন ছিল একটি অবিরাম প্রক্রিয়া, যা সব সময় শ্রেষ্ঠ ঘটনাসমূহের সমান্তরালে চলেনি, যদিও তাঁরা ওসব ঘটনাকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এমনও দেখা যায় যে, অনেক সময় ঔপনিবেশিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়েছে আনুষ্ঠানিক-ভাবে ভূ-খণ্ড দখলের আগেই, আবার অনেক সময় রাজ্য বিজয়ের পরও ঔপনিবেশিক ক্ষমতা প্রয়োগ পিছিয়ে থাকে। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া যেভাবে দৃষ্ট হয় ঠিক সেভাবে এর ইতিহাস তৈরী করা প্রায়শ কঠিন। ক্ষমতাকেন্দ্রের উচ্চ রাজনীতি এবং প্রাথমিক ঔপনি-বেশিক শাসকদের জীবনধারা লিপিবদ্ধ করা সহজ। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তি ও আঞ্চলিক রাজনীতির গোধূলী পর্যায় নিয়ে লেখা খুবই কঠিন। এ অঞ্চলে অধিকাংশ কর্ম নায়ক পড়তে জানে না, লিখতে জানে না। এর বিপরীতে আছে ঔপনিবেশিক কর্মচারীরা। এদের অজ্ঞতাপূর্ণ ও পক্ষ-পাতদুষ্ট প্রতিবেদনই আমাদের স্থানীয় ইতিহাসের প্রধান উৎস।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি প্রাথমিক একটি কৃষক বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করবো। ১৮২৪ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে একটি ব্যাপক বিদ্রোহ উত্তর ময়মনসিংহ জেলাকে আন্দোলিত করে। কিন্তু এ বিদ্রোহ সম্পর্কে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসবেত্তাগণ নীরব। ঔপনি-

বেশিক শাসনের প্রথম দিকের কৃষক অসন্তোষ নিয়ে বিস্তর লেখালেখির পটভূমিতে এ নীরবতা খুবই লক্ষণীয়, বিশেষ করে যখন দেখতে পাই যে এ বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রচুর সরকারী দলিলাদি ও অন্যান্য সাক্ষ্যাদি বিদ্যমান।[১] এ নীরবতার কারণ? এর একটি কারণ এই যে ময়মনসিংহ বিদ্রোহটি সহজে প্রচলিত ইতিহাস লিখন ধারায় পড়ে না। কৃষক বিদ্রোহকে যারা বিংশ শতকের কৃষক অসন্তোষের খাপে ফেলতে চান তাদের পক্ষে ময়মনসিংহ বিদ্রোহকে অনুধাবন করা একটি সমস্যা বটে, এবং তাদের পক্ষে এ বিদ্রোহকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রচলিত ধারায় এ বিদ্রোহকে প্রাক-জাতীয়তাবাদী, প্রাক-সমাজতান্ত্রিক বা প্রাক-সাম্যবাদী বলে আখ্যায়িত করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

এ মনোভঙ্গীর একটি উপমা তিতুমীরের বিদ্রোহ ও ফরায়জী আন্দোলনের উপর গবেষণাসমূহ। এসব গবেষণা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে যে ওসব সশস্ত্র বিক্ষোভ আন্দোলন ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক তৎপরতা যা পরবর্তীতে ইসলামীক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।[২] উক্ত গবেষণা সমূহ মনে করে যে ঔপনিবেশিক আমলের প্রাথমিক পর্বের বিদ্রোহগুলো ছিল অনেকটা প্রাক রাজনৈতিক। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাহীন, স্বতঃস্ফূর্ত, স্থানীয়, ধর্মভিত্তিক। আর ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্বের আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক, অর্থাৎ পরিকল্পিত, নেতৃত্বাধীন, আদর্শিক ও সংগঠিত। ময়মনসিংহ বিদ্রোহকে আদিপর্বে গণ্য করা হয়। এ ধারণা ফের পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে ময়মনসিংহ বিদ্রোহকে সংযুক্ত করে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, প্রাথমিক ঔপনিবেশিক যুগের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে পরবর্তী যুগের নিরিখে বিচার না করে সমকালীন পরিস্থিতির নিরিখে বিচার করলে আমরা বিদ্রোহের আসল রূপের সন্ধান পেতে পারি।

কৃষক বিদ্রোহের পরিবেশ

অঞ্চলের অস্থির অবস্থা

ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশে ১৮২৪ সালে একটি কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। হাঙ্গামা এলাকার সীমা পশ্চিম-দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী, উত্তরে গাড়ো পাহাড়মালা ও পূর্বে হাওড় এলাকা। ভৌগোলিকভাবে এ এলাকার রয়েছে আলাদা পরিচয় ও সত্তা। এর অবস্থান এমন যে অতীতে বাংলায় রাজ্যের পর রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু কোন রাজ্যই এ এলাকাকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয় নি। কখনও বৃহত্তর রাজ্যে

অন্তর্ভুক্তি, কখনও আঞ্চলিক স্বাধীনতা হচ্ছে এ এলাকার রাজনৈতিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। বেশ কয়েকটি ক্ষুদে রাজ্য এখানে স্থাপিত হয়েছে দুঃসাহসী রাজনৈতিক ফটকাবাজদের দ্বারা। আসাম বা বাংলায় পরাজিত হয়ে পশ্চাদাপসারণ করে এরা এখানে স্থাপন করেছে নিরাপদ ঘাঁটি। চতুর্দশ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আঞ্চলিক ক্ষুদে রাজ্যগুলি স্থাপনে নেতৃত্ব দিয়েছে গারো, কোচ, আফগান, উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও মোগল বাহিনী থেকে বিচ্যুত সেনানীরা।[৩] মোগল সম্রাটরা যদিও এ অঞ্চলের উপর সার্বভৌমত্ব ও রাজস্ব দাবী করেছে, কিন্তু বাস্তবে মোগল কর্তৃত্ব ছিল নামেমাত্র বা শূন্য।

১৭৬৫ সালে বাংলায় মোগল রাজ্য বৃটিশদের করতলগত হয় এবং এর সঙ্গে বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্গত হয় উত্তর ময়মনসিংহও। কিন্তু এমন একটি এলাকার উত্তরাধিকারী হয়, যে অঞ্চলের উপর কখনও কেউ শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেনি বা করতে পারেনি। এ এলাকার বহু দুর্গের অস্তিত্বের কারণ এর অতীতের সংঘাতময় ইতিহাস। দুর্গগুলোর একটি হচ্ছে চতুর্দশ শতাব্দীর গড় জরিপা। দুর্গটি ছিল সাত দেয়াল ও চার পরিখা বেষ্টিত। আলোচ্য কৃষক বিদ্রোহে এ দুর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪]

বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক যুগে উত্তর ময়মনসিংহে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছিল খুবই দুর্বল। পুরনো পরগনা প্রথা মোতাবেক শেরপুর, শুসং ও আলপসিংহ—এ তিনটি পরগনায় বিভক্ত ছিল এলাকাটি।[৫] থানা তিনটি—শেরপুর, ঘোষগাঁও ও নেত্রকোনা। প্রতি থানার জন্য মাত্র তেরো জন পুলিশ ও তিনটি থানায় সব মিলে সাত শত চৌকিদার।[৬] অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রায় তিন লক্ষ লোক অধ্যুষিত এলাকাটিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-কাঠামো ছিল খুব দুর্বল।[৭] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বিদ্রোহের কেন্দ্রভূমি শেরপুর পরগনার রাজস্ব দাবী ছিল মাত্র ১২০০ সিক্কা টাকা। কিন্তু ১৮২০ সালে কৃষকদের কাছ থেকে জমিদার কর্তৃক আদায় কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ সিক্কা টাকা।[৮] অর্থাৎ জমিদার যেখানে সরকারকে রাজস্ব দিচ্ছে এক হাজার বা এর কম, সেখানে উক্ত পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহের মানে হচ্ছে সরকার তাদের মোট আয়ের হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র পেতো রাজস্ব হিসেবে। এক কথায়, জমিদারেরা রাজস্ব সংগ্রহকারীর ভূমিকা গ্রহণ করলেও তাদের সনাতন আধা-স্বাধীন নরপতির মর্যাদা প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে।

সন্ন্যাসী ও ফকীরদের তীব্র তৎপরতা ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দুর্বলতা প্রমাণ করে। হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলিম ফকীরেরা বহু পূর্ব

থেকেই উত্তর ময়মনসিংহে বসবাস করতে থাকে।[৯] এদের অনেকে ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়, আবার অনেকে টাকা লগ্নি ব্যবসাও করে।[১০] ১৭৭০ ও ১৭৯০ এর দশকের মধ্যে ভ্রাম্যমান ফকীর সন্যাসীরা ঘন ঘন আঘাত হানে। এদের প্রভাবে স্থানীয় বৈষয়িক আধ্যাত্মিকেরাও জমিদারদের প্রতি উগ্র মনোভাব ধারণ করে। ১৭৭০ এর পর সশস্ত্র ফকীর-সন্যাসীরা প্রায় নিয়মিত ময়মনসিংহে অনুপ্রবেশ করে গাড়ো পর্বতমালা পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং জমিদারদের কাছ থেকে নানা তোলা সংগ্রহ করে। এর ফলে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ নানাভাবে ব্যাহত হয়।[১১] জমিদারেরা রাজস্ব মওকুফের আশায় ফকীরদের দ্বারা সংঘটিত নিপীড়নের কথা সরকারের কাছে বাড়িয়ে বর্ণনা করলেও এটা সঠিক যে ফকীর-সন্যাসীরা জমিদার ও সরকারের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছিল।[১২] এ ব্যাপারে আবাসিক ফকীরেরা জমিদারদের কাছ থেকে তাদের দাবী দাওয়া আদায়ে অধিকতর তৎপর হয়ে উঠেছিল।[১৩] ফকীর-সন্যাসীরা ছিল এমন একটি শক্তি যার বিরোধীতার লক্ষ্য ছিল স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী ও ঔপনিবেশিক শক্তি উভয়ই। অবশ্য অনেক জমিদার অস্ত্রচালনায় পারদর্শী ফকীরদের তাদের বরকন্দাজ হিসেবে নিয়োগ করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।[১৪]

আঠারো শতকের শেষে উত্তর ময়মনসিংহে অনেক পরস্পর বিরোধী শক্তি ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এদের একটি। সব মিলে গঠন করে একটি জটিল ও অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা। কৃষি উৎপাদনের উপর দাবী ছিল কৃষক, জমিদার, রাষ্ট্র ও আমলা শ্রেণীর এবং ঐ দাবীর মধ্যেই নিহিত তথাকার রাজনৈতিক অস্থিরতার বীজ।[১৫]

জমিদারদের যুদ্ধ ঘোষণা

উক্ত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে এটা স্বাভাবিক যে জমিদারেরা তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধিকল্পে তৎপর হবে। এরা চেষ্টা করে কৃষকের উপর কর বৃদ্ধি ও জমিদারীর সীমা সম্প্রসারণ করতে এবং রাষ্ট্রের স্থানীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখতে। সরকারকে নামেমাত্র রাজস্ব দেবার শর্তে ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ে জমিদারেরা বিপুল উদ্বৃত্ত আয় আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়। এর উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকার নিয়ন্ত্রণবিহীন আয় দিয়ে জমিদারেরা ব্যক্তিগত বাহিনী গড়ে তোলে। এ বাহিনী বলে এরা সরকারের ইপ্সিত স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েম করার প্রচেষ্টাকে ব্যহত করার সফল প্রয়াস পায়। অধিকন্তু, জমিদারেরা ফকীর-সন্যাসী আক্রমনের জিগীর তুলে তাদের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় সিপাহী

পাঠাবার দাবী জানায়। অর্থাৎ প্রজাসাধারণদের আনুগত্যে বাধ্য করতে বা মহাজন শ্রেণীকে বাগে আনার ব্যাপারে জমিদারসমাজ গঠন করে রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্র।[১৬]

জমিদারদের ভূ ভিত্তিক ক্ষমতা দু'রকমভাবে লাভ করা যেতো। প্রথম, জমিদারীর অনাবাদ অংশে রায়ত বসিয়ে আয় বৃদ্ধি করা,[১৭] এবং দ্বিতীয়, প্রতিবেশী জমিদারী বা উত্তরের গারো পাহাড়ী অঞ্চল দখল করে জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি করা।[১৮] ১৭৭৫ সালে গারো পাহাড়ের পশ্চিম দুরপাদদেশে অবস্থিত কড়ইবাড়ীর জমিদার গারো এলাকা আক্রমণ করে নিজেকে একজন স্বাধীন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। তার উচ্চাভিলাষের ফলস্বরূপ প্রতিবেশী শেরপুর ও সুশং এর জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। সে গারো পাহাড়ের অনেক অঞ্চল দখল করে এবং পরে শেরপুর ও সুশং পরগনায় আক্রমণ চালায় ও লোকজন হরণ করে।[১৯] প্রতিপক্ষ শেরপুর ও সুশং এর জমিদারগণ পাল্টা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করে। ১৮০৯ সাল পর্যন্ত কড়ই বাড়ীর জমিদার একজন স্বাধীন নরপতি হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে শেরপুর জমিদারীর বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে হিস্যা নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অংশীদারগণ স্ব স্ব দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র আইনের লড়াই ছাড়াও স্থানীয়ভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে। পরিস্থিতি চরম জটিলতা লাভ করে যখন এক পর্যায়ে বিদেশী ভাড়াটে বরকন্দাজরা বিদ্রোহ (১৭৯১) করে একজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছারী লুট করে এবং তাকে বন্দী করে তদীয় শত্রু কড়ইবাড়ীর জমিদারের কাছে সমর্পণ করে। বিদ্রোহী বরকন্দাজদের সহায়তায় কড়ইবাড়ীর জমিদার শেরপুর আক্রমণ করে এবং অপর প্রধান জমিদারকেও বন্দী করে। সরকারের হস্তক্ষেপে অবশেষে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান ঘটে এবং বন্দী জমিদারগণ মুক্তি পায়।[২০]

হিস্যা নিয়ে বিভিন্ন অংশীদারদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে ১৮০৩ সালে দীওয়ানি আদালতের রায়কে কেন্দ্র করে শেরপুরে আবার প্রচন্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। দাঙ্গা দমানোর জন্য শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনী তলব করতে হয়। আবার শুরু হয় দীওয়ানি আদালতে আইনের লড়াই। ১৮০৮ সালে আদালত রায় দিলে ঐ রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে সকল পক্ষ আবার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়। ৭৬টি গ্রাম পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। সামরিক বাহিনীর সাহায্যে অবশেষে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়।[২১]

এর ঠিক পর পরেই শেরপুর জমিদারী বাটোয়ারার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমিন পাঠানো হয়। কিন্তু উক্ত বাটোয়ারা সম্পন্ন করতে সময় লাগে প্রায় বারো বছর। এ দেরীর জন্য সরকারী ব্যাখ্যা হচ্ছে, জমিদারীর বিভিন্ন অংশীদারদের প্রতিরোধ, বিচার বিভাগের সঙ্গে অসহযোগিতা ও আমিনের দুর্নীতি।[২২] এ সব কিছু প্রমাণ করে যে ঊনবিংশ শতকের প্রথম সিকি পর্যন্ত এলাকায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল অসম্পূর্ণ। ১৮২০ সালে সরকার শেরপুর জমিদারীর বাটোয়ারা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, কেননা অংশীদারগণ পরস্পর প্রতিরোধ প্রতিদ্বন্দ্বীতার পথ পরিহার করে স্বেচ্ছায় বাটোয়ারা গ্রহণ করতে রাজী হয়।[২৩] এসব ঘটনা এলাকায় ঔপনিবেশিক শাসনের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে।

বিধ্বস্ত অর্থনীতি

খণ্ডিত সার্বভৌমত্ব, প্রলম্বিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কৃষককুলের উপর মাত্রাতিরিক্ত কর-চাপ, নিরাপত্তার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা প্রভৃতি কারণে স্থানীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। ১৭৮৭ সালে ব্রহ্মপুত্র নদের পুরনো গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে নতুন যমুনা নদীর সৃষ্টি হলে উত্তর ময়মনসিংহের অর্থনীতিতে তা প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[২৪] এর ফলে ভূ-গর্ভের পানি-স্তর অনেক নীচে নেমে যায় এবং মওসুমী বন্যার অভাবে মাটির উর্বর শক্তি কমে যায়। নদীর নূতন গতিধারা পুরাতন উচ্চভূমিকে আর আগের মতন বর্ষা মওসুমে জলমগ্ন করে না।[২৫] স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে ওসব কারণে উত্তর ময়মনসিংহের কৃষি উৎপাদনের ফলন অনেক কমে যায়।

বিদ্রোহের পায়তারা

পূর্বোল্লিখিত অবস্থার ফলে অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেও কৃষকদের উপর কর বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষক জমিদার সম্পর্কে অবনতি ঘটে। ১৮২০ নাগাদ মাত্রাতিরিক্ত কর আরোপ চরমে ওঠে।[২৬] বে-আইনী ও উৎপীড়নমূলক কর ও আবওয়াব আদায় করতে জমিদারদের বল প্রয়োগ করতে হয়।[২৭] তদুপরি, জমিদারদের খামারে বেগার খাটার বিরুদ্ধেও রায়তেরা সোচ্চার হয়ে উঠে।[২৮]

রায়তেরা সরকারের কাছে আরজি জানায় যে, ১২২৭ বাংলা সালে (১৮২০ খৃঃ) এলাকায় কানুন প্রথা প্রচলনের পর থেকে খাজনার হার অনেক গুণ বেড়ে গেছে।[২৯] শেরপুর পরগনা বাটোয়ারার পর মালিকগণ যার যার এলাকায় কাছারী স্থাপন করে এবং কাছারীর খরচ রায়তের

কাছ থেকে দাবী করে। এ সব বে-আইনী আবওয়াবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে জমিদারেরা আবার আইন শৃঙ্খলার পতন ঘটায়।[৩০] বকসু ও দ্বীপচাঁদের নেতৃত্বে বে-আইনী আবওয়াবের বিরুদ্ধে রায়তেরা সংগঠিত হয়। পরবর্তীতে এরা ছিলেন পাগল বিদ্রোহের বিশিষ্ট নেতা।[৩১]

সুশং পরগনার প্রথম দিকে কৃষক প্রতিরোধের লক্ষ্য ছিল বেগার প্রথার বিলুপ্তি।[৩২] সুশং জমিদারদের একটি লাভজনক ব্যবসায় ছিল ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও দিল্লীতে হাতী সরবরাহ করা।[৩৩] ১৮২০ সাল নাগাদ জমিদারের হাতী খেদায় বেগার শ্রম ব্যবহার করতে থাকে। বেগারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে প্রতিবাদীদের নেতা মুনা সরকারকে হাতীর পায়ে পিষ্ট করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিশোধে বিক্ষুব্ধ রায়তেরা সমস্ত হাতী খেদা ভেঙ্গে দেয় এবং সুশং ও দুর্গাপুরে জমিদারী কাছারী আক্রমণ করে। প্রাণ রক্ষার্থে জমিদারেরা নেত্রকোনায় গিয়ে আশ্রয় নেয়।[৩৪] এখনও ঐ এলাকার লোকেরা এ সংগ্রামে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের নাম স্মরণ করেন।[৩৫]

১৮২৪ সালের দিকে জমিদার রায়ত সম্পর্ক খুবই অশান্ত রূপ ধারণ করে। জমিদারের রাজস্ব আদায়ের অধিকার রায়তেরা দু'ভাবে চ্যালেঞ্জ করে। প্রথমতঃ এরা মনগড়া মতে রাজস্ব ধার্যের আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে, এবং দ্বিতীয়তঃ চ্যালেঞ্জ করে তাদের শ্রম ও উৎপাদনের উপর জমিদারের নানা দাবী। বল প্রয়োগ করে জমিদারেরা তাদের দাবী আদায়ের চেষ্টা করলে রায়তেরা তা প্রতিরোধ করে।

রাষ্ট্রীয় নীতি রায়তের অর্থনীতি ও জীবনের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। নব প্রবর্তিত কানুনগো প্রথা জমিদারদের উপর সরকারী দাবীর প্রস্তুতি মনে করে জমিদারেরা আগে থেকেই রায়তের উপর এদের দাবী বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এলাকায় পুলিশ ষ্টেশন স্থাপনের পর বে-আইনী ও অত্যাচারমূলক রাজকর্ম বেড়ে যায়।[৩৬] গ্রামে সরকারী পরোয়ানা ইত্যাদি জারী করতে এসে সরকারী সাধ্যপালেরা গ্রামবাসীর উপর নানা প্রকার চাঁদা ও বকশিশ দাবী করে। পুলিশরাও অনুরূপ-ভাবে তোলা তুলে রায়তদের অতিষ্ট করে তুলে।[৩৭] শেষ পর্যন্ত শোষণ প্রক্রিয়া এমন চরমে পৌঁছে যে, আর একটি অতিরিক্ত দাবী দাওয়া আসলে রায়তের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে বিদ্রোহের পথ বেছে নেবার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ১৮২৪ সালে ঔপনিবেশিক সরকার থেকে সে দাবীটি আসে।

ব্রহ্মযুদ্ধের আদেশ

হঠাৎ করে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি উত্তর ময়মনসিংহের ঘটনা প্রবাহের

উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটিশ ও বর্মী সাম্রাজ্যবাদ মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। বর্মী সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে সম্প্রসারিত করতে তৎপরতা চালান। আসাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘ-কাল স্থানীয়ভাবে সংঘর্ষ চলার পর হঠাৎ বৃটিশরা ১৮২৪ সালে ব্রহ্ম-দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধ ১৮২৬ সালে শেষ হয়। আসাম মনিপুর ও ব্রহ্মদেশের দুটি অংশ বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে হয়।[৩৮]

প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে বৃহত্তর লড়াই উত্তর ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহের আশু কারণ রূপে অবদান রাখে। আসামে যুদ্ধ করার জন্য জামালপুর থেকে সুশং এর সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তা তৈরী এবং জামালপুরের নিকট ব্রহ্মপুত্র পারাপারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকা সরবরাহ করার জন্য ১৮২৪ সালে শেরপুরের জমিদারেরা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে নির্দেশ পায়।[৩৯] রাস্তা নির্মাণের জন্য জমিদারেরা বলপ্রয়োগে রায়তদের বেগার খাটায়। তদুপরি পল্টনের খরচ, রসদ বাবদ অবৈধ আবওয়াব রায়তের নিকট দাবী করে।[৪০] ১৮২৪ সালের একুশে মার্চ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে খবর পৌঁছে যে, কৃষকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহী মনোভাব দেখাচ্ছে।[৪১] বেগার খাটতে ও নতুন কর দিতে এরা প্রস্তুত নয়। এর তিন দিন পর বৃটিশরা বিদ্রোহীদের নেতা টিপুকে বন্দী করে।[৪২] কে সে টিপু? কি তার ভূমিকা?

টিপু ও পাগলপন্থী সম্প্রদায়

উত্তর ময়মনসিংহ ছিল বাংলার ইতিহাসের মূলধারা থেকে বেশ বিচ্ছিন্ন। ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগতভাবে এ অঞ্চল ছিল মূলত গারো, হাজং, ডালু, হুদি, রাজবংশী অধ্যুষিত। এদের মধ্যে মিশেছিল হিন্দু ও মুসলমান।[৪৩] প্রকৃতি পূজা, হিন্দু ও ইসলাম ছিল এলাকার প্রধান ধর্ম। যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীরা উক্ত এলাকায় এসে নিরাপদ আস্তানা স্থাপন করে।[৪৪] পাগলপন্থীরা ছিল এদের মধ্যে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। পাগলপন্থীরা একে অপরকে সম্বোধন করতো ভাইসাহেব বলে।[৪৫] করম শাহ্ এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। জাতিতে তিনি ছিলেন সম্ভবতঃ একজন পাঠান। ১৭৭৫ সাল নাগাদ করম শাহ্ সুশং পরগনার লেতারকান্দা গ্রামে বসবাস শুরু করেন।[৪৬] স্থানীয় লোকদের আচার অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে তিনি ইসলাম ধর্মকে এমনভাবে ব্যাখ্যা দেন যেন সব মত ও ধর্মাবলম্বীরাই এতে আকৃষ্ট হতে পারে।[৪৭] তাঁর মুরিদ বা শিষ্যদের মধ্যে ছিল পাহাড়িয়া, প্রকৃতিপূজক, হিন্দু,

মুসলমান সবাই।[৪৮]

পাগল সম্প্রদায়ের মতবাদ খুব সরল এবং সোজা। পাগলদের মতে সব মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। অতএব মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই, উচ্চ-নীচ নেই।[৪৯] সব মানুষ ভাই ভাই। তাই করম শাহের ভক্তেরা একে অপরকে সম্বোধন করে 'ভাইসাহেব' বলে। এদের চলাফেরা ও আচার অনুষ্ঠান নিম্নাঞ্চলের লোকদের চোখে এমনি অস্বাভাবিক ঠেকে যে ওরা 'ভাইসাহেব'দের পাগল বলে আখ্যায়িত করে।[৫০] পাগলপন্থীরা ছিল প্রচলিত সব ধর্মের অহিংস উপাদান নিয়ে গঠিত এবং ছিল গ্রাম বাংলার কৃষক শ্রেণীর সনাতন ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[৫১]

করম শাহ ছিলেন একজন অতিশয় ধার্মিক ও কামেল পুরুষ এবং ভবিষ্যৎবক্তা।[৫২] তিনি ফুঁ দিয়ে রোগ নিরাময় করতে পারতেন বলে ভক্তদের বিশ্বাস ছিল ঃ

"সব ধর্ম ও বর্ণের লোকেরা মানত করতো যে তাদের রোগমুক্তি হলে বা ইপ্সিত সাফল্য লাভ করলে তারা কিছুকাল করম শাহ্‌র খানকার সেবায়েতের কাজ করবে। হিন্দু, মুসলমান, গারো, হাজং প্রভৃতি ধর্ম ও বর্ণের লোকের থাকার ব্যবস্থা হিসেবে আলাদা কুটির নির্মাণ করা হয়েছিল।"[৫৩]

করম শাহ্‌র মৃত্যুর (১৮১৩) পর তাঁর পুত্র টিপু শাহ্ গদিতে বসেন। টিপু শাহ্‌ও তাঁর পিতার অনুরূপ কেরামতি শক্তি লাভ করেন। পাগলদের জোর বিশ্বাস ছিল, টিপুর আধ্যাত্মিক শক্তি এমন বিশাল যে তিনি যা চাইতেন তা-ই লাভ করতে সক্ষম ছিলেন।[৫৪] করম শাহ্‌র আধ্যব্যক্তিত্ব ও তার পরিবারকে কেন্দ্র করে এলাকার রায়তেরা সংগঠিত হতে থাকে। ১৮০২ সালে শেরপুর জমিদারগণ যখন আত্মকলহে নিমজ্জিত, তখন করম শাহ্‌র জ্যেষ্ঠ পুত্র শাবতী গারো পাহাড়ীয়া এলাকার উপর জমিদারী সনদ লাভের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু বোর্ড অব রেভিনিউ তাঁর আরজি প্রত্যাখ্যান করে।[৫৫]

টিপু ও তাঁর মাতার নেতৃত্বে পাগলপন্থী সম্প্রদায় দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করতে থাকে। অচিরেই টিপুর ভাবমূর্তি এমন হয়ে উঠে যে তাঁর ক্ষমতার প্রতি কারও সন্দিহান হওয়ার অবকাশ থাকেনি।[৫৬] ১৮২০ সাল নাগাদ কর্তৃপক্ষ টিপুকে একটি 'সন্দেহজনক চরিত্র' বলে চিহ্নিত করে। তখন শেরপুর জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কৃষক অসন্তোষ চলছিল। বুকশো ও দ্বীপচান্দ নামে দুজন কৃষক নেতা টিপু শাহ্‌কে এলাকার সমস্যার কথা বলেন এবং জমিদার বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।[৫৭]

ইতিমধ্যে টিপুকে জড়িত করে বিভিন্ন ফৌজদারী মামলা রুজু করা হয়। এতে মনে হয়, উক্ত এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৫৮] কর্তৃপক্ষ ও অনুসারীদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ফৌজদারী মামলায় নেতৃবৃন্দদের হয়রানি করা একটি সাধারণ কৌশল।[৫৯] অপর-পক্ষে, পুরাদস্তুর কৃষকবিদ্রোহের প্রস্তুতি হিসেবে প্রাথমিকভাবে আইন-শৃংখলা ভঙ্গের ছোটখাটো ঘটনাও ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উভয় ক্ষেত্রেই টিপুর আবির্ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

টিপু ও তাঁর মা ১৮২৪-এর বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিলেও বিদ্রোহীরা সবাই পাগলপন্থী ছিল না।[৬০] মরিসন রিপোর্ট সব বিদ্রোহীদের নির্বিচারে পাগল বলে উল্লেখ করায় পরবর্তীকালে লেখকরা বিদ্রোহটিকে পাগলপন্থী বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন।[৬১] বিদ্রোহীদের নামের তালিকায় শেষ নাম পাগল বা অন্যান্য বর্ণ বা জাতির পরিচয় বহন করে।[৬২]

তাহলে বিদ্রোহে পাগল সম্প্রদায়ের এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কারণ কি? এর প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, তাৎক্ষণিকভাবে কৃষক সমাজে সংগ্রামী সংগঠনের অভাবে পাগলদের সংগঠন বিদ্রোহের প্রাথমিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে। করম শাহ্‌র মৃত্যুর পর পাগল সম্প্রদায় এবং এর সংগঠন উভয়ই প্রবল শক্তি অর্জন করে। টিপু সফরে বের হলে তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করতো দশ কি বারো জন চাকর এবং তা ছাড়াও থাকতো অনেক আজ্ঞাবহ চাকর নোকর। তাঁর নিবাসের জন্য তিন জায়গায় ছিল তিনটি সুবিশাল বাড়ী।[৬৩] বিদ্রোহের প্রাক্কালে পাগলদের সংগঠন ক্রমোচ্চভাবে বিন্যস্ত ছিল কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু বিদ্রোহের পরে ক্রমোচ্চ সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। বিদ্রোহকালে পাগলদের মধ্যে দেখা যায় জমাদার, সর্দার, তহশিলদার, কাজী, ফৌজদার ইত্যাদি।[৬৪] এদের সবাই পাগল সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল না। তবে পাগলরাই ছিল বিদ্রোহীদের সংগঠনের আদি ভিত্তি।

বিদ্রোহের বিবরণ

প্রতিরোধ ঘনীভূত

বিদ্রোহের প্রথম পর্ব ১৮২৪ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৮২৫ সালে শেষ হয়। এ পর্বে বিদ্রোহের আশু কারণ ছিল ব্রহ্মযুদ্ধজনিত নানা কর, চাঁদা ও শ্রম, যথা, বেগার ও 'রসদ পল্টন খরচ'। এসবের প্রতিবাদে রায়তেরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

"১৪ই ডিসেম্বরে পুলিশ অফিসার প্রতিবেদন দেন যে হাত্রী এবং

অন্যান্য রায়তেরা জমিদারদের আদেশ মান্য করতে অস্বীকার করে এবং ঘোষণা করে যে টিপু পাগল ছাড়া আর কারও অধীনতা তারা মানে না। ৫ই ডিসেম্বরে জমিদারগণ প্রতিবেদন দেন যে রায়তের অবাধ্যতার ফলে তারা সেনাবাহিনীর জন্য রাস্তা নির্মাণে ব্যর্থ হচ্ছে।''[৬৬]

রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ করতে সাধারণ রায়তের একটি আপত্তি এই যে এর ফলে তাদের বর্ণপাত হচ্ছে।[৬৭] তারা আরও অভিযোগ করে যে সরকারের সহযোগীতা করলে এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে পাগল কর্মীরা এদের হুমকি দেয়।[৬৮] সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মুখে সরকার প্রকল্পিত স্থানে রাস্তা নির্মাণ ও সামরিক চলাচল বন্ধ করে তা রংপুরে সরিয়ে নেয়।[৬৯] ইতিমধ্যে ১৭০০০ পশু ও ৫০০০ মানুষের রসদের ভার পড়ে রায়তের কাঁধে।[৭০] কোর্ট অব সার্কিটের জজ মরিসনের রিপোর্ট মতে ঃ

> "পল্টনের রসদ যোগাবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে জমিদারেরা গ্রামের রায়তের কাছ থেকে বাকীতে বা অন্য উপায়ে রসদপাত্র সংগ্রহ করে। বাকী টাকা কদাচিৎ পরিশোধ করা হয়েছে এ অজুহাতে যে, সরকার জমিদারকে তাদের সরবরাহ বাবদ টাকা পরিশোধ করেনি। জমিদারদের যা খোয়া গেছে তা সহজেই তারা রায়তর কাছ থেকে রসদ চাঁদা বাবদ উঠিয়ে নেয়। প্রতি রায়তের উপর গড়ে এক মাসের খাজনা চাঁদা হিসেবে ধার্য হয়।"[৭১]

এমতাবস্থায় রায়ত শ্রেণী সহজেই পাগলদের শ্লোগানে বিশ্বাস স্থাপন করে। এরা গ্রামে গঞ্জে প্রচারণা চালায় যে "বৃটিশ রাজত্বের অবসান আসন্ন, জমিদারী ক্ষমতা বিলুপ্তির পথে এবং নতুন রাজত্বের কর্ণধার হবে টিপু।"[৭২] তাদের ভাষায় ঃ

> "ফিরিঙ্গী ও জমিদার চলে গেলে টিপুই হবে শেরপুর পরগনার রাজা। তখন রায়তের প্রতি কোর কৃষি জমির খাজনা মাত্র চার আনায় কমিয়ে আনা হবে।[৭৩] সব রায়ত তখন প্রথম তিন বছর ভূমি নিষ্কর ভোগ করবে। তখন বেগার খাটতে হবে না, আবওয়াব, মাথুথ, খরচা ইত্যাদি দিতে হবে না।[৭৪] পাগল টিপু হবে তাদের দয়ালু শাসক।"[৭৫]

টিপুর এসব প্রচারণার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ অভিযান চালায়। ৭ই ডিসেম্বর তাঁকে বন্দী করা হয়। দুই দিন পর তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আবার বন্দী হন এবং ১৭ই ডিসেম্বর আবার মুক্তি পান। ইতিমধ্যে জামিদারী শোষণ-উৎপীড়ণের বিরুদ্ধে রায়তের

প্রতিরোধ আন্দোলন আরও বৃদ্ধি পায়। ৬ই জানুয়ারী (১৮২৫) পুলিশ খবর পায় যে শেরপুর পরগণার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধকারী রায়তেরা সমবেত হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য টিপুকে আবার বন্দী করা হয়। শেরপুর শহর প্রতিরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।[৭৬]

সশস্ত্র সংঘাত, ১৮২৫

সামরিক বাহিনীর আগমন প্রতিরোধ আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তুল্‌লো। কারণ রায়তের মনে ধারণা জন্মে যে, ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বলপ্রয়োগ করে হলেও জমিদারদের রক্ষা করতে প্রস্তুত। রায়তেরা জায়গায় জায়গায় প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করে, জমিদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়, টিপু ভাইসাহেবের নামে সুলতানী ও সিরনী নামক চাঁদা আদায় করে।[৭৭] টিপুর নামে রাজস্ব আদায়ও শুরু হয়।[৭৮]

১৯শে জানুয়ারী প্রায় ৮০০ বিদ্রোহী প্রথম শেরপুর শহরে আক্রমণ চালায়, তারপর জমিদারদের বাড়ী তছনছ করে দুইজন বরকন্দাজকে হত্যা করে এবং আরও চার জনকে বন্দী হিসেবে নিয়ে যায়। এক মাস পর বন্দী বরকন্দাজদের হত্যা করা হয়। শেরপুর অভিযানের সময় রায়তেরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাবী জানায় যে তারা জমিদারী অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করতে রাজী নয়।[৭৯] ম্যাজিস্ট্রেট এক সপ্তাহ পর এক পরওয়ানা জারি করে। পরওয়ানায় সব রকম বেগার, বাড়তি খাজনা ও আবওয়াব সংগ্রহ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখতে বলা হল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহ দমনে জমিদারী বাহিনীর সঙ্গে পুলিশ যোগদান করে। শেরপুরের উত্তরে গড় জরিপা নামে একটি পুরনো দুর্গ আক্রমণ করে সম্মিলিত পুলিশ ও জমিদার বাহিনী। উদ্দেশ্য ছিল ঐ দুর্গে অবস্থানরত তুরুক শাহ্‌কে বন্দী করা। তুরুক শাহ্ সম্ভবতঃ একটি প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্রোহী গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। গড় জরিপা দুর্গ আক্রমণ ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহীদের হাতে একজন পুলিশ অফিসার আহত হয় এবং পুলিশের হাতে তাদের একজন নিহত হয়।[৮০] একটি লড়াইয়ের বিবরণ দিয়ে মরিসন বলেন ঃ

> "ফেব্রুয়ারীর ছয় তারিখ প্রায় ১৫০ জন পাগল বুইসখ্যা বাঈদ গ্রামে হানা দেয়। ইতিপূর্বে এরা তথ্য লাভ করে যে ঐ দিন গ্রামের সংগৃহীত খাজনা সদরে চালান যাবে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জীবন। জমিদারী বরকন্দাজ স্বরূপ সিংহ পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু ভগবান সিংহ বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে।"[৮১]

উক্ত সংঘর্ষের পর পাঁচ সপ্তাহ যাবং বিদ্রোহী কৃষকরা সশস্ত্র প্রতিরোধ

তৎপরতায় লিপ্ত থাকে। এ সময়ে তিনটি বড় ধরণের লড়াই হয়। এর মধ্যে দু'টি লড়াই হয় যখন বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের জন্য পুলিশ অভিযান চালায় এবং তৃতীয় লড়াইটি সংঘটিত হয় যখন বিদ্রোহীরা তাদের বন্দী সাথীদের জেলখানা থেকে ছিনিয়ে নিতে আসে। একুশে ফেব্রুয়ারী আশিজন পুলিশ ও সিপাহী মাদারপুর গ্রামে অভিযান চালায়। কৃষক নেতা রামচন্দ্রকে গ্রেফতার করা ছিল এর উদ্দেশ্য। রামচন্দ্র তখন শেরপুর শহর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

> "দারোগা রামচন্দ্র ও আরও ২৩ জন বিদ্রোহীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। বন্দীদের নিয়ে থানায় প্রত্যাবর্তনের সময় দারোগার বাহিনীকে তিন-চার হাজার বিদ্রোহী ঘেরাও করে তাদের বন্দী নেতা ও সাথীদের ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা চালায়। সিপাহীরা তখন গুলি বর্ষণ করে। গুলিতে সুবা হাত্রী নিহত হয়। পাগলেরা তখন পিছিয়ে পড়ে।"[৮২]

৫ই মার্চ প্রায় দুই শত বিদ্রোহী দুহোলিয়ার একটি বাড়ী আক্রমণ করে একজন পুলিশ বরকন্দাজ ও দু'জন পুলিশ হরণ করে এবং তাদের হাওলায় দু'জন বিদ্রোহী বন্দীকে মুক্ত করে। এর দুই দিন পর একটি বাহিনী অভিযান চালিয়ে পুলিশ কর্মচারীদের মুক্ত করে।[৮৩] অবশেষে ১৬ই মার্চে বিদ্রোহীদের 'মহান নেতা' ডুকো জোয়ারদারকে গ্রেফতার করার জন্যে বন্দেরকাটা গ্রামে পুলিশ হানা দেয়।'[৪] প্রায় ১৫০ জন সশস্ত্র বিদ্রেহী ডুকো জোয়ারদারকে প্রহরা দিয়ে রাখে এবং উল্টো পুলিশকে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানায়। বিদ্রোহী ও পুলিশের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ফলে কতিপয় বিদ্রোহী নিহত ও আহত হয়। প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে অবশেষে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়।[৮৫] এ লড়াইয়ে সরকারী হিসেবে দুই জন পুলিশ নিহত হয়, এবং আহত হয় তিন জন। এমনিভাবে ১৯শে জানুয়ারী ও ১৬ই মার্চের (১৮২৫) মধ্যে ১৪ জন নিহত হয়ঃ চার জন বিদ্রোহীদের পক্ষে এবং বাকী সরকার ও জামিদার পক্ষে।[৮৬]

বিরতি কাল, ১৮২৫-১৮৩২

১৮২৫ সালের মার্চ মাসের পর বিদ্রোহ একটি নতুন পর্বে উপনীত হয়। এ পর্বে কোন সরাসরি সংঘর্ষ না ঘটলেও বিদ্রোহীরা তাদের সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে চাঁদাতোলা অব্যাহত রাখে, জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ অহিংসভাবে প্রতিহত করে। এ সময়ে রায়তেরা একটি সমান্তরাল স্বায়ত্ব শাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে, এমন কোন

জোরালো প্রমাণ মেলে না।[৮৭] বরং আমরা জানি যে এ সময়ে টিপু এবং তাঁর প্রধান অনুসারীরা বন্দী জীবনযাপন করছিলেন।[৮৮]

ইতিমধ্যে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে গ্রামীণ গন্ডগোলের উৎস অন্যায় ভূমি রাজস্ব দাবী এবং ঐ ভূমি রাজস্ব প্রশ্নটির সুষম সমাধা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ চলতেই থাকবে। রায়তদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে জমিদারেরা রায়তী খাজনার ব্যাপারে সরকারী তদন্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়।[৮৯] কিন্তু টিপুকে আটক করার পূর্ব পর্যন্ত ঐ তদন্ত পরিকল্পনা রায়তেরা প্রত্যাখ্যান করে। টিপুর আটকাদেশের পর ভূমির ভূতপূর্ব খাজনার হার, ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা, পার্শ্ববর্তী পরগণার খাজনার হার প্রভৃতি বিষয়ে তদন্তান্তে নতুন করে খাজনার হার ধার্য হয়।[৯০] কিন্তু ১৮৩০ সালে বিদ্রোহী কৃষকদের উকিল উজির সরকার[৯১] ঐ বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন এ মর্মে যে বন্দোবস্তের ব্যাপারে ভুক্তভোগী কৃষকদের কোন শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়নি।[৯২] প্রত্যুত্তরে কালেক্টার যুক্তি দেন, সাধারণ রায়তের পক্ষ থেকে শেরপুর পরগণার বিশ জন গণ্যমান্য প্রধান রায়ত বন্দোবস্ত গ্রহণ করেছে।[৯৩] ১৮৩১ সালে কালেক্টারের বন্দোবস্ত অষ্টম আইন রূপে ঘোষণা করা হয়।[৯৪] কিন্তু রায়তেরা তা গ্রহণ করেনি। অতএব, শুরু হয় প্রতিরোধ।

বিদ্রোহের চূড়ান্ত, ১৮৩৩

রায়তেরা ফের বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এ মর্মে কর্তৃপক্ষ খবর পায় ১৮৩৩ সালের প্রথম নাগাদ। এবার নেতৃত্ব দেন দু'জন পাগল—জানকো পাথের ও দুবরাজ পাথের।[৯৫] শেরপুরের উত্তর পশ্চিমে বাটাজোড় গ্রামে মিলিত হয় জান্‌কোর বাহিনী. আর দুব্‌রাজের বাহিনী সমবেত হয় শেরপুরের প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে লালিতাবাড়ী গ্রামে।[৯৬] উভয় দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে বিদ্রোহীরা শেরপুর শহরে অনুপ্রবেশ করে। সব জমিদার বাড়ী ও রাজস্ব অফিস সমূহ লুটপাট করা হয়। পুলিশ স্টেশনের সমস্ত অস্ত্র হস্তগত করে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্রোহীরা নিজেদেরকে শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। জমিদার, পুলিশ. সরকারী আমলারা সব জেলা সদর ময়মনসিংহে আশ্রয় নেয়। অন্তত কিছুকাল মনে হয় যে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটেছে।[৯৭]

১লা এপ্রিল, ১৮৩৩ একটি সরকারী বাহিনী শেরপুর পুনর্দখল করে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পরে বিদ্রোহীরা সরকারী বাহিনীর বাংলোয় চোরাগুপ্তা আক্রমণ চালায়। জমিদারী বরকন্দাজ বাহিনী সমর্থিত পুলিশ ও সিপাহীরা দুব্‌রাজ বাহিনীকে তাড়া করে

নালিতাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হলে বিদ্রোহীরা কোন সম্মুখ প্রতিরোধ না করে গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে। নালিতাবাড়ী থেকে সরকারী বাহিনী প্রত্যাহার করার পর পরই বিদ্রোহীরা আত্মপ্রকাশ করে এবং জমিদারী অফিস দখল করে নেয় এবং দু'জন পুলিশ ও দু'জন জমিদারী আমলাকে ধরে আনে। কর্তৃপক্ষ তখন বুঝতে পারে যে এলাকায় ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত সামরিক বাহিনী মোতায়েন ছাড়া গত্যন্তর নেই।[৯৮]

এপ্রিল মাসে বিদ্রোহীরা সমগ্র এলাকার উপর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করে এবং তা প্রতিরক্ষার জন্য হাজার হাজার সশস্ত্র রায়ত তরবারী, বল্লম, বিষাক্ত তীর-ধনুক ও কতিপয় গাদাবন্দুক নিয়ে এলাকা প্রহরা দিতে থাকে।[৯৯] ২৮শে এপ্রিল সামরিক বাহিনীর আগমন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ নিস্তেজ থাকে। সেনাদের অর্ধেক অংশ নালিতাবাড়ী ও বাকী অর্ধেক বাটাজোরের দিকে অগ্রসর হলে প্রায় পাঁচ হাজার বিদ্রোহী তরবারী, বল্লম, বন্দুক নিয়ে তাদের মোকাবিলা করে। সেনাবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৩রা মে সেনারা বাটাজোড়ে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কৃষকরা অদূরে গারো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মাত্র ছয় জন বিদ্রোহী ধরা পড়ে।[১০০] সেনা অভিযানের প্রধান ক্যাপ্টেন শীল বাটাজোড়ের উত্তরে জালংগায় চার হাজার বিদ্রোহীর একটি ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ চালায়।[১০১] বিদ্রোহী চাষীরা প্রথমে পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু পরে অন্য একটি পথ দিয়ে সেনাদের ফিরতি পথে আক্রমণের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে। আক্রমণ ছিল অতি প্রচন্ড কিন্তু অধিকতর সিপাহী আগমনে সিপাহীরা প্রাণে রক্ষা পায়।[১০২]

৭ই মে সেনারা দুব্‌রাজ বাহিনীর মোকাবিলার জন্য নালিতাবাড়ীর দিকে এগোয়, কিন্তু পথিমধ্যে এরা প্রায় সাত শত বিদ্রোহী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে সেনাবাহিনী দুব্‌রাজের মূল দুর্গ চিহ্নিত করার জন্য পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়। আবার সেনাবাহিনী অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়ে। সেনাবাহিনী দুবরাজের দুর্গ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্গ তখন ছিল সম্পূর্ণ খালি। ১লা এপ্রিলের অপারেশনে বিদ্রোহীরা যে চার জনকে ধরে এনে এখানে বন্দী রেখেছিল এদের তিনজনকে নিয়ে এরা সরে পড়ে। বাকী একজনকে সেনাবাহিনী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

জানকো ও তাঁর অনুসারীদেরও একই পরিণতি হয়। কর্তৃপক্ষ পরওয়ানা জারি করে যে যারা জানকোর দলে যোগদান করেছে তাদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে।[১০৩] এর অব্যবহিত পরে উভয় প্রতিরোধ

কেন্দ্রের লোকেরা আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ১৮৩৩ সালের ১৩ই মে থেকে বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে যায়। তবে জানকো বা দুবরাজ কাউকেই বন্দী করা সম্ভব হয়নি।[১০৪] তবে বিদ্রোহ বন্ধ হলেও কর্তৃপক্ষ অত্যধিক সতর্ক থাকে কেননা বিদ্রোহীদের দাবী পূর্ণভাবে মেনে না নেওয়া পর্যন্ত যেকোন সময় ফের শান্তি শৃংখলার পতন ঘটতে পারে এ ভয় কর্তৃপক্ষের ছিল।[১০৫]

কৃষকদের দাবী দাওয়া না মানার জন্য প্রথম পর্বের বিদ্রোহের (১৮২৫) পর আবার বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৩৩ সালে। অতএব, দাবী না মানলে যেকোন সময় বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে। তবে কর্তৃপক্ষের ধারণা যে বিগত বন্দোবস্তে কৃষকদের ন্যায্য দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে। এর পরেও যদি অসন্তোষ বিরাজমান থাকে তবে কর্তৃপক্ষের মতে তা কৃষকদের অযথা বিদ্রোহ প্রবণতা বৈ কিছু নয়। ১৮৩৩ সালে ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন ঃ

> "এই এলাকার লোকেরা, বিশেষ করে পাহাড়ের পাদদেশে যারা বাস করে, তারা খুব দুর্ধর্ষ, সদা অসন্তুষ্ট, স্বভাবগত ভাবে দাঙ্গা হাঙ্গামাকারী। এখানকার পাগলেরা কারও কোন কথা শুনতে রাজী নয়। যে-ই তাদের বিনা পরিশ্রমে খাদ্যের আশ্বাস দেবে এবং আইন-কানুনের বিধি নিষেধ তুলে নেবার অঙ্গীকার করবে তার ডাকেই তারা বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত।"[১০৬]

তবে ১৮৩৩ এর পর আর কখনও সম্মিলিত বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। বিদ্রোহের পথ পরিহার করে কৃষকগণ তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য উজির সরকারকে উকিল নিযুক্ত করে ময়মনসিংহে প্রেরণ করে। আদালতের লড়াইয়ে তাদের হাত শক্ত করার জন্য কলিকাতা থেকেও একজন এ্যাটর্ণী আনা হয়।[১০৭]

প্রতিরোধ কাঠামো

আনুগত্য বদল

ময়মনসিংহ বিদ্রোহ ছিল কতিপয় জটিল পরিস্থিতির প্রতি রায়তের প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা লাঘব করা। এ বিদ্রোহের মাধ্যমে রায়ত শ্রেণী যে একটি নিষ্কলুষ স্বর্ণযুগের দিকে এগোবার চেষ্টা করেছিল, তা নয়। এরা চেয়েছিল শুধু উদ্বৃত্তের উপর শোষণ কিছু হ্রাস করার জন্য, এর বিলুপ্তি নয়। এরা চেয়েছিল নির্মম নিষ্ঠুর শোষক প্রভুর বদলে একজন সনাতন ভূ-স্বামী।

কৃষকদের চার দফা দাবীর মধ্যে ছিল রাজস্ব হার কোর প্রতি চার

আনায় হ্রাস, তিন বছর খাজনা মওকুফ, অবৈধ চাঁদা সংগ্রহ ও বেগার বন্ধ করা। এ ধরনের দাবী অবশ্য নতুন কিছু নয়। ১৮০২ সালে কৃষকরা তাদের নেতা সাবাতিকে তাদের স্থানীয় শাসক হিসেবে নিয়োগের দাবী জানিয়েছিল।[১০৮] ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক এ দাবী মেনে না নিয়ে শোষণ-মূলক জমিদারী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার ফলেই বাধ্য হয়ে কৃষকরা প্রতিরোধের পথ বেছে নেয়।

বিদ্রোহীদের প্রোগ্রাম ছিল সাদাসিধে। তা ছিল খারাপ উপরিস্থ প্রভু থেকে আনুগত্য প্রত্যাহার করে একজন ভাল প্রভুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ জমিদারের বদলে টিপুকে শাসক হিসেবে গ্রহণ করা। এহেন আনুগত্য হস্তান্তর হঠাৎ করে ঘটেনি। ১৮২৪ সালের অনেক আগে যখন উত্তর ময়মনসিংহের কৃষকরা জমিদারদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করছিল তখন থেকেই এর প্রক্রিয়া শুরু। ১৭৭০ এর দশক থেকে সনাতন জমিদারী ব্যবস্থার অবক্ষয় শুরু হয়। তখন থেকেই রায়তেরা অনুভব করে যে জমিদার কর্তৃক তাদের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আত্মসাতের কোন আইনগত ভিত্তি নেই। অতএব, জমিদারদের নব নব দাবীর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানাতে থাকে। রায়তের মধ্যে এ চেতনা কখন কিভাবে বিস্তৃত হয় তা বলা কঠিন। কিন্তু সব তথ্য নির্দেশ করে যে বিদ্রোহের পনর বছর আগে থেকেই কৃষকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে ছিল সচেতন।

উনিশ শতকের প্রথম দশকে আন্তঃ জমিদারী দ্বন্দ্ব নিরসনে অনেক সময় সামরিক অভিযান পর্যন্ত প্রেরণ করতে হয় এবং ঐ সব অভিযানে যারা প্রাণ হারায় তারা ছিল কৃষক। ১৮০৮ সালে ঔপনিবেশিক বাহিনী শেরপুরের ৭৬ টি গ্রাম ধ্বংস করে এবং হত্যা করে বহু কৃষককে। অথচ ঐ সব অভ্যুত্থানের নায়ক জমিদারগণ থাকে অক্ষত। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব গতিধারা পরিবর্তনের ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার উপর জমিদারী অত্যাচার।

১৮১০ সালের পর হঠাৎ করে পাগল পন্থী সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি কঠিন বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না। পাগলদের মতবাদ জোর দেয় সত্য ও বিশ্বজনীনতার প্রতি এবং এহেন মতবাদ ছিল জমিদারী কর্তৃত্বকে বর্জন করার নামান্তর। অতএব, প্রকাশ্য প্রতিবাদের অনেক আগেই জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে রায়তেরা মানসিক প্রতিবাদ শুরু করে। এদের প্রতিবাদ প্রথম প্রতিফলিত হয় হাতী খেদা বিদ্রোহে, এবং পরে ১৮২৪-৩৩ সালের সর্বাত্মক বিদ্রোহে।

১৮২৪ নাগাদ কৃষকেরা আনুগত্য হস্তান্তরের জন্য ছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত। জমিদার থেকে আনুগত্য প্রত্যাহার করে এরা টিপুকে শাসক

হিসেবে গ্রহণ করে এবং টিপুকে ন্যায্য হারে খাজনা দিতে থাকে।[১০৯] কৃষকরা অবশ্য অবগত ছিল যে এ ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ প্রতিশোধমূলক প্রতি-ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অতএব, আত্মরক্ষার্থে পূর্ব থেকেই রায়তেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকে।

প্রয়োজনে আনুগত্য হস্তান্তর রায়তের অধিকার—এ তত্ত্বে জমিদার ও ঔপনিবেশিক সরকার ছিল অপ্রস্তুত। তারা আনুগত্য হস্তান্তরকে একটি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে গণ্য করে। জমিদারেরা অনুভব করে যে এর ফলে তাদের জীবন ও সম্পত্তি উভয়ই আক্রান্ত হয়, আর ঔপনিবেশিক সরকার এর মধ্যে দেখতে পায় রাষ্ট্রদ্রোহীতা।[১১০] ফলে, সংকট মোকাবিলার জন্য সরকার সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন করে। রায়তেরা প্রথম জমিদার ও ঔপনিবেশিক সরকারকে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করতো, কিন্তু অচিরেই তারা দেখতে পায় যে শাসকশ্রেণী হিসেবে এদের চরিত্র এক। তখনই রায়তেরা আক্রমণ চালায় উভয় শত্রুর উপর। প্রকৃতপক্ষে রায়তের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতিক্রিয়ায় খাজনা ইস্যুটি একটি স্থানীয় যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়।

নেতৃত্ব

ময়মনসিংহ বিদ্রোহের নেতা দুজন—টিপু ও তাঁর মা। অবশ্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি টিপুকেই বেশী প্রাধান্য দেয়। পীর-মাকে শুধু পাগল সম্প্রদায়ের সদস্যরাই ভক্তি করেনি, কর্তৃপক্ষও তাঁকে বিদ্রোহের একজন অন্যতম নেতা বলে গণ্য করে এবং নেতা ছিলেন তিনি নিজ গুণেই। ১৮২৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কর্তৃপক্ষের এক রিপোর্টে দেখা যায় টিপুর গ্রেফতারের পর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পীর মাতা। অতএব পীর মাতাকে বন্দী করার আদেশ দেওয়া হয়।[১১১] পীর মাতাকে আটকাদেশ দেওয়া হয় টিপুর জেল থেকে মুক্তি পাবার তিন সপ্তাহ পর। এ থেকে বোঝা যায় যে পীর মাতা শুধু টিপুর অবর্তমানে তাঁর বদলি হিসেবে নেতৃত্ব দেননি, বরং টিপুর পাশাপাশি পীর মাতাও ছিলেন একজন স্বীকৃত নেতা।১৩ই মার্চ (১৮২৫) তিনি বন্দী হন। এর পর পীর মাতার নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।[১১২]

বিদ্রোহের প্রাথমিক নেতৃত্ব সম্পর্কে আমাদের খুব বেশী জানা নেই তবে মনে হয় টিপু ও তাঁর মাতা বিদ্রোহের আদি উস্কানিদাতা ছিলেন না। বিদ্রোহীরা বরঞ্চ তাঁদেরকে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এ ধরনের অর্পিত নেতৃত্বের ব্যাপার অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহের বেলায়ও ঘটেছে।[১১৩] টিপু নিজ থেকে রায়তদের উস্কিয়ে দিয়েছেন

বিদ্রোহ করার জন্য—এ ধরনের সরকারী অভিযোগ মিথ্যা।[১১৪]

টিপু ও তাঁর মাতার কর্তৃত্বের ভিত্তি ছিল তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। মানুষের বিশ্বাস ছিল যে করম শাহ্ আগুন ও পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন।[১১৫] তাঁর পুত্র টিপু ও পত্নী আরও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে ছিল ভক্তদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস রায়তদের বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদের ধারণা ছিল যে পীর মাতা তাঁর পেটিকোট ঝাড়া দিয়ে ফুঁ দিলেই তা থেকে এক গুপ্ত সেনাবাহিনী বেরিয়ে আসবে[১১৬], কাঠের ঢাল তলোয়ার পরিণত হবে শক্ত ইস্পাতের অস্ত্রে। ইংরেজের অস্ত্র তখন পাগলদের গা স্পর্শ করবেনা।[১১৭]

এ ধরনের বিশ্বাস মিথ্যা আত্মবিশ্বাস ও জন সংহতির মিথ্যা ভিত্তি বলে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু পরম শক্তিশালী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতের বিদ্রোহ প্রস্তুতিতে উক্ত ধরনের অন্ধ বিশ্বাস সব জায়গাতেই সাধারণ ভাবে ক্রিয়া করে।[১১৮] ময়মনসিংহ বিদ্রোহেও অনুরূপ যাদুশক্তি জন সংহতি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। প্রকৃতই বিদ্রোহীরা কাঠের অস্ত্র ব্যবহার করেছে এমন কোন প্রমাণ নেই। টিপুর বাড়ী তল্লাসী করে যে সব অস্ত্র পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জিংগুল, পিস্তল, তরবারী, ঢাল, বল্লম প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র।

পুলিশের কাছে দেয়া এক জবানবন্দীতে রায়তেরা ঘোষণা করে যে তারা টিপু ও পীর মাতাকে রাজস্ব দিয়েছে এজন্য যে তাদের চোখে ওঁরা ছাড়া অন্য কোন কর্তৃপক্ষ নজরে পড়েনি।[১১৯] এ কর্তৃত্ব তাঁরা কিভাবে লাভ করে? চতুর্দিকে রটে যায় যে অচিরেই টিপুকে বাদশাহ্ বলে ঘোষণা করা হবে।[১২০] ১৮২৫ সালের জানুয়ারীর শেষ নাগাদ গোটা পাগল সম্প্রদায় টিপু ভাইসাহেবকে সমস্ত সম্পদ ও রাজস্বের প্রভু বলে ঘোষণা করে।[১২১] কিন্তু কখনও রায়তেরা তাঁকে রাজা বা বাদশাহ্ বলে ঘোষণা করেনি। অতএব, টিপু তাঁর শংকর পুরস্থ বাড়ীতে রাজকীয় দরবার স্থাপন করেছেন এ সরকারী অভিযোগ ভিত্তিহীন।[১২২] অথচ পরবর্তী সব লেখকরাই টিপুর রাজকীয় দরবারের কথা উল্লেখ করেছেন।[১২৩]

কৃষকেরা হয়তো বিজয়ের পর টিপুকে তাদের 'রাজা' বলে ঘোষণা করতো, কিন্তু সে 'রাজা' মানে স্বাধীন শাসক নয়। শেরপুর, সুসংএর জমিদারগণ ছিল রাজা উপাধিতে ভূষিত। কিন্তু তারা স্বাধীন ছিল বলা যায় না। টিপুকে কৃষকেরা ওদের রীতিতে রাজা ঘোষণা করে আনুগত্য জানাতে চেয়েছিল। এটা ছিল আনুগত্য হস্তান্তরের সংগ্রাম।

টিপু ও পীর মাতার নেতৃত্ব ছিল প্রতিরোধের প্রতীক মাত্র। তাঁরা

কখনও সরাসরি সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত হননি। সংগ্রামের দৈনন্দিন গতিধারা থেকে তাঁরা ছিলেন দূরে। টিপুকে ধরা হয় ন্যায় ও সত্যের প্রতিভূ হিসেবে। সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকলেও বিদ্রোহীরা টিপুকে আদর্শ করেই প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। জেল-হাজতে থাকাকালীনও টিপু ছিলেন প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতীক এবং জেলেই তারা তাঁকে দুধ, কলা, মিষ্টি প্রভৃতি অর্ঘ্য দেয়।[১২৪] দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর বন্দী জীবনযাপনের পর টিপু কারাগারেই ১৮৫২ সালে মারা যান।

প্রতিরোধের কৌশল এবং উৎপীড়ণ

উত্তর ময়মনসিংহের প্রতিরোধ আন্দোলন প্রথম শুরু হয় শাসক শ্রেণীর প্রতি রায়তের মানসিক উপেক্ষা থেকে। পরিশেষে মানসিক উপেক্ষাই রূপান্তরিত হয় সশস্ত্র সংগ্রামে। আনুগত্য হস্তান্তর জনমানসে শুরু হয় প্রথম। পরে রায়তেরা প্রকৃতপক্ষেই জমিদারকে খাজনা ও বেগার দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

জমিদার ও সরকারের দৃষ্টিতে পরিস্থিতি ছিল তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। অতএব ভীত হয়ে তারা নানা নির্যাতন, উৎপীড়ণ কৌশল অবলম্বন করে রায়তকে বাগে আনার জন্য। জমিদারী বরকন্দাজ ও পুলিশ মোতায়েন করা হয় রাজস্ব সংগ্রহের জন্য। অবশেষে শেরপুরে সামরিক অভিযান পর্যন্ত প্রেরণ করে বিদ্রোহীদের নেতা টিপুর বিরুদ্ধে নানা হয়রানিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু এতে উত্তেজনা প্রশমিত না হয়ে বিদ্রোহ এক নতুন মোড় নেয়। রায়তেরা এখন শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

লড়াইয়ে কৃষকদের দু'টি সুবিধা ছিলঃ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও সংখ্যা। তাদের কৌশল ছিল বহু সংখ্যক লোকের হঠাৎ আক্রমণ ও দ্রুত নিরাপদ পিছু হটা। সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে কৃষকরা প্রকৃত গেরিলা পদ্ধতিতে প্রতিরোধ পরিচালনা করে। এদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল জমিদারী দালান-কোঠা। মাঝে মধ্যে পুলিশ স্টেশনে তারা আক্রমণ চালায়। আক্রমণ চালিয়ে তারা জমিদারী আমলাদের হত্যা বা হরণ করে, বন্দীদের মুক্ত করে, আগ্নেয়াস্ত্র হস্তগত করে। শত্রুকে তারা সংখ্যা দেখিয়ে বিচলিত করতে চেষ্টা করে। সাধারণত বিদ্রোহীরা সব সময়ই চলমান থাকে। শুধু দু'বার তারা ঘাঁটি বেঁধে অপারেশন চালাবার চেষ্টা করে।

উক্ত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের কৌশল ছিল নির্যাতন। কর্তৃপক্ষের হিংসাত্মক কার্যাবলী বিশেষ বিশেষ জায়গায় পরিচালিত হতো। উদ্দেশ্য ছিল নেতৃস্থানীয় বিদ্রোহীদের ধরা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া।

বিদ্রোহের নেতা তুরক শাহ, রাম চন্দ্র, ডুকো জোয়ারদার এবং দুব্‌রাজ পাথেরকে ধরার জন্য বড় রকমের সশস্ত্র অভিযান প্রেরণ করতে হয়। কর্তৃপক্ষ নির্ভর করতো অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের উপর। বিদ্রোহের শেষ নাগাদ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেয়।

বিদ্রোহীদের প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্রোহী রায়ত ও জমিদার উভয়ই ঔপনিবেশিক সরকারকে নিজ পক্ষে টানার চেষ্টা করে। জমিদারগণ এ কৌশলে বেশী সফলকাম হন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রায়তদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে জমিদারগণ সক্ষম হন। রাষ্ট্র কর্তৃক জমিদারকে সমর্থন দেওয়া মানে জমিদারদের আরোপিত অবৈধ কর, বেগার প্রভৃতি মেনে নেওয়া। সরকার জমিদারকে অনুমতি দেয় 'খরচ রসদ পল্টন' সংগ্রহ করতে। অপর-পক্ষে রায়তকেও বলা হয় জমিদারকে নিরিখের অতিরিক্ত খাজনা না দিতে।[১২৬] রায়তেরা জমিদার কর্তৃক নিরিখ-অতিরিক্ত খাজনা সংগ্রহের কথা জানালে কর্তৃপক্ষ দারোগা ও জমিদারের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়েই দায়িত্ব শেষ করে।[১২৭] ফলে রায়তেরা অবশেষে বাধ্য হয় বিচার নিজের হাতে তুলে নিতে।

কৃষক বিদ্রোহ জানুয়ারী থেকে মার্চ (১৮২৫) পর্যন্ত চলে। কিন্তু দলিল থেকে ঠিক বোঝা যায় না কেন হঠাৎ করে ২৬ শে মার্চ থেকে হিংসাত্মক তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ হয়ত সামরিক পরাজয়। কিন্তু এদের শেষ আক্রমণ এমন মরণ-পণ ছিল যে পুলিশ অফিসারগণ ষ্টেশন ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়,[১২৯] এবং ঔপনিবেশিক সরকার ঐ এলাকা থেকে আসাম যুদ্ধ তৎপরতা উঠিয়ে নেয় এবং জমিদারেরাও রসদ পল্টন খরচ সংগ্রহ বন্ধ করে দেয়।

বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্বে কৃষকেরা সরকারের সঙ্গে সংলাপ পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করে। ১৮২৭ সালে টিপুকে বন্দী ও নতুন ভূমি বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা অহিংস প্রতিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন করে। কিন্তু অহিংস প্রতিরোধ পদ্ধতিতে যখন ঈপ্সিত ফল লাভে কৃষকেরা ব্যর্থ হয় তখন আবার তারা শুরু করে সহিংস তৎপরতা। হিংসাত্মক তৎপরতা মে মাস (১৮২৫) পর্যন্ত চলে। এবারও দেখা যায় যে কোন চূড়ান্ত পরাজয় ছাড়াই বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ কি হতে পারে যে কৃষিকর্ম ফেলে দীর্ঘকাল বিদ্রোহে লিপ্ত থাকা ছিল তাদের পক্ষে অসম্ভব? এর কারণ যা-ই-হোক না কেন, উত্তর ময়মনসিংহের রায়তশ্রেণী দাবী আদায়ে হিংসার পথ পরিহার করে আইন আদালতের পথই বেছে নেয়। বিগত কালের ঘটনা প্রবাহের ফলে কৃষকশ্রেণী এখন জমিদার ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংলাপে বেশী সিদ্ধহস্ত। সম্মিলিতভাবে চাঁদা তুলে রায়তশ্রেণী উকিল

সরকার নামক একজন উকিল নিযুক্ত করে। সে উকিল রায়তের প্রতিনিধি হিসেবে স্থায়ীভাবে ময়মনসিংহ শহরে অবস্থান নেয়। কলিকাতা থেকেও একজন আইন বিশেষজ্ঞ এটর্ণী আনা হয়। ময়মনসিংহ শহরে এভাবে আইন লবি প্রতিষ্ঠা থেকে বোঝা যায় যে ১৮৩৩ সালের পরও রায়তেরা ছিল সংগঠিত এবং সংগঠিতভাবে তারা আইন আদালতের মাধ্যমে প্রতিরোধ চালিয়ে যায়।

কৃষক প্রতিরোধ ও রাষ্ট্র গঠন

ময়মনসিংহ বিদ্রোহের প্রকৃতি

বিভিন্ন মানদন্ডে গ্রামীণ মানুষের সামগ্রিক ক্রিয়াকান্ড যাচাই করা হয়। অনেক লেখক তিন পরিমাপকের উপর জোর দেনঃ সংগঠন গঠন, লক্ষ্য ও মতাদর্শ। এ তিনটি পরিমাপকের আলোচনা দিয়ে ময়মনসিংহের বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে চাই।

গঠনে ময়মনসিংহ বিদ্রোহ ঘোগের (gough) জন বিদ্রোহ তত্ত্বের কাছাকাছি। ঘোগের তত্ত্ব মতে বিশেষ অভিযোগ-দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য জনগণ প্রয়োজনে গণ-অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে।[১৩০] তাঁর মতে গণ অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ অন্যায় শোধরাবার দাবীতে প্রাথমিকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যবহার; কর্তৃপক্ষ হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করলে হিংসাত্মক ভাবেই এর প্রত্যুত্তর দেওয়া; আসল যোগদান ও নেতৃত্ব আসে কৃষককুল থেকে; এবং একক কোন কেরামতি ক্ষমতা-সম্পন্ন ধর্মীয় নেতা এটা নিয়ন্ত্রণ করে না।[১৩১] ময়মনসিংহ বিদ্রোহের ঘটনারাজি থেকে বোঝা যায় যে বিদ্রোহের প্রকৃত নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় নেতাগণ।[১৩২] যদিও টিপু ও তাঁর মাতার কর্তৃত্বের উৎস ছিল তাদের কেরামতি (charisma) তথাপি তাঁরা কখনও মাঠে নেমে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেননি। বিদ্রোহের সংগঠন কাঠামো ছিলো এমন ঢিলা ধরনের যে অপারেশনের কলা-কৌশল সম্পর্কে নির্দেশ আসতো এক কেন্দ্র থেকে নয়, বহু কেন্দ্র থেকে। সংগঠনের মূল শক্তি ছিল কৃষক। শত্রুর মোকাবিলায় কৃষকরাই সব সময় এগিয়ে এসেছে।

বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। বিদ্রোহীদের দাবী ছিল তাদের উৎপাদনের উপর বাইরের লোকের দাবী হ্রাস করা ও অত্যাচার উৎপীড়ন নিরসন করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা অত্যাচারী উচ্চ কর সংগ্রহকারীর কাছ থেকে আনুগত্য প্রত্যাহার করে তা এমন একজনের কাছে অর্পণ করে যে ছিল বিশ্বাসী ও যুক্তিসঙ্গত কর সংগ্রহের পক্ষপাতী। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একটি স্বাধীন

অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা এমন অসাধারণ কিছু ছিল না। ১৮০৯ সাল পর্যন্ত কড়ইবাড়ীর জমিদারগণ ছিলেন প্রায় স্বাধীন এবং গারো পাহাড়ীয়া অঞ্চল আরও কয়েক দশক পর্যন্ত ছিল স্বশাসিত।

বিদ্রোহীদের মতাদর্শে রয়েছে কিছু স্বপ্ন। কিন্তু তাই বলে একে নেহাৎ অবাস্তব স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[১৩৩] স্বাপ্নিক আন্দোলনের থাকে তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যথা, (১) মন্দ থেকে ভালো কিছুতে উত্তরণ, (২) আসন্ন সুখের রাজ্যের আশা, ও (৩) অলৌকিক শক্তিবলে সুখের স্তরে পদার্পণ।[১৩৪] কিন্তু ময়মনসিংহ বিদ্রোহে রাতারাতি ভাগ্য পরিবর্তনের এমন কোন প্রত্যাশা করা হয়নি। তারা বরং তাদের অবস্থার আংশিক উন্নতিই কামনা করেছিল। তবে বিদ্রোহের প্রথম পাদে অলৌকিক উপাদান বর্তমান ছিল বৈকি। টিপু ও পীর মাতার কেরামতি ক্ষমতা কৃষক-দের সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[১৩৫] কিন্তু ১৮২৫ সালের পর ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের উপর আশাবাদ দুর্বল হয়ে আসে।

গুরুত্ব সহকারে বলা দরকার যে ময়মনসিংহ বিদ্রোহ কোন উপজাতীয় বা ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীরা ছিল সব ধর্ম ও বর্ণের। বিদ্রোহীদের সামাজিক পটভূমি ছিল মূলতঃ উপজাতীয়, নানা উপবর্ণের হিন্দু ও নানা পেশার মুসলমান। এরা গোষ্ঠীগতভাবে নানা ভাষাভুক্ত ছিল বটে কিন্তু এদের সাধারণ ভাষা ছিল বাংলা। অংশ-গ্রহণকারীদের ধর্ম ও বর্ণভেদ কখনও সংগ্রামের কোন ইস্যু হয়নি। তাদের বিদ্রোহের কারণ ছিল একটি সাধারণ মতাদর্শ যে মতাদর্শ ছিল উৎপাদন সম্পর্ক ও শোষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিদ্রোহীরা সামাজিকভাবে মোটামুটি অভিন্ন (undifferentiated) ও ক্ষুদ্র কৃষক ছিল বলে মনে করা যায়। খাজনার হার হ্রাস, অবৈধ কর ও বেগার বিলোপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র কৃষকশ্রেণীরই দাবী। বিদ্রোহটি ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রপুষ্ট জমিদারদের শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি গণ আন্দোলন।

উত্তর ময়মনসিংহে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া

হঠাৎ করে উত্তর ময়মনসিংহে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৭৬০ এর দশকে এবং শেষ হয় ১৮৩০ এর দশকে। এ সময়কালে ঔপনিবেশিক সরকারকে পর পর তিনটি শক্তিকে পরাভূত করতে হয়। যথা, ফকীর-সন্যাসী, আধা-স্বাধীন জমিদার এবং রায়ত শ্রেণী। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ আরোপিত বাড়তি রাজস্ব জমিদারগণ রায়তের কাঁধে বর্তিয়ে দেয়। ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তন, স্থানীয় জমিদার যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্যের

পতন প্রভৃতি সমস্যা কৃষকের উৎপাদন শক্তি কমিয়ে দেয়। এর উপর বাড়তি সরকারী রাজস্ব দাবী রায়তের দুর্ভোগ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ঔপনিবেশিক সরকার জমিদারদের ব্যবহার করে এর শোষণ প্রক্রিয়ার হাতিয়ার হিসেবে। সরকার পুলিশকে নামে মাত্র মায়না দেয়। পুলিশকে অভয় দেয় স্থানীয় জনসাধারণ থেকে তার বেতন ঘাটতি তুলে নেবার জন্য।[১৩৭] এ অবস্থার প্রত্যাশিত পরিণতি ছিল বিদ্রোহ। রায়তের পক্ষে বিদ্রোহ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জমিদার ও সরকার উভয়ই ছিল রায়তের শত্রু। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে রায়তেরা লাভ করেছে একটি সংশোধিত বন্দোবস্ত। এরপর পরবর্তীকালে আর সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়নি।[১৩৮]

পাগল পন্থী বিদ্রোহকে একটি বিছিন্ন ঘটনা হিসেবে গণ্য করা ভুল হবে। বাংলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার ক্রমাগত স্থানীয় প্রতি-রোধ আন্দোলনের এটা ছিল একটি অংশ মাত্র। পাগল বিদ্রোহের যদি কোন আলাদা রকমের বৈশিষ্ট্য থাকে তবে এর জন্য দায়ী স্থানীয় পরিস্থিতি। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের রায়তেরা যেখানে ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রজা, সেখানে উত্তর ময়মনসিংহ ছিল ঐতিহ্যগতভাবে প্রায় স্বাধীন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন সেই স্বাধীন স্বত্বাকে বিনষ্ট করে দেয়। স্থানীয় জনগণকে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নতুন ছিল রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থা। এ সকল পরিবর্তন ধারার কুফল থেকে রক্ষা পাবার জন্য রায়তেরা কিছুকাল নতুন সরকারের মুখাপেক্ষী থাকে।[১৩৯] কিন্তু অচিরেই তারা হতাশ হয় দেখে যে ঔপনিবেশিক সরকার তাদের জন্য মোটেই কল্যাণ বয়ে আনেনি। এ হতাশা বিদ্রোহের তীব্রতাকে অনেকটা ব্যাখ্যা করে।

বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের উপর ঐতিহাসিক লেখালেখি'

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাথমিক পর্বের কৃষক বিদ্রোহগুলোকে এর শেষ পর্বের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পটভূমিতে বিচার করা হয়েছে। বিশ্ব উপনিবেশবাদ, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক বিদ্রোহ-গুলোকে ধরা হয়েছে 'প্রাক্-রাজনৈতিক' ক্রিয়াকাণ্ড। ইতিহাস চর্চার এ ধারা মনে করে যে গ্রামীণ বিদ্রোহগুলো ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম থেকেই শুরু হয় সংকীর্ণ ধর্ম-বর্ণকে অবলম্বন করে এবং ধীরে ধীরে এর উত্তরণ ঘটে আধুনিক মতাদর্শভিত্তিক শ্রেণী সংগ্রামে।

ভারতে কৃষকবিদ্রোহ সংক্রান্ত ইদানীং কালের একটি পর্যালোচনায় বলা হয় যে খাজনা প্রশ্নে বিদ্রোহ দেখা দেয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি

থেকে, এবং এর পূর্বেকার বিদ্রোহগুলো ছিল মূলতঃ ধর্মীয় বা উপজাতীয়।[১৪০] বিদ্রোহের সময়কালের উপর ভিত্তি করে এর স্বরূপ নির্ণয়ের এহেন পদ্ধতির উপযোগিতা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ের বিদ্রোহগুলো একরকম না আলাদা তা গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করা দরকার, মনগড়াভাবে নয়। ময়মনসিংহ বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে খাজনা প্রশ্নকে 'আধুনিক' আখ্যায়িত করার মধ্যে যেমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই, তেমনি উপজাতীয় বা ধর্মীয় বিদ্রোহগুলোর মধ্যেও সব কিছু সেকেলে নয়।[১৪১] বিদ্রোহগুলোকে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য একটি ছাঁচে ফেলতে না পারা পর্যন্ত এগুলোর চরিত্র বের করা উচিত বিদ্রোহবিশেষের কাঠামো, উদ্দেশ্য ও মতাদর্শ দিয়ে।

আধুনিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে যে বেশ[illegible]ক আছে তা ইউরোপের ইতিহাস থেকে বোঝা যায়। এ মডেল বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা পরীক্ষা করা যেতে পারে।[১৪২] প্রাক্-শিল্প ইউ-রোপে কৃষকেরা আধুনিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করে। বাংলার ব্যাপারেও তাই। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন ও এর বিস্তার কৃষকদের বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে উত্তর ময়মনসিংহের বিদ্রোহকে প্রাক্ জাতীয়তাবাদী বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলে আখ্যায়িত করা যায় না। স্থানীয় লোকেরা তখনও বৃহত্তর বাজার যোগাযোগ, নিখিল বঙ্গ বা নিখিল ভারত রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তখনও তারা কোন রাজ-নৈতিক দাবী তোলেনি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তারা বৃটিশবিরোধীও ছিল, আবার ভারতপ্রেমিকও ছিল না। তারা সংগ্রাম করেছে বাড়তি করের বিরুদ্ধে, তাদের উৎপাদনে বহিরাগত-দের ভাগ বসানোর বিরুদ্ধে। এ সংগ্রামে বৃটিশ, ভারতীয়, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি উপাদান ছিল অনুপস্থিত।

অনুরূপভাবে প্রাথমিক ঔপনিবেশিক যুগের বিদ্রোহগুলোকে প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক বা উপজাতীয় বা ধর্মীয় বলে বর্ণনা করা যায় না। এগুলো স্পষ্টতঃ ছিল সমাজের উচ্চস্তরের বিরুদ্ধে নিম্নস্তরের বিদ্রোহ। কিন্তু এদের বিদ্রোহে এমন কোন সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচী ছিল না যে জন্য উক্ত কর্মধারাকে প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক বলা যায়। তাছাড়া, পুঁজিবাদ, শ্রমে পুঁজিবাদের অভিঘাত, উৎপাদন সম্পর্ক, উদ্বৃত্ত আত্মসাতের ব্যবস্থা প্রভৃতি তখন এমনি নিম্ন পর্যায়ে যে ঐ অবস্থায় স্থিত রাজনীতিকে প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক বলা যায় না। অপরপক্ষে, একে উপজাতীয়ও বলা যায় না কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক তখন উপজাতীয় পর্যায় থেকে

যথেষ্ট উচ্চস্তরে ছিল।[১৪৩] সব কয়টি বিদ্রোহ ছিল রাষ্ট্রবিরোধী। রাষ্ট্রের স্থানীয় প্রতিভূ ছিল জমিদার, পুলিশ, সেনাবাহিনী, মহাজন, আমলা। কৃষকের বিদ্রোহ ছিল এদের সবার বিরুদ্ধে।

ইউরোপের মত বাংলায় আধুনিক রাষ্ট্র গঠন কৃষক শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি। বিংশ শতকের প্রথম থেকে কৃষক বিদ্রোহের গঠন, লক্ষ্য ও মতাদর্শে পরিবর্তন আসে। তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৭) ও নক্সাল-বাড়ী বিদ্রোহ (১৯৬৭) প্রভৃতি অত্যাধুনিক বিদ্রোহে পরিকল্পিত বাহ্যিক নেতৃত্ব দেখা যায়, দেখা যায় সাংগঠনিক পরিপক্কতা।[১৪৪] কিন্তু প্রাথমিক ঔপনিবেশিক যুগের বিদ্রোহে তেমনটি ছিল না। না থাকলেও এর মানে এ নয় যে ঐ সব বিদ্রোহ ছিল উদ্দেশ্যবিহীন, আত্মকেন্দ্রিক, স্থানীয় এবং আদিম।[১৪৫] তবে রাষ্ট্রগঠনের বিরুদ্ধে অপরিকল্পিত কৃষক প্রতিরোধ আজও চলছে।[১৪৬] অবশ্য ইদানীং কালের কৃষক আন্দোলনে দেখা যায় যে কৃষক-অকৃষক মৈত্রী ভাবে ভাটা দেখা দিচ্ছে।[১৪৭] এ সকল সমস্যা কৃষক বিদ্রোহগুলোকে নতুনভাবে পরীক্ষা করে দেখার তাগিদ দিচ্ছে। এ তাগিদ আসছে রাষ্ট্রগঠনে নিয়ত প্রক্রিয়া থেকেই।

অনুবাদঃ সিরাজুল ইসলাম

তথ্যনির্দেশ

১. The principal sources are : Bengal Revenue Consultations, 9 March 1826, No. 3, Report on the causes of the late disturbances in Pergunnahs Sherepore and Allapsing, from R. Morrieson, Offg Judge of Circuit, Nusseerabad, Mymensing, sent to H.B. Bayley, Chief Secy to Govt in the Judicial Department, Fort William on 12/11/1825 (this 117-page report is hereafter referred to as *Morrieson, 1825*); Jamini Mohan Ghosh. 'The Pagal Panthis of Mymensingh', *Bengal Past and Present,* 28:55/56 (July-December, 1924), pp. 42-53 (hereafter *Ghosh, 1946 b*) ; and Pramatha Gupta, *Muktijuddhe Adibashi (Maymansingh)* Calcutta, 1964.
Other early-colonial peasant revolts have been the subject of detailed monographs, for example Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal, 1783 : The First Formidable Uprising against the Rule of East India Company,* New

Delhi, 1972); Muinud-din Ahmad Khan, *Titu Mir and His Followers in British Indian Records*, Dacca, 1977; Jagdish Chandra Jha, *The Bhumij Revolt (1832-33) : Ganga Narain's Hangama of Turmoil*, Delhi, 1967, Cf. Narahari Kaviraj, *Wahabi and Farazi Rebels of Bengal*, New Delhi, 1982, and Sunil Sen, *Peasant Movements in India : Mid Nineteenth and Twentieth Centuries*, Calcutta and New Delhi. 1982, See also note 2.

২. Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856*, Dacca, 1961; Muin-ud-din Ahmed Khan, *Muslim Struggle for Freedom in Bengal, A.D. 1757-1947*, Dacca, 1960; Muin-ud-din Ahmed Khan, *History of the Fara'idi Movement in Bengal (1818-1906)*, Karachi, 1965; Khan, 1977. See for a critique, Kaviraj, 1982.

৩. F.A. Sachse, *Mymensingh*: Bengal District Gazetteers Calcutta, 1917, pp. 162-166; Ghosh, 1924b, p. 42; E. Gait, *A History of Assam*, Calcutta, 1967, chapter p. 4; Milton S. Sangma, *History and Culture of the Garos* New Delhi, 1981, p. 5.

৪. Cf. Sachse, 1917, p. 32: 'The fort was built as a protection against Garos by Dalip Samanta, but the Muhammadans took possession about 1370'. See also Jamini Mohan Ghosh, 'An Afghan Fortress in Mymensingh', *Bengal Past and Present*, 27 : 53/54 (January-June, 1924) pp. 56-58 (hereafter *Ghosh, 1924a*).

৫. Alapsingh pargana extended to the south of the Brahmaputra but only its northern part, known as Tappe Satsikka, was involved in the revolt. Nowadays the area of the revolt is divided administratively between the thanas of Sribordi, Sherpur, Nalitabari, Nakhla, Haluaghat, Fulpur, Purbodhola and Durgapur.

৬. In the 1820s each of these thanas had 1 inspector (*daroga*), 1 clerk (*muhuri, mohurer*), 1 constable (*zomadar*) and 10 armed policemen (*borkondaz*). Sherpur thana had '10 or 12' bailiffs (*mozkuri piada*), 12 'day guardians who

protect travellers' and 633 village choukidars. Ghoshgaon had 744 village *choukidars* and Netrakona 1002. In case of emergency the police could summon a *posse comitatus* consisting of *zamindari* bodyguards and male villagers, or call in the military. See Morrieson, 1825, paras. 69, 74, 81-85 ; and Bengal Revenue Consultations, 9 March 1826, No. 3, letter from W. Dampier (Offg Mage, Mymensingh) to R. Morrieson (Offg Judge of Dacca Court of Circuit, Mymensingh), 27 October 1825 (hereafter *Dampier, 1825*).

৭. The population of Mymensingh was estimated at 1.4 million in 1826 , the 1872 census returned 2.4 million and the 1891 census 3.5 million. The estimate for 1826 is based on the number of villages according to the district list of choukidars (9,254, considered 'deficient') multiplied by the average number of houses (estimated at 30) and the number of inhabitants of each house (5). A similar procedure for the three northern thanas yields a population figure of about 350,000 (2,379x30x5). See Morrieson, 1825, para. 85 ; Dampier, 1825 ; Sachse, 1917, p. 34.

৮. Morrieson, 1825, para. 30 ; Ghosh. 1924b, p. 36. This area was known as '*Gird Garo*' (Land of the Garos) or 'the *Doon*'.

৯. Jamalpur (Singjani) and Begunbari, both on the bank of the Brahmaputra ; see Jamini Mohan Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal*, Calcutta, 1930, p. 26.

১০. Ghosh mentions some revenue-free estates granted to sannyasis in Sherpur pargana in the middle of the 18th century p. 159. For religious sects in this area, see Ghosh, 1924b, p. 42, and for moneylending, Ghosh, 1930, pp. 89-90, 139, 144-147, 149. A recent reconsideration of the causes of the Sannyasi and Fakir revolt is in Suranjan Chatterjee, 'New Reflections on the Sannyasi, Fakir and Peasants War', *Economic and Political Weekly*, 19:4 (21/1/1984) : PE·2-PE.13.

১১. Proceedings of the Provincial Council of Revenue at

Purnea, 14 March 1780, quoted in Ghosh, 1930, p. 75. On levying money, see idem pp. 44,75,92-93, and on sannyasis and fakirs in the Garo Hills, idem pp. 84, 149, 158.

১২. দেখুন Ghosh, 1930, pp. 89-90, 148-149.

১৩. দেখুন Sachse, 1917, p. 31 ; Ghosh, 1930, pp. 56, 75, 84, 148-151, 158.

১৪. Sachse, 1917, p. 31 ; Ghosh, 1930, p. 139.

১৫. দেখুন section 2. 4 below.

১৬. Thus, when in 1782 the Committee of Revenue ordered an investigation into zamindari complaints about sannyasi/fakir disturbances and their relation to zamindari indebtedness, its representative in northern Mymensingh reported from Begunbari that 'numerous obstacles were put forward on the part of the zemindars whose object from the commencement had been to prevent any investigation whatever , it is evident they are using every stratagem to delay it as long as possible, their last resource will be purposely falling in arrears to Government'. (Quoted in Ghosh, 1930, p. 149). The north Mymensingh zamindars wished to enlist the military force of the colonial state in their struggle against the sannyasis/fakirs and they could do so by invoking the security of revenue collection. On the other hand, they were opposed to any state interference in the actual process of revenue and rent collection and firmly and successfully refused to cooperate with attempts at 'adjustment of accounts between the zamindars and the Sannyasis'. (ibid, p. 148) The zamindars used military intervention as an instrument to depress local interest rates on loans, while the colonial government intervened with a view to establishing the necessary 'law and order' to ensure smooth revenue collection.

১৭. Apart from the sannyasi settlers mentioned in the literature, other groups migrated to northern Mymensingh, often at the instigation of the local zamindars. Thus the Hajongs of Shushong pargana appear to have arrived in the 18th century, brought to the area by the Shushong zamindars.

Sachse, pp. 41, 166 ; Gupta, p. 28.

১৮. Alexander Mackenzie, *History of the Relations of the Government with the Hill Tribes or the North-East Frontier of Bengal*, Calcutta, 1884, pp. 245-247 ; Sachse, p. 89 ; Ghosh, 1924b, p. 43 ; Sangma, 1981, pp. 5-16. Often relations between Garos and plains people were so tense that the former took hostages before starting on their trading expeditions. A pattern of encroachment by plains people rebutted by raids from the hills further complicated the situation ; these raids continued until the final incorporation of the Garo Hills into British India in 1873.

১৯. Morrieson, 1825 ; Mackenzie, 1884, pp. 246-247 ; Sachse, pp.31, 163-164 ; Ghosh, 1924b, pp. 43-44 Sangma, pp. 8-9.

২০. Morrieson, 1825 ; Sachse, pp. 162-164 ; Ghosh, 1924b ; p.44.

২১. Morrieson, 1825.

২২. Letter from Mr. Packenham to the Board of Revenue (1813), quoted in Sachse, pp. 163-164 : the station referred to is Mymensingh town.

২৩. Cf. Morrieson, 1825, paras. 34-37 which mentions how the zamindars obstructed implementation of the 1793 orders and refused to give village accounts, but were not forced to obey by the judicial branch.

২৪. Sachse, p. 31 ; Ghosh, 1930, p. 35 ; Haroun er Rashid, *Geography of Bangladesh*, Dacca, 1977, pp. 24-29, 63-67.

২৫. Rashid, p. 27.

২৬. Morrieson, 1825, para. 31.

২৭. ibid. Cf. para. 32 : 'These palpable irregularities and systematic illegalities form in my judgment the primary causes of the existing disagreements between the Landholders, the discontent of the ryots, and the turbulent risings of the unhappy and oppressed inhabitants of Pergunnah Sherepore and of Tippah Saut Sicca'.

২৮. When a group of peasant leaders were freed from jail on 26 January 1825, they 'declared their innocence and asserted the whole cause of the disturbances originated in the illegal and excessive exactions extorted from the

ryots by the Zemindars, Talookdars, &ca.' (Morrieson, 1825, para. 60) And on 19 January 1825, 'a large body of ryots attended at the Magistrate's Cutcherry to complain that they could no longer bear with the oppressive rents and endless exactions, and unrequited labour forced from them by the Zemindar'. (ibid., para. 57).

২৯. Bengal Revenue Consultations, 9 March 1826, No. 3. letter from J. Hayes (Judge, Nusseerabad) to R. Morrieson (Offg Judge of Dacca Court of Circuit, Nusseerabad), 26 September 1825. Kanungos (accounts officers) had existed in Bengal during Mughal times but the kanungo system had collapsed in 1757 and was formally abolished by the British in 1792. In an attempt to improve the colonial government's information on revenue matters, the system was revived in 1819. 'The kanungoes were directed to record the extent of the possessions of zamindars, the rights and interests of the agricultural community, and to report about village management, and village life and customs'. Zamindari resistance to this interference by the state caused the final abolition of the system in 1828. See Sirajul Islam, *Rural History of Bangladesh : A Source Study*, Dacca, 1977, p. 17.

৩০. Sachse, p. 164 ; Ghosh, 1924b, p. 46 ; Gupta, 1964, p. 30.

৩১, Gupta, p. 30. For references to Bokshu and Dwipchand, see Ghosh, 1924b, p. 47 ; Gupta, 1964, p. 31.

৩২. The following account is based on Gupta, pp. 28-30, which in turn is based on oral sources.

৩৩. Cf. note 17 above. On the origin and identity of the Hajong there is much controversy ; cf, E. A. Gait, *Census of India, 1891, Assam*, Shillong, 1892, pp. 155, 160, 233 ; E. A. Gait, *Census of India, 1901, Volume VI : The Lower Provinces of Bengal and there Feudatories*, Calcutta, 1902, p. 413, II. pp. 110-113 ; B, C. Allen, *The Khasi and Jaintia Hills, the Garo Hills and the Lushai Hills* ; Assam District Gazetteers, Volume X Allahabad 1906, II. p. 29 ; E. T. Dalton. *Descriptive Ethnology of*

Bengal, Calcutta, 1960 (1872), pp. 87-88 ; Gupta, pp. 4-11 ; and Abdus Sattar, *In the Sylvan Shadows*, Dacca, 1971, pp. 180-191.

On the role of the Hajongs in later insurrections, see Nikhil Chakravarty, 'In Bengal's Biggest District : Share-cropper's Battle for New Harvest : Remarkable Solidarity of Hindu-Muslim Kisans', *People's Age*, Calcutta, December 22, 1946 p. 5 ; 'Tribal Unrest in North-East Bengal : Agrarian Reformers would do well to await a Better, Quieter Opportunity', *The Statesman*, Calcutta, March 25, 1947, p. 6 ; Gupta ; Sunil Sen, *Agrarian Struggle in Bengal, 1946-47*, New Delhi, 1972 pp.41-43, 59-60, 67, 71, 90.

৩৪. Khedas were destroyed at Farangpara, Bijoypur, Chengni, Dhenki, Arapara and Bhorotpur, now in the thanas of Durgapur and Kalmakanda, Gupta, p. 29.

৩৫. Gupta, p. 29, lists the follwing : Ratia Hajong from Betogra village, Mongla from Dhenki, Bihari from Lengura, Bagha from Hodipara, Zogo from Fandagram and Shoa Hajong from Biajoupur. Goa Morol from Bagpara was captured by the zamindars and never heard of again and two others, Mola and Tonglu disappeared without trace. All these casualties, occurred in the northern most part of Shushong.

৩৬. Morrieson, 1825, para. 84.

৩৭. Morrieson, 1825, para. 81. This passage continues : 'It was a Custom established for these Peeadahs to go round annually to every Village within the thanah jurisdiction for the purpose of taking a Moochilka from all the ryots, not to Harbour Thieves and Dukaits, and for this, they exacted 3 Annas a day from every Village for each Peeadah . . . I considered it my duty to forbid the employment of the Peeadahs and to stop the custom of the yearly Moochulkhas. On enquiry by the Acting Magistrate it appeared that the custom of employing Muzkooree Peeadars was not confined to the Sheerepore Thanah, but was universal throughout the Zillah . . . it had been customary for the Darogahs and other Police Officers when on duty within their jurisdic-

tion in Pergunnah Sherepore, 'to have their expenses paid by the Zeemindaree Amlah...who to meet the same must levy from the ryots a commensurate illegal exaction . . . orders were issued to the Police Officers forbidding any such receipts in future'. (paras. 81 and 82).

৩৮. Cf. John F. Cady, *A History of Modern Burma*, Ithaca, N. Y, 1958, 72-76.

৩৯. 'On the 16th the Sherepore Zemindars Received an order from the Magistrate to make a new Military road from the Jummalpore Ghaut on the Burampooter throughout Pergunnah Sherepore, to the borders of Pergunnah Soosong and Saut Sicca in Allapsing towards Sylhet'. Morrieson, 1825, para. 38. The length of this proposed road was about 60 km.

৪০. 'About this time the zemindars commenced realizing from their Talookdars, Ijarahdars and ryots, a Tax called "Kurchai Russudi Pulton", to defray their alledged losses and expences in supplying the ordered articles for the Troops.' Morrieson, 1825, para. 41). Cf. Ghosh, 1924 b, p. 46 ; and Binay Bhushan Chaudhuri, 'Peasant Movements in Bengal 1850-1900' *Nineteenth Century Studies*, Calcutta, No. 3, July 1973, pp. 358-359.

৪১. Morrieson, 1825, para, 39.

৪২. Ibid., para. 40. In the literature Tipu is given various titles : Tipu Pagol (Tipu the Madman), Tipu Bhai Sahib (Brother Tipu), Tipu Shordar (Tipu the Leader) ; the Mymensingh District Gazetteer even refers to him erroneously as Tipu Garo (Tipu the Garo). See Morrieson, 1825 ; Gupta, p. 30 and Sachse, p, 32.

৪৩. Sachse, pp. 39-41, quotes the following numbers for these groups from the 1911 Census : Garos (38,000), Hajongs (25,000), Daluis (or Dalus : 4,800), Hodis (26,000), Rajbangshis (23,000). All were concentrated in Sherpur and Shushong. Gait (1902 : II, 110-113) provides thana-wise breakdowns for 1901. Cf. H. Beverley, *Report on the Census of Bengal 1892*, Calcutta, 1872, cxv ; Gupta, pp. 1-19.

৪৪. The success of proselytism among the north Mymensingh people is mirrored in the popularity of the Hindu sects of the Agal Sankar and Guru Satya (Ghosh, 1924b, p. 42) and Ramkrishna and Arya Samaj ('Tribal Unrest,' 1947), the syncretic Pagolponthi set, various Christian sects (Australian Baptists and Oxford Mission are mentioned in Sachse, p. 41 and 'Tribal Unrest. .' 1947) and the Communist movment ('Tribal Unrest. ., 1947 ; Sen, 1972).

৪৫. Morrieson, 1825 ; Mackenzie, p. 254.

৪৬. Morrieson, 1825 ; Ghosh 1924b, pp. 42-43. Letarkanda is now in Durgapur thana, Ghagra union. On the role of fakirs in a contemporaneous revolt in southern Bengal, i e. the Titu Mir or Wahhabi Rising of 1831, see Khan, 1977, pp. 24,33,37 ; Kaviraj, 1982, pp. 32-33, 50.

৪৭. Morrieson, 1825. The full passage runs as follows : 'It appears that about 50 years ago, a Muhommadun Fukeer named Kurreem, seeing the corrupt state of the pinciples and dissolute habits of the people inhabiting the Doon and the borders of Sherepore, Saut Sicca and Soosong, set himself up as a reformer and Soothsayer, and having forsaken his former creed, embraced that of a Deist and established a discipline suited to the habits of the people he aimed at making his converts. In time he gained proselytes, and obtained permission from the Rajahs of Soosing to take up his abode in the village of Leterkundee where his followers erected a habitation for him, and supported him and his family by their free gifts and offerings. From the novelty of the Doctrines and discipline of this new sect, its head and Members were by their neighbours designated Panguls, and hence the Pungul Puntee of Sherepore. Kurreem Pangul sent forth his son Tippoo Pungul to teach and make converts, he did so successfully and those proselytes became his brethren and hence the term Bhaee. and Bhaee Sahib. As the sect increased, so did the Riches of the Priest.'

৪৮. Morrieson, 1825. i.e. Hajong, Hodi (?), Dalu, Banal,

Razbongshi and Dai. These groups were at most semi-Hinduized, except for the Dai who constitute a Muslim occupational group of low rank. cf. Sachse, 1917 pp. 39-41 ; Gupta, pp. 1-19. On the Banai, see especially Gupta, p. 13, but 'Bonaee' may also refer to Garos, because the headmen of Garo villages 'were known as *Boneah*'. Jayanta Bhusan Bhattacharjee, *The Garos and the English 1765-1874*, New Delhi, 1978, p. 34. Garos certainly formed part of the sect from its early days. Ghosh, 1924b, p. 43.

৪৯. Ghosh, 1924b, p. 46.

৫০. Collector of Mymensingh, 1802, quoted in Ghosh, 1924b, p. 43. 'Pagolponthi' means 'followers of the mad sect.'

৫১. The mass conversion of Bengal peasants to Buddhism and later Islam may also be viewed in this light. Non-doctrinaire egalitarianism is equally important as a core characteristic of that other 'mad' sect of Bengal, the Bauls, and from the 1820s onwards the rural Wahhabi and Faraizi movements also displayed a strongly egalitarian character. The puritanical aspects of these latter movements may well have been exaggerated in the literature. There is certainly no ground to designate the Pagolponthis a 'puritanical sect of the Muslims', as was done by Chaudhuri, 1973, p. 359, ; Kathleen Gough, 'Indian Peasant Uprisings', in A.R. Desai (ed.) *Peasant Struggles in India*, Delhi, 1979, p, 103. Sen, 1982, p. 2. To underline this point I refer to the emphatically syncretic practices and appeal of the sect as it survived in the 1920s. Ghosh, 1924b, pp. 52-53.

৫২. Morrieson, 1825.

৫৩. Ghosh, 1924b, p. 43. The habit persisted at least until 1924 ; cf. idem : 52.

৫৪. Morrieson, 1825.

৫৫. Cf. Ghosh, 1924b, pp. 44-45 ; Sachse, pp. 31-32. Sabati's petition ran as follows : 'Towards the north-east beyond the boundaries of Purgunnah Sherpur upon the hills there is an extensive tract of land belonging to the Abri Garos, viz., mouzas Sumbhu, Bhagaicaveny, Gedna, Mewas,

Phaphageery, Budhugeery, Helal and Calature all of which mouzas are inhabited by Abri Garos, who never paid any revenue to Government. A parwanah may be granted me with a guard of sepoys, that on the part of Governement, I may take possession of the above land and after deducting Moshahara and Saranjami from the jumma, Tahood may be taken from me for the revenue.' The Collector's recommendation to the Board dated November 30, 1802,. contained the following passages: 'I beg leave to submit translation of a petition presented by Safati Miah, inhabitant of Pargana Susung, a person of respectable character, by profession a Fakir and a religious teachter of a sect commonly known as Pagala Fakirs. The Garos residing upon the hills are, in general, his followers. . .His influence and intercourse with the Garrows is well-known especially to the Chowdhuries of Susung and Sherpur. He states that it is the wish of these people to come under the protection of Government and they now offer to pay a revenue through him for such protection. Aware, therefore, of the respectability of the petitioner and well-convinced of the truth of the representation, I have thought it my duty to state the circumstances for the consideration of my superiors. . . His application for a guard of Company's sepoys is, he says, to convince these people of his having the support of Government and acting under their authority.' (Quoted by Ghosh, 1924b, pp, 44-45). Obviously, the local officials thought highly of the family and hoped to harness its popular support to imperial ends. Incidentally, this is the first and last time Sabati appears in the record and it is therefore likely that he predeceased his father. Tipu succeeded his father, but, lacking male issue, he was succeeded by Sabati's son Badan Shah Pagol whose grandson Ekabbali Shah Pagol was the sect leader *(Pagol Guru)* at the time of Ghosh's investigation. See genealogy in Ghosh, 1924b, pp. 53.

৫৬. Morrieson, 1825.

৫৭. Gupta, p. 30.

৫৮. 'About four or five years ago he became a suspected character. And in 1821 one of his followers, Ruffeea, was taken up in a case of Robbery attended with wounding, and made confession of his guilt, acknowledging Teepoo Pungul to be the Receiver of the robbed property. The Darogha made a search on which no property found (sic), being suspected, Tepoo was not apprehended. In 1822 he was tried for the murder of Sumboo Pungul, and narrowly escaped being acquited, not in innocence but on want of clear and satisfactory legal proof. And in 1824, in the trial of a case of Burglary, four Witnesses swore to their strong suspicions against Tippoo Pungul and his 10 or 12 armed body guard. But Teepoo was not called upon to explain'. (Morrieson, 1825).

৫৯. Compare the harassment of the Faraizi leader, Dudu Mia. Khan, 1965, pp. 25-46.

৬০. 'The crafty counsel of this man Tipu Pangal, according with the excited feelings of the lower orders of the ryots, and particularly those of the Pangal sect, led to seditious meetings, Riots and insurrection.' (Morrieson, 1825, para. 33). 'On the 21st November 1824 the Magistrate Received the first intimation of the sect of Panguls and the dissatisfied ryots, becoming troublesome and turblent.' (para. 39). 'On the 5th the Zumeendars reported that the Hatries and Panguls refused to work.' (para. 42). 'On the 14th the Police reported the Ryots joining with the Panguls in acts of riot and oppression.' (para. 47) Cf. paras. 57, 59 and 88.

৬১. Mackenzie, 1884 : 254 ; Sashi Bhushan Chaudhuri, *Civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1857)*, Calcutta, 1955, pp. 105-108 ; Stephen Fuchs, *Rebellious Prophets : A Study of Messianic Movements in Indian Religions*, London, 1965, pp. 111-116, and so on, Already in 1833 the Collector of Mymensingh, John Dunbar, used the

term for all dissatisfied peasants : 'The discontented ryots or those who are usually now caled Pauguls are ever ready to listen to any mad man. . .' 'Quoted in Ghosh, 1924b, p. 52.

৬২. For example, Turk Shah Fakir who repelled a British force and operated relatively independently of Tipu ; Soba Hartri who was shot dead by the sepoys ; or Duku Joardar, who led another battle. Morrieson, 1825, paras. 59, 68, 74.

৬৩. Morrieson, 1825.

৬৪. দক্ষিণ বঙ্গে ফরায়জী ও তিতুমীরের ভক্তেরা যা করেছিলেন, দ্রষ্টব্য, Khan, 1965, pp. 104-123 ; Kaviraj, 1982, p. 50.

৬৫. Morrieson. 1825, paras. 64, 68, 74 ; cf. para. 77, 'According to a ballad, remnants of which are available, Bakshu was appointed Judge, Dwipchand Foujdar or Magistrate and Gumanu Sarkar Collector.' Gosh, 1924b, p. 47. 'Bokshu was in charge of the judicial department, Dwipchan used to do the work of a magistrate and Gumanu Shorkar took care of all records and documents. . . Mr. Ramnath Bidyabhushon of Sherpur wrote :

"Bokshu jojiyoti kore, Dwipchan kalektar,
Nothipotro pesh kore Gumanu Shorkar."

(=Bokshu was judge, Dwipchan collector, and Gumanu Shorkar presented the records) (Gupta, p, 31 ; my translation) Ramnath Bidyabushon was a balladeer of anti-peasant and pro-zamindar sentiments. See Ghosh, 1924b, p. 47.

৬৬. Morrieson, 1825, para. 42, The Hatries are probably Hodis.

৬৭. প্রাগুক্ত, প্যারা ৫৪।

৬৮. ঐ, প্যারা ৪২।

৬৯. ঐ, প্যারা ৪৪।

৭০. I.e. 14,000 oxen with 1400 drivers, 1025 camels with 1025 drivers, 1000 sepoys, 600 cavalry complete, 1200 horses with syces, and followers. (Morrieson, 1825, paras. 50, 62, 63).

৭১. Morrieson, 1825, para. 79.

৭২. প্রাগুক্ত, প্যারা ৪০।

৭৩. স্থানীয়ভাবে এক কুরের সমান এক একর। Sachse, 1917, p. 109.

৭৪. *Aboab*, *mathot* and *khoroch* were various illegal fees levied on the peasantry; *begaris* were those who were forced to do corvee labour.

৭৫. Morrieson, 1825.

৭৬. Morrieson, 1825, paras. 43, 48, 51, 53.

৭৭. I.e. dues to rulers and holy persons.

৭৮. Morrieson, 1825, para. 55.

৭৯. ঐ, প্যারা ৫৭।

৮০. ঐ, প্যারা ৫৯।
আহত কৃষকদের নাম নিধু ও ভোতা, ও নিহত কৃষকের নাম শক্তিরাম।

৮১. Morrieson, 1825, para. 65.

৮২. ঐ, প্যারা ৫৮।

৮৩. ঐ, প্যারা ৭৩।

৮৪. ঐ, প্যারা ৭৪। In late February the police had decided to call out a *posse comitatus*, i.e. a group of able-bodied men in the pargana who were given arms by the police and summoned to repress the disturbances. This 'divided the Ryots into two parties of "The Company Ke Suhur" or Government Party, and the "Pangul Ke Suhur" or Pangul Party.' (Ibid., para. 69).

৮৫. ঐ, প্যারা ৭৪।

৮৬. '(I)n these disturbances 499 individuals have been brought to trial, of Whom 21 have died pending inquiry, 61 been punished by the Acting Magistrate, 377 liberated, 26 committed for trial, and 14 on whom no orders have yet been passed.' (Ibid., para. 93) Cf. Bengal Judicial Consultations, 11 August 1829, Nos. 9-11, letter from C. Tucker (Commissioner Dacca Division) to W.H. Macnaghten (Register to the Nizamut Adawlut, Fort William).

৮৭. Gupta, p. 31. Cf. Bengal Revenue Consultations, 9 March 1826, No. 4, letter from W. Dampier (Offg Joint Magte & Register, Mymensingh) to J. A'hmuty (lst Judge) and other Judges of the Court of Appeal and Circuit, Dacca, of 31/12/1825. This letter deals with complaints by the Garos of Ghoshgaon, Goni and Borak against the zamindars of Sherpur concerning extortion.

৮৮. Ghosh, 1924b, p. 48.

৮৯. ঐ।

৯০. ঐ।

৯১. On June 5, 1833, the Collector of Mymensingh wrote to the Commissioner of Dacca : 'The chief among the counsellors of the Pauguls were Gumanoo Sarkar and Ujir Sarkar, who had during the last seven years under the pretence of law expenses drawn contributions from the ryots. This was generally one instalment of the annual kist.' (Quoted in Ghosh, 1924b, p. 47, note 14).

৯২. Quoted in Ghosh, 1924b, p. 48.

৯৩. ঐ।

৯৪. ঐ, পৃ, ৪৮-৪৯।

৯৫. ঐ, পৃ, ৪৯। The suffix Pathor signifies, according to this source, a Garo chief but Gupta. (p. 32) informs us that these two men were Hodis. See also Sachse, p. 164.

৯৬. Battajor is now in Sribordi thana and Nalitabari is the headquarters of a thana of the same name.

৯৭. Ghosh, 1924b: P. 49. The British East India Company was the colonial government.

৯৮. Thus Mr. Dunbar, Magistrate of Mymensingh, wrote to the Commissioner of Circuit at Dacca in April, 1833 : 'Fresh disturbances of a very serious nature have occurred at Sherpur...From the character of the occurences as noticed in the reports of the police and confirmed by numerous individuals who have left the place, I fear that nothing short of military force will restore order'. (Quoted in Ghosh, 1924b : p. 49.

৯৯. This quotation is from a letter by Mr. Dunbar dated 27/4/1833 that shows the situation as perceived by the colonial authorities : 'I regret to say that the peace of the district has been so seriously disturbed by certain of the inhabitants of Pargana Sherpur, usually known by the name of Pauguls, that they are now in such a force, that I find it impossible even to attempt to reduce them to obedience or to restore order without the aid of troops. They have proceeded

to many wanton acts of violence in the prosecution of their design to render themselves independent of the local authorities and have for the present completely taken possession of the country between Sherpur and the Garrow hills and are now employed in levying contributions from the ryots and add to their numerical strength with a view it is reported of plundering the town of Sherpur. Under the circumstances, I have the honour to request that you will immediately on receipt of this letter afford me the aid I require. The Pauguls are said to have small bodies of four or five hundred men, at different places, throughout the Pargana, but the main body is believed to consist of three thousand men, under a leader called "Jonakoo Pauter", armed with spears, swords, bows and (poisoned) arrows and a few matchlocks. I do not anticipate any serious resistance to the troops whose chief duty will I think consist in surrounding, caputring and dispering those in arms. It is, however, incumbent on me to place success in any encounter with them, beyond doubt if possible, and I, therefore, beg that one hundred and fifty men may be sent on this duty.' Quoted in Ghosh, 1924b, pp. 49-50.

১০০. Or possibly Toglapara (Gupta, p. 32).

১০১. Or Jolangi. (Ibid.).

১০২. Ghosh, 1924b, p. 50-51.

১০৩. ঐ, পৃঃ ৫১।

১০৪. But two leaders of Janku's group were captured on 13 May: Kalavadra and Pandit Shah. (Ghosh, 1924b, p. 51; cf. Gupta, p. 32).

১০৫. Morrieson, 1825, para. 88.

১০৬. Letter of June 5, 1833, from Mr. Dunbar to Mr. H. J. Middleton, Commissioner of the Dacca Division. (Quoted in Ghosh, 1924 b, p. 52).

১০৭. ঐ, নোট ২১।

১০৮. দেখুন, নোট ৫৫।

১০৯. Morrieson, 1825, para. 55.

১১০. ঐ, প্যারা ৮৩, ৫২।
১১১. দেখুন, 'নেতৃত্ব' অনুচ্ছেদ।
১১২. Morrieson, 1825, para. 67.
১১৩. Ibid., para 75. No other mention is made of the role of women in this revolt.
১১৪. For example, D, Sabean, 'The Communal Basis of pre-1800 Uprisings in Western Europe', *Comparative Politics* 8 (1975-76), pp. 355-364.
১১৫. Morrieson, 1825, para. 46.
১১৬. Ghosh, 1924 b, p. 43.
১১৭. Morrieson, 1825 ; Mackenzie, p. 254. Cf. Ghosh, 1924 b, p. 45.
১১৮. Morrieson, 1825. Ghosh mentions that according to 'current tradition' bamboo guns were used. (1924 b, p. 45, note 9).
১১৯. Colonial sources treat such beliefs at length and with ridicule, and the participants in these movements are made to appear as less rational and more 'superstitious', 'gullible' and 'excitable' than their colonial adversaries. Having thus shown them as childish and immature, the colonial, authors proceed to present them as innocent rustics who have been misled by ambitious and unscrupulous leaders. Tipu was viewed in this way by Morrieson : 'The superstition of the people enabled him to practice his tricks of necromancy and establish his name as a great Fukeer, which secured him an ascendancy over the Minds and actions of his votaries and proselytes, which he turning [sic] to his own advantage', and he was pronounced guilty of 'being the Criminal Inventor, Inciter, and Head of the seditious Pangul association'. (para. 77. Cf. paras. 33, 46). This perspective disallows peasants an active part in their own movements and serves to deny the broad social basis of peasant resistance. Compare Herbert's critique of earlier interpretations of the Hsaya San rebellion in Burma. Patricia Herbert, *The Hsaya San Rebellion (1930-1932) Reappraised*, Melbourne, Monash University, Centre of Southeast Asian Studies, 1981.

১২০. Morrieson, 1825, para. 74. Cf. para. 42.

১২১. ঐ, প্যারা ৪০।

১২২. ঐ, প্যারা ৬৬।

১২৩. ঐ প্যারা ৭৭। Shankarpur village lies on the Kangsha river opposite Letarkanda, Tipu's home village.

১২৪. Thus Mackenzie, who based his story on Morrieson's report, writes : 'Tippoo was the only person who benefitted by the troubles, and of him we read that he built himself a Palace, and styled it the "Royal Court of King Tippoo Paghul", p. 255. Ghosh has Tipu establish his 'Royal Court' at Garh Jaripa, but mentions that, according to local tradition, Tipu's capture at his 'court' occurred at Letarkanda. (1924b, pp. 47, 48) As argued, Morrieson's report of 1825 does *not* provide conclusive evidence for the existence of any 'Royal Court', and certainly does not locate it at Garh Jaripa.

১২৫. Ghosh, 1924b, pp. 52-53.

১২৬. This may be due to a defective record. During the attack on Sherpur of 19 January 1825, the rebels *may* have plundered zamindari hosues (Ghosh, 1924b, 47 ; but cf. Morrieson, 1825, para. 56, in which this is not mentioned) and the last attack on Sherpur, in early 1833, involved both plunder and arson, Ghosh, 1924b, p. 49 ; Gupta, p. 32.

১২৭. Morrieson, 1825, para, 61.

১২৮. Cf. Hayes (note 29 above).

১২৯. Morrieson, 1825, para, 74.

১৩০. Galt, pp. 332-340.

১৩১. Gough, p. 94.

১৩২. ঐ, ১০৮।

১৩৩. In some cases we even know the home villages of the leaders : Gumanu Shorkar came from Satpaika village in Jamalpur thana and Ujir Shorkar from Bharati Mankunda in Fulpur thana. Ghosh, 1924b, p. 47. Cf. notes 46 and 95 above.

১৩৪. As is done by Fuchs, pp. 111-116.

১৩৫. Norman Cohn, 'Medieval Millenarism : Its bearing on the

Comparative Study of Millenarian Movements', in Sylvia L. Thrupp (ed.), *Millennial Dreams in Action*, The Hague, 1962 ; p, 32 ; cited in Gough, pp, 99-100.

১৩৬. Cf, notes 72, 75, 85, 118 above.

১৩৭. Cf. notes 26, 37 above.

১৩৮. Some peasant resistance against the settlement of pachwai (liquor) excise reported for Durgapur in 1885 (Bengal General Proceedings—Miscellaneous, Vol. 2476 (December 1885) : 'Annual General Administration Report, Dacca Division, for 1884-85', by R. Larminie, p. 116, and Sachse p. 42, gave an account of disturbances in connection with the Swadeshhi movement in 1907-08. Northern Mymensingh was the scene of another large peasant revolt in 1946-47. Directed against thh extortionate *tanka* rent and led by CPI cadres, this revolt had links with the Tebhaga rebellion that broke out in other parts of Bengal at the same time. On the Tanka revolt, see Chakravarty, 1946 ; 'Tribal Unrest . .', 1947 ; Gupta, 1964 ; and Sen, 1972. On tanka rent in northern Mymensingh, see also F. A. Sachse, 'Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Mymensingh, 1920'. in Proceedings of the Government of Bengal, Revenue Department, Branch Land Revenue, December 1921, pp. 53-57.

১৩৯. Cf. note 55 above.

১৪০. In the second half of the nineteenth century there was the beginning of a new kind of peasant struggle in India, which centred mostly on the rent question . . . these movements were becoming secular, cutting across caste and communal barriers , . . [Earlier] struggles revealed peasant discontent but hardly brought to the fore the rent question that exacerbated the relations between landlords and their tenants'. Sen, pp. 1-2.

১৪১. The rent question was also the focus of the huge Rangpur revolt of 1783 and this movement lacked a millenarian or sectarian ideology. (Kaviraj, 1972) Although there is some debate about the nature of the sannyasi and fakir

uprisings in the late eighteenth century; i. e. whether or not these can be classified as peasant revolts, there is no doubt about their focus on exploitation and the absence of millenarian overtones. See Chatterjee, 1984. The notion of 'tribal revolt' suffers from the vagueness of the concept of 'tribe' in the south Asian context and may overplay ethnic fators at the expense of economic ones· A list of 'tribal revolts' in early-colonial Bengal is proved by V. Raghavaiah, 'Tribal Revolts in Chronological Order : 1778 to 1971', in A. R. Desai (ed) *op. cit.* p. 23-27. Cf. notes 1 and 2 above.

১৪২. For example, L. Blum, *The End of the Old Order in Rural Europe*, Princeton University Press, 1978, pp. 332-357 ; Y. M. Berce, *Revoltes et revolutions dans l'Europe moderne, XVIe-XVIIIe siecle*, Paris, 1982, Ch. Tilly, 'Rural Collective Action in Modern Europe', in : J. Spielberg and S. Whiteford (eds.), *Forging Nations : A Comparative View of Rural Ferment and Revolt*, East Lansing : Michigan State University Press, 1976 p. 9-40.

১৪৩. ১৪১ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৪. Teodor Shanin, 'Peasantry as a Politieal Factor', in Teodor Shanin (ed.), *Peasants and Peasant Societies : Selected Readings*, Harmondsworth, 1973, p. 257.

১৪৫. The early revolts generally lacked leaders who were highly literate and motivated to explain the insurgency in terms that were readily understandable to outsiders. Obviously, it cannot be assumed that the peasants who participated in the Tebhaga and Naxalbari revolts held clearer views of their aims than those participating in earlier insurgency simply because their leadership was more articulate.

১৪৬. For the reason mentioned in note 145 above most of this resistance remains unreported unless it is collective and large-scale. One example is the ongoing 'undeclared war' against state encroachment in the Chittagong Hill Tracts district of Bangladesh. On this topic, see for example, M. Q. Zaman, 'Crisis in Chittagong Hill Tracts : Ethnicity

and Integration', *Economic and Political Weekly* (January 16, 1982), pp. 75-80.

১৪৭. Rajni Kothari, 'The Non-Party Political Process', *Economic and Political Weekly* (February 4, 1984), pp. 216-224.

মঈনুদ্দীন আহ্‌মদ খান

ফরায়েযী ও ওয়াহাবী আন্দোলন

বাংলাদেশের ইতিহাসে খৃষ্টীয় উনিশ শতকের অধ্যায়টি অত্যন্ত অন্ধকারময়, বিষাদপূর্ণ ও মর্মান্তিক। এই যুগের অসহায় গণমানুষের অফুরন্ত আর্থ-সামাজিক দুর্দশা তদানীন্তন বাংলাদেশে দখলদার পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী ইংরেজ বণিক শাসক গোষ্ঠীর শোষণ-মূলক প্রশাসনিক ও ব্যবসায়ী অপকৌশলের বিষময় ফলশ্রুতি বৈ আর কিছু ছিল না।

সুজলা, সুফলা, শষ্যশ্যামলা, নদী মেখলা ও গিরিকুন্ডলা সবুজের লীলা ক্ষেত্র এই পলিমাটির দেশে যুগে যুগে নানা জাতীয় মানব গোষ্ঠীর সমাগম হয়েছে। এদেশের স্নেহময়, আবেগ উদ্দীপ্ত, প্রাণচঞ্চল মানুষের সাথে সুখ-দুঃখ, জরা জীর্নতা, হাসি-তামাশা, আরাম আয়াশ, আহলাদ ও আনন্দ আত্মস্থ করে, নিত্ত নৈমিত্তিক ঝড় তুফানের অন্ধ ছোবল, প্রলয়ংকরী বন্যা, ভয়াল অরণ্য, সাপ, কুমীর, নরখাদক পশু, রোগ, শোক সব কিছুর সার্বক্ষণিক উপদ্রব ও উৎকন্ঠা হাসিমুখে উপেক্ষা করে, এদেশের বন-জঙ্গলে, হাওর-বিলে, মাঠে ঘাটে সবাই বসতি স্থাপন করেছে। চাষ বাস, ক্ষেত খামার ও আচরণ বিচরণের মাধ্যমে সুখ-দুঃখ সবার সাথে ভাগ করে নিয়ে, এদেশকে তারা করেছে সুন্দর, মনমুগ্ধকর, স্নেহ মমতা ও ভালবাসার আকর।

কিন্তু এত সব ঐশ্বর্য্য বণিক প্রবর ইংরেজের মনে দাগ কাটতে পারে নাই। তারা ব্যবসা নিয়ে এসেছিল এবং ব্যবসান্তে এদেশ থেকে প্রস্থান করেছে...রেখে গেছে আকন্ঠ শোষিত, রক্ত মাংসহীন অস্থি সর্বস্ব একটি দেশ ও একটি জাতি। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে যখন ওরা নিরেট ব্যবসা নিয়ে এদেশে আগমন করে, তখন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা চলন সই, বরং সমৃদ্ধির পথে প্রাগ্রসর ছিল। আর এরা যখন বিংশ শতাব্দীর মধ্যখানে থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে গেল, তখন বাংলাদেশকে আমরা দুনিয়ার সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত দেশ গুলির সর্ব নিম্ন স্তরে খুঁজে পাই।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এই অগ্রগতি ও অধঃগতির ফাঁক ও অসংগতির কারণ বিশ্লেষণের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরায়েযী ও ওহাবীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সঠিক রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে। এর জন্য প্রথমে এদেশে দখলদার ইংরেজদের কার্যকলাপ ও তার ফলশ্রুতির দিকে নজর দিতে হয়।

ইংরেজ শাসনের ভূমিকা

ইংরেজদের ১৯০ বছর (খৃঃ ১৭৫৭-১৯৪৭) বাংলাদেশে অবস্থান কালে, তারা এদেশের শাসন যন্ত্রে, রাজনীতি, অর্থনীতি শিক্ষানীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন সাধন করে।[১] এগুলির ফলশ্রুতিতে ইংরেজদের নব নির্মিত কলিকাতা শহরের নব্য হিন্দু চেতনার প্রতীক ইয়ং বেঙ্গল বা ইংগ-বংগ সমাজকে কেন্দ্র করে এক ধরনের "ইংরেজ সুলভ বাংগালী মানসিকতার" চত্বরে একটি নব বাংগালী সংস্কৃতি, তথা নব বাংগালী সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে।[২]

এই ইংগ-বংগ নবচেতনার মহা পুরোহিত ছিলেন, একজন এ্যাংলো পরতুগীজ যুবক হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। ইনি ইংগ-বংগ চেতনার চত্বরে নব্য ইউরোপীয় সভ্যতার বীজ বপন করেন।[৩] এই নব্য ইউরোপীয় ভাবধারার সার কথা ছিল—সমকালীন পাশ্চাত্য খৃষ্ট ধর্মের কুপমন্ডুকতায় নিবদ্ধ, মানুষের দৃষ্টিভংগীকে মুক্ত করে, নব নূতন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের প্রশস্ত চত্বরে উদ্ভাবিত "প্রাকৃতিক নিয়মের" দিকে তাদের চিন্তা ভাবনাকে পরিচালিত করা এবং এরই মাধ্যমে মানুষের কর্ম তৎপরতাকে মানব কল্যাণ মুখী করা।

কিন্তু খৃষ্ট ধর্মের কুপমন্ডুকতা খৃষ্টানদের আচার ব্যবহারের অভিব্যক্তি ছিল; খৃস্ট ধর্মের প্রসুত ছিল না। খৃষ্ট্র ধর্মের মর্মবানী ছিল একক স্রষ্টাবাদে বিশ্বাস ও বিশ্বজগত এবং প্রকৃতিকে সৃষ্টি রূপে জ্ঞান করা। বলা বাহুল্য যে, ইহুদী ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম মূলতঃ এই একই সূত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু পাশ্চাত্য খৃষ্ট ধর্মের কুপমন্ডুকতার নির্বাসনের সাথে নব্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক চেতনার দাপটে খৃস্ট ধর্মের স্রষ্টাবাদও বিসর্জন-প্রাপ্ত হয়।

আবার ভারতীয় আর্যবাদও একক ব্রহ্ম, তথা একক স্রষ্টা বাদে বিশ্বাসী ছিল। অতএব, নব্য বাংগালী চেতনায় পাশ্চাত্যের প্রকৃতিবাদের দাপট খাটি আর্যবাদের প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায়কে বিক্ষুব্ধ করেছিল বলে শোনা যায়। তিনি নাকি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যে, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক সৃষ্টাকে বাদ দিয়ে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির

রহস্য উদ্ঘাটনে করতে ব্রতী হয়েছে।

কিন্তু এদেশের ব্রহ্মবাদ ও সাধারণ হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে অনেক তফাৎ বিদ্যমান। হিন্দু পূজা পার্বনের সাথে সংশ্লিষ্ট কূপমন্ডুকতাকে বাদ দিলে, শৈব বৈষ্ণববাদ এবং তন্ত্র মন্ত্রে বিশ্বাসী সনাতন হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস সূত্রগত ভাবে প্রকৃতিবাদের অনুকূল। তাই কথিত আছে যে, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ আধুনিক সংস্কারবাদীরা আর্য ধর্মের স্রষ্টাদের বদলে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন প্রকৃতিবাদকে গ্রহণ করেন এবং নব্য পাশ্চাত্য চেতনার ধ্বজাধারী খৃষ্টান সাহিত্যিকেরা যেমন রিনেসাঁর উৎপ্রাণতায় গ্রীক-রোমান দেব-দেবীর উপাখ্যান, উপমা ও রূপকথা, সাহিত্য এবং শিল্প কলার ক্ষেত্রে বহুল প্রচলন করে, তেমনি আধুনিকতার ধ্বজাধারী বাংগালী হিন্দুরাও প্রকৃতিবাদের চত্বরে সনাতন হিন্দু বিশ্বাসের সাথে সংগতি-পূর্ণ পৌত্তলিকতাপ্রবণ ও দেব-দেবীর অর্চনা ভাবাপন্ন চিন্তাধারার বহুল প্রচলন করে নব্য বাংলার কাব্য চর্চা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে নতুন আধুনিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে তাই কালক্রমে বঙ্কিম চন্দ্র,[৪] শরৎ চন্দ্র ও বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের লেখায় পূর্ণতা লাভ করে।[৫]

প্রনিধান যোগ্য যে, এই নব্য বংগালী সংস্কৃতি নব্য ইউরোপীয় সভ্যতার সাথে প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদের চত্বরে একাত্মতা পোষণ করছিল বটে, কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা মূলতঃ বিজ্ঞান কেন্দ্রিক ছিল এবং কাব্য চর্চা ছিল এর উপজীব্য; পক্ষান্তরে আধুনিক বাংগালী সংস্কৃতির রূপায়ন ছিল কাব্য কেন্দ্রিক এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, বরঞ্চ নানা রংবেরঙ্গের পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদই ছিল এর উপজীব্য। পাশ্চাত্যে কাব্য চর্চা বিজ্ঞানের উপর ভর করে দিন দিন ফ্যাক্ট বা তথ্য মুখিন হয়েছে। তদস্হলে আধুনিক বাংগালী কাব্য চর্চা নানা দার্শনিক মতবাদ ও শিল্পকলার ঐতিহ্যের উপর ভর করে দিন দিন কল্পনা বা ফিকশন মুখিন হয়েছে। অতএব, যতই সৃজনশীল, প্রাণবন্ত ও জোরদার হোক না কেন, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনায় আধুনিক বাঙ্গালী সংস্কৃতি বিজ্ঞান চর্চার বদলে কল্পনা ও মতবাদ সর্বস্ব একটি মহা বিভ্রান্তিকর প্রগিতবাদে পর্যবসিত হয়। হিস্ট্রী অব বেংগল, দ্বিতীয় খন্ডের সম্পাদক স্যার যদুনাথ সরকার ঊনবিংশ শতাব্দীর চমকপ্রদ আধুনিক বাঙ্গালী প্রগতিকে একটি ধার করা আলোর প্রদীপ্ত উজ্জ্বল-তার সাথে তুলনা করেছেন।[৬] এরূপ একটি বিভ্রান্তিকর সভ্যতা ইংরেজরা বাংলাদেশে ছেড়ে গেছে, যাতে সভ্য মানুষের আচরণের সাথে রাজনীতির অর্থনীতির এমনকি নৈতিকতার কোন সংগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।[৭]

দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ববর্তী দেশীয় শিক্ষা

ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে আধুনিক প্রকৃতিবাদে ও মানবতা বাদে উদ্বুদ্ধ নব্য প্রগতিবাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের আধুনিক বা তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভাব ধারণার সাথে বিরোধ ভাবাপন্নতা সৃষ্টি করে। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মই যেখানে শেষ কথা এবং মানবতা বা মহামানবতাই যেখানে চূড়ান্ত সত্য বলে ধর্তব্য, তাতে সর্ব ক্ষমতাবান একক স্রষ্টায় বিশ্বাসী ইসলামী দৃষ্টিভংগীর সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হতে বাধ্য। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে তা মুসলমানদেরকে আধুনিক শিক্ষা-গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।[৮] ফলে, একদিকে মুসলমানেরা প্রচলিত আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে যায় এবং অন্যদিকে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠির সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ ইংরেজরা বাংলাদেশ দখলের পর থেকে এদেশের বহির্বাণিজ্য নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখে এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য তাদের মারোয়ারী গোমস্তাদের বা এজেন্টদের মাধ্যমে পরিচালনা করে। এদের সাথে অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দু গোমস্তাও সামিল ছিল। এই গোমস্তারা দেশীয় বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে, হাট বাজারের জন্য সম্ভার জোর জবরদস্তি স্বল্প মূল্যে একচেটিয়া খরিদ ও ও চড়া দামে বিক্রি করে এবং দাদন বা অগ্রিম মূল্য গ্রহণে চাষীদেরকে বাধ্য করে, স্বল্পমূল্যে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য হাত করে ও অন্যান্য অপকৌশল প্রয়োগ করে নিজেদেরকে তড়িঘড়ি অবস্থাপন্ন এবং দেশ ও দশকে উচ্ছন্ন করে তোলে।[৯]

পরবর্তী কালে ১৭৯৩ খৃীস্টাব্দের জমিদারী প্রথা প্রবর্তন করে, ইংরেজরা এদেশে ইংলন্ডের সামন্তবাদী ব্যারন প্রথার ধাঁচে এক নব সামন্তবাদের প্রচলন করে নূতন পয়সাওয়ালা গোমস্তাদেরকে জমিদারিত্ব অর্জন করার সুযোগ করে দেয়। আর এদের মাধ্যমে একটি পোষ্য লেজুড় ও ইংরেজদের তোষামেদকারী শ্রেণী গড়ে তোলে।

চতুর্থতঃ এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পাঁচ শত বছর পূর্ব থেকে এখানে ইসলামী ধাঁচের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। এর উর্ধ ভাগে ছিল বিচার বিভাগ, যা অন্যান্য বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এই বিভাগ কাযীদের মাধ্যমে আদালতের চত্বরে আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মোতাবেক ন্যায়তঃ বিচার করত। এতে বাদী-বিবাদী সরাসরি কাযীর আদালতে তাদের ফরিয়াদ ও জওয়াব এবং সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করত। এতে উকিল মোক্তার অথবা বহির্ভূত কোন লোকের দখল ছিল না। এমনকি এতে আমীর ওমরাদের অথবা

স্বয়ং শাসনকর্তারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না। কোন প্রকার আইনের নামে অথবা আদেশ নির্দেশের দোহাই দিয়ে অন্যায় বিচার করা চলত না। তদস্থলে ইংরেজরা রোমান ধাঁচের আইনের শাসন প্রবর্তন করে উকিল, মোক্তার ও জুরীর আবেদন নিবেদন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং মতামতের ভিত্তিতে কোর্টের চত্বরে বিচার ব্যবস্থা চালু করে। এহেন বিচার ব্যবস্থা এদেশের রীতিনীতি ও মননশীলতার সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায়, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কোর্টের বিচার পক্ষপাত দুষ্ট মিথ্যা সাক্ষ্যের আকর ও দুর্নীতি পরায়নতার লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চমতঃ ইসলামের দৃষ্টিতে আসমান জমিনের সব কিছুর হাকীকী মালিক আল্লাহ। মানুষের মালিকানা মেজাযী অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত বা ব্যবহারিক। এই দৃষ্টিভংগীর প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলমানেরা এদেশের ভূমি ব্যবস্থা রায়তী মালিকানা ভিত্তিতে "বন্দোবস্তি" অর্থাৎ ইজারা বা লীজ এর নামে কায়েম করে। তাই ইংরেজদের পূর্বযুগে এদেশের ভূমি মালিকানা ছিল সাময়িক ও ব্যবহারিক তথা চাষ ও দখল ভিত্তিক। এই ব্যবস্থায় জমির রাজস্বের তালিকা রায়ত বা চাষী ভিত্তিক পদ্ধতিতে সরকারেই তৈরী করত, সরকারী খাস মহলে তা আদায় করা হত এবং প্রতি এলাকায় আমীন বা ক্ষেত্র কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিল, যারা নিয়মিত ভাবে প্রতি দশ বছরে জমি জরীপ করে ও প্রয়োজন হলে সাময়িক ভাবে জরীপ করে জমির প্রকৃত চাষী ও দখলদারের নামে জমির বন্দো-বস্তি সংশোধন করে দিত, যাতে মুসলিম পূর্বযুগের সামন্তবাদী বর্গা প্রথা ও অন্যান্য দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

ইংরেজদের জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী চাষী মালি-কানা[১০] প্রথা বানচাল হয়ে পড়ে এবং ব্যবসায়ী মানসিকতা সম্পন্ন মারওয়ারী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সামন্তবাদী বর্গা প্রথা পুনরায় চালু হয়। আবার জমিদারী প্রথার এমন কিছু ধারা সম্বলিত হয়, যেগুলির বদৌলতে, ছলে বলে ও কৌশলে—পক্ষপাতমূলক বিচার ব্যবস্থা ও দুর্নীতি পরায়ন প্রশাসনের সহায়তায় ভূমি-মালিকানার ছক কৃষকদের মাথা ডিংগিয়ে জমিদারদের সান্নিধ্যে বর্তায়।[১১] এই প্রক্রিয়ার রহস্য নিহিত ছিল রোমান আইনের শুভংকরী ফাঁক, তথা" প্রিজামশন অব ল", বা আইন ধর্তব্য বাদে। এই প্রথা প্রয়োগ করে বন্দোবস্তি মূলে মালিকানা ধর্তব্য হয়; অর্থাৎ যেখানে বন্দোবস্তি ছিল একটি সাময়িক ইজারা, যা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বন্দোবস্তিকারী প্রতি বছর চাষাবাদ করতে বাধ্য থাকত এবং তিন বছর বন্দোবস্তিকৃত জমি "খিনা" বা অনাবাদী থাকলে, তা সরকার বাজেয়াপ্ত করে চাষ করার জন্য অন্যকে দিয়ে দিত অথবা অন্য

কেউর দখলে ও চাষে পাওয়া গেলে পূর্ব বন্দোবস্তিকারীর নাম কেটে দখলদারের নামে বন্দোবস্তি দেওয়া হত। তদস্থলে বন্দোবস্তি মূলে মালিকানার বদৌলতে তা স্থায়ী মালিকানায় পর্যবসিত হয় এবং এই শুভংকরীর মাধ্যমে এদেশে ইউরোপীয় ধাঁচের রিয়্যাল এস্টেট অর্থাৎ প্রকৃত মালিকানা প্রবর্তন করা হয়। জমির এহেন মালিকানা প্রথা ছিল সমূগ্র-গত ভাবে ইসলামী শরীয়তের বিরোধী।

তদুপরি জমিদারী প্রথার মাধ্যমে জমিদারকে প্রথমতঃ প্রজার উপর কর বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ চার বছরের কর অনাদায়ে প্রজার বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ করে জমি খাস করে জমিদারের মালিকানায় গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয়তঃ ক্রোক আইনের মাধ্যমে প্রজাকে হয়-রাণী ও প্রজার সর্বস্ব লুট করার ক্ষমতা জমিদারের হাতে অর্পন করা হয়।

ইংরেজ বণিক ও কর্মকর্তাদের গোমস্তারা যেমন ইংরেজদের নিরাপত্তায় এদেশের হাটবাজার ও ব্যবসা বাণিজ্য ইতিপূর্বে পঙ্গু করে দিয়েছিল, তেমনি এই নূতন মারোয়ারী জমিদাররা কিছু দিনের মধ্যেই প্রজাদেরকে ফতুর করে দেয়।[১২]

ষষ্ঠতঃ প্রজাদের দুঃখের উপর দুঃখ। এই সম্রাজ্যবাদের লেজুর সামন্তবাদী জমিদারদের সাথে অচিরেই আর একদল শোষণকারীর সংযোগ ঘটে। তারা ছিল, উপনিবেশবাদী ইংরেজ নীলকর কুঠিয়াল।[১৩]

এরা একটি জঘন্য ধরনের পুঁজিবাদী সামন্তবাদের প্রথা চালু করে চাষীদেরকে ইউরোপীয় রোমান সাম্রাজ্যের অভিশপ্ত সার্ফডমের সাথে তুলনীয় "ভূমি দাসে" পরিণত করে। নিজ নিজ নীল কুঠি এলাকায় নীল চাষের জন্য চাষীদের জমি বাছাই করে তাতে নীল চাষ করতে চাষীদেরকে বাধ্য করার ক্ষমতা এদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। চাষীদের নীল চাষে মূলধন জোগান দেওয়ার জন্য এরা চাষীদেরকে দাদন বা অগ্রিম টাকা নিতে বাধ্য করত এবং নীলের মূল্য প্রদান করার সময় সুদে-আসলে তা আদায় করে নিত/এদের হাতে চাষীদের হয়রানি ও খুন খারাবীর কোন সীমা ছিল না। ইংরেজ জজ ও জুরীর পক্ষপাতিত্বে খুনের অভিযোগ থেকেও এরা বেকসুর খালাস পেত।[১৪]

সপ্তমতঃ পূর্ববর্তী মুসলিম শাসন যুগে ধর্ম ও নৈতিকার দৃষ্টিতে যেমন বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহকে বিশ্ব জোড়া ও একচ্ছত্র এবং একক প্রভু, প্রকৃত মালিক, প্রকৃতির নিয়ন্তা, মানব, দানব পশুপক্ষী সব কিছুর রিযিক্‌দাতা হিসাবে স্বীকার করা হত, তেমনি বিবেক ও আইনের চোখে মানুষকে পরস্পর সমান বলে জ্ঞান করা হত। এরূপ আল্লাহর প্রভূত্ব ও মানুষের সমতার নিরীখে স্বাধীন বিচারক মন্ডলী কাযীদের তীক্ষ্ম দৃষ্টির মধ্যে,

প্রশাসক মন্ডলী (যাদেরকে মোঘল আমলে—দপ্তর কর্মকর্তা বা মনসবদার বলা হত) নিজ নিজ এলাকায় ব্যক্তিগত দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করত।[১৫]

তদস্থলে ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে, কোম্পানী আমলে, কোর্ট কাচারী ও সরকারী দপ্তরে ঘোষণা করা হত যে, "দেশ আল্লাহর, রাজত্ব দিল্লীর বাদশার ও প্রশাসন কোম্পানী বাহাদুরের।" প্রশাসনের কন্দরে এরূপ বিবর্তন মুখী টানা-হেঁচড়ার মুখে সর্ব প্রকার অপবাদ অভিযোগ থেকে ইংরেজ কর্মর্তাদের রেহাই দেওয়ার জন্য সরকারী কর্মকাণ্ডের সর্ববিধ দায়িত্ব, ব্যক্তিগত স্কন্ধ থেকে ফাইলের আদেশ-নিষেধের আইন ও রুলগত বৈধতার চত্বরে পরিবর্তিত করা হয়। এই অবস্থায় এদেশীয় ইংরেজ প্রশাসনে সরকারী কর্মকাণ্ডে কোন স্তরে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব চিহ্নিত করার পরিসর সম্পূর্ণরূপে বানচাল হয়ে পড়ে। এতে দুর্নীতি, ঘুষ, পক্ষপাতিত্ব, দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ ইত্যাদিতে দশ ও দেশ উচ্ছন্ন গেলেও, কর্মকর্তাদের শিষ্টাচার পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে।

অষ্টমতঃ ইংরেজ প্রশাসন সুদকে আইন সংগত করে (যা ইসলামী শরীয়তে কঠোর ভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ ছিল) এদেশে, দেশীয় মহাজনী পুঁজিবাদ অর্থাৎ ইউজারী এবং পাশ্চাত্যের শিল্প ব্যবসায়ী পুঁজিবাদের গোড়া পত্তন করে। ফলে এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য কার্টেল ও মনপুলীতে নিমজ্জিত হয়।[১৬]

নবমতঃ ইংরেজ প্রশাসন এদেশে কন্ট্রাক্টরী ব্যবস্থা চালু করে কুলি মজুরদের উপর কর্তৃত্বশালী ও ইংরেজের পূজারী একটি মধ্যবিত্ত টাউট, লাঠিয়াল ও গুণ্ডা শ্রেণীর সৃষ্টি করে এবং এদের সাহায্যে ইংরেজ সাহেবেরা স্বাধীনচেতা স্থানীয় লোকদের শায়েস্তা করে।[১৭]

এরূপ একটি মহা-বিভ্রাট ও বিপর্যয়ের মুখে গণ মানুষের যত্র তত্র ক্ষুদ্রবৃহৎ মৃত্যুপণ প্রতিরোধের প্রক্রিয়ায় যথা, ফকীর বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, উপজাতীয় বিদ্রোহ ইত্যাদির মধ্যে ফরায়েযী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল অন্যতম।

পটভূমি

ফরায়েযী আন্দোলন প্রকারান্তরে ওয়াহাবী আন্দোলনেরই একটি প্রশাখা। আবার ওয়াহাবী কথাটি একদিকে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং অন্যদিকে ওয়াহাবী শব্দটির উৎপত্তি ও প্রয়োগ অপবাদ মূলক। অতএব, বিষয়টি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য যৎকিঞ্চিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের নাম থেকে ওয়াহ্হাবী কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। অতএব, এই আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কেউ কেউ একে মুহাম্মদী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু মুহাম্মদ ইবেন আবদুল ওয়াহ্হাব নিজে একে তওহীদের অর্থাৎ একত্ববাদের আন্দোলন ও মুওয়াহ্হিদীন অর্থাৎ এককত্ববাদীদের আন্দোলন নামে প্রচার করেছেন। বস্তুতঃ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের নাম থেকে আরবী কায়দা মতে "ওয়াহ্হাবী" শব্দটি বের হয় না—"মুহাম্মদী" অথবা "ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবী" হতে পারে। তাই "ওয়াহ্হাবী" শব্দটি কোন আরব গোষ্ঠির দ্বারা নিঃসৃত হওয়া সন্দেহজনক।

এ বিষয়ে প্রথম লিখিত তথ্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ কথাটি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবকে অপদস্ত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ও তুর্কী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজেরাই বের করেছে এবং বহুল প্রচারের মাধ্যমে এমন জনপ্রিয় করে তুলেছে যে, তা পরবর্তী কালে এমনকি বর্তমানেও অনিচ্ছাকৃত ভাবে সবাই সাধারণ বোধগম্যতার জন্য ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে।[১৮] যেহেতু "ওয়াহ্হাবী" কথাটি এই আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী ইংরেজ ও তুর্কীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এদের মতবাদ খণ্ডন করার মানসে ও এদেরকে অপবাদ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছে, তাই এই শব্দটি সংস্কার আন্দোলনকারী কোন দলের নিকটই গ্রহণীয় নয়। তারা তাদের আন্দোলনকে উপস্থাপন করার জন্য তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত নাম ব্যবহার করে, যেমন মুয়াহ্হিদীন বা মুওয়াহহিদুন আন্দোলন, সনুসী আন্দোলন, সলফী আন্দোলন, ফুলানী আন্দোলন, শাহ ওয়ালীউল্লাহী বা মুজাহিদীন আন্দোলন, আহলে হাদীস আন্দোলন, ফরায়েযী আন্দোলন এবং ইন্দোনেশীয় পাদুরী আন্দোলন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা এদের একাত্মতা বুঝাবার জন্য এবং একই সাথে সবগুলিতে নির্বাসন দেওয়ার জন্য এগুলিকে একই সাথে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে।[১৯]

তদুপরি উল্লেখযোগ্য যে, ওয়াহ্হাবী কথাটি ইংরেজীতে উচ্চারণ কটু হওয়ার কারণে হান্টার সাহেব সরলীকরণ করে একে "ওয়াহাবীতে" রূপায়িত করেন।[২০] এবং এই ইংরেজী সূত্র অনুসরণ করে বাংলায়ও সরলীকৃত রূপে "ওয়াহাবী" কথাটির বহুল প্রচলন ঘটে।

একজন আধুনিক আরব ঐতিহাসিক আহমদ মুস্তাফা আবু হাকীমা বলেনঃ "সংক্ষেপে বলতে গেলে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের এককত্ববাদের ভিত্তি ছিল অনমনীয় ও অলংঘনীয় আল্লাহর একত্বের

ধারণা। শেখ মুহাম্মদের এই ধর্মনীতিতে কোন নূতনত্ব ছিল না অথবা তিনি এতে ঐ রূপ কিছু করার প্রত্যাশাও করেন নাই। একজন সংস্কারক হিসাবে, শেখ মুহাম্মদ তার সহচর লোকজনকে পাপ পঙ্কিল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যখন তারা আল-কুরআনের প্রদর্শিত পথ থেকে সরে গিয়ে মুসলিম ধর্মনীতি থেকে তাঁর ব্যাখ্যা অনুয়ায়ী বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। তিনি তাদেরকে আল্লাহর বাণী, আল-কুরআনের নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন ও রসুলের (ছঃ) এবং তাঁর পুণ্যবান সহচরদের নির্দেশ কার্যকরী করার দিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। শেখ মুহাম্মদের ধর্ম প্রচারের এটাই সারমর্ম ছিল"।[২১]

আরো গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে, প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের উদ্দেশ্য ছিল-মুসলিম সমাজকে অন্যায় অনাচার, বহির্প্রভাব, অনৈসলামিক রছম-রেওয়াজ, আচার ব্যবহার এবং ধর্মের নামে কুপমণ্ডুকতা, বিশেষতঃ সর্বপ্রকার শিরিক ও বিদাআত থেকে মুক্ত করে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে পরিশোধন ও কলুষ মুক্ত করে, মুসলমানদেরকে আল্লাহর কালাম, আল-কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক ও রসুলের (ছঃ) সুন্নাত অনুসারে এবং প্রথম যুগের পুণ্যবান মুসলিমদের[২২] জীবন যাত্রার ধাচে জীবন যাপন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। সামাজিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে তাঁর পরিশোধন নীতির চারটি স্তর ছিল, যথা—ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন। আরো সরল কথায় বলা যায়—একমাত্র প্রভু আল্লাহ ছাড়া আর কিছু পুজার যোগ্য নয়; আল-কুরআনের নির্দেশ ও রসুলের (ছঃ) কর্মপন্হা বা সুন্নতই যথার্থ ইসলাম ধর্ম; এবং জীবনের সর্বস্তরে আল-কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর একান্ত কর্তব্য।

প্রকাশ্যতঃ এটা ছিল ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী সংস্কার আন্দোলন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব একজন হাম্বলী মাযহাবের ধ্বজাধারী ছিলেন এবং তিনি এই পন্হায় তাঁর পুর্বসুরী হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে হানবল এবং হাম্বলী মযহাবের ইমাম ইবনে তাই মিয়া ও ইবনে কাইয়ুম জৌমিয়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। উপরে উল্লিখিত ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী সংস্কার আন্দোলন গুলি উপরোক্ত নীতিগুলির ধারক ও বাহক ছিল। উপরোক্ত সংস্কার নীতিগুলির বিষয়ে একাত্মতা পোষণ করার কারণে বিরুদ্ধবাদীরা এগুলিকে সাধারণ ভাবে ও একত্রে "ওয়াহ্হাবী" বলে চিহ্নিত করে। আদতেও এগুলির অধিকাংশ মুওয়াহ্হিদুন আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল, যদিও এগুলির প্রত্যেকটির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান ছিল। উদাহরণ

স্বরূপ ফরায়েযী আন্দোলনকে বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশের ফরায়েযী আন্দোলনের মূলনীতি গুলি আরবের মুওয়াহ্‌হিদুন আন্দোলনের অনুসরণে নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু মুওয়াহ্‌হিদুন আন্দোলন হাম্বলী ভাবাপন্ন হওয়ায় হুবহু হাদিছ অনুসরণের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিল; পক্ষান্তরে ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তুল্লাহ হানফী ভাবাপন্ন হওয়ার দরুণ ফিকাহ শাস্ত্রের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সরল ভাষায়, মুওয়াহ্‌হিদুনের কথা হলঃ রসুলুল্লাহকে যে ভাবে যে কাজ করতে দেখা গেছে সে ভাবে সে কাজ সম্পাদন কর। পক্ষান্তরে ফরায়েযীদের কথা ছিলঃ রসুলুল্লাহ্‌র কর্মকান্ডের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করে হানফী ইমামগণ যে ভাবে ইসলামের সরল ও সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন তদনুযায়ী আমল কর। তদুপরি মুওয়াহ্‌হিদ পন্থীরা সুফী-বাদকে ইসলামের আদি যুগ বহির্ভূত ঐতিহ্য হিসাবে গণ্য করে তা বিদআতের নামে বর্জন করে; পক্ষান্তরে ফরায়েযীরা সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য সুফীদের জিকির পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় মনে করত।

আবার ফরায়েযী আন্দোলনের উৎসমূল আরবের মুওয়াহ্‌হিদুন আন্দোলনের চত্বরে নিবিষ্ট ছিল; কিন্তু "ভারতীয় ওয়াহাবী" বলে বিরুদ্ধবাদী লেখকগণ ও সাধারণ ভাবে হান্টার সাহেব এবং ইসলামী এনসাইক্লোপিডিয়ার অনুকরণে ইংরেজী লেখকেরা যাদের চিহ্নিত করেছে, যথা—তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া ও আহলে হাদিস, তাদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল ভিন্নতরঃ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাবের স্থলে দিল্লীর শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহ্‌লবী।

স্মর্তব্য যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রায় একই সময়ে খৃষ্টীয় ১৭০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জনের জন্ম হয়েছিল পূর্ব আরবের নজদ প্রদেশে আর দ্বিতীয় জনের জন্ম হয়েছিল দিল্লী নগরীতে। প্রথমজন তাঁর জন্মস্থান নজদে শিক্ষা-দীক্ষা আরম্ভ করেন এবং পরে বসরা, মসুল, দামেস্ক, মক্কা নগরী ও ইরানের কুম শহরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুওয়াহ্‌হীদ আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। অন্য দিকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ নিজ জন্ম স্থান দিল্লীতে তাঁর পিতা শাহ্ আবদুর রহীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে তাতে হাদিছ শাস্ত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি হজ্জ সমাপন ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। তথায় কিঞ্চিত অধিক এক বছর কাল অবস্থান করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুহাম্মদ

ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের মতই মুসলিম সমাজ থেকে শিরিক ও বিদ্আতের মূল উৎপাটন করার উদ্দেশ্যে তাঁর তওহীদ বা এককত্ববাদী সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ ইমাম মালিকের (রাঃ) হাদীছ সংকলন "মুয়াত্তা" গ্রন্থ গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন এবং "মুসওয়া" ও "মুসফ্ফা" নামে এর দুইটি ভাষ্যও রচনা করেন। এই সূত্রে তিনি মুহাদ্দিহিনদের হাদিছ ভাবাপন্ন চিন্তাধারার দ্বারা সমধিক অনুপ্রাণিত হন। এই পন্থা হাম্বলী ভাবাপন্ন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের চিন্তাধারার নিকটবর্তী ছিল। তদপরি খৃীস্টীয় আঠারো শতকের সমকালীন মক্কা নগরীর উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে ইবনে তাইমিয়ার কঠোর এককত্ববাদী সংস্কার চিন্তাধারার প্রভাব গভীর রেখাপাত করেছিল বলে মনে হয়। যার দ্বারা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব ও শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ সমভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। প্রনিধানযোগ্য যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনার নাম "কিতাব আল-তওহীদ" অর্থাৎ এককত্ববাদের গ্রন্থ এবং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা "তুহফতুল মুওয়াহ্হিদীন" অর্থাৎ এককত্ববাদীদের সওগাত। এই গ্রন্থ দু'টিতে উভয়ের আপোসহীন এককত্ব-বাদী চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের সাথে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর কখনও সাক্ষাৎকার ঘটেনি; তাঁদের প্রথম জন হাম্বলী মযহাব পন্থী ছিলেন ও দ্বিতীয় জন হানফী মতাবলম্বী ছিলেন. এবং প্রথমজন সুফীবাদকে ইসলামে বহির্প্রভাব বিবেচনায় বর্জন করেন, ও দ্বিতীয়জন তাঁর সংস্কারের পন্থায় সুফীবাদকে অতি উচ্চে স্হান প্রদান করেন।[২৩]

এদিক থেকে লক্ষ্যণীয় যে, তথাকথিত ভারতীয় ওয়াহ্হাবী বাদের প্রবর্তক সৈয়দ আহামদ শহীদ ছিলেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্ আজিজের আধ্যাত্মিক শিষ্য এবং শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ পন্হী ছিলেন। তাঁর সাথে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের মতবাদের কোন সম্পর্ক ছিলনা অথবা তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্বে আরবের মুওয়াহ্হিদুনদের সংস্পর্শেও আসেন নাই। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের নামও ভিন্ন। সৈয়দ আহমদ শহীদ তার সংস্কার আন্দোলনকে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া, অর্থাৎ মুহাম্মদ (ছঃ) এর আদি পন্হা, বলে আখ্যায়িত করেন। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ শত্রুদের বিরুদ্ধে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়ার কঠোর সংগ্রামের কারণে এ আন্দোলন জিহাদ বা মুজাহিদীন আন্দোলন নামে খ্যাত হয়। ভারতীয়

আহলে হাদিছ আন্দোলনও এর একটি প্রশাখা মাত্র। অতএব, তরীকায়ে মাহাম্মদীয়া ও আহলে হাদীস আন্দোলনকে নাম ও উৎপত্তির দিক দিয়ে ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা কিছুতেই সংগত নয়, যদিও এই আন্দোলন গুলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রায় অভিন্ন ছিল।[২৪]

আমাদের শিরোনামায় "ওয়াহাবী" আন্দোলন বলতে ভারতীয় "তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া" আন্দোলনকেই বিশেষ ভাবে বুঝানো হয়েছে। আদতে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়ার তিন প্রস্থ ঢেউ বাংলাদেশকে গভীর-ভাবে দোলা দিয়ে গেছে। প্রথমতঃ সৈয়দ আহমদ শহীদের ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমনকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে একটি অভাবনীয় ও বিস্ময়কর ধর্মীয় চেতনার উত্তাল তরঙ্গ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বিপুল সাড়া জাগায়। বাঙ্গালী মুসলমানেরা সৈয়দ আহমদ শহীদকে আখেরী যমানার মেহদী বলে বিবেচনা করে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশের সর্বদিক থেকে জন স্রোতের মত কলকাতার দিকে ছুটে চলে।

দ্বিতীয় দফায় সৈয়দ নিছার আলী ওরফে তিতুমীর সৈয়দ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ১৮২৭ খৃীস্টাব্দের দিকে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন। তা শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে।

তৃতীয় দফায় ১৮৩২ খৃীস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শহীদের এবং তিতুমীরের ইন্তেকালের অব্যবহিত পর থেকে পাটনার মৌলানা এনায়েত আলীর নেতৃত্বে উত্তর বাংলা ও পশ্চিম বাংলার কিয়দংশে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটে, যা শেষ পর্যন্ত "আহলে হাদীছ" আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। স্মর্তব্য যে মৌলানা এনায়েত আলী ও তার সঙ্গীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার বাঙ্গালী মুসলমান বিদেশী দখলদার ইংরেজ ও তাদের দোসের পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বাঁকা পথে প্রায় তিন হাজার মাইল পায়ে হেটে সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার, ময়দান, এমনকি ছিতান্নার যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হয় এবং ইসলামের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

এই পরিচ্ছেদের উপরোক্ত শিরোনামায় আমরা বিশেষতঃ ফরায়েযী ও তরীকায়ে মুহাম্মদীয়ার উপরোক্ত সংস্কার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনাবলী সংক্ষেপে পর্যা-লোচনা করব।

ফরায়েযী আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, পরিধি ও বিকাশ।

ফরায়েযী আন্দোলন মূলতঃ একটি ধর্মীয় আন্দোলন ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম অন্যান্য প্রচলিত ধর্মগুলির মত সাধারণ ভাবে কেবল মানুষের ইহ-পরজাগতিক আশা, আকাঙ্খা ও সখের প্রত্যাশী নয়। বরং বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের পারস্পরিক আচরণ বিচরণ, লেন দেন, কার্য্য কলাপ এমনকি কথা বার্তার কল্যাণমুখী, সুসংযত, জুলুম বিবর্জিত বা শোষন-হীন ও ন্যায়নিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে ইহ জাগতিক ও পরজাগতিক সুখ অর্জনে ব্রতী হয়। অতএব, ইসলামী পুনরুজ্জীবন মূলক আন্দোলন গুলি প্রাথমিক ভাবে মানুষের বাস্তব জীবনকে আয়াস ও বাহুল্য মুক্ত করে সুশৃংখল, সুসংযত ও সুসংহত করার প্রয়াস পায়। অনুরূপ ভাবে ফরায়েযী আন্দোলনও শিরিক বিদআত ও আয়াস আড়ম্বর থেকে মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনকে মুক্ত করে একক আল্লাহর ইবাদত বা আরাধনার দিকে মানুষকে আমন্ত্রন জানায় এবং কর্তব্য সাধনে বাস্তবতার ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন ও রসুলের (ছঃ) সুন্নাহর অনুশাসন বহির্ভূত, পরবর্তীকালের আবিষ্কৃত আচার ব্যবহার অথবা অন্যান্য ধর্ম ও জীবন নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত রছম-রেওয়াজ পরিহার করে ফরজ বা অবশ্য করণীয় কর্তব্যগুলি প্রথমে সমাধা করার প্রয়োজনীয়তার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন করে।

ফরায়েযী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে সহজ সরল ইস-লামের চত্বরে পুনর্বাসিত করা, যাতে অবশ্য করণীয় কর্তব্য গুলি সমাধা করতে তারা তাদের সর্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং বাহুল্য বর্জন করে। এক কথায় ফরায়েযীরা বলতে চেয়েছিল যে, প্রধান কর্তব্যগুলি প্রথমে সম্পাদন কর। প্রধান কর্তব্যগুলির প্রতি অবহেলা করে, অন্যান্য সামাজিক আচার ব্যবহারে ব্যপৃত হয়ে নিজের মুসলমানিত্ব প্রমান করার চেষ্টা করা অথবা পুণ্য অর্জন করতে যত্নবান হওয়ার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নাই। অতএব, ফরয কর্তব্যগুলি, যথা—ঈমান, সালাত, যাকাত, সওম, হজ্জ সম্পাদন করার দিকে প্রথমে নজর দাও। ফরয কাজ বাদ দিয়ে চুট্টি, পুট্টি, ফাতেহা, ওরছ ও অন্যান্য আড়ম্বরপূর্ণ রছম রেওয়াজ উদযাপন করা অনুচিত। উপকারহীন, ইসলাম বিগর্হিত, বরং ধর্মের নামে নব আবিস্কৃত রছম রেওয়াজে ব্যাপৃত হওয়া বিদআত এবং পাপের উৎস। ফরয অর্থাৎ প্রথম কাজ প্রথমে কর—এই ছিল তাদের শ্লোগান। তাই তাদের নাম ফরায়েযী।[২৫]

ফরায়েযী আন্দোলনের ভৌগোলিক আয়তনের পরিধি ছিল পূর্ব

বাংলা ও আসাম। বিশেষতঃ ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা ও কুমিল্লার চত্বরে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাই ফরায়েযী আন্দোলন ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে একটি খালিছ বাংলাদেশী ইসলামী সংস্কার আন্দোলন।[২৬]

ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাজী শরীয়ত উল্লাহ। তিনি তদানিন্তন ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমায় ১৭৮১ খৃীস্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন। শৈশবেই তার মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। ৮ বছর বয়সে তাঁর পিতা আব্দুল জলীল তালুকদারও ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তিনি তাঁর চাচা আজীমুদ্দীন তালুকদারের সাথে কিছু কাল বসবাস করে হুগলী জিলার ফুর ফুরায় পালিয়ে যান। তথায় জনৈক মৌলবী বশরত আলীর সান্নিধ্যে লেখা পড়া করেন এবং ১৭৯৯ খৃীষ্টাব্দে দখলদার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নামে ইংরেজ রাজত্বের গোলামীর কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার মানসে উভয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে হিজরত করেন। সেখানে ২০ বছর ধরে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করার পর হাজী শরীয়ত উল্লাহ ১৮১৮ খৃীস্টাব্দে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরে এসে তিনি বাংলাদেশে ইসলামের বৃক্ষকে ঈমানের পানির অভাবে মৃতপ্রায় দেখেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ফরায়েযী আন্দোলন আরম্ভ করেন।[২৭]

ইসলামের সার্বিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে মানব জীবনের প্রতি নজর দিলে, মানুষের চিন্তা প্রক্রিয়ায় অন্যূন পাঁচটি স্তর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে; যথা-(ক) জৈবিক বা আত্মিক চাহিদা (খ) চাহিদা পূর্ণ করার বাসনা (গ) লাভ ক্ষতি চিন্তা বা অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (ঘ) ভাল মন্দ যাচাই বা নৈতিক বিচার এবং (ঙ) বাস্তবায়ানের পদক্ষেপ বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আরও প্রণিধানযোগ্য যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সর্বদা গোষ্ঠি বা জাতীয় স্বার্থে নির্ধারিত হয় এবং অবশ্যংভাবী রূপে ধর্ম বা আদর্শ, তথা আইডিয়লজী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। লব্ধ কর্মটি এই চিন্তা প্রক্রিয়ার শেষ প্রান্তে সংঘটিত হয়।

পক্ষান্তরে কর্ম সংস্থানের প্রান্ত থেকে উল্টোভাবে নজর দিলে আমরা মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের পেছনে (ক) একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেখতে পাই; এই সিদ্ধান্তের পেছনে (খ) একটি নৈতিক উদ্দেশ্য' নৈতিক উদ্দেশ্যের পেছনে থাকে (গ) একটি অর্থনৈতিক মূল্যায়ন; (ঘ) মূল্যায়নের পেছনে থাকে (ঙ) একটি চাহিদা পূর্ণ করার বাসনা এবং এই বাসনার পেছনে বিদ্যমান থাকে (চ) একটি বাস্তব চাহিদা বা অভাব। অতএব, জৈবিক বা আধ্যাত্মিক চাহিদা হল মানুষের কর্ম তৎপরতার

উৎস এবং কর্ম সংস্থানের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি।

ইসলামী চিন্তা প্রক্রিয়া ও কর্ম ধারায়, তথা জীবন ব্যবস্থায়, উপরোক্ত প্রত্যেকটি দিক যথাযথ ভাবে বিদ্যমান থাকে। ফরায়েযী আন্দোলনে এবং সমভাবে ওয়াহাবী আন্দোলনে উক্ত সব ক'টি দিক জোরালো রূপেই খুঁজে পাওয়া যায়। দুইয়ের মধ্যে একটি মাত্র লক্ষ্যণীয় পার্থক্য এই ছিল যে, ফরায়েযী আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটি কার্যতঃ প্রচ্ছন্ন ছিল; আর ওয়াহাবী আন্দোলনে ছিল তা প্রকট। অন্যান্য স্তর গুলিতে, যথা—নৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, এবং বাস্তব চাহিদার ক্ষেত্রে উভয় আন্দোলনে ভাবগতি ছিল অভিন্ন।

ফরায়েযী আন্দোলনের প্রথম কথা ছিল আল্লাহকে একক অর্থাৎ একমাত্র প্রভু বলে স্বীকার করা, মান্যকরা ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। এতদ্‌সংগে শিরিক ও বিদআত থেকে নিজেকে বিরত রাখা। অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্বে কাকেও অংশীদার না করা এবং ধর্মে কর্মে কোন নূতন বিষয়ের সংযোজন না করা।

দ্বিতীয়তঃ ফরায়েযীরা মানুষের কর্তব্য সম্পাদনের উপর জোর দেয়। মানুষের অবশ্য করণীয় কর্তব্যগুলি যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা প্রত্যেক নরনারীর জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। ধর্মীয় কর্তব্যগুলি যেরূপ পালন করা প্রয়োজন, তেমনি সচরাচর পার্থিব কর্তব্যগুলিও সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তার দিকে তারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাজী শরীয়ত-উল্লাহর সময়কালীন ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি এলাকায় সদ্য প্রসূত শিশুর নার কাটা নিয়ে একাট মহা বিভ্রাট দেখা দেয়। হিন্দুদের দেখাদেখি উক্ত এলাকার মুসলমানেরা সমাজের মধ্যে উচ্চ–নিচ স্তর নির্ণয় করে এমন ভাবে আচার ব্যবহারের প্রচলন করে যা বর্ণবাদের সাদৃশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সদ্য প্রসূত শিশুর নার কাটা "দাই" নামে পরিচিত গোত্রের কাজ রূপে নির্দিষ্ট হয়। নার কাটা একটি নীচ কাজ বলেও বিবেচিত হয়। যে সব পাড়া গাঁয়ে "দাই" এর বসবাস ছিল না, সেগুলিতে সদ্য প্রসূত শিশুকে দাই এর অপেক্ষায় নার না কেটে রেখে দেওয়া হত। হাজী শরীয়ত উল্লাহ এই কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য যথা সময়ে নার কাটার ববস্থা করা শিশুর পিতার কর্তব্য বলে নির্ধারিত করেন এবং তাঁর শিষ্যদেরকে নির্দেশ দেন যে, প্রয়োজন হলে নার কাটা বাপের কর্তব্য রূপে পরিগণিত হবে। বাপেরা নার কাটতে আরম্ভ করলে, বিরুদ্ধবাদীরা ফরায়েযীদেরকে "নার কাটা" বলে অপ-বাদ দেয়।

হাজী শরীয়ত উল্লাহ শ্রম লব্ধ উপার্জনকে হালাল রুজী হিসেবে

অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন এবং শিল্প কর্মে ব্যাপৃত লোকজনকে কারীগর উপাধিতে ভূষিত করেন। তেলী বা কলুদেরকে অন্যান্যরা নিম্ন বিত্তের লোক বলে হিংসা করত। হাজী সাহেব এদেরকেও কারীগর উপাধি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন।

তৃতীয়তঃ ইসলামের বিশুদ্ধ আদি নীতির অনুসরণে হাজী শরীয়ত উল্লাহ মানুষের সমতা ও ভ্রাতৃত্বের উপর জোর দেন; একমাত্র আল্লাহকেই জমির প্রকৃত মালিক বলে ঘোষণা করেন এবং একমাত্র শ্রমকেই মানুষের অধিকার ও সম্পদের বৈধ উৎস বলে গন্য করেন। এই নীতি অনুযায়ী জমির উৎপন্ন ফসল চাষীর প্রাপ্য বলে ঘোষণা করেন এবং মধ্য স্বত্বের দাবীদার জমিদারকে অবৈধ শোষক ও অত্যাচারী বলে মত প্রকাশ করেন।

প্রণিধান যোগ্য যে, আল-কুরআনের নীতি অনুযায়ী সর্বপ্রকার আদেশের উৎস একমাত্র আল্লাহ এবং সর্বপ্রকার সম্পদের উৎস একমাত্র শ্রম। অতএব রাজত্ব, প্রশাসন ও ন্যায় বিচারের ক্ষমতা মূলতঃ আল্লাহর প্রদত্ত এবং দাবী, অধিকার ও সম্পদের উৎস মূলতঃ পরিশ্রম। অন্য ভাবে সমীয় ধাঁচে বলতে গেলঃ আল্লাহর ছাড়া হুকুম নাই এবং শ্রম ছাড়া অধিকার নাই। শেষোক্ত কথাটি আল-কুরআনে আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ "প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ছাড়া মানুষের কিছুই প্রাপ্য নাই।"

আদি ইসলামের পুনরুজ্জীবনকামী হাজী শরীয়ত উল্লাহ বাংলা-দেশের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার চত্বর থেকে চুট্টি, পুট্টি, মহরম, ফাতেহা, ওরস, মিলাদ ইত্যাদির উদ্‌যাপন, হিন্দু জমিদারদের আদেশে দুর্গাপূজা, কালিপূজা ইত্যাদিতে চাঁদা প্রদান ও অংশ গ্রহণ, খাতনা, কান ছেদানী, বিবাহ ইত্যাদিতে আড়ম্বর পূর্ণ জাকজমক প্রভৃতি ইসলাম বহির্ভূত, ইসলাম বিরুদ্ধ অথবা বহিঃপ্রভাব জনিত আচার ব্যবহারের বিরোধিতা করেন এবং এগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই কারণে একদিকে ইংরেজ রাজত্বের সৃষ্টি জমিদার ও জোতদার শ্রেণী যেমন ফরায়েযী আন্দোলনের বিরোধ ভাজন হয়, তেমনি অন্যদিকে এদেশের ঐতিহ্যবাহী, সাবেকী মুসলিম সমাজপতিরাও ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠে। সমসাময়িক ভাষ্যকারদের মতে, জমিদার ও জোত-দার শ্রেণীর প্ররোচনায় এবং রক্ষণশীল সমাজনেতাদের যোগসাজোশে ফরায়েযী জন সাধারণের সাথে সাবেকী মুসলিম সমাজের কূপমন্ডূকতায় আবদ্ধ এক অংশের বিবাদ বিসম্বাদের কালো ছায়া দিন দিন ঘনীভূত হতে থাকে এবং অবশেষে খৃীষ্টীয় ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসের দিকে সংস্কার বাদী ফরায়েযী ও রক্ষণশীল সাবেকীদের মধ্যে ঢাকা জিলার রামনগর নামক স্থানে এক সংঘর্ষ বাঁধে। স্থানীয় হিন্দু জমিদারেরা

এই সুযোগ গ্রহণ করে, হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও তাঁর সহযোগীদের রামনগরের আশে পাশে অবস্থিত নয়াবাড়ী থেকে সরকারের সাহায্যে নির্বাসিত করে। এটা হাজী শরীয়ত উল্লাহর ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল। তিনি সেখান থেকে বাহাদুরপুরে চলে আসেন এবং এই নূতন কেন্দ্র থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ফরায়েযী সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন।

বিশেষতঃ হাজী শরীয়ত উল্লাহ এদেশে ইংরেজদের রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং তাঁর মক্কা শরীফে হিজরত করার এটাই ছিল প্রধান কারণ। অতএব তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর যৎকিঞ্চিত সাধ্য ও সম্বলের প্রয়োগ সম্ভব, তা দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি প্রচার করেন যে, এদেশ ইংরেজদের অধীনে চলে যাওয়ায় এদেশে হানফী মযহাব অনুযায়ী জুমার নামায কায়েম করা অবৈধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, এদেশে গ্রামে গঞ্জে, শহরে বন্দরে ইসলামী প্রশাসন কায়েম নাই এবং ইসলামী প্রশাসকের উপস্থিতি জুমার নামাযের প্রথম ও প্রধান শর্ত। অতএব, ইসলামী প্রশাসন কায়েম করার সাপেক্ষে তিনি বাংলাদেশে জুমার নামায এবং একই কারণে দুই ঈদের নামায নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং জনগণকে জুমার বদলে যোহরের নামাজ আদায় করতে উপদেশ দেন। ওটা প্রকারান্তরে ইংরেজ সরকারের প্রতি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ এবং জনগণের প্রতি ইংরেজদের বিতাড়িত করে জুমার নামায বৈধভাবে কায়েম করার জন্য তৎপর হওয়ার আহবান ছিল।

মৌলানা কিরামত আলী জৌনপুরী এর বিরোধিতা করেন এবং একে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী কালে মৌলানা জৌনপুরী বৃটীশ শাসনাধীন ভারতকে "দারুল হরব" এর বদলে "দারুল আমন" বা নিরাপত্তার দেশ বলে মত প্রকাশ করেন এবং এই অজুহাতে ইংরেজদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে জমিদারেরা যে বিপুল ক্ষমতা লাভ করেছিল, তার সুযোগ নিয়ে তারা প্রজাদের উপর বৈধ রাজস্ব কর ছাড়াও কুড়ি ত্রিশ প্রকার সেস বা আবওয়াব ধার্য করেছিল। হাজী শরীয়ত উল্লাহ জমিদারের আইন সালামী, শীতের কাপড় খরচ ইত্যাদি সেসকে অবৈধ ও কালী পূজা, দুর্গা পূজা, শ্রাদ্ধ খরচ ইত্যাদিকে শিরিক জনিত ইসলাম বিরোধী অপরাধ বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর শিষ্যগণকে এগুলি আদায় করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তাতে ফরায়েযী-দের সাথে হিন্দু জমিদারদের বিরোধ ও সংঘর্ষ বাঁধে। ফরায়েযীদেরকে

কাবু করার জন্য জমিদারেরা ইংরেজ নীলকরদের হাত করে এবং তাদের যোগসাজশে ইংরেজ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিচারক মন্ডলীকে ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে সচেষ্ট হয়। কলিকাতার হিন্দু প্রেস এদের সহায়তায় এগিয়ে আসে এবং ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় সোচ্চার হয়। তখনও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে চিরাচরিত মানবতা সুলভ সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য বজায় ছিল। ইংরেজ প্রশাসন ও মারওয়ারী জমিদারদের সৃষ্ট হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বোধ তখনও দানা বেঁধে উঠেনি। ইংরেজ প্রশাসন ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হলেও জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের দ্বারা নিপীড়িত রায়ত-চাষীরা ন্যায় বিচারের আশায় সম্প্রদায় ও ধর্ম নির্বিশেষে ফরায়েযীদের পক্ষে যোগদান করে। ইত্যবসরে ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যু হলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও নমশূদ্র সম্প্রদায় ভুক্ত রায়ত ও চাষীরা তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরসূরী মুহসীন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিঞার নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়।

নিপীড়িত রায়ত ও চাষীদেরকে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য দুদু মিঞা বাংলাদেশের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংগঠন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন করেন এবং সাম্য ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সর্বপ্রকার ঝগড়া বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করেন। যত্র তত্র মিথ্যা সাক্ষী ও বানোয়াট ওকালতির মাধ্যমে পরিচালিত ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কোর্ট কাচারীর বিচারের তুলনায় দুদু মিঞার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এত অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ফরায়েযী অধ্যুষিত এলাকা থেকে কোর্ট কাচারীতে মামলা মোকদ্দমা দায়ের এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়।

অধিকন্তু দুদু মিঞা ফরায়েযী সমাজ ব্যবস্থার চত্বরে নীচের থেকে উপর দিকে পর্যায়ক্রমে সুবিন্যস্ত একটি খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ছোট গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক নির্বাচনের মাধ্যমে একজন গাঁও খলীফা নিযুক্ত হত। খলীফা মানে ফরায়েযী নেতা দুদু মিঞার প্রতিনিধি। কয়েকজন গাঁও খলীফার উপর একজন সুপারিন্টেনডেন্ট খলীফা বা গিরদ খলীফা (অর্থাৎ সার্কল খলীফা) গাঁও খলীফাদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হত এবং সর্বোপরি কয়েকজন অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ খলীফাকে স্বয়ং দুদু মিঞা উপরস্ত খলীফা রূপে নিযুক্ত করতেন। এঁদের সালিশ ও বিচারের মাধ্যমে ফরায়েযীদের বিবাদ বিসম্বাদ শরীয়ত মুতাবেক নিস্পত্তি হত। এমনকি ফরায়েযী খিলাফত এলাকা থেকে অ-ফরায়েযীরাও বিচার আচার ও বিবাদ নিস্পত্তির জন্যে খলীফাদের ডিঙ্গিয়ে কোর্ট কাচারীর

স্মরণাপন্ন হত না। কোর্ট মামলা দায়ের করতে চাইলেও ফরায়েযী খলীফাদের সম্মতির প্রয়োজন হত। অন্যথায় বাদী বিবাদীর সাক্ষী জুটত না। এই জন্য অনেকে ফরায়েযী সামাজিক সংগঠনকে "রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র" বলে অভিহিত করেছেন।

পিতার নমনীয় নীতি পরিত্যাগ করে দুদু মিঞা খোলাখুলি ভাবে ফরায়েযী নীতিমালার বাস্তবায়নে প্রবৃত্ত হন। তিনি সদরে ঘোষণা করেন যে, জমিন আল্লাহর এবং একমাত্র চাষীই শ্রমের মূল্যে ফসলের হকদার। বিনাশ্রমে মালিকানার দাবীদার জমিদার জোতদারদের জমির ফসলের উপর কোন অধিকার নাই। মানুষ ভাই ভাই এবং সব মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্ট ও পরস্পর সমান। আর প্রত্যেক ভাইকে সাহায্য প্রত্যেক ভাইয়ের করা কর্তব্য। অতএব, পরস্পরের সহযোগিতা, বিশেষতঃ আপদে বিপদে পরস্পরের সাহায্যের জন্য তিনি একটি ফরায়েযী ভ্রাতৃ সংঘ গড়ে তুলেন এবং এতদ্দেশ্যে একটি সাধারণ তহবিলের প্রতিষ্ঠা করেন। যে কোন ফরায়েযী বিপদে পড়লে এই তহবিল থেকে তাকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হত।

বিশাল ইংরেজ শক্তির সাথে তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে মুকাবিলা করা যেমন তিনি প্রায় অসম্ভব বলে মনে করেন, তেমনি ইংরেজ প্রশাসনের সাহায্য পুষ্ট জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও বিনাবাধায় জনগণের উপর অত্যাচার করতে ছেড়ে দেওয়াকে তিনি অসমীচিন মনে করেন। তাই এদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালদের মুকাবিলায় তিনি ফরায়েযী লাঠিয়াল বাহিনীর প্রবর্তন করেন। প্রত্যেক ফরায়েযী গ্রাম থেকে বলিষ্ঠ জোয়ানদের বাছনী করে গাঁও খলীফাদের তদারকে সঙ্গোপনে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত এবং সুপরিন্টেনডেন্ট খলীফা ও উপরন্তু খলীফারা এদের সংগঠনের সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করত। কোন ম্যাজেষ্ট্রেটের কোর্টে দুদু মিঞা বলেছিলেন যে, যে কোন মুহূর্তে তিনি পঞ্চাশ হাজার লোককে মাঠে নামাতে পারেন।

এই লাঠিয়াল বাহিনীর সাহায্যে দুদু মিঞা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে ফরিদপুরের জমিদার ও নীলকরদেরকে এমন ভাবে শায়েস্তা করতে পেরেছিলেন যে, পরবর্তী ১০ বছর ইংরেজ শাসক গোষ্ঠির উপরোক্ত এজেন্টগন ঐ এলাকায় রায়ত ও চাষীদের হয়রানী করা থেকে সর্বোতভাবে বিরত থাকে। ১৮৫৭ সালে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের অজুহাতে ইংরেজ সরকার দুদু মিঞাকে বন্দী করে এবং বিনা বিচারে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত হাজতে আবদ্ধ করে রেখে ফরায়েযী আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত করে।

দুদু মিঞার শিষ্য এবং ছেলেরা যদিও তাঁর মত বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি, তবুও তার দ্বিতীয় পুত্র ও উত্তর সুরী নয়া মিঞা কালক্রমে ফরিদপুর এলাকায় বিশেষ প্রভাবশালী নেতা রূপে প্রতীয়মান হন এবং তাঁর সাহায্যে তদানিন্তন মাদারীপুরের সাব ডিভিশন্যাল অফিসার নবীন সেন পালং এর হিন্দু জমিদারদেরকে প্রজাদের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত করতে সক্ষম হন।

অবশ্য, ১৮৫৭-৫৮ এর ভারতের মহান স্বাধীনতা আন্দোলন বিফল হওয়ার পর থেকে বিশাল ব্রিটীশ সম্রাজ্যবাদের মহা দাপটের কবলে পতিত হয়ে, ক্ষুদ্রাকৃতি, ব্রিটীশ প্রশাসনের আওতাধীন ফরায়েযী আন্দোলনের মত একটি স্বেচ্ছাসেবী ধরনের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন রাজনীতি ও সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে কোন প্রকার কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ছিল না। তাই ধীরে ধীরে তা একটি নিছক ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে মজে যায়। যদিও ফরায়েযীদের আন্তরিকতা, দেশপ্রেম ও ন্যায় নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত ও শৌর্য্য বীর্য বাংলাদেশের মুসলমানদের ঊনবিংশ শতাব্দীর তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল ভাস্কর রূপে আশার আলোক বিকিরণে দীপ্তমান থাকে।[২]

বাংলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলন

বাংলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলন বলতে, বিশেষ ভাবে "তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া" আন্দোলনকেই বুঝায়। রায় বেরেলীর স্বনাম ধন্য সৈয়দ আহমদ শহীদ ১৮১৮ সালে দিল্লীতে এই আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দিহলবীর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্ আবদুল আজীজের অনুপ্রেরণা এই আন্দোলনের শক্তির প্রধান উৎস ছিল। ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হিসেবে আরম্ভ হয়ে অচিরেই 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' রাজনৈতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং ইংরেজ দখলদার শক্তি ও এর শিখন্ডী পাঞ্জাবের শিখ রাজত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ আন্দোলনের পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই জেহাদ বা সংগ্রামী চেতনার জন্য একে "মুজাহিদীন আন্দোলন" ও বলা হয়। ভারতীয় ইংরেজ প্রশাসন ও ইউরোপীয় লেখকেরা একে "ভারতীয় ওয়াহাবীবাদ" নামে অপবাদ দেয়। রক্ষণশীল ওলামাদের এক অংশও একে "ওয়াহাবী" বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদ নিজ থেকে এর নামকরণ করেন "তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া"।

তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনে শাহ ওয়ালী উল্লাহর দৌহিত্র শাহ্ ইসমাইল শহীদ ও মৌলানা আবদুল হাই ফুলতি, যিনি শাহ্

আবদুল আজীজের জামাতা ছিলেন-দুই জন প্রসিদ্ধ আলিম সৈয়দ আহমদ শহীদের হাতে হাত মিলান। এদের মত দুইজন যুগের প্রধান বিজ্ঞ আলিম সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় এই আন্দোলন ত্বরিত সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২৯]

তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদকে প্রায়শঃ বলতে শোনা যেত "ইহা মুহম্মদ (ছঃ) এর পথ, যার অনুসারীরা কেবল মাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। তারা যখন গৃহে অবস্থান করে, পথে পরিভ্রমন করে, বসা, চলা, ঘুমন্ত জাগ্রত, আহার রত থাকে—সর্ব অবস্থাতেই তাদের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর হুকুম তামিল করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই হয়ে থাকে। এই পথে বৈধ ও হালাল উপার্জন দ্বারা সে নিজেকে ও পরিবারকে প্রতিপালন করবে, সালাত কায়েম করবে, ছওম সাধনায় ব্যাপৃত হবে, যাকাত আদায় করবে, হজ্জ সমাপন করবে এবং অন্যান্য কর্তব্য কাজ সমাধা করবে।' এটা অবিকল ফরায়েযীদের আদর্শও বটে।

১৮২১-২২ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদের সদলবলে হজ্জ যাত্রা তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ও সর্বভারতে জনপ্রিয় করে তোলে এবং ১৮২৬ সালে জানুয়ারী মাসে দেশত্যাগ করে দখলদার ইংরেজ অধিকৃত ভারতীয় এলাকার বহির্ভূত কোন স্বাধীন মুসলিম রাজ্যে গমন করে দেশ উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করার কঠিন ও ও কঠোর সিদ্ধান্ত একে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান চত্বরে সন্নিবেশিত করে।[৩০]

এদিকে তিনি যখন পবিত্র মক্কা নগরীতে হজ্জ সমাপন করতে গমন করেন, তথায় বাংলাদেশের তিতুমীর তাঁর সান্নিধ্যে আসেন. তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ সালের দিকে আদিষ্ট হয়ে খাঁটি ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে তিতুমীর পশ্চিম বাংলার নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার একটি চমকপ্রদ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

তথ্যনির্দেশ

১. একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য দেখুন লেখকের, *Muslim Struggle for Freedom in Bengal,* Dhaka, 1982.

২. ডঃ কাজী আবদুল মন্নান ঃ "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা," ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৩১ থেকে সামনের দিকে।

৩. ঐ, পৃঃ ৩৫—৩৬।

৪. পৌত্তলিকতা বিরোধী খাঁটি ব্রাহ্মবাদে বিশ্বাস ও দেবদেবীর অর্চনা সর্বস্ব পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসের দিক দিয়ে রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্কিম চন্দ্র পরস্পর বিপরীত ধর্মী ছিলেন।

৫. দর্শনের দিক থেকে আক্ষেপের বিষয় যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম-বিশ্বাসগতভাবে ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও তার কাব্য কবিতায় তিনি আধুনিক ফরাসী মহা মানববাদ ও সনাতন হিন্দু পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণ ঘটান।

৬. Jadunath Sarkar (ed), *History Bengal*, Vol, II, Dacca, 'Preface' দেখুন।

৭. লেখকের প্রবন্ধ "আধুনা নৈতিক সংকট ও বাংলাদেশ ঃ একটি ঐতিহাসিক শব্দতাত্বিক বিশ্লেষণ" ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় দর্শন সেমিনারে পঠিত।

৮. এই সংঘাত আধুনিক শিক্ষাজ্ঞান ও সংস্কৃতির চত্বরে এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

৯. ডঃ কাজী আবদুল মন্নান, "উপরোক্ত গ্রন্থ," পৃঃ ২৮ থেকে সামনের দিকে।

১০. পশ্চিম বঙ্গের সাম্প্রতিক তেভাগা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাকারান্তরে প্রাচীন সামন্তবাদী বর্গা প্রথারই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১১. লেখকের "মুসলিম স্ট্রাগল"। পৃঃ ৯ থেকে সামনের দিকে দেখুন।

১২. ঐ।

১৩. ঐ, পৃঃ ১৪ থেকে সামনের দিকে।

১৪. লেখকের "History of the Faridi Movement in Bengal, Appendix দেখুন।

১৫. মনসবদারী প্রথা সম্রাট আকবর প্রচলন করেন।

১৬. K. K. Aziz (ed) *Syed Amir Ali, His Life & Works*, Lahore, 1965, ইন্টারেস্ট সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭. ঐ।

১৮, লেখকের "A Diplomats Report on Wahibism of Arabia,' *Islamic Studies*, Islamabad, V 7, No 1, March 1968, pp. 33-46.

১৯. আহমদ মুস্তাফা আবু হাকীমা, "হিস্ট্রী অব ইস্টার্ণ এরাবিয়া ১৭৫০-১৮০০", বেরূত, ১৯৬৫, পৃঃ ১২৭, পদটীকা-৪।

২০. W. W. Hunter, *Our Indian Musalman*, London, 1871.

২১. আহমদ মুস্তফা আবু হাকীমা, উপরোক্ত, পৃঃ ১২৬-২৭।

২২. প্রথম যুগের পুণ্যবান মুসলিম বলতে সাহাবী, তাবেই ও তাবে-তাবেয়ী অর্থাৎ রসুলুল্লাহর (দঃ) সহচর, তাদের সহচর ও তাদেরই সহচরের তিন যুগকে বুঝানো হয়।

২৩. লেখকের প্রবন্ধ, 'শাহ ওয়ালী আল্লাহস্ কনসেপ্শন অব ইজতিহাদ' ''জার্ন্যাল অব দি পাকিস্তান হিসটোরিক্যাল সোসাইটী'', করাচি, ভ ঃ ৭ খণ্ড ৩, জুলাই ১৯৫৯, পৃঃ ১৬৮ থেকে সামনের দিকে।

২৪. লেখকের ''হিস্ট্রী অব দি ফরায়েদী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল'' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৫. ঐ।

২৬. ঐ।

২৭. ঐ।

২৮. ঐ।

২৯. লেখকের প্রবন্ধ, 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া মুভমেন্ট, এন্ এনালাইটিক্যাল ষ্টাডী', ''ইসলামিক স্টাডিজ'', প্রাগুক্ত, ভলঃ ৬, নং ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৭, পৃঃ ৩৭৫-৩৮৮।

৩০. লেখকের প্রবন্ধ ঃ 'সৈয়দ আহমদ শহীদ্স্ কেমপেইন এগেইনষ্ট দি শিখ্স্,' ''ইসলামিক স্টাডিজ'', প্রাগুক্ত, ভলঃ ৭, নং ৪, ডিসেম্বর ১৯৬৮, পৃঃ ৩১৮-৩৮।

বিনয় ভূষণ চৌধুরী

তুষখালীর কৃষক-বিদ্রোহ

তুষখালীর[১] কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫৮-১৮৭৫) এখনও প্রায় অজ্ঞাতই[২] রয়ে গেছে। অথচ বাংলার সুসংগঠিত এবং সফল কৃষক-বিদ্রোহগুলির এটা অন্যতম। এতে দুই প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের পরাভব ঘটে। এ বিদ্রোহের দু'টি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে (১৮৫৫-১৮৫৮) প্রতিরোধ ছিল টাকীর[৩] রায় চৌধুরী জমিদার পরিবারের প্রিয়নাথ রায়ের বিরুদ্ধে। পর্যুদস্ত 'রাজাবাবু'[৪] মহল ছেড়ে পালিয়ে যায়। তীব্র হতাশা আর গ্লানিবোধ তাকে নির্মম প্রতিহিংসাপরায়ন করে তুলে। যাবার আগে তার নায়েবকে নির্দেশ দেয়, অবাধ্য প্রজাদের ভিটেছাড়া করে তাদের ভিটেয় সরষে বুনতে।[৫] দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৭২-৭৫) বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ছিল খাজনার নূতন নিরিখ চালু করার জন্য মোরেলের[৬] প্রয়াস ব্যর্থ করা। কুড়িবছরের[৭] বন্দোবস্ত নিয়ে মোরেল বছর তিনেকের বেশী টিকতে পারেনি। সেও তার নিজের ক্ষমতায় নয়। প্রতিনিয়ত রাজকর্মচারীদের হস্তক্ষেপ না ঘটলে কোনো খাজনা আদায় করাই তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। ১৮৭৫ সালের মার্চমাসে তুষখালী খাসমহল সরাসরি সরকারের পরিচালনায় আসে। বিদ্রোহের জের তখনও চলতে থাকে। কিন্তু সরকারের বিপুল শক্তির সঙ্গে কৃষককুল আর পেরে ওঠেনি।

১

কৃষক-বিদ্রোহের আলোচনা-প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক চিন্তা ভাবনার[৮] একটা উল্লেখযোগ্য দিক বিদ্রোহীদের চেতনার বিভিন্ন রূপে বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ। এ ধারণানুযায়ী কৃষক-বিদ্রোহ কোনো নিরুদ্ধ আক্রোশের আকস্মিক স্বতস্ফূর্ত উৎক্ষেপ নয়; তা সংঘবদ্ধ কৃষকদের সচেতন প্রয়াস। এ চেতনার বিশ্লেষণ তাই কৃষক-বিদ্রোহের চরিত্র বোঝার জন্য অপরিহার্য।

এ ধারণা কৃষক-আন্দোলনের ঐতিহাসিকদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কৃষক অন্দোলনের অনেক ইতিহাসই অসম্পূর্ণ। এতে

প্রধান জোর কৃষকদের নৈর্ব্যক্তিক শ্রেণী-চরিত্র এবং শ্রেণী সম্পর্কের উপর তাদের বিদ্রোহ যেন শুধুমাত্র এ সম্পর্কের অনিবার্য এবং একমাত্র পরিনাম। এ সব আলোচনায় বিদ্রোহীদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার কোন পরিচয়ই প্রায় মেলেনা। শ্রেণী-সম্পর্কের কোন বিশিষ্ট দিক তাদের বিদ্রোহের পক্ষে নিয়ে গেল? শত্রুর আধিপত্য তারা এদ্দিন মেনে নিয়েছিলই বা কেন? নিজেদের শক্তি বা তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাদের ধারণার উৎস কি? বিদ্রোহের ঝুকি নিতে বহুক্ষেত্রে কৃষকদের দ্বিধা ছিল কেন? কোন প্রত্যয়ের ফলে তাদের দ্বিধা ও সংশয় কেটে গেল? আন্দোলনের তীব্র আবেগঘন মুহূর্তগুলিতে তাদের চেতনার কোন নূতন রূপ উন্মোচিত হল? শত্রুবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপ, অনেক সহিংস আচরণ তারা কেন ন্যায্য মনে করেছিল? তাদের সংগঠনের প্রধান শক্তি কি শুধু একই শত্রুর প্রতি বৈরিতা? শুধুমাত্র কৃষকদের শ্রেণী-সম্পর্কের বিশ্লেষণ থেকে এ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর মিলবেনা। তাদের বৃহত্তর সমাজ জীবন, সংস্কৃতির নানা দিক, ধর্মবিশ্বাস এবং আরো নানা প্রশ্নের আলোচনা এ প্রসঙ্গে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বর্তমান আলোচনায় এ ধারণার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্রোহী কৃষকদের চেতনার নানা দিকের আলোচনা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তুযখালীর আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে কৃষকদের উদ্যোগেই সংগঠিত হয়েছে। এ ধরণের আলোচনায় একটা প্রধান বাধা প্রয়োজনীয় উপকরণের অপ্রতুলতা। কিন্তু তা অনতিক্রম্য নয়।

তবে এ আলোচনা শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের চেতনার রূপ বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ নয়। যে বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কৃষক হিসেবে বিদ্রোহীদের চেতনা বিকশিত হয়েছে তার জটিলতা বিশ্লেষণ আমরা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক মনে করেছি। কৃষকদের অনেক ধারণা বা বিশ্বাসের উৎস হয়ত এ সম্পর্ক নয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগেই হয়ত তাদের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এ আদি ধারণা অবিকৃত থাকেনি। বাইরের রূপ হয়তো পাল্টায়নি; কিন্তু অনেক বিশ্বাস সম্ভবতঃ আগের মত প্রবল থাকলনা। অথবা নূতন বোধের ফলে এ বিশ্বাসেও নূতন প্রবণতা দেখা গেল। কৃষকদের একান্ত প্রত্যক্ষ জীবন-ধারণের পরিবর্তমান পরিবেশ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা আলোচনা করেছি। ফরায়েযীদের আদি ধর্মীয় সংগঠন ও সমাজ-দর্শন কি ভাবে নূতন পরিবেশের প্রভাবে অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গেল।

তুযখালীর কৃষি-অর্থনীতি ও শ্রেণী-সম্পর্কের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য

এখানকার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

এ অঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তি সাম্প্রতিক নূতন আবাদ। জমি উর্বর; সেচের জল সহজলভ্য। শস্যহানির সংখ্যাও তাই নগন্য। এর ফলে আবাদের দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়েছে।

এ আবাদের সংগঠন এখানকার শ্রেণী-সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সুন্দরবনের বহু জায়গায় এ সংগঠনের একটা বিশিষ্ট রূপ ছিল[৯]। জমিদার (বা সরকার) এ আবাদের দায়িত্ব দিত বিত্তশালী এক গোষ্ঠীকে। 'আবাদী-তালুকদার এদের আঞ্চলিক নাম। এদের নির্বাচনে জমিদারের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল নিয়মিত খাজনা দেবার সামর্থ্য। আবাদের কাজে পূর্ব-অভিজ্ঞতা নয়। কারণ আবাদে এদের প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা প্রায়শ থাকতনা। 'তালুকদারী' আসলে জমির উপর এক ধরনের অধিকার। জমির বাজার-দরের উপর এর বেচাকেনার সংখ্যা নির্ভর করত। আবাদী তালুকদার ওসাত-তালুকদারের কাছে এ অধিকার হস্তান্তর করে মুনাফা করার চেষ্টা করত। নূতন আবাদের জন্য এরাও সচরাচর কোন অর্থলগ্নী করত না। তারাও তাই মুনাফা রেখে নিজের অধিকারকে বিক্রী করতো 'হাওলাদার'দের কাছে। আবাদের সংগঠনে প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল এদের। বন কেটে বা অন্যান্য ভাবে চাষ-বাড়ানোর জন্য সব খরচই দিত তারা। কাছাকাছি অঞ্চলে চাষীর সংখ্যা পর্যাপ্ত না হলে দূর জায়গা থেকে তাদের আনার ব্যবস্থা করতো। কয়েকটা অঞ্চল ছাড়া এ চাষীরা প্রচলিত অর্থে শুধুমাত্র মজুর ছিল না। হাওলাদার (বা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অধস্তন গোষ্ঠী নিম-হাওলাদার)দের থেকে জমি নেবার পর চাষের পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাদের। কোন জমি কি ভাবে চাষ করবে, এ বিষয়ে হাওলাদার বা নিম-হাওলাদার কোন হস্তক্ষেপই করতনা। যেখানে চাষীরা মজুর হিসেবে খাটতো, সেখানে তাদের পাওনা ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের নির্দিষ্ট ভাগে। তাদের চাষের জমিও নির্দিষ্ট ছিল না। মালিকের মর্জি অনুযায়ী জমি বদল হতো। কিন্তু সত্যিকারের চাষীরা নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে জমি দখলে রাখতো। বহুবছর পর্যন্ত সরকারী আইনে তাদের কোন অধিকার স্বীকৃত হয়নি। যা কিছু অধিকার তারা ভোগ করত তার ভিত্তি স্থানীয় প্রথা।

সুন্দরবনের অন্যান্য কয়েকটা অঞ্চলের মত তুষখালীতেও নানা ভাবে এ আপাত-সুশৃংখল শ্রেণী সম্পর্কে জটিলতা বাড়তে থাকে। ফল গ্রামীণ সমাজে দীর্ঘকাল-স্থায়ী বিক্ষোভ। এর একটা রূপ কৃষক-বিদ্রোহ।

চাষী ('কর্ষা')দের সঙ্গে তাদের ঊর্ধ্বতন গোষ্ঠীর সম্পর্ক কদাচিৎ এ জটিলতা সৃষ্টি করেছে। এর প্রধান উৎস জমিদার (বা সরকারের)

সঙ্গে আবাদী তালুকদার বা আবাদী তালুকদারের সঙ্গে তাদের ঠিক নীচের গোষ্ঠীর বিরোধ। এ বিরোধের ফলে তলাকার সম্পর্কগুলোতেও আসে অস্থিরতা ও জটিলতা। পারস্পরিক এ সম্পর্কগুলোর পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রয়াসের পটভূমিকা সব জায়গায় এবং সব সময় অভিন্ন নয়।

জমিদার বা সরকারের ধারণা, আবাদী তালুকদারে সংগে তাদের সম্পর্ক অনড় অপরিবর্তনীয় নয়। তারা চাইত নির্দিষ্ট সময় অন্তর সম্পর্কের সর্ত পুনর্নির্ধারিত হোক; বিশেষ করে আবাদের প্রসার, ধান চালের ব্যবসার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, জমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ বাড়ুক। তারা মনে করত সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতিতে এ বৃদ্ধির দাবী বৈধ এবং যুক্তিসংগত। সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় এ পরিমাণ স্থির হয়েছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতে এর পরিবর্তন অপরিহার্য। হাওলাদারকে দেয় চাষীর খাজনার হার তো অনবরত বেড়ে চলেছে। জমিদারেরাই বা কেন তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হবে?

৩

তুষখালীতে এ বিরোধের ক্রমবর্ধমন তীব্রতার কয়েকটা বিশেষ কারণ ছিল। এ বিরোধের দু'টি পর্যায়ের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তাদের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবেই করা সমীচীন।

১৮৫৫-৫৮, পর্বের কৃষক-আন্দোলনের কারণ বিশ্লেষণে 'টাকীবাবু'দের তুষখালী-বন্দোবস্তের আনুপূর্বিক ইতিহাস-বর্ণনা প্রাসঙ্গিক হবে। তুষ-খালীর বিরোধের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তাতে পরিষ্কার হবে।

এ ইতিহাসের আদি পর্ব তুষখালীর উপর পার্শ্ববর্তী সৈয়দপুর জমিদারের কর্তৃত্বের অবসান এবং তুষখালীকে সরকারী মহল হিসেবে ঘোষণা (১৮৩০-৩৮)। এ বিস্তীর্ণ সুন্দরবনের অংশে নূতন আবাদের বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা ছিল সৈয়দপুর জমিদারের। বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর। তাদের ধারণা ছিল এ অঞ্চল তাদের জমিদারীর এক্তিয়ার ভুক্ত। নূতন আবাদের সবটাই ঘটেছিল সরকারের অগোচরে। কৃষির বিপুল প্রসারের কথা তারা জানতে পারে ১৮৩০ সাল নাগাদ। ১৮২৮ সালের একটা আইনে [১০] বলা হয়েছিল, জনবসতিহীন সুন্দর বনের অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতার বাইরে। সৈয়দপুর জমিদারের উদ্যোগে সম্পন্ন নূতন আবাদের উপর তাই তাদের কোন অধিকার নেই। ১৮৩০ সালের মার্চমাসে তুষখালীকে খাসমহল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ সিদ্ধান্ত সৈয়দপুর জমিদার মেনে নেয়নি। ছ'বছরেরও বেশী সময় মোকদ্দমা চলে। ১৮৩৬ সালে আদালতের রায়ে সৈয়দপুর

জমিদারের দাবী নাকচ হয়ে যায়। এ বিশাল সমৃদ্ধ অঞ্চলের উপর তাদের জমিদারী যে গেলই। রাজস্ব আদায় করে দেবার দায়িত্বও সরকার তাদের দিল না।

সে দায়িত্ব পেল টাকীর জমিদার পরিবার,[১১] যার সংগে এ অঞ্চলের আবাদের কোন যোগই ছিল না। ১৮৩৮/৩৯ সালে কুড়ি বছরের জন্য তারা তুষখালীর বন্দোবস্ত পেল।

এ নূতন ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবাদী তালুকদারদের (এ অঞ্চলে যাদের 'মাজুল' ও বলা হত) সঙ্গে টাকী বাবুদের সংঘর্ষ শুরু হয়। মাজুলদের ক্ষমতা খর্ব করার জন টাকী-জমিদার প্রথম থেকেই দৃঢ় সংকল্প ছিল। তুষখালীর মাজুলদের সম্পর্কে সরকারী মনোভাব তাদের আরো অনমনীয় করে তুলেছিল। সরকারের ধারণা, তুষখালীর উপর সৈয়দপুর জমিদারের বৈধ কোন অধিকার ছিল না। তাই তাদের থেকে যে সব মাজুলরা ইজারা নিয়েছে, তাদেরও কোন আইন-সম্মত অধিকার নেই। তাদের অপসারণ সম্পূর্ণ যুক্তি-সংগত। কিন্তু আবাদের বিস্তারে যাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, জমিতে তাদের বিশেষ কোন অধিকার আছে কি নেই, সে বিষয়ে তখনো অনিশ্চয়তা ছিল। এ অধিকার আঞ্চলিক প্রথা-সম্মত। কিন্তু আইনের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান তখনও ছিল না।

মাজুল-বিরোধী সরকারী মনোভাবকে টাকী-জমিদার সুকৌশলে কাজে লাগাল। কারণ তারা জানত, মাজুলদের না সরালে বা তাদের প্রতিপত্তি খর্ব না করলে তুষখালীর বন্দোবস্ত থেকে মুনাফা বাড়ানোর কোন উপায় থাকবে না। তুষখালীতে আবাদের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ না হলে টাকী-জমিদার হয়তো নির্দ্বিধায় মাজুলদের অপসারণের কাজে প্রবৃত্ত হত না। স্থানীয় রাজকর্মচারীদের মতে, এ অঞ্চলকে খাসমহল হিসেবে ঘোষণা করার সময়েও চাষ-বাড়ানোর সুযোগ আর ছিলনা বলেই চলে। এমনকি নূতন সুপুরি এবং নারকেল বাগান তৈরী করার সুযোগও ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। ১৮৫৮ সালের বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের সময় রীলি[১২] নিজে দেখেন। সচ্ছল লোকেদের বসতবাটি প্রায় সবই পুরনো। নূতন বাড়ীর সংগে সুপুরি বা নারকেল গাছ প্রায় নেই-ই। কয়েকটা কলাগাছ মাত্র তিনি দেখেছেন।

মাজুলদের সংগে এ অনিবার্য সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণ মেলে না। মাজুলরা সহজে তাদের ক্ষমতা ছাড়েনি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাদের অপসারণের চেষ্টা অবৈধ। টাকী-জমিদার বিরোধী আন্দোলনে তাদের অধস্তন গোষ্ঠীর সহযোগিতা[১৩] তাদের আত্মবিশ্বাসকে আরো প্রবল

করে। হাওলাদার এবং 'কর্ষা'দেরও ধারণা, মাজ্জুলদের দাবী সম্পূর্ণ যৌক্তিক। সম্ভবতঃ তাদেরও আশংকা ছিল। মাজ্জুলদের কর্তৃত্বলোপের ফলাফল তাদের পক্ষেও অশুভ হতে পারে।

নূতন আইনের বিধানের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ থেকে এ সংঘর্ষের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা অনুমান করা যায়। ১৮৫৭ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে সদর দেওয়ানী আদালতের দুটো রায়ে জমিতে মাজ্জুল এবং সমগোত্রীয় মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর ক্ষমতা সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা দূর হল।[১৪] যে সমস্ত নূতন আবাদী অঞ্চলে সরকার জমিদারের "অর্ধেক দখল" অস্বীকার করে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, এ রায় তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। আদালত বলল, এ ধরণের মহলে সরকার নিজের ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করতে পারবে। আগের দখলকারী গোষ্ঠীর কোন দাবী সরকার মানতে বাধ্য নয়; এমনকি চাষ-বাড়ানোর জন্য যারা এককালে অনেক কিছু করেছে, তাদের ক্ষেত্রেও না।

রীলির তদন্ত থেকে জানা যায় এ রায়ের পর থেকেই অবাধ্য মাজ্জুলদের তাড়ানোর কাজ নূতন উদ্যমে শুরু হয়। রীলির ধারণা, ১৮৫৮ সালের বিদ্রোহের আগেই এদের পুরনো আধিপত্য প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১৫] এ ধারণার যথার্থতা বিচার করার মত আনুসঙ্গিক সরকারী দলিল নেই। তবে টাকী-বাবুদের সাফল্য সন্দেহাতীত।

৪

তুষখালীর গ্রামীণ সমাজে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার উৎস শুধুমাত্র মাজ্জুলদের খর্ব প্রতিপত্তি এবং আহত অভিমান নয়। তার ভিত্তি অনেক ব্যাপকতর। তুষখালীর বন্দোবস্ত থেকে আয় বাড়ানোর জন্য টাকী-বাবুদের বিবিধ কৌশল হাওলাদার এবং সাধারণ কর্ষাদেরও উত্তরোত্তর বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল।

যেখানে মাজ্জুলদের অপসারণ সম্ভব হয়েছিল, টাকী বাবুরা সেখানে সরাসরি কৃষকদের সংগে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারল। যেখানে মজুলেরা রয়ে গেল, সেখানেও আয়ের উপায় ছিল। খাজনার নিরীখ বৃদ্ধি সহজ সাধ্য ছিল না। প্রধান উপায় ছিল নানা ধরণের আবওয়াব আদায়।

রীলি টাকীবাবুদের অপরিহার্য আর্থিক প্রয়োজন আবওয়াব আদায়ের প্রধান কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন।[১৬] বিপুল ঋণের বোঝা ও অন্যান্য জমিদারী নীলামে হারানোর ভয় ছিল বলেই তারা একের পর এক আবওয়াব প্রজাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিল রীলির এ মন্তব্য সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। প্রচলিত আবওয়াবগুলোর বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিষ্কার হবে।

কোন্ ক্ষমতার বলে জমিদার বিচিত্র সব আবওয়াব আদায় করতে সক্ষম হতো, তার আলোচনা এখানে প্রাসংগিক হবে। কারণ আবওয়াবের এ দিকটা প্রায় উপেক্ষিত থেকে গেছে। আবওয়াবকে প্রধানতঃ জমিদারের প্রজা-পীড়নের একটা দৃষ্টান্ত হিসেবেই ধরা হয়েছে।

আবওয়াব আদায়ে স্থানীয় প্রশাসনের কোনো সমর্থনই ছিল না। বরং সরকারী আইন আবওয়াবকে অবৈধ ঘোষনা করেছে। জমিদারের ক্ষমতা এই প্রথা-সম্মত মাত্র। এ অবৈধ আদায়কে গ্রামীন সমাজে জমিদারের বিপুল ক্ষমতার একটি প্রমাণ হিসেবে নেওয়া যায়। প্রজারা বহু ক্ষেত্রে এ ক্ষমতাকে মেনে নিয়েছিল বলেই জমিদারের পুনরাবৃত্ত দাবী প্রথায় রূপান্তরিত হতে পেরেছিল।

জামিদার-কৃষক সম্পর্কের প্রাথমিক ভিত্তি কৃষকের জোত-জমির উপর জমিদারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এ সম্পর্ক কিন্তু তাঁকে অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। জমিদারদের ক্ষমতার এক্তিয়ার নির্দিষ্ট থাকল না। এর কারণ, কৃষকদের সংগে সম্পর্ককে জমিদার এক বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে দেখছিলঃ কৃষকেরা শুধু চাষী নয়; জমিদারের প্রজা, সর্বতোভাবে জমিদারের অধীন এক সামাজিক গোষ্ঠী; প্রজাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নানা দিক নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার জমিদারের আছে; জমিদারের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রজাদের থেকে ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও জমিদার নানা ভাবে প্রজাদের বশ্যতা দাবী করতে পারে।

যেখানে চিরাচরিত রীতিতে জমিদারী-পরিচালনাই জমিদারের একটি মাত্র কাজ ছিল না এবং নূতন নূতন উপায়ে আয় বাড়ানোর জন্য তারা সচেষ্ট হয়েছিল, সেখানে স্বভাবতই তাদের ক্ষমতা-ব্যবহারের ঢঙও পাল্টে গেছে, আর ফলস্বরূপ তাদের ক্ষমতার এক্তিয়ারও বিস্তৃতহয়েছে।

তুষখালীতে প্রচলিত আবওয়াবের যে দীর্ঘ বিবরণ[১৭] রীলি দিয়েছেন তার থেকে এ এক্তিয়ার সম্পর্কে কয়েকটা ধারণা করতে পারি। টাকীবাবুর তুষখালীর 'জমিদার' ছিল না। কিন্তু তাদের অভ্যস্ত জমিদারসুলভ মানসিকতা এ মহল-পরিচালনার কায়দাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে।

(ক) তারা মনে করত তাদের ধর্মীয় উৎসবের খরচ মেটানোর জন্য তারা প্রজাদের থেকে খাজনার অতিরিক্ত পাওনা চাইতে পারে। তুষখালীর প্রজারা প্রধাণতঃ ইসলামধর্মাবলম্বী জেনেও তারা এ দাবী করতে ছাড়েনি। অন্যান্য অনেক জায়গায় পুজো-পার্বন শুধুমাত্র জমিদারের পারিবারিক উৎসব ছিল না। পল্লী সমাজের এক বড়ো অংশ এতে স্বেচ্ছায় যোগ দিত। এবং প্রয়োজনীয় খরচের কিছুটা সমাজপতি হিশেবে

জমিদারকে দিত। তুষখালীর ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন উঠেই না। রীলি সরস্বতী পুজো, কালী-পুজো, দোল উৎসব, নীল পুজো বা চরক পুজোর উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা আবওয়াব চালু ছিল। টাকী-জমিদার-নিযুক্ত ইজারাদারদের পারিবারিক পুরোহিতের জন্যও প্রজারা আবওয়াব দিত, টাকায় এক গন্ডা হিসেবে ('গন্ডী-খরচ')।

(খ) ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের হস্তক্ষেপ করাও টাকী বাবুরা নিজেদের ক্ষমতা-বহিভূর্ত মনে করত না। যেমন ফরাজী-অধ্যুষিত অঞ্চলেও প্রকাশ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। অথচ গো-হত্যা ফরাজীদের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অংগ ছিল। গো-হত্যার অভিযোগে জমিদার দু'জন ফরাজীকে মোটা পরিমাণ অংক জরিমানা করে। এ ঘটনায় প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। রীলির বিশ্বাস, তাঁর হস্তক্ষেপের জন্যই বিক্ষুব্ধ ফরাযীরা কোন হাঙ্গামা করেনি।

(গ) প্রজাদের অন্য ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় আচারও জমিদার আয়-বাড়ানোর স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতো। গ্রামের প্রত্যেকটা বিবাহ উপলক্ষে প্রজাদের আড়াই থেকে তিন টাকা জমিদারকে দিতে হত ('শাদিয়ানা')। শুধু তাই নয়। বিয়ের কনের পালকী কোন্ কোন্ বেহারা বয়ে নিয়ে যাবে, জমিদার তাও স্থির করে দিত। বিশেষ বিশেষ ডিহী নির্দিষ্ট কাহারগোষ্ঠীর এক্তিয়ার ছিল। এ অধিকারের জন্য বেহারারা জমিদারকে সেলামী দিত ('বেহারা মহল')। বলাই বাহুল্য, তারা কনের পরিবার থেকে তা আদায় করে নিত।

(ঘ) মহল পরিচালনার খরচের একটা মোটা অংশ প্রজাদের থেকে প্রাপ্য, জমিদার তাও ধরে নিত। 'মোসাহেব' আর ইয়ার-পরিবৃত্ত হয়ে জমিদার যখন মহল পরিক্রমা করত, তার জন্য 'সংগী খরচ' বলে আবওয়াব প্রজাদের দিতে হত। প্রিয়নাথের আমলে মহল-পরিচালনার এক অপরি-হার্য অংগ ছিল 'ইজারাদার' গোষ্ঠী। 'ইজারাদার রসুম' নামের আবওয়াব এ বাবদ খরচ মোটানোর জন্য ধার্য হয়েছিল। লাঠিয়াল পোষার জন্য জমিদার প্রজাদের থেকে 'নেগদীয়া খরচ' আদায় করত।

(ঙ) আকস্মিক দুর্ঘটনা-জনিত জমিদারের কোনো ক্ষতির পূরণের দায়িত্বও ছিল প্রজাদের। একবার এক পাগলা ঘোড়ার ক্ষ্যাপামিতে বাবুদের গাড়ী ভয়ানক রকমে জখম হয়। সারানো খরচের বোঝা এসে পড়ল চাষীদের ঘাড়ে। 'গাড়ী-খরচ' আবওয়াবের ইতিহাস এই।

(চ) তুষখালীতে এমন কয়েকটা আবওয়াব প্রচলিত ছিল, যা সচরাচর পুরানো জমিদারীতে দেখা যায় না। অর্থনীতিতে টাকী বাবুদের নূতন ধরণের ভূমিকাই এদের মূলে। তাদের কাছে এ মহলের এক বিশেষ

আকর্ষণ ছিল। তাদের অন্যান্য সুন্দর বন লটে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের একটা বড়ো অংশ মিলত এখান থেকে; বিশেষ করে নিকটবর্তী দেবনাথপুর লটের জন্য। রীতির সিদ্ধান্ত, চাষীদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হত। জংগল-কাটা, পুকুর খোঁড়া, বসত-বাড়ী বানানো ইত্যাদি নানা কাজে তাদের বেগার খাটানো হতো। কোনো রকম অবাধ্যতার শাস্তি মোটা জরিমানা। আসলে দেবনাথপুরে মত অঞ্চলে লটদারদের প্রধান খরচ হত শ্রম-বাবদ। সুন্দর বনের অনেক জায়গায় ব্যয় বহুল বাঁধ নির্মাণ করে পরিষ্কার জলের ব্যবস্থা করতে হত, কারণ লোনা জলে জমি অনুর্বর হয়ে যেত। এ ব্যবস্থা এখানে অপ্রয়োজনী ছিল।

তুষখালীতে আবাদের জন্য যা কিছু খরচ পড়ত তার জন্য এক নুতন আবওয়াব ('কাঠি-খরচ') আদায় করা হত। এমনকি, আবাদের কাজ শেষ হয়ে গেলেও এটা তুলে নেওয়া হয়নি। যারা কাঠি-খরচ দিতে চাইতনা, জমিদার তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করে অন্য কাউকে দিত। 'কাঠি-খরচে'র কিছু পরিমাণ দিলে জমির অংশ বিশেষ দখলে রাখা যেত। চাষীদের একটা প্রধান অভিযোগ ছিল, এ আবওয়াবের জন্য জমিতে তাদের কোনো স্থায়ী স্বত্ব জন্মাত না। 'কাঠি-খরচ' দিয়ে গেলে সমূহ আর্থিক ক্ষতি। না দিলে জমিতে অধিকার-বিলোপের সম্ভাবনা।

ধান চালের ব্যবসা টাকী জমিদারের নুতন ধরণের কার্যকলাপের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ব্যবসার ভিত্তি কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত কৃষি-পণ্যের বাজার। তুষখালীর তিনটি বড়ো বাজারে জমিদারের ধানচালের গোলা ছিল। রপ্তানী হত প্রধানতঃ কলিকাতায়। এ তিনটি বাজার ছাড়া অন্য কোথাও চাল বিক্রী না করার জন্য চাষীদের বাধ্য করা হত। আসল উদ্দেশ্য, খোলা বাজারের দরে চাল না কিনে ব্যবসায় মুনাফা বাড়ানো। বাজারের দরের তুলনায় তিন-চার আনা কমে, চাষীদের চাল বিক্রী করতে হত। উৎপন্ন শস্যের সবটাই যাতে চাষীরা বাজারে ছাড়ে, তার ব্যবস্থাও জমিদার করেছিল। খাজনার কিস্তী এমনভাবে ঠিক করা হয়েছিল যাতে নির্দিষ্ট কোন সময়ে চাষীরা চাল বিক্রী করতে বাধ্য হয়। এ কিস্তীর ব্যাপারে কোন ওজর-অজুহাত শোনা হোত না। 'মির্দা' ও 'পেয়াদা' নামের কর্মচারীরা এ কিস্তী-আদায়ের ব্যাপারে সর্বদা তৎপর ছিল।

টাকী জমিদারের মহাজনী-ব্যবসা ও ধান-চালের বাজারকে কুক্ষিগত করার ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ধার দেবার এ সুসংগঠিত ব্যবস্থার নাম ছিল 'কর্জ-মহল'। চড়া সুদের দেনা শস্য দিয়ে শোধ করার রীতি বহুল প্রচলিত ছিল।

অপরিহার্য আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই আবওয়াবগুলোর

প্রচলন, রীলির এ মন্তব্যের যথার্থতা বিভিন্ন আবওয়াবের উপলক্ষ বিশ্লেষণ থেকে তাই প্রমাণিত হয় না। স্বল্প মেয়াদী বন্দোবস্ত থেকে যথা সম্ভব বেশী মুনাফা করে নেওয়াই জমিদারের উদ্দেশ্য ছিল। তুষখালী তাদের জমিদারী না হলেও তারা ধরে দিয়েছিল চাষীদের উপর তাদের আধিপত্য স্বয়ং সিদ্ধ, প্রশ্নাতীত।

৫.

টাকী-জমিদার বিরোধী বিক্ষোভের ভিত্তি স্পষ্টত উত্তরোত্তর ব্যাপক হয়ে উঠছিল। একটা প্রাসংগিক প্রশ্নঃ প্রিয়নাথের আমলেই (১৮৫৫-১৮৫৮) কেন এ বিক্ষোভ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের রূপ নিল? মাজুলদের হঠানোর জন্য কালীনাথও চেষ্টার কসুর করেনি। রীলির বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, আবওয়াবগুলোর বেশ কয়েকটা তার আমলেই শুরু হয়েছিল। মাজুলেরা তাকে কম বিব্রত করেনি। তাদের জন্য হাওলাদারদেরও নৈতিক সমর্থন ছিল। কিন্তু সুসংগঠিত এমন কোন প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে উঠেনি, যেখানে হাওলাদার এবং কর্ষারাও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। অথচ কালীনাথের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যেই প্রতিরোধের তীব্রতা ক্ষমতা-মদমত্ত প্রিয়নাথের বিপুল স্বৈরাচারী শাসন যন্ত্রকে সম্পূর্ণ বিকল করে দেয়। রাতের অন্ধকারে তাকে প্রাণের ভয়ে পালাতে হয়।

রীলি এর কারণ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণার ভিত্তি বিদ্রোহীদের জবানবন্দী। তার থেকে বিদ্রোহীদের চৈতন্যের আভাসও মেলে। সব জমিদারই স্বৈরচারী, কিন্তু কারো কারোর স্বৈরাচার সহনশীল-তার সীমা ছাড়িয়ে যায় না।

বিদ্রোহীদের বক্তব্যের সারমর্ম এই[১৮]ঃ কালীনাথ দু'তিন বছর অন্তর মহল ঘুরে যেত; 'নগর', 'চাঁদা' এবং নানা আবওয়াব বাবদ হাজার দশ বারো টাকা আদায় করে নিত। কিন্তু চলে যাবার আগে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে গ্রামের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাত। আমলাদের বিরুদ্ধে প্রজাদের নালিশ মন দিয়ে শুনতো, আর প্রতিকারের চেষ্টাও করত।

কালীনাথের আচরণের দুটো দিক তার প্রভুত্বকে প্রজাদের কাছে সহনীয় করেছিল। তার আচরণে প্রজারা কেবলমাত্র অবিমিশ্র অর্থগৃধ্নুতা দেখেনি। আয়ের অংশ কালীনাথ যেভাবে খরচ করেছিল, তার মধ্যে প্রজারা বনেদী জমিদারী মেজাজের ছাপ দেখেছিল। সামাজিক ভোগের ফলে জমিদার আর প্রজাদের স্বাভাবিক দূরত্ব খানিকটা ঘুচে যেত। কালীনাথের ঔদার্য সাময়িক; কিন্তু জমিদারী আধিপত্যের নগ্নরূপ তাতে কিছুটা ঢাকা পড়ত। অন্যদিকে জমিদারী-স্বৈরাচারের প্রত্যক্ষ প্রতিভূ

জমিদার নয়। কারণ জমিদার সুদূরবর্তী, তার অস্তিত্ব দৃষ্টির অন্তরালে। আমলাদের সংগেই প্রজাদের নিত্যনিয়ত প্রত্যক্ষ যোগ। তাই অনেক সময় প্রজাদের ধারণা ছিল, নীতিবোধ বিবর্জিত আমলাদের তাড়ালেই সব অনাচারের অবসান ঘটবে। প্রজারা রীলিকে বলেছে, আমলাদের বিরুদ্ধে তাদের সব অভিযোগ কালীনাথ ধৈর্য ধরে শুনত।

প্রিয়নাথ সম্পর্কে কৃষকদের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। ক্রমেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। আয় বাড়ানোর জন্য তার নূতন নূতন কৌশল এ দূরত্বকে প্রায় দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল। কৃষকরা জানতই না তাদের নানা অভিযোগের কোন প্রতিকার আছে কিনা। প্রিয়নাথের কার্যকলাপ থেকে তাদের এ ধারণা সুদৃঢ় হল যে সমাধানের কোন পথ খোলা নেই। তার স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য আর হঠকারিতা প্রতিকারের ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও উন্মূল করে দিয়েছে। জমিদারের সঙ্গে বিপুল দুস্তর ব্যবধানের বোধ আস্তে আস্তে এক ক্ষমতাহীন বিরুদ্ধতার রূপ নিল।

১৮৫৮ সালের আন্দোলনের পটভূমিকা হিসেবে কৃষকদের এ পরিবর্তিত মনোভাব মনে রাখা দরকার। কারণ আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা ছিল এ সংখ্যা-গরিষ্ঠ শ্রেণীর। প্রিয়নাথ সরকারকে বোঝাতে চেয়েছিল, সব ব্যাপারটাই আসলে মাজুলদের কারসাজি। প্রিয়নাথকে খাজনা না দেবার ফন্দি। এ যুক্তি রীলি খন্ডন করেছেন।[১৯] তাঁর সিদ্ধান্ত, আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মত উদ্যম খর্ব-প্রতাপ মাজুলদের ছিলনা। বিশেষ করে আদালতের মাজুল-বিরোধী রায়ের পর। পুরনো মাজুলরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, রীলির এ ধারণা গ্রাহ্য না হলেও আন্দোলনে মাজুলদের গৌণ ভূমিকা সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত যথার্থ। মাজুলদের সম্পর্কে হাওলাদার এবং সাধারণ কৃষকদের মনোভাব গত দু'এক দশকে পাল্টে গিয়েছিল। কালীনাথ-বিরোধী প্রতিরোধের সময় মাজুলরা কৃষকদের অকুন্ঠ সমর্থন পেয়েছিল। কৃষকদের ধারণা ছিল, মাজুলদের দাবী সম্পূর্ণ বৈধ; ক্ষমতা-চ্যুত সব মাজুলরা আবার ফিরে আসবে। কিন্তু মাজুলদের অধিকার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ক্রমে বাড়ছিল। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালে আদালতের রায়ের পর টাকী বাবুদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই থাকলনা।

অন্যদিকে আয়-বাড়ানোর জন্য প্রিয়নাথের কলা-কৌশল তার কর্তৃত্বকে কৃষকের কাছে অসহনীয় করে তুলেছিল। তার আমলের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 'ইজারাদার' (বা ছে-ইজারাদার) নামক নূতন ধরনের আমলার নিয়োগ।[২০] এ ব্যবস্থা কিন্তু জমিদারের প্রত্যক্ষনিয়ন্ত্রণাধীন 'আমলাতন্ত্র' নয়। এখনকার অবস্থায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যয়সাপেক্ষ

ছিল। আর জমিদারও জানত, অতিরিক্ত খরচের ঝুঁকি না নিয়েও তার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। উদ্দেশ্য যথাসম্ভব দ্রুত মুনাফা বাড়ানো। এর সহজ একটা উপায় বিশেষ সর্তে এ ধরনের ইজারাদারকে খাজনা ও আবওয়াব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া।

ইজারাদার-নিয়োগের পদ্ধতি ও তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিশ্লেষণ করলে প্রিয়নাথের কৌশল পরিষ্কার বোঝা যাবে। এ নিয়োগ অনেকটা নীলামে জমি বিক্রীর মত। সব চাইতে বেশী মুনাফা যোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতিই এ নিয়োগের ব্যাপারে প্রিয়নাথের প্রধান বিচার্য বিষয়। সারা তুষখালী মহল ছাব্বিশ জন ছে-ইজারাদারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। রীলি কেবলমাত্র একটা ডিহির চারজন ইজারাদারের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা কোন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, তা খানিকটা অনুমান করা যায়। তিনজন স্থানীয় মুসলমান হাওলাদার; একজন বাইরের লোক গোবিন্দ গাংগুলী। হাওলাদার বলতে তুষখালীতে সাধারণত যাদের বোঝাত, এ তিন ইজারাদার ঠিক তা নয়। বহুক্ষেত্রে হাওলাদারেরা নিজেরাই চাষ করত, বা কৃষিকাজের তদারকি করত। খুদে গরীব চাষীদের ঋণের টাকা ও শস্য প্রধানত তারাই যোগাতো[২১] কর্ষাদের চড়া খাজনায় চাষের জমি দিত। এ তিন ইজারাদারের নিয়োগের শর্ত থেকে বোঝা যায়, তারা বিশেষ বিত্তবান হাওলাদার। ঠিক হয়েছিল তিন হাজার চারশ টাকা তারা প্রিয়নাথকে খাজনা ইত্যাদি বাবদ দেবে। নিয়োগ-পত্র পাবার আগে অতিরিক্ত ছ'শ পাঁচ টাকা দিতে হয়েছে। আর খুদে আমলাদের খুশী করার জন্য ঘুষ তো ছিলই।

এই হাওলাদারেরা রীলিকে নিজেরাই বলেছে, কেন এত বেশী মূল্যে ও তারা ইজারা পেতে উন্মুখ ছিল। এত খরচ করতে তারা গররাজী থাকলে শুধু মাত্র টাকার জোরে আমলাদের সুপারিশের জোরে বাইরের লোক ঢুকে পড়ত। গোবিন্দ গাংগুলী একাই প্রতিশ্রুত সমগ্র মুনাফার ৩৭.৫% জোগাড় করার দায়িত্ব পেয়েছিল। এধরনের বাইরের লোক ঠেকানোর উদ্দেশ্য ছিল, ইজারা পেলে এরা হাওলাদারদের চাষীদের উত্ত্যক্ত করবে।

নিজের পাওনা নিয়মিত পেয়ে গেলে প্রিয়নাথ ইজারাদারদের কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করতনা। তার আরও এক উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে এক বশংবদ গোষ্ঠী তৈরী করা। তারা সতর্ক থাকবে, সরকারের কাছে তার বিরুদ্ধে কোন নালিশ যাতে না পৌঁছায়। ষোল আর বত্রিশ টাকা মূল্যের দু'ধরনের সাদা ষ্ট্যাম্প কাগজে তাদের সই করে এ ধরনের মুচলেকা দিতে হত।

এ ইজারা-ব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিত প্রজা-শোষণের পথ খুলে দিয়েছিল।

কৃষকদের পক্ষে এর আরো একটা কুফল, প্রতিষ্ঠিত আবওয়াবগুলোর নিয়মিত আদায় সম্ভব হল। কয়েকটা ছাড়া রীলির বিবরণে উল্লেখিত সব আবওয়াব কালীনাথের আমল থেকে চালু ছিল, কিন্তু সবগুলো সম্ভবতঃ নিয়মিত আদায় হতনা। মাজুলদের সংগে সংঘর্ষ চলছিল বলে কালীনাথ এ বিষয়ে খানিকটা ঔদার্য দেখিয়েছিল। যাতে কৃষকেরা সক্রিয় ভাবে মাজুলদের সাহায্য না করতে পারে। মাজুলদের গৌরব ও প্রতাপ আর থাকলনা বলে প্রিয়নাথের ক্ষেত্রে এ কৌশলের প্রয়োজন ছিলনা।

আবওয়াব-আদায়ে এ পরিবর্তনের ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষকদের আর্থিক ক্ষতি অনেক বেড়ে গেল। বিশেষ করে যেখানে চাষীরা বেগার প্রথা এড়াতে পারতনা আর প্রিয়নাথের একচেটিয়া বাজারে কৃষি-পণ্য বিক্রী করতে বাধ্য হত।

বিদ্রোহের আগের কয়েক বছর আগে তুষখালীর পার্শ্ববর্তী সুন্দরবনের অন্যান্য লটে নূতন আবাদের দ্রুত প্রসার ঘটে। জংগল-পরিষ্কার ইত্যাদির জন্য শ্রমের চাহিদা ও মজুরীও বেড়ে যায়। এ প্রয়োজনীয় শ্রমের একটা বড়ো অংশ তুষখালী থেকে আসত। আবাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল বলে অন্যান্য লটের তুলনায় এখানকার জনবসতি ছিল অনেক ঘন। তাছাড়া অবিরত উপদ্রব, দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অশান্তির জন্য কাছের নানা জায়গা থেকে জমি ছেড়ে কৃষকেরা তুষখালীতে চলে আসছিল।[২২] অন্যদিকে আয়ের দিক থেকে তুষখালীর অনেক চাষীর কাছে জংগল-কাটার কাজ চাষবাসের তুলনায় অনেক বেশী আকর্ষনীয় ছিল। শুধুমাত্র বসত-বাড়ীটা রেখে অনেকেই তাই নূতন জীবিকার জন্য তুষখালী ছাড়তেও রাজী ছিল। রীলি এমনও বলেছেন: "জংগল কাটার আয় না থাকলে তারা প্রিয়নাথের হরেক রকমের অন্যায় দাবী মেটাতেই পারতনা"। স্বভাবতই জোর-জুলুম করে চাপানো বেগার প্রথা চাষীদের আর্থিক সমৃদ্ধির পথে একটা বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াল।

কৃষি-পণ্যের বাজারের উপর কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণের ফলেও চাষীরা আগের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে (১৮৫৭) নানা কারণে[২৩] জিনিষপত্রের দাম বাড়তে থাকে। তুষখালী ও বাকেরগঞ্জের অনেক জায়গা ছিল ধানচালের যোগানের দিক থেকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল। স্বভাবতই সিপাহীবিদ্রোহ-প্রভাবিত এক বিরাট এলাকায় তুষখালীর কৃষি-পণ্যের বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। প্রিয়নাথের নূতন ব্যবস্থায় অনেক কৃষক আয়-বাড়ানোর এ সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল।

৬

এতসব সত্ত্বেও হয়ত কৃষকেরা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করতনা। কিন্তু প্রিয়নাথের এক হঠকারিতা তা অনিবার্য করে তুলল। এ চরম অবিবেচনার মূল লক্ষ্য ছিল আবার কুড়ি বছরের জন্য তুষখালীর বন্দোবস্ত পাওয়া। নানা সূত্র থেকে সে জেনেছিল সরকার এ প্রস্তাবে নিমরাজী, কারণ, চাষীদের সঙ্গে তার কোন বনিবনা হচ্ছেনা, সর্বত্র বিশৃংখলা এবং ব্যাপক শান্তি ভংগের সম্ভাবনা। বিপুল মুনাফার লোভে সে বন্দোবস্তটি পাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিল। এর জন্যই তার নির্বোধের মত আচরণ।[২৪]

তার ফন্দি ছিল, সরকারকে বোঝানো, যে তুষখালীর অশান্তির মূলে কৃষকদের খাজনা ফাঁকি দেওয়ার চক্রান্ত। সে ধরে নিয়েছিল, শুধু এ ভাবেই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার কাজে সরকারকে প্রবৃত্ত করা যাবে। খাজনা বন্ধ হলে সরকারের রাজস্বও মিলবেনা। এ ক্ষতি সরকার তাই বরদাস্ত করবেনা। ফরায়েযীদের সম্পর্কে সরকারের অতি বিরূপ মনোভাবের কথা মনে রেখে প্রিয়নাথ এমনও জিগীর তুলল যে সব বিশৃংখলাই ফরায়েযী-জোটের সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রিয়নাথ এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় মেতে ছিল। কৃষকেরা খাজনা বন্ধ করেছে, এ অভিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য সে চেষ্টা করল, যাতে কৃষকের জমি-সংক্রান্ত সব দলিল এবং খাজনার দাখিলা জোর করে কেড়ে নেওয়া যায়। তাহলে তার বক্তব্য খন্ডন করার জন্য কৃষকদের হাতে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকবেনা। এ জোর জুলুমের প্রধান অস্ত্র নূতন ইজারাদারেরা। রী লর ভাষায়, "প্রিয়নাথের হুকুম বরদার এ সব দুরাত্মার দল চাষীদের জোর করে ধরে আনত। তাদের প্রচন্ড মারধোর করত। দাখিলা ও জমির পাট্টা না দিয়ে দেওয়া পর্যন্ত নির্য্যাতন চলত"। দারোগারা ছিল প্রিয়নাথের আর এক নির্ভর। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের অভিযোগও হয়ত অতিরঞ্জিত ছিল। আদালতে তাদের সে সব মামলা তাই খারিজ হয়ে যেত। এ ধরনের ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে দারোগা ও ইজারাদারেরা চাষীদের মিথ্যা মামলায় জড়াতে চাইল। তারা নালিশ করল, চাষীরা ইজারাদারের নৌকো লুট করেছে। ইজারাদারের পক্ষ নিয়ে পুলিশ-বরকন্দাজ বাড়ী বাড়ী তল্লাস করে চাষীদের বেঁধে আনল। একটা মতলব ছিল, পুলিশ-বাহিনীকে বাধা দিতে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের প্ররোচিত করা। তাহলে পুলিশকে হেনস্তা করার অজুহাতে আরো অনেককে গ্রেপ্তার করা যাবে।

এ নূতন চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্যই কৃষকেরা প্রথম সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করল (ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৮)। কারণ এ চক্রান্তে প্রিয়নাথের

সাফল্যের ফলাফল তাদের পক্ষে ভয়াবহ হত। প্রিয়নাথের ফন্দিতে বিভ্রান্ত হয়ে সরকার যদি আবার দীর্ঘদিনের জন্য প্রিয়নাথকেই বন্দোবস্ত দেয়, তার অর্থ হবে কৃষককুলের অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ। বন্দোবস্ত পাওয়ার ব্যাপারে বিফলতা তাকে প্রতিহিংসাপরায়ন করে তুলবে। বন্দোবস্তের বাকী সময়টুকুতে আয় বাড়ানোর জন্য নুতন নুতন উপায় খুঁজবে। জমির কোন দলিল, খাজনার কোন দাখিলা না থাকলে কৃষকেরা তার দাবীর যৌক্তিকতা অপ্রমাণ করবেই বা কি করে? ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত প্রমাণ বিলুপ্ত হলে কৃষকদের দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে। খাজনার দাখিলা লোপ করার চেষ্টা ছাড়াও প্রিয়নাথের অন্য এক গূঢ় অভিসন্ধির কথাও কৃষকেরা জানিত। প্রিয়নাথ চাইছিল কৃষকের জোতজমিকে নিজের খাসদখলের জমিতে রূপান্তরিত করা। কারণ জমিদারের খাসজমিতে চাষীদের প্রথা-বা-আইনসিদ্ধ কোন স্বত্ব ছিলনা। তাদের অনেকটা মজুর হিসেবে গণ্য করা হোত। কিন্তু যে জোত জমির জন্য কৃষকরা বংশ-পরম্পরা নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত খাজনা দিয়ে যেত, তাতে তাদের মোটামুটি স্থায়ী অধিকার জন্মাত। বস্তুতঃ গত দু'বছর ধরে হাট্টা, রাজপাড়া বাটমোর, সারগ্রাইল প্রভৃতি জায়গায় প্রিয়নাথ বিচ্ছিন্ন ভাবে খাসদখলের এলাকা বাড়ানের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কৃষকেরা এখন তাই প্রমাদ গুনল। জোতজমি দখলকারী কৃষক হিসেবে তাদের অস্তিত্বই প্রায় বিপন্ন হতে যাচ্ছিল।

প্রিয়নাথের এ সর্বশেষ মূঢ়তা কৃষককুলের সামগ্রিক বিপর্যয় ঘটাতো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর আগেও তার কার্যকলাপ তাদের পক্ষে উত্তরোত্তর দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল। অথচ তখন তারা বিদ্রোহী হয়নি। কেন?

আসলে সংঘবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত বিক্ষুব্ধ কৃষকের কাছে অতি দুরূহ এক প্রশ্ন বিশেষ করে যেখানে তাদের সংখ্যা বিপুল। (রীলির মতে প্রায় আট হাজার কৃষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্রোহের সংগে যুক্ত ছিল।) এধরনের বিদ্রোহ শুধুমাত্র দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বিরুদ্ধ আক্রোশের চকিত অগ্ন্যুৎপাত নয়। এর প্রকাশ শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন হিংসা নয়। এর প্রাণশক্তি বহু কৃষকের সমবেত সংকল্পের একমুখিতা বা পরাক্রান্ত শত্রুর বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের উপর নিপুনভাবে পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ আঘাত। এ সিদ্ধান্ত নেবার নেপথ্যে বহু চিন্তাভাবনা। এ দুঃসাহসী পদক্ষেপের জন্য অনেক দ্বিধা, সংশয় ও শংকা অতিক্রম করতে হয়। কারণ এর ঝুঁকি অজস্র, পরাজয়ের অর্থ বিনাশ ও হতে পারে। আর শত্রুর উদ্দীপ্ত রোষের কাছে অসহায় আত্ম-সমর্পণ। শত্রু অপ্রতি-

রোধ্য নয়, এ বিশ্বাস যেমন বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করে, তেমনি শত্রুর প্রবলতা সম্পর্কে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বিদ্রোহের পথ থেকে তাদের নিবৃত্ত ও করে।

জমির দলিল ও খাজনার দাখিলা জোর করে কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের আগে বিদ্রোহ না হবার কারণ সম্পর্কে কৃষকদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার পরিচয় রীলির বিবরণ থেকে মেলে। শত্রুর ক্ষমতার উৎস এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও কৃষকদের ধারণা ছিল পরিষ্কার। টাকী-বাবুদের বন্দোবস্ত স্বল্পমেয়াদী। জমিদারীর সঙ্গে এর পার্থক্য মৌলিক। ১৮৫৯ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ এ মেয়াদ শেষ হবে। নূতন বন্দোবস্ত নিয়ে সরকারী মহলে সাম্প্রতিক আলোচনা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। জমি জরিপের ভিত্তিতে আবার নূতন করে বন্দোবস্ত হবে সরকারের এ মনোভাব তারা জানত। কৃষকদের একটা স্থির বিশ্বাস, সরকারী নির্দেশের কোনো রদবদল হয়না, কোন অবস্থাতেই নয়। যে ড্যাম্পিয়ার সাহেবের নাম, তুষখালীর সব কৃষকই দীর্ঘদিন, ধরে জানে, তিনিই এখন বোর্ড অব রেভেন্যুর প্রধান। এ সাহেবেরই নির্দেশ। নূতন বন্দোবস্ত হবে। যদি সত্যি তাই হয়, তাহলে তাদের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ ছাড়াও প্রিয়নাথের জুলুম শাহীর অবসান হবে। রীলির মতে কৃষকদের এ ধারণা "তাদের প্রত্যয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ"[২৫] আর কয়েকটা মাস গেলেই তো তাদের ভোগান্তির শেষ। তদ্দিন পর্যন্ত তাদের ধৈর্য ধরতে হবে। অন্যদিকে ধৈর্যহারা হয়ে বিদ্রোহ করলে তার ফল উল্টোও হতে পারে। প্রিয়নাথের দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল বাহিনীর কথা তারা জানত। এ বাহিনীর দুই প্রধান, পরা-শুল্লা ও কালু, কৃষক সমাজে ত্রাস স্বরূপ। গ্রামের থানা, পুলিশ-বরকন্দাজ অনেকটা তাদের হাতে। কিসের ভরসায় তারা বিদ্রোহে নামবে ?

প্রিয়নাথের শেষ চক্রান্ত তাদের মনে গভীর সংশয়ের সৃষ্টি করল। এ চক্রান্ত সফল হলে সরকারের মনোভাবই পাল্টে যেতে পারে। সরকার ভাবে, প্রিয়নাথের বিরুদ্ধে প্রজা-পীড়ণের অভিযোগ ভিত্তিহীন। কৃষকেরাই যত নষ্টের গোড়া। এ চক্রান্তকে সর্বশক্তি দিয়ে তাই ব্যর্থ করতে হবে। এ নূতন চিন্তার ফল ১৮৫৮ সালের ফেব্রয়ারীতে বিদ্রোহ।

প্রিয়নাথের এ কূট অভিসন্ধির কথা গ্রামে গ্রামে 'অরণ্য বহ্নি'র মত ছড়িয়ে পড়ল। কৃষকেরা ধরেই নিয়েছিল পাল্টা আঘাত অনিবার্য ভাবে আসবে। এ আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য তারা দু'ধরনের কৌশল নিয়েছিল।[২৬] তারা তাদের স্ত্রী এবং শিশু পুত্র-কন্যাদের নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিল। তাদের আশংকা, তাদের জব্দ করার জন্য প্রিয়নাথের লাঠি-

য়ালরা তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেবে। তাদের জমির দলিল ইত্যাদিও তারা সরিয়ে ফেলল। বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় কৌশল আরো গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে শুরু থেকেই তারা স্থানীয় সরকারী প্রশাসনের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। তাদের সংশয় ছিল, শুধুমাত্র নিজেদের শক্তি দিয়ে তারা শত্রুর সংগে এ'টে উঠতে পারবেনা। আশংকাও তাদের ছিল, যে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার চেষ্টায় সরকার তাদের কার্যকলাপকে নানা ভাবে বাধা দেবে। রীলি এবং সুন্দরবনের সহকারী কালেক্টর গোমেস্ তখন তুষখালীতেই ছিলেন। বিদ্রোহীদের দুটো দল আলাদা ভাবে বিদ্রোহের কথা তাঁদের জানাল। এমনকি স্থানীয় দারোগার সংগেও তারা দেখা করল। রীলির মতে, দারোগার কাছে এ নিবেদনের ঘটনা অভূতপূর্ব; গত বিশ বছরে এর দৃষ্টান্ত মেলেনা। সবার কাছে তাদের বিনীত প্রার্থনা, প্রিয়নাথের চক্রান্ত তাঁরা ব্যর্থ করুন।

সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য ছিল। কিন্তু তা মেনে নেবার ফল হল। বিদ্রোহের তীব্রতা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে এল। রীলির উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর মধ্যস্থতায় একটা আপোষ হোক। এর একটা অর্থ, বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা বিদ্রোহের পথ পরিহার করবে। বিদ্রোহীদের মনোভাবেও পরিবর্তন এসেছিল। ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রিয়নাথের মহল ছেড়ে পালাবার পর তারা ভেবেছিল প্রিয়নাথের দুঃসাহসী হঠকারিতার পুনরাবৃত্তি আর তা সম্ভবতঃ ঘটবেনা।

কৃষকদের কৌশলও এখন পাল্টে গেল। তারা চাইল, রীলির মধ্যস্থতায় প্রিয়নাথের সব অবৈধ উপায় পরিত্যক্ত হোক্। পরের মাসে (মার্চ) রীলি তুষখালী এলে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা দরখাস্ত মারফৎ আলাদা ভাবে তাদের অভিযোগ, দাবীদাওয়া জানায়। রীলির বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রতিদিন প্রায় এক হাজার কৃষক তাঁর সংগে দেখা করত। তাঁর কাছে পেশ করা পনেরো শ' ঊনত্রিশটা দরখাস্তের মধ্যে আটশ' তেরটাই প্রিয়নাথের বিরুদ্ধে। সবটার নিবেদন একই—প্রিয়নাথের উৎপীড়ন বন্ধ হোক্, অন্যথায়, তাদের তুষখালী ছেড়ে যেতে হবে।

কৃষকদের অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে রীলির বিন্দু-মাত্র সন্দেহ ছিলনা। প্রিয়নাথের লাঠিয়াল-বাহিনীর কীর্তি-কলাপ তাঁর জানা হয়ে গেছে। আরো লাঠিয়াল জড়ো করার জন্য প্রিয়নাথের ব্যবস্থার কথাও তিনি জানতে পারেন। দারোগা এ সব বন্ধ করার কোনো চেষ্টাই করেনি। আর, দারোগার উপর কৃষকদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। রীলির কাছে তাদের সবারই অভিযোগ, দারোগার সংগে গোপন যোগ-সাজসেই প্রিয়নাথ সব অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

রবীলি কৃষকদের প্রতিকারের আশ্বাস দেন। কিন্তু প্রিয়নাথের ন্যায্য পাওনা তারা মিটিয়ে দেবে, কৃষকদের থেকে এ প্রতিশ্রুতিও তিনি চাইলেন[২৭] দুপক্ষের মধ্যে আপোষের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি প্রথমেই চাইলেন যাতে কোনো রকমে শান্তি ভংগ না হয়। প্রিয়নাথের লোক ও নেতৃস্থানীয় কৃষকদের আদালতে মুচলেকা দিতে হবে, শান্তি-ভঙ্গের সব দায়িত্ব তাদের। অশান্তি হলনা বটে, কিন্তু প্রিয়নাথ নানা ছল করে লাঠিয়াল বাহিনীর দুই সর্দার, পরাশুল্লা ও কান্দুকে, আদালতে হাজির করালোনা।

৮

কৃষকদের পক্ষে বিদ্রোহের সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ফল, প্রবল শত্রুর নৈতিক পরাজয়। পুরনো আত্মবিশ্বাস সে আর ফিরে পায়নি। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত স্পর্ধা ও দম্ভ তার পরের আচরণে আর দেখা যায়নি। বিদ্রোহের পরই 'রাজাবাবু' পরিপূর্ণ উপলব্ধি করল, তার জন্য প্রজাদের কী তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ! তাদের আনুগত্য ও বিশ্বাস ফিরে পাবার আর কোন উপায় থাকল না। তার পুরনো প্রতাপের অন্তসারশূন্যতা সম্পর্কে তার নূতন বোধ তার প্রতিটি পদক্ষেপকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলল। এমন কি লাঠিয়াল ছাড়া নিজের কাছারীকে নিরাপদ রাখতে পারবে কিনা, এতেও তার সংশয় জাগল। রবীলি জানতে পারেন, প্রধানতঃ এর জন্যেই দুই লাঠি-য়াল সর্দারকে বরখাস্ত করার সাহস তার হয়নি। প্রজাদের কোন কোন দাবী তাকে মানতে হল। যেমন নায়েব আর আমীন কাশীনাথ ঘোষকে বরখাস্ত করা। প্রিয়নাথের মত নায়েব ও বিদ্রোহের সময় মহল ছেড়ে পালিয়েছিল। একটা ফৌজদারী মামলাও তার মাথার উপর ঝুলছিল। সে আর ফিরে আসতে সাহস পায়নি। নূতন নায়েব নিয়োগ করা হল। কাশীনাথও বরখাস্ত হল। প্রিয়নাথের পক্ষ হয়ে দেওয়ান তারা চরণ দত্ত প্রতিশ্রুতি দিল। আগামী ডিসেম্বর (১৮৫৮) পর্যন্ত আর কোন অন্যায় দাবী-দাওয়ায় কৃষকদের উত্যক্ত করা হবেনা।

আপোষের জন্য রবীলির সব শর্ত কিন্তু কৃষকেরা মানল। সব চাইতে কঠিন শর্ত ছিল। ন্যায্য খাজনার এক-চতুর্থাংশ তারা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দিয়ে দেবে প্রচলিত প্রথানুযায়ী খাজনার এক-চতুর্থাংশ শীত-মরসুমের আগে দিতে হত। বাকীটা ফসল উঠার পর ডিসেম্বর ও জানু-য়ারীতে আদায় হত। রবীলির শর্ত মতে, এক-চতুর্থাংশ নূতন বাংলা সালের শুরুতেই দিতে হবে। (১৮৫৮-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ)।

এ শর্ত মানাও ছিল কৃষকদের সমবেত সিদ্ধান্ত, এবং তাদের প্রতিরোধ

আন্দোলনের একটা কৌশল। তাদের আশা ছিল, খাজনা না দেবার কুমতলবে কৃষকেরা একজোট হয়েছে, প্রিয়নাথের এ অপবাদ এতে অপ্রমাণিত হবে। এ শর্ত মানতে গিয়ে কৃষকেরা যে সুগভীর ঐক্য ও সংহতিবোধ দেখিয়েছিল, তা রীলিকে বিস্মিত করেছিল। সাড়ে তের হাজার টাকা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তারা দিয়ে দিল। ফসল ওঠার অনেক আগে দিতে হল বলে তাদের অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হল। তাদের অন্য কোন সম্পত্তি বিক্রী করে বা বন্ধক রেখে তারা প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করল। বলাই বাহুল্য, সবার এ সামর্থ্য ছিলনা। অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীরা দুঃস্থ কৃষকদের ধার দিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিশোধের কোনো শর্তই ছিলনা। ফসল ওঠার পর ডিসেম্বরে সব দেনা শোধ করা হবে, শুধু এ মুখের কথাই যথেষ্ট ছিল।

৯

বিদ্রোহী কৃষকদের চেতনার রূপ বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা এক বিশেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিঃ চরম আঘাতটি আসা পর্যন্ত কৃষকেরা কেন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেছিল? এ বিষয়ে কৃষকদের মনোভাব স্পষ্ট। বিদ্রোহ আসলে ক্ষমতার লড়াই। লড়াইয়ের পথ নানা হতে পারে। যদি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়াও প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার বিকল্প কোন উপায় থাকে, তাহলে তাই কৃষকদের পক্ষে অধিক গ্রহণীয়। কারণ সংঘর্ষের ঝুঁকি অনেক। ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তো আছেই। প্রিয়নাথের বন্দোবস্তের মেয়াদ এমনিতেই বছর খানেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এ সময়ের জন্য তারা তাই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী। কিন্তু প্রতিপক্ষের কৌশলে আকস্মিক পরিবর্তন, তাদের দীর্ঘদিনের নিশ্চিত এ প্রত্যয় প্রায় ভেঙ্গে দিল। কারণ, এ কৌশলের সাফল্যের অর্থ তাদের অস্তিত্বের সংকট। সংঘর্ষ ছাড়া এ কৌশলকে ব্যর্থ করার আর কোন উপায় থাকল না। তাদের জয় হবেই, এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েও তারা লড়াইয়ে নামেনি। তারা নামল অন্য কোন উপায় ছিলনা বলে।

পরিপূর্ণ জয়ের আগেই যে তারা সংঘর্ষের পথ থেকে সরে এল; তার একটা সম্ভাব্য কারণ নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয়। শত্রুর চরম আঘাত প্রতিহত হল বটে; কিন্তু তার বিপুল শক্তি অক্ষতই থাকল। সরকারী মধ্যস্থতায় যে আপোষের পথ তারা বেছে নিয়েছিল তার ফল তাদের পক্ষে মারাত্মকও হতে পারত, বিশেষ করে যদি তাদের সম্পর্কে সহানুভূতিলেশহীন কোন রাজকর্মচারীর উপর আপোষের দায়িত্ব বর্তাত। রীলির মনোভাব মোটেই সর্বজনগ্রাহ্য সরকারী মহলের

মনোভাব নয়। মোরেল-বিরোধী আন্দোলনের আলোচনায় আমরা দেখব, রাজকর্মচারীদের অনেকেই বিদ্রোহীদের সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ, পক্ষপাত-দুষ্ট ধারণা পোষন করতেন। সম্ভবতঃ নূতন লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর ক্যাম্বেলের হস্তক্ষেপ না ঘটলে বিদ্রোহীদের দমনে সরকারী শাসন-যন্ত্র অনেক বেশী সক্রিয় হত।

এমন কি আপোষের জন্য রীলির ও কয়েকটা শর্ত কৃষকদের পক্ষে খুবই দুরূহ ছিল, বিশেষ করে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই খাজনার এক-চতুর্থাংশ দিয়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা। অথচ আমীন কাশীনাথ ঘোষকে বরখাস্ত করা ছাড়া প্রতিপক্ষকে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। দুই কুখ্যাত লাঠিয়াল সর্দারের গায়ে হাত পড়েনি। যে ইজারাব্যবস্থাকে রীলি নিজেই কঠিন সমালোচনা করেছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সংস্কারের কোনো প্রস্তাবও তার ছিলনা।

১০

এ আন্দোলনের সংগঠনে আবাদী–তালুকদার বা মাজুল গোষ্ঠীর ভূমিকা যে নিতান্তই গৌন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ আন্দোলন যে প্রধানতঃ কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন, তা নানা সূত্র থেকে অনুমাণ করা যায়। কিন্তু কৃষক-সমাজেও বৈষম্য ছিল। একটা স্তর ভেদ ছিল প্রাসঙ্গিক প্রশ্নঃ কোন গোষ্ঠী কি এ আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল ?

রীলির বিবরণ থেকে তুষখালীর কৃষক সমাজে স্তরভেদ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা চলে। কোন কোন রাজকর্মচারীরা কৃষক বলতে হাওলাদারের উল্লেখ করেছেন। এ ধরণের সমীকরণ ভ্রান্ত। হাওলা-দারদের কেউ কেউ সরাসরি চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল; নিজেরাই চাষ করতো, বা চাষের তদরকি করত। আবাদের কাজে এদের প্রধান ভূমিকার কথা সবাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পুরনো হাওলাদারদের মধ্যে অনেকেরই এ সক্রিয় ভূমিকা আর থাকল না। তাদের অধস্তন গোষ্ঠীর উদ্যোগই নূতন আবাদের বনিয়াদ। তাদের আঞ্চলিক নাম কর্ষাদার। আসলে জোতজমি ও বিত্তের দিক থেকে সব কর্ষাদার মোটেই সমগোত্রীয় ছিলনা। রীলি যাদের 'খুদকস্ত রায়ত'[২১] এবং 'স্থায়ী বসবাসকারী' রায়ত বলেছেন তাদের অনেকেই এক সময়ে কর্ষাদার ছিল।

স্বভাবতই, কর্ষাদারের উপর হাওলাদারদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ যেখানে অপেক্ষাকৃত শিথিল, সেখানে কর্ষাদার শ্রেণী থেকে মোটামুটি সম্পন্ন এক কৃষক-গোষ্ঠীর উদ্ভব সম্ভব ছিল। এ ছাড়া প্রধানতঃ দুই ভাবে টাকী বাবুদের আমলে এ আদি কৃষক সমাজে স্তরভেদ ঘটতে থাকে।[১] তুষ-

খালীর পাশ্ববর্তী সুন্দর বনের অন্যান্য লটে নূতন আবাদের দ্রুত প্রসার তুষখালীর কৃষকদের কাছে আয় বৃদ্ধির নূতন সুযোগ আনে। এক সমৃদ্ধ কৃষকদের গোষ্ঠীর বিকাশ এই ভাবে ঘটে,[২] অন্যদিকে পুরনো কৃষক এক উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের জমি ও নানা অধিকার হারায়। টাকীবাবুদের মহল-পরিচালনার নূতন রীতিনীতি এর প্রধান কারণ। কৃষকদের জমি আত্মসাৎ করেই তারা খাস-তালুকের এলাকা বাড়ায়। নূতন চাষীদের প্রথা-ও-আইন সিদ্ধ-কোন অধিকার ছিলনা। 'কাঠি-খরচ' দিয়ে যাবে, এ শর্তে টাকীজমিদার অনেক বহিরাগতকে জমি বিলি করে। এ জমি কোন কোন ক্ষেত্রে অনাবাদী ছিল। অনেক ক্ষেত্রে 'কাঠি-খরচা' যোগাতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক চাষীদের জমি এ ভাবে দেওয়া হতো। রীলি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, প্রিয়নাথ এবং তার আমলারা কি ভাবে নানা অজুহাতে জমি ঝাড়াও কৃষকদের নানা অস্থাবর সম্পত্তি—যেমন, বসতবাটি, নারকেল ও সুপারী গাছ—দখল করে নিয়েছে।

আন্দোলনে এ কৃষক-সমাজের কোন গোষ্ঠীর বিশেষ ভূমিকা ছিল কিনা অনুমান করা শক্ত। বস্তুতঃ, টাকী জমিদারদের স্বৈরাচার সর্ব-শ্রেণীর কৃষকদের স্বার্থ নিদারুণ ক্ষুন্ন করেছিল। ব্যতিক্রম তারা যারা আমলাদের দাক্ষিণ্যে জমিতে অধিকার কায়েম করতে পেরেছিল। তবুও মনে হয়। কৃষকদের মধ্যে সম্পন্ন এক অংশ প্রতিরোধের সংগঠনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিল। এর একটা মাত্র প্রমাণ রীলির বিবরণে মেলে। তার মধ্যস্থতায় আপোষ হবার একমাসের মধ্যেই কৃষকেরা বাৎসরিক খাজনার এক-চতুর্থাংশ দিয়ে দেয়। নূতন ফসল ওঠার তখনও প্রায় সাত আট মাস বাকী। বাইরের কোন সূত্র থেকেবিন্দুমাত্র সাহায্য আসেনি। এর মাত্র দু'মাস আগে তাদের অনেক বাড়তি খরচও হয়েছে। স্ত্রী এবং শিশুদের নিরাপদ জায়গায় পাঠানো ছাড়া এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলা ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার। সম্পন্ন কৃষক ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে এ দায়-দায়িত্ব মোটানো সহজসাধ্য ছিলনা।

১১

দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে (১৮৭২-৭৫) যে সম্পন্ন কৃষক গোষ্ঠীই সব চাইতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৬০ এর দশকে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধির ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। অনেক বেশী সংহত এবং ব্যাপক হয় ফরায়েযী গোষ্ঠীভুক্ত কৃষকদের সামাজিক সংগঠন। স্বভাবতই, নিশ্চততর প্রত্যয় নিয়ে তারা প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল।

নানা ভাবে এ গোষ্ঠীর সমৃদ্ধির পথ সুগম হয়েছিল। প্রিয়নাথের অপসারণের পর রীলির নূতন ব্যবস্থার (১৮৫৯-৬০) অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৯] রীলির মূলনীতি ছিল, সরকার সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে। মধ্যবর্তী কারোর কোন অধিকার স্বীকার করা হবেনা। টাকী জমিদারের আমলের নূতন সব হাওলাদারী স্বত্ব অবৈধ। কারণ আদালতের সাম্প্রতিক রায় অনুযায়ী, টাকী-জমিদারের বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এ স্বত্বেরও বিলোপ ঘটল। হারানো অস্থাবর সম্পত্তির খানিকটাই হয়ত কৃষকেরা ফিরে পেল। কিন্তু সরকারী আইনে তাদের ভূমিস্বত্বের স্বীকৃতি তুষখালীর গ্রামীণ সমাজে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। প্রায় দশহাজার কৃষকের সঙ্গে আলাদা ভাবে বন্দোবস্ত হয়। শুধু এ আইনগত স্বীকৃতিই সম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রাজস্বের গুরুভার এ বিকাশকে অনিবার্য ভাবে ব্যাহত করত। রাজস্ব মেটাতে গিয়ে যদি কৃষকের সঞ্চয় নগণ্য হয়ে যায়, তাহলে জমির মূল্যই বা কি ? রীলির নূতন ব্যবস্থা কৃষকের সম্পদ বৃদ্ধির পথ সুগম করেছিল। টাকী-জমিদারের আমলের সব আবওয়াব অবৈধ ঘোষিত হল। এর অর্থ এক দুর্বহ ভার থেকে কৃষকের মুক্তি। রীলি দু'শ কৃষকের খাজনার হিসেব পরীক্ষা করে জানেন, মূল জমা ছাড়া ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ আবওয়াবের জন্য দিতে হত।[৩০ক] রীলির বন্দোবস্তে রাজস্বের সর্বোচ্চ নিরীখ ছিল বিঘা প্রতি এক টাকা চার আনা। মোরেলের সঙ্গে নূতন চুক্তির সময় (জানুয়ারী ১৮৭১) পর্যন্ত এটা বাড়েনি। কৃষকদের একটা ধারণাই হয়ে গিয়েছিল এ নিরীখ অপরিবর্তনীয়। রীলি কিন্তু এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দেননি। ১৮৭০ সালের জুন মাসে বাকেরগঞ্জের সহকারী কালেক্টর মহেন্দ্রনাথ বসু তুষখালী-সংলগ্ন চারটে মহলে খাজনার হারের সঙ্গে তুষখালীর হারের পার্থক্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন মোটামুটি সমান ধরণের জমির জন্য তুষখালীর নিরীখ অনেক কম।[৩০খ]

জমির উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধি বিশেষ এক কৃষক গোষ্ঠীর সমৃদ্ধির আর একটা প্রধান কারণ। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, নানা ধরণের উপদ্রব ও অশান্তির জন্য অনেক কৃষক পাশ্ববর্তী মহল ছেড়ে তুষখালীতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। তা ছাড়া, ১৮৬০ এর দশকে ধান-চালের রপ্তানী বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের মূল্যের ঊর্ধগতি ও জমির আকর্ষণ অনেক বাড়িয়ে দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই কৃষিপণ্যের দাম বাড়তে থাকে। বিদ্রোহ শেষ হবার পর পণ্য-সরবরাহ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। বিশাল সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির জন্য কৃষিপণ্যের

চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে দামও বেড়ে যায়। বিদ্রোহের পর মূল্যবৃদ্ধির এ প্রবণতা হ্রাস পায়। ১৮৫৬/৬৬ সালের অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় থেকে আবার দ্রুত দাম বাড়তে থাকে। বাংলার পশ্চিমাংশ ও বিহারের বিস্তৃত অঞ্চলে ধান চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য তুষখালী ও পূর্ব-বাংলার দুর্ভিক্ষ মুক্ত অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ শস্য রপ্তানী হয়। দুর্ভিক্ষের পরে দাম পড়ে যায়, কিন্তু প্রাক্-দুর্ভিক্ষ মূল্যস্তরের অনেক ঊর্ধ্বে থাকে।

জমি বেচাকেনার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কোর্ফা চাষের প্রসার[৩০গ] তুষখালীতে জমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা যায়। আবার এর, ফলে সম্পন্ন কৃষকের প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধিও বাড়ে; যদিও নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থা এবং কৃষিপণ্যের সম্প্রসারিত বাজারের তুলনায় এই দুই পরিবর্তনের ফল অনেক সীমাবদ্ধ।

কৃষকের জোতজমি হস্তান্তরের অধিকার তখন ও আইন-সিদ্ধ-ছিলনা। বস্তুত, ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের আগে কোথাও আইনে এ অধিকার স্বীকৃত হয়নি। ১৮৮৫ সালের আইনেও এ স্বীকৃতি নিঃশর্ত নয়। বলা হয়েছিল, যেখানে হস্তান্তর আঞ্চলিক প্রথা-সম্মত, শুধু সেখানেই আদালত তাকে মানবে। কিন্তু আইন যাই বলুক, জমি বেচাকেনা হামেশাই হচ্ছিল, জমিদারী এলাকায় জমিদার দীর্ঘদিন এ হস্তান্তরকে নানা ভাবে বাধাদেবার চেষ্টা করেছে। স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্ত বলে টাকী জমিদার তা সম্ভবতঃ করেনি।

বাধানিষেধহীন জমি-হস্তান্তর সম্পন্ন কৃষকদের দু'ভাবে সাহায্য করেছিল। ছড়ানো নানা খুদে জোতের বদলে একটা বড়ো জোতের সৃষ্টি এ ভাবে অনেক সহজ হল। চাষের সামগ্রিক খরচও তাতে কমল। তাছাড়া শুধুমাত্র জমির জোরে অনেক সহজ শর্তে মহাজন থেকে ধার মিলত। যেখানে জমি-বেচাকেনার বৈধতা প্রশ্নাতীত নয়, সেখানে স্বভাবত সুদের হার চড়া হতো।

অন্যদিকে জমির ব্যাপক চাহিদা ছিল বলে সম্পন্ন চাষীরা নিজেদের জমির কিছু অংশ কোর্ফাদের কাছে বিলি করে আয় বাড়াতে পেরেছিল। কারণ তাদের খাজনার নিরিখ কোর্ফাদের তুলনায় অনেক কম ছিল।

তুষখালীর কৃষকদের এক বৃহৎ অংশ ছিল ফরায়েযী গোষ্ঠীভুক্ত।[৩১] ১৮৬০ এর দশকেই তাদের সামাজিক সংগঠন সুদৃঢ় হয়। আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে ফরায়েযী সংগঠনের বিকাশে এক বিশেষ প্রবনতার আলোচনা করেছি। আদি সংগঠনে প্রাণশক্তি ছিল এক ধর্মীয় চেতনা, এবং নূতন বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নূতন ধর্মমত প্রচারে

বিপুল উৎসাহ। এ প্রথম প্রেরণা উত্তরোত্তর নিস্তেজ হয়ে এল। ক্রমেই প্রবল হল শ্রেণী-চেতনা। তীব্রতর হল শ্রেণী-শত্রুদের সংগে সংঘর্ষ। বিন্যাসের দিক্ থেকে পুরনো সংগঠনে কোথাও আমূল পরিবর্তন হয়নি। যা কিছু নূতন, তা উদ্দেশ্যে এবং অনুপ্রেরণায়, এবং অনিবার্য-ভাবে উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ে ও কৌশলে। এ নূতন সংগঠন মোরেল বিরোধী প্রতিরোধে কিভাবে সংহতি এনেছিল, তা পরে আলোচিত হয়েছে।

১২

তুষখালীর নূতন বন্দোবস্তের (জানুয়ারী, ১৮৭১) প্রায় শুরু থেকেই মোরেলের সঙ্গে গভীর আত্ম-প্রত্যয়-দৃপ্ত এ সম্পন্ন কৃষক-গোষ্ঠীর সংঘর্ষ শুরু হয়। মহল-পরিচালনায় মোরেলের নূতন কায়দায় তারা বিপন্ন বোধ করল ; বিশেষ করে প্রতিপক্ষের বিপুল পরাক্রমের জন্য।

সুন্দরবন অঞ্চলে মোরেলের প্রতিপত্তি এ বন্দোবস্তের আগেই সু-প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ অঞ্চলের যে চারটে মহল[৩২] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় ছিল, তার দুটো মোরেলের জমিদারীতে। সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চল মোরেল আবাদের জন্য সরকার থেকে ইজারা নিয়েছিল। আসলে এর বিশাল অংশ প্রথমে টাকী জমিদারের ইজারায় ছিল। অতি সামান্য অংশ তারা আবাদ করতে পারল। প্রধানতঃ মোরেলের চেষ্টাতেই এখানে চাষের দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৮৬০ সালে দুটো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে[৩৩] অঞ্চলের উপর নবাব আবদুল গণির কর্তৃত্ব অবৈধ ঘোষিত হলে রণীলি মোরেলের হাতে রাজস্ব-আদায়ের ভার দেন। শর্ত ছিল সংগৃহীত রাজস্বের পঁচিশ শতাংশ মোরেল পাবে। জমিদারী, ইজারা এবং তহশীলদারী ছাড়া ধান-চালের রপ্তানী থেকেও মোরেলের প্রচুর আয় হত। মোরেলগঞ্জ ধানচালের ব্যবসা এত প্রসার লাভ করে যে, ১৮৭০ সালে এ গঞ্জকে সরকার বন্দর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

মোরেলের ক্ষমতার একটা প্রধান উৎস সরকারের আনুকূল্য। প্রিয়নাথের অপসারণের পর থেকে ১৮৭১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত তুষখালী ছিল সরকারী পরিচালনায়। কিন্তু এই এগার বছরের মধ্যে প্রায় আট বছর রাজস্ব-আদায়ের ভার ছিল মোরেলের উপরই। অনুমান করা যায়, এ দীর্ঘকালের যোগ সেখানে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল।

মোরেলের উদ্যম এবং উদ্দেশ্যের প্রশংসায় সরকারী মহল ছিল পঞ্চমুখ। "জবরদস্ত য়ুরোপীয় জমিদার"[৩৪] হিসেবে তার উপর ছিল গভীর আস্থা। তাকে তুষখালীর বিশ বছরের বন্দোবস্ত দেবার আগে ফরায়েযী-আন্দোলন দমনে তার অকুণ্ঠ সাহায্যের কথা সরকার গভীর

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।[৩৫]

মোরেলের উপর সরকারের আস্থার একটা বড়ো প্রমাণ সরকার তুষখালীকে জমিদারী হিসেবে বিক্রী না করে মোরেলকে তার বন্দোবস্ত দেন। ঢাকা বিভাগের কমিশনার ছাড়া প্রায় সব রাজকর্মচারীর মত দিল[৩৬] তুষখালীতে জমির নিরিখ বাড়ানো দুঃসাধ্য ব্যাপার; বাড়তি রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি মোরেল তাই রাখতে পারবেনা; তাদের ধারণার ভিত্তি তুষখালীর কৃষকদের মেজাজ সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান; এ মহল বিক্রী করে দিলেই খাজনা-বাড়ানোর সব দায়-দায়িত্ব আর ঝামেলা থেকে সরকার রেহাই পাবে; বিক্রীর টাকা সুদে খাটানোর আয় প্রত্যাশিত রাজস্বের পরিমাণ থেকে বেশী বই কম হবেনা। বোর্ড অব রেভেন্যুও এ যুক্তি মানেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোরেলকেই বন্দোবস্ত দেওয়া হল। বাড়তি রাজস্বের প্রলোভন অবশ্যই ছিল। কিন্তু মোরেলের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে না উঠলে সরকারের দ্বিধা হয়ত অতি সহজে কাটতনা।

১৩

কৃষকদের সঙ্গে মোরেলের বিরোধের কারণ তার তুষখালী-মহল-পরিচালনায় বিশিষ্ট রীতি। প্রধানতঃ তিনটে উদ্দেশ্যে মোরেল এ বন্দোবস্ত পেতে বিশেষ আগ্রহী ছিল: খাজনার হার বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধি; তার অন্যান্য সুন্দরবন লটে আবাদের জন্য তুষখালী থেকে শ্রমের যোগান; এবং তার বিস্তৃত রপ্তানী ব্যবসার জন্য এ সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে কৃষি-পণ্যের সংগ্রহ।

বন্দোবস্তের একটা শর্ত ছিল, মোরেল সরকারকে বছরে অতিরিক্ত পনেরো হাজার টাকা রাজস্ব দেবে।[৩৭] তার দৃঢ় ধারণা ছিল, সে খাজনার নিরিখ বাড়াতে পারবে; তাহলে সরকারের বাড়তি পাওনা মিটিয়েও তার প্রচুর মুনাফা থাকবে। মোরেলের সংগে সবশুদ্ধ ছেষট্টি হাজার আটশ ছাপ্পান্ন বিঘার বন্দোবস্ত হয়েছিল। বিঘা প্রতি চার আনা খাজনা বাড়িয়েছিল। তা থেকে বাড়তি আয় হতো ষোল হাজার সাতশ চৌদ্দ টাকা। তা ছাড়া মাথা পিছু প্রত্যেক কৃষক-পরিবারকে অতিরিক্ত দশ টাকা দিতে বলা হল। অবশ্য এক কালীন। প্রায় আট হাজার কৃষকের সঙ্গে মোরেল বন্দোবস্ত করেছিল। তা বাবদ প্রত্যাশিত আয় প্রায় আশি হাজার টাকার মত। তা ছাড়া মোরেল ধরেই নিয়েছিল বন্দোবস্তের বিশ বছরের মধ্যে আবার নিরিখ বাড়ানো সম্ভব হবে। আইনের বিধান তার পক্ষে। সরকারী মহলে নিরিখ-বৃদ্ধির বৈধতা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য হত; জমিদারী এলাকায় এ বৃদ্ধি তো অতি সাধারণ ঘটনা। বস্তুতঃ, প্রথম বৃদ্ধি থেকে মোরেলের অতি সামান্য মুনাফা থাকত—হাজার দেড়েকের

কিছু বেশী। তার প্রত্যাশা ছিল, পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধি থেকেই তার মোটা মুনাফা আসবে।

মোরেলের কাছে তুষখালীর একটা বড়ো আকর্ষণ ছিল। তার সুন্দরবনের অন্যান্য লটের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম এখান থেকেই জোগাড় করা যাবে। মোরেল সরকারের কাছে এটা খোলাখুলিই বলেছিল। সংঘবদ্ধ কৃষক-আন্দোলনের ফলে খাজনা-আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হবার উপক্রম হলে সরকার মোরেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত বাতিল করার কথা ভাবছিলেন। মোরেল বোঝাতে চাইছিল, এর ফল তার পক্ষে মারাত্মক হবে। বোর্ড অব রেভেন্যুর ভাষা অনুযায়ী, মোরেলের আশংকা, তার পক্ষে এর ফল "সম্পূর্ণ বিনাশ",[৩৮] কারণ তার পক্ষে অপরিহার্য শ্রমের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে।

মোরেলের অভিজ্ঞতা, কোন মহলের বন্দোবস্ত তাকে শুধুমাত্র খাজনা আদায়ের অধিকার দেয়না; তাকে দেয় গ্রামীণ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপক ক্ষমতা। এ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছাড়া প্রয়োজনীয় শ্রম জোগাড় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'নীল তদন্ত কমিশনের'[৩৯] কাছে মোরেল তার এ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন; বিশেষ করে পাশ্ববর্তী এলাকার জমিদারদের বিরোধিতার কথা।[৪০] এমনও হয়েছে লাঠিয়াল পাঠিয়ে প্রতিপক্ষ জমিদারেরা তার নৌকো লুট করিয়েছে। আমাদের কাছে নিযুক্ত শ্রমিকদের নূতন বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। জমিদারের উদ্দেশ্য লুঠ করা নয়। তারা চেয়েছিল, কাছাকাছি কোথাও নূতন গ্রাম, নূতন বসতি না গড়ে উঠুক। তাদের ভয় ছিল, তা না হলে কৃষকেরা তাদের মহল ছেড়ে সেখানে চলে যাবে। কৃষকদের কাছে জমিদারের উৎপীড়ণ এড়ানোর এটাই সহজতম উপায়।

শুধুমাত্র পাশের জমিদারের বৈরিতা কাটানোর জন্য মোরেল 'জমিদারী কর্তৃত্ব' চায়নি। এ কর্তৃত্বের জোরে মজুরী বাবদ খরচ অনেক কমানো যেত। কারণ প্রচলিত হারে মজুরী এ ক্ষেত্রে কদাচিৎ দেওয়া হত। প্রিয়নাথ ঠিক এ ভাবেই শ্রমিক জোগাড় করত। মোরেলও যে অবৈধ প্রভাব খাটাত, সরকারী মহলে তা একেবারেই অজানা ছিলনা। ঢাকা বিভাগের কমিশনার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বোর্ড অব রেভেন্যুকে লেখেন:[৪১] "ইজারা পাওয়াতে মোরেলের আসল উদ্দেশ্য যে সম্পত্তির আয় থেকে মুনাফা করা নয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্য, 'জমিদারী প্রভাব' খাটিয়ে সুন্দরবনে তার অন্যান্য লটের জন্য এ জনবহুল মহল থেকে মজুর জোগাড় করা"। তুষখালী বন্দোবস্ত বাতিল হলে মজুর যোগানোর জন্য মোরেলের অগ্রিম দাদনের সব অর্থ জলে যাবে—এ যুক্তিও বোর্ডের কাছে গ্রহণীয় ছিলনা। বোর্ড নিঃসন্দেহ ছিল, ন্যায্য মজুরী দিলে শ্রমিক পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়। 'সম্ভবতঃ, মোরেল এ উপায় গ্রহণ করতে নারাজ।

অবৈধ কোন ব্যাপার চললে সরকার তো আর চোখ বুজে থাকতে পারবেনা'।[৪২]

রপ্তানী-ব্যবসার স্বার্থেও তুষখালীর বন্দোবস্ত মোরেলের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান ছিল। মহাজনীর জোরে টাকী-জমিদার অপেক্ষাকৃত কম দামে প্রজাদের থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করত, এটা আগেই বলেছি। মোরেলের সুদের কারবার ছিল কিনা জানা নেই। 'নীল তদন্ত কমিশনে'র কাছে সুন্দরবন কমিশনার রীলির সাক্ষ্য[৪৩] থেকে জানতে পারি, ধান চাল জোগানোর জন্য মোরেল শুধুমাত্র খোলা বাজারের উপর নির্ভর করতনা। রীলি ধানের ব্যাপারীদের ধান সংগ্রহের উপায় ব্যাখ্যা করেছেন। বছরের নির্দিষ্ট কোন সময় তারা চাষীদের দাদন দিত। শর্ত ছিল, ফসল ওঠার পর চাষীরা ফসল মারফৎ ব্যাপারীর পাওনা মিটিয়ে দেবে। সাধারণতঃ দাদনের সময় বাজারে ধান-চালের যোগানে টান পড়ত বলে তার দামও বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশী থাকত। দাদনের টাকাকেই ধারের পরিমাণ হিসেবে ধরা হত; এ অর্থে সে সময় যা শস্য পাওয়া যেত তাকে নয়। ফসল ওঠার পর দাম থাকত পড়তির দিকে। সে সময় দাদনের টাকায় প্রাপ্য শস্যের পরিমাণ তাই অনেক বেশী। সম্পন্ন চাষীরাও কেন এ পর্বে তাদের শর্ত মেনে নিত, রীলি তা ব্যাখ্যা করেননি। সম্ভবতঃ বহু দূরের বাজারে শস্য রপ্তানী তাদের পক্ষে সহজ-সাধ্য ছিলনা। বাজার প্রধানতঃ কলকাতা ও তার আশে পাশের অঞ্চল। এ অসুবিধের জন্যই হয়ত কৃষকেরা প্রতিষ্ঠিত ব্যাপারীর উপর নির্ভর করত।

মোরেল কৃত্রিম কোন উপায়ে ধানচালের কেনার বাজারে তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল কিনা জানা নেই। অন্ততঃ চুনা এবং পান, এ দুটো ক্ষেত্রে টাকীবাবু এবং মোরেল একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৭৫ সালে তুষখালী পরিক্রমার সময় তদানীন্তন সুন্দরবন কমিশনার গোমেস[৪৪] দেখেন, এখানকার চারটে[৪৫] বাজারের মধ্যে তিনটাতে সওদা প্রায় বন্ধ। কারণ হিসেবে তিনি এ কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করেন। এ দুটো পণ্যের উৎপাদন সীমিত ছিল বলে তাদের বাজারও সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যেত। ধান চালের ক্ষেত্রে খুদে ব্যাপারীর সংখ্যা অনেক বেশী। বাজারও ছড়ানো। সেখানে হয়তো প্রচন্ড জোর-জুলুম ছাড়া এ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সফল হতে পারতোনা।

১৪

কৃষক-আন্দোলনের বিশ্লেষণে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন—আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা কোন কৃষক গোষ্ঠীর? বিদ্রোহীদের দাবীদাওয়া থেকে আন্দোলনের

এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

তুষখালীর ক্ষেত্রে এ দাবীদাওয়ার একটা লক্ষণীয় দিক, মজুর-সংগ্রহ ধান বেচাকেনা, আবওয়াব আদায় ইত্যাদি সম্পর্কে মোরেলোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই বিদ্রোহীরা রাজকর্মচারীদের কাছে করেনি। সরকারী নথিপত্রে আবওয়াবের উল্লেখ বিশেষ নেই। কিন্তু অন্য দুটি ক্ষেত্রে যে মোরেলের নীতি অনেক কৃষকের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুন্ন করেছিল, তা সন্দেহাতীত। অথচ বিদ্রোহীদের একমাত্র দাবী, আইন বহির্ভূত উপায়ে খাজনা বাড়ানো চলবেনা। আকস্মিকভাবে পঁচিশ শতাংশ খাজনা-বৃদ্ধির দাবী কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আয় বাড়ানোর জন্য মোরেলের অন্য সব অবৈধ উপায় সম্পর্কে বিদ্রোহীদের নীরবতা বিস্ময়জনক।

খাজনার প্রশ্ন জমিতে অধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই কৃষক সমাজের কোন্ গোষ্ঠী এ অধিকার রক্ষার সংগ্রামে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক।

রাজকর্মচারীদের অনেকেরই ধারণা ছিল, এ আন্দোলন মুখ্যতঃ বিত্ত-শালী হাওলাদারদের আন্দোলন। সাধারণ কৃষকের স্বার্থের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। ঢাকা বিভাগের কমিশনারের মতে[৪৬] হাওলাদারেরা খাজনার নিরিখ অপরিবর্তনীয় রাখতে দৃঢ়সংকল্প। এ প্রয়াস শুধু তুষখালীতেই সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই হাওলাদারেরা গ্রামীণ সমাজে শক্তিশালী গোষ্ঠী, সেখানেই এ বিরোধ ছড়িয়ে পড়ছে। পূর্ববঙ্গের বহু জায়গায় হাওলা-দারের সঙ্গে জমিদারের সাম্প্রতিক বিরোধের দু'টি প্রধান পর্যায়। গোড়ার দিকে হাওলাদারের প্রধান লক্ষ্য ছিল, ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিধান অনুযায়ী জমিতে 'দখলী স্বত্ব'[৪৭] অর্জন করা। এ সংগ্রামে তারা বিজয়ী। একটানা বার বছর নির্দিষ্ট খাজনায় জমি দখলে রাখতে পারলে এ অধিকার মিলত। তাদের এ স্বত্ব অত্যন্ত মূল্যবান। শুধু আদালত মারফত তাদের খাজনা বাড়ানো যাবে। তাও আবার সুনির্দিষ্ট কয়েকটা শর্তে। কমিশনারের ধারণা এ অর্জিত অধিকারকে সুদৃঢ় করার জন্যই দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম। এ সংগ্রাম সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এর লক্ষ্য, কোন শর্তেই খাজনার নিরিখ বাড়ানো চলবেনা।

একই ধারণা ছিল বাকেরগঞ্জের সহকারী জেলা শাসক টেষ্ট্রোর।[৪৮] ভূমিস্বত্ব চিরস্থায়ী করার জন্য হাওলাদার যে কোন মূল্য দিতে রাজী। তিনি সনাতন সমাদ্দারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। বিশ বছরের মেয়াদী স্বত্ব লাভের জন্য সনাতন তিন হাজার টাকা মোরেলকে এক সঙ্গে দিতে সম্মত ছিল।

চিরস্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী ভূমিস্বত্ব অর্জনের আকাংখা সামগ্রিকভাবে তুষখালী আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা ছিল কিনা বিচার্য। সনাতন সমাদ্দারের দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিক নয়। তার আয়ের একটা বড়ো অংশ আসত তেজারতি ব্যবসা থেকে। এক দফায় তিনহাজার টাকা দিয়ে দেওয়া তার পক্ষে কঠিন কিছু ছিলনা। বিত্তের দিক থেকে বিদ্রোহী কৃষকেরা তার তুল্য কিছুতেই নয়।

জমির পরিমাণ ও বাৎসরিক খাজনাকে কৃষকদের বিত্তবত্তার একটা প্রধান সূচক হিসেবে মেনে নিলে এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। পুরনো হারে খাজনা নিতে মোরেল অস্বীকার করলে বিদ্রোহীরা তাদের দেয় মোট খাজনা মুন্সেফের কাছে জমা দিতে শুরু করে।[৪৯] সরকারী এক দলিল থেকে জানা যায় তিনশ' এক চল্লিশ জন বিদ্রোহী মোট চার হাজার দু'শ আটাশ টাকা মুন্সেফের কাছে জমা দেয়।[৫০] মাথাপিছু খাজনার পরিমাণ তাই মাত্র বাৎসরিক ১২.৪৫ টাকার মত। এদের বিত্তশালী হাওলাদার বলে অভিহিত করা বিভ্রান্তিকর।

রীলির নূতন ব্যবস্থায় (১৮৬০) জমির সর্বোচ্চ নিরিখ বিঘা প্রতি টাকা ১.২৫। তাহলে এক কৃষক পরিবারের জোতজমির পরিমাণের গড় ৯.৯৬ বিঘা।[৫১] তাই অনুমান করা যায়, বিদ্রোহীরা বড় জোতের মালিক ধনী চাষী নয়। মোটামুটি 'মাঝারি' সম্পন্ন কৃষক।

মোরেলের নূতন নিরিখের দাবী নানা কারণে এ কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তুলল। রীলির নিরিখ চালু হবার পর থেকেই তাদের ধারণা হয়েছিল এর কোন পরিবর্তন হবেনা। রীলি কিন্তু এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেননি। কী ভাবে কৃষকদের এ ধারণা বদ্ধমূল হল, তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা রাজকর্মচারী খুঁজে পাননি।[৫২] কিন্তু তারা সবাই কৃষকদের এ সযত্ন লালিত বিশ্বাসের কথা বলেছেন। মোরেলের দাবী স্বীকার করে নেওয়া তাদের পক্ষে তাই সহজ ছিলনা।

শুধুমাত্র এ দাবীর আকস্মিকতা নয়, তার পরিমাণ এবং মোরেলের নিরিখ বাড়ানোর কায়দাও কৃষকদের গভীরভাবে আশংকিত করে। খাজনার হার বাড়ল পঁচিশ শতাংশ। আর প্রতি পরিবার পিছু এককালীন দশটাকা। তাছাড়া এ বৃদ্ধি প্রচলিত কোন আইনের ভিত্তিতে নয়। আদালতেরও কোন অনুমোদন নেই। ফলে, এমন কোন নিশ্চয়তা থাকলনা যে কয়েক বছরের মধ্যেই মোরেল আবার বর্দ্ধিত নিরিখ দাবী করবেনা। প্রথম সফলতাকে সে পরে নজীর হিসেবে ব্যবহারও করতে পারে। তাই তার প্রথম চেষ্টাকেই প্রতিহত করতে হবে। তাদের নিশ্চিত ধারণা ছিল আইনের বিধান অনুযায়ী বৃদ্ধির পরিমাণ অসংগত। এবং এ

প্রশ্নের নিষ্পত্তি একমাত্র আদালতেই সম্ভব। মোরেলের মর্জি বা খামখেয়ালের উপর তা নির্ভর করেনা।

কৃষকদের এ অনমনীয় মনোভাব রাজকর্মচারীদের বিস্মিত করেছিল।[৫৩] বাকেরগঞ্জের সহকারী জেলাশাসক টেম্প্রো তাদের নানাভাবে বুঝিয়ে আপোষের চেষ্টা করেছিলেন: তাদের নিরিখ চিরস্থায়ী, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; আপোষ সম্ভব না হলে মোরেল আদালতে যেতে বাধ্য হবে; এমনও হতে পারে আদালতের অনুমোদিত হার মোরেলের হারের থেকেও বেশী; তাছাড়া মামলা-মোকদ্দমা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এ পথে না গেলেই তারা বিজ্ঞতার পরিচয় দেবে।

টেম্প্রো অবাক্ হয়েছিলেন, তাঁর কোন যুক্তিই বিদ্রোহীদের সংকল্পকে টলাতে পারলনা। তার মতে, তাদের বক্তব্যে কোন অস্পষ্টতা ছিলনা; আইনের জটিল ধারা উপধারা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিষ্কার; রাজকর্মচারীদের থেকে তাদের শেখার বা জানার কিছুই ছিলনা; আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া তারা কোন সর্তেই নূতন নিরিখ মানবেনা, এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আদালতে মোরেলের দাবী অগ্রাহ্য হবে।

এ বিদ্রোহ আসলে জমির নিরিখ 'অপরিবর্তনীয় রাখার জন্য বিত্তবান হাওলাদারদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস মাত্র'—ঢাকা বিভাগের কমিশনারের এ সিদ্ধান্ত তাই গ্রাহ্য নয়। বিদ্রোহীরা কখনও বলেনি। যে কোন অবস্থাতেই তারা বাড়তি খাজনা দেবেনা; তারা সব সময় বলেছে, আদালত অনুমোদন করলেই তারা দেবে।

বিদ্রোহের একটা পর্যায়ে তারা ঠিক করেছিল, কোন রকম খাজনাই তারা মোরেলকে দেবেনা। এটা সাময়িক এক কৌশল মাত্র। মোরেলের অনড় নীতির একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। তারা পুরনো হারে খাজনা দিতে চেয়েছিল। মোরেল তাতে অরাজী। তারা মুন্সেফের তহবিলে খাজনা জমা দিতে চাইল[৫৪] মোরেল তাও মানল না। বিদ্রোহীরা তাই সিদ্ধান্ত নিল, নিরিখ-বৃদ্ধি বিষয়ে আদালতের রায় না আসা পর্যন্ত তারা কোন খাজনাই দেবেনা।

ঐতিহ্যানুগামিতা এ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের চেতনার বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ, খাজনা-বৃদ্ধি প্রতিরোধের বৈধতা কোন আঞ্চলিক-প্রথা সিদ্ধ নয়। কৃষকদের প্রধান নির্ভর ছিল নূতন আইন কানুন। ১৮৫৮ সালের আন্দোলনে দ্বিধার একটা কারণ এ বিষয়ে অনিশ্চয়তা। উচ্চ-আদালত মধ্যবর্তী শ্রেণীর সীমাবদ্ধ অধিকারের কথা বলেছিল। কিন্তু কোনো আইনেই বলা হয়নি কি ভাবে কৃষকেরা অনিয়মিত খাজনা-বৃদ্ধি বোধ করবে। প্রিয়নাথের হঠকারিতাই কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ নিতে বাধ্য করে।

খাজনা-বৃদ্ধি তাদের প্রতিবাদের বিষয় ছিল না। প্রিয়নাথ যা করতে চেয়েছিল, এমনটি আগে কখনও ঘটেনি। তাদের কাছে প্রিয়নাথের দুঃসাহসের প্রধান তাৎপর্য, সে সাবেকী সব প্রথা লংঘন করেছে।

১৮৭২ সালের বিদ্রোহীরা শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত দস্তুরকে অনুসরণ করেনি। পুরনো ঐতিহ্যের জন্য সম্ভ্রমবোধ দিয়ে তাদের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না। তারা সে ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে এসেছিল। তাদের আত্মবিশ্বাসের মূলে ছিল এক নিশ্চিত ধারণা যে, নিরিখ-বৃদ্ধির জন্য মোরেলের উপায় অবৈধ। এ বৃদ্ধির সমর্থনে তার যুক্তিগুলিও গ্রাহ্য নয়। পাশাপাশি মহলের তুলনায় তাদের নিরিখ এমন কিছু কম নয়। কৃষি-পণ্যের দামও এমন বাড়েনি যে মোরেল এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি সংগতভাবে দাবী করতে পারে।

১৫

তুষখালীর কৃষকদের মানসিকতা মোরেলের অজানা ছিলনা। আট বছর সরকারের হয়ে সে এ মহলের রাজস্ব আদায় করেছে। তার আগেও ফরায়েযীদের মেজাজ, হাবভাব নিজের চোখেই দেখেছে। অথচ সে মোরেল আইনের সব বিধান উপেক্ষা করে হঠাৎ তাদের খাজনা এক-চতুর্থাংশ বাড়াতে একটুও দ্বিধা করল না।

এ মহলের খাজনা-বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীদের চিন্তা-ভাবনা তাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। তা ছাড়া মোরেল নিশ্চিত ছিল, সরকার তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। নৈতিক সমর্থনই শুধু নয়। সরকারের প্রত্যক্ষ স্বার্থও যে ছিল। নূতন নিরিখ চালু না হলে অতিরিক্ত পনেরো হাজার টাকা রাজস্ব পাবার আশা নির্মূল হতে পারে।

তবুও মোরেল যথেষ্ট সতর্ক হয়েই এগিয়েছিল। জমিদারদের সাবেকী এক কৌশল সে নিল। তার ধারণা ছিল, নেতৃস্থানীয় এবং প্রভাবশালী কৃষকদের হাত করলেই সব মুশকিল আসান। তাই তার প্রস্তাব বোঝানোর জন্য দু'হাজার সম্পন্ন মুসলমান কৃষককে ডেকে পাঠাল। এ চাল একেবারেই খাটল না। এক সরকারী চিঠির ভাষ্য অনুযায়ী, কৃষকদের প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া, "তাদের ভাব-ভঙ্গী মোরেলের পক্ষে ভীতিদায়ক ছিল'।[৫৫] যাও কিছু প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল, তা কাজে এলনা। বিঘা প্রতি ১.৭৫ টাকা হারে খাজনা দেবে বলে ছ'শ কৃষক পরে পরে চুক্তিনামা করেছিল। কিন্তু কাজের বেলা কিছু করল না।[৫৬] মোরেল স্বপক্ষে আদালতের ডিক্রী পেল। কিন্তু শুধু ডিক্রীই সার। নূতন নিরিখে খাজনা আদায় তার পক্ষে

অসাধ্য হল।

মোরেল কিন্তু হাল ছাড়েনি। প্রিয়নাথের মত জোরজুলুম করে কাজ হাসিল করা যাবে, এমন আশা তার ছিল না। তার প্রধান নির্ভর ছিল, সরকারী শাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। পুলিশ-বরকন্দাজ বাহিনীর জবরদস্তী নয়। রাজপুরুষদের বিপুল নৈতিক প্রভাব। মোরেলের আমলাকে বিদ্রোহীরা ভ্রূক্ষেপ না করতে পারে। কিন্তু অত সহজে সরকারী কর্মচারী-দের উপদেশ বা নির্দেশ উপেক্ষা বা অমান্য করবে না। মোরেল জানত, গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনও তাদের কি সমীহ করে।

রাজকর্মচারীরা উদ্যোগী হয়ে মোরেলকে সাহায্য করেও ছিলেন। বিশেষতঃ খাজনা-আদায়ের জন্য। (মোরেল অবশ্য শান্তি ও শৃংখলা ভঙ্গের জিগির তুলে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকারকে অনুরোধ করেছিল। সরকার এ অভিযোগ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন)।[৫৭] প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় নির্বাচনে বিদ্রোহীরাও কখনো বিস্মৃত হয়নি। যে মোরেলের শক্তি একার শক্তি নয়। বিদ্রোহীদের চেতনায় সরকারের ক্ষমতার এক বিশেষ ভাবমূর্তি উৎকীর্ণ ছিল: এ ক্ষমতা অপরিমেয়, দুর্লঙ্ঘ্য। তাই সরকারের তরফ থেকে তাদের আচরণের অনুমোদন বা মোরেলের বিরূপ সমালোচনা তাদের আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছিল।

সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই কেন মোরেলের পক্ষ নিয়েছিলেন, বিদ্রোহীরা হয়ত তার সব কারণ জানত না। সরকারী দলিল থেকে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব।

মোরেলের পক্ষে সব চাইতে জোরালো যুক্তি ছিল ঢাকা বিভাগের কমিশনারের।[৫৮] তা ছিল এই:[৫৯] খাজনা-বৃদ্ধি সম্পূর্ণ সংগত এবং বৈধ। পাশাপাশি মহলের তুলনায় তুষখালীর নিরিখ অনেক কম। ধান চালের রপ্তানী সম্প্রতি অনেক বেড়েছে, বিশেষ করে মোরেলগঞ্জকে বন্দর হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর। কৃষকদের সচ্ছলতাও তাই বেড়েছে। বিঘা প্রতি চারআনা খাজনা-বৃদ্ধি এমন একটা বেশী নয়। মোরেল যেভাবে খাজনা বাড়িয়েছে, তাও অসংগত নয়। আদালত মারফত খাজনা-বৃদ্ধি যে সহজ-সাধ্য নয়, সরকার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তা জানে। আনুষঙ্গিক আইন-কানুন অত্যন্ত জটিল। খাজনা-বৃদ্ধি অনুমোদনের জন্য আদালতের শর্ত জমিদার বা ইজারাদার অনেক ক্ষেত্রে পূরণ করতে পারে না। অপ-রিহার্য অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ তারা জোগাড়ই করতে পারে না। আদালত মেনে নিলেই যে কৃষকরা নূতন নিরিখ মেনে নেবে তা মোটেই নয়। তা নিয়ে মামলা, মোকদ্দমা অশান্তি লেগেই আছে। বিদ্রোহ-দমনে সরকারের

অনেক বেশী তৎপর হওয়া উচিৎ। কারণ বিদ্রোহীদের সফলতার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। পাশাপাশি মহলের কৃষকেরা অধীর আগ্রহে তুষখালী-বিদ্রোহের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে আছে। সরকার নিজেই তার নানা খাসমহলে খাজনার নিরিখ বাড়ানোর জন্য বদ্ধ পরিকর। বিদ্রোহীদের জয়ের ফল তাই সরকারের পক্ষে অশুভও হতে পারে। এ বিদ্রোহ আরও এক বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিদ্রোহ আসলে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ফরায়েযীদের সংগ্রাম। মাত্র কয়েক বছর আগেই তাদের কার্যকলাপ কি বিশৃংখলাই না সৃষ্টি করেছিল। তুষখালীতে তাদের জয় এ অরাজকতাকে অনেক ব্যাপক করে তুলবে। তাই সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থের দিক থেকেও এ বিদ্রোহের ফল শুভ নয়। যদি মোরেলের বদলে খাজা আবদুল গণির মত কোন প্রভাবশালী, জমিদার তুষখালীর বন্দোবস্ত নিত, তাহলে বিদ্রোহীদের অত সাহসই হোত না।[৬০] জোরজুলুম, মামলার পর মামলা, মামলা জেতার জন্য মিথ্যা সাক্ষী তৈরী করা—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গণি সাহেব কোন কৌশলই কি বাদ দিত ?

বাকেরগঞ্জের কালেক্টর বেভেরিজের[৬১] মত ছিল, মোরেলকে সমর্থন করা সরকারের নৈতিক কর্তব্য। খাজনা-বাড়ানোর সব দায়িত্ব সরকারের নিজের হাতে নেওয়া উচিত ছিল। তা সে দায়িত্ব সরকার এড়াল, অথচ অতিরিক্ত রাজস্বের লোভে মোরেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত হল। তার দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়ানো সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

বোর্ড অব রেভেনুার[৬২] প্রধানতঃ বিদ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্য বিচার করেছিলেন। তাদের মতে ফরায়েযীরা 'অত্যধিক উত্তেজনা-প্রবণ মুসলমান কৃষক'। একান্তভাবে ফরায়েযী-নিয়ন্ত্রিত এ বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকার উদাসীন থাকতে পারে না।

ছোটলাট ক্যাম্পবেল কিন্তু এ সব যুক্তি মানেননি। তাঁর মতে শান্তি-পূর্ণ খাজনা-বিরোধী আন্দোলন মোটেই অবৈধ নয়। কৃষকেরাও কোথাও পুরনো হারে খাজনা দিতে অস্বীকার করেনি। মোরেল যা করছে, তাই বরং অবৈধ। আদালতকে সে গ্রাহ্যই করছে না। অথচ সেই কৃষকদের "বিদ্রোহী" এবং "ষড়যন্ত্রকারী বলে অপবাদ দিচ্ছে। খাজনা-বাড়ানোর জন্য মোরেলের আইন-বহির্ভূত ব্যবস্থা তাই সরকার কোন রকমেই সমর্থন করতে পারেনা। সরকার শুধুমাত্র দেখবে, কোথাও যাতে শান্তি-শৃংখলা না ভেঙ্গে পড়ে।[৬৩]

ক্যাম্পবেলের এ মনোভাব কৃষকেরা জানত। ঢাকা বিভাগের কমিশনারের মতে[৬৪] কৃষকদের প্রতিনিধি কোলকাতায় থেকে এ সম্পর্কে সব খবরাখবর নিত। কৃষকদের মধ্যে এ সম্পর্কে যা রটনা হয়েছিল,

তা একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। যেমন, খাসমহল ইজারা দেবার ব্যবস্থা ছোটলাটের একেবারেই পছন্দ নয়, বিশেষ করে যদি য়ুরোপীয়দের ইজারা দেওয়া হয়, ইজারা যদি দিতেই হয়, তাহলে শুধু ছোট ছোট মহলের ক্ষেত্রে সরকার তা দেবে। রটনায় খানিকটা অতিরঞ্জন অবশ্যই ছিল। যেমন, ক্যাম্পবেলের ইচ্ছা, মোরেলের বন্দোবস্ত বাতিল হোক; হাওলাদারদের নিরিখ চিরকালের জন্য স্থির হোক্। অন্যান্য অনেক কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, এখানেও তাই ঘটেছে। রটনার ভিত্তি শুধু-মাত্র বাস্তব ঘটনা, নির্জলা সত্য নয়। বিদ্রোহীদের প্রত্যাশা, আকাংখা এবং বিশ্বাস এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশে যায়; এবং তাকে নূতন রূপ দেয়।[৬৫]

প্রধানত, ক্যাম্পবেলের নীতির জন্যই বিদ্রোহ দমনে সরকার সরাসরি কোন হস্তক্ষেপ করেননি। কিন্তু কৃষকদের মতে, স্থানীয় প্রশাসন আর সবভাবে মোরেলকে সাহায্য করেছে। রাজকর্মচারীরাও স্বীকার করেছেন, তা না হলে কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলন তীব্রতর হত।

১৬

মোরেলের শক্তির প্রবলতা সম্পর্কে তাই বিদ্রোহীদের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। এক সময় তারা এমনও ভেবেছিল, শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতা দিয়ে এত পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে তারা পেরে উঠবেনা; মোরেলের সমকক্ষ কোন স্থানীয় জমিদারের সমর্থন তাদের পেতেই হবে। প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা হয়ত মোরেলকে নিরিখ-বৃদ্ধির দৃঢ় সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করবে।[৬৬]

প্রধানতঃ একটা উপায়েই এ সমর্থন পাওয়া সম্ভব ছিল : বিদ্রোহীরা সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের কাছে আনুগত্যের শপথ নেবে; জমির স্বত্ব-সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ তার হাতে তুলে দি'তে হবে; তার কাছে প্রত্যাশা, শত্রুর নিপীড়ণ বা প্রতিহিংসা থেকে কৃষকদের সে রক্ষা করবে। বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে এ আশ্রয়-প্রার্থনার প্রথার নাম 'জিম্বা'।[৬৭]

বিদ্রোহীরা তিনজনের কাছে এ আশ্রয় ভিক্ষা করে : রায়কাঠির জমিদার, কাজলাকাঠির জমিদার হরচন্দ্র চক্রবর্তী এবং খাজা আহসান উল্লাহ। তাদের প্রলুব্ধ করার জন্য কৃষকেরা প্রভূত অর্থ সেলামী হিসেবে দেবার প্রস্তাবও দেয়।

যে কোন কারণেই হোক্, এ জমিদারেরা মোরেলের বিরুদ্ধাচরণ করতে চায়নি। কিন্তু কৃষকদের এ কৌশলের ঝুঁকিও ছিল অনেক। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত হয়তো হল; কিন্তু নিঃশর্ত আনুগত্যের শপথের পরিণাম' নিকৃষ্টতর জমিদারী-প্রভুত্বের কাছে আত্ম-সম্পর্ণও হতে পারতো।

বিদ্রোহীরা হয়ত ভেবেছিল, মোরেলের পরিকল্পনা ব্যর্থ করা আপাতত অনেক বেশী জরুরী কাজ।

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের একমাত্র নির্ভর ছিল তাদের নিজস্ব ক্ষমতা ও সংগঠন। তাদের সংহতি এবং অবিচল ঐক্য রাজকর্মচারীদের বিস্মিত করেছিল। অবশ্য তাঁদের সবারই ধারণা, ফরায়েযী গোষ্ঠীভুক্ত না হলে এ ঐক্য সম্ভব ছিল না।

তাঁরা নিঃসংশয় ছিলেন যে মোরেল-বিরোধী আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ফরায়েযী-নিয়ন্ত্রিত। ঢাকা বিভাগের কমিশনারের মতে,[৬৮] এখানেও ফরায়েযীদের সুপরিচিত সব কৌশলের পুনরাবৃত্তি। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত এ ফরায়েযীরাই মেঘনার চরে চরে কত ভাবেই না সরকারকে উত্ত্যক্ত করেছে। মোরেল-বিরোধীরা বরং অনেক বেশী সংগঠিত ও আত্মবিশ্বাসী। কমিশনার জানতে পারেন,—তারা প্রকাশ্যে সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছে, মাত্র কয়েক বছর আগে তারা ক্ষমতা মদমত্ত য়ুরোপীয় নীলকরদের ফরিদপুর থেকে বিতাড়িত করেছে; অদূর ভবিষ্যতে জমিদারদের দাপট তারা একই ভাবে নির্মূল করবে।

মোরেল–বিরোধী আন্দোলনের সংগঠনে ফরায়েযীদের ধর্ম[৬৯] ও ধর্মীয় সংগঠনের বিশিষ্ট অবদান ছিল। বহুক্ষেত্রে এ দুই সংগঠন প্রায় অভিন্ন। ঢাকা বিভাগের কমিশনারের আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ধর্মীয় নেতারা।[৭০]

ধর্মীয় সৌভ্রাত্র ফরায়েযী-কৃষকদের মধ্যে এক গভীর সংহতি বোধ সৃষ্টি করেছিল। ফরায়েযীদের সমাজ-দর্শন এ বোধকে আরো দৃঢ় করে। আদি ইসলামের একটা প্রধান মূলনীতি সামাজিক সাম্য হলেও অন্যান্য জায়গার মতো বঙ্গদেশেও নানা ধরনের বৈষম্য ক্রমেই বাড়তে থাকে। সম্ভ্রান্ত উচ্চ-বংশগত মুসলমান (যেমন সৈয়দ, শেখ, পাঠান এবং মোল্লা) এবং নিম্নবর্গের মুসলমান (যেমন গরীব চাষী, জোলা, বেলদার, কলু, কাহার ইত্যাদি) ছিল। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুই সামাজিক গোষ্ঠী। জীবিকা, সামাজিক আদব-কায়দা এবং সংস্কৃতির দিক থেকে তাদের মধ্যে কোন যোগসূত্রই প্রায় ছিল না। উচ্চবর্গের মুসলমান (সাধারণভাবে আশরাফ্ যাদের বলা হত) নিম্ন বর্গের মুসলমান (আলতাফ্)কে অবজ্ঞার চোখে দেখত। এমনকি চাষী এবং জোলাদের মধ্যেও এ সামাজিক পার্থক্য বোধ ছিল। অনেক জায়গায় তাদের মসজিদও ছিল আলাদা।

বাংলার ফরায়েযী ধর্মগুরুরা এ সামাজিক বৈষম্যকে শুধু অস্বীকারই করেন নি। ফরায়েযী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শরীয়তুল্লার পুত্র দুদু মিঞা শিষ্যদের বলতেন, এ অসাম্য গুরুতর এক পাপ। নিবিড় অনুশোচনা

বোধের মধ্য দিয়ে সব ফরায়েযীরা আল্লাহর প্রকৃত অনুগামী হতে পারে; ফলে তাদের মধ্যে সব পার্থক্য বোধ বিলুপ্ত হবে। কোন কোন জীবিকার লোক বিশেষভাবে অবগত হত বলে দুদু মিয়া তাদের বৃত্তিগত ও পারিবারিক উপাধি সম্পূর্ণ বর্জন করতে বলে। যেমন, জোলা ও কলুদের তিনি নূতন উপাধি দিয়ে ছিলেন কারিগর। কোরান পড়ার মত বিদ্যা যাদের ছিল, তাদের উপাধি দিয়ে ছিলেন মোল্লা। সম্ভবতঃ জোলারা ফরায়েযী সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বলে দুদু মিঞার এ নাম-সংস্কারের চেষ্টা। ফরায়েযী বিরোধিরা শরীয়তুল্লাকে ব্যঙ্গভরে 'জোলাদের পীর' বলেই ডাকত।

ফরায়েযী সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং বিকাশ একান্তই সাম্প্রতিক[৭১], ঘটনা বলে তাদের এ ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক সমতাবোধ তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং সামাজিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। সময়ের ব্যবধানে অনেক প্রবল আবেগ, মহতী প্রেরণাও স্তিমিত, নিস্তেজ হয়ে আসে।

ব্যাপক এক ধর্মীয় সংগঠন না গড়ে উঠলে এ সংহতিবোধ হয়ত শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং নীতিবোধে সীমাবদ্ধ থাকত; ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে অনুপ্রাণীত করতে পারত না। বাংলাদেশে ফরায়েযী সম্প্রদায়ের বিকাশের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, নূতন ধর্মকে কেন্দ্র করে এক বিপুল সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠল।

এক বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের জন্য এ সংগঠন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বিশ্বাসের মূল প্রশ্ন, ইসলামের আদি সরল জীবন চর্চা থেকে বিচ্যুত হয়ে যারা অনেক দূরে সরে এসেছে, তারা অনাবিল সে উৎসে ফিরে যাবে কি ভাবে? ফুল ফুটলে তার চারপাশে মৌমাছিরা জড়ো হয়। কিন্তু ফরায়েযী ধর্মগুরুদের ধারণা ছিল, শুধুমাত্র নূতন মতের আকর্ষণেই সংস্কার ক্লিষ্ট সাধারণ মুসলমান এ নূতন পথ খুঁজে নিতে প্রয়াসী হবেনা। বহুদিনের ভ্রান্ত বিশ্বাস, বিচারহীন অন্ধ আনুগত্য এবং অভ্যস্ত আচারের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। নূতন ধর্মবোধে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত এক গোষ্ঠীর নিরলস চেষ্টার ফলেই এ সংস্কার মুক্তি সম্ভব হবে। তা ছাড়া, এ প্রয়াস অন্য কোন মত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্ত ছিলনা। বিভ্রান্ত মুসলমানদের মোহমুক্তি, তাদের অধ্যাত্ম ও নৈতিক রূপান্তরের একটি মাত্র লক্ষণ এ গোষ্ঠীর কাছে গ্রাহ্য, ছিল। তাহল তারা ফরায়েযী নির্দেশিত পথকে অভ্রান্ত বলে মানবে, এবং ফরায়েযী-সম্প্রাদায়ভুক্ত হবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে ফরায়েযী মত গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়। ধর্মগুরুরা চাইতেন, এ মত তাদের অনুগামীদের জীবন-চর্যা

নিয়ন্ত্রিত করুক। তাই তারা দিয়েছিলেন কঠোর অনুশাসনের বিধান, যাতে আদর্শ থেকে বিচ্যুত না ঘটতে পারে। ফরায়েযী ধর্মমত প্রচার তাই বিস্তৃত, সুশৃংখল এবং নিয়মশাষিত এক সংগঠন ছাড়া অসম্ভব ছিল।

ধর্মীয় সংগঠন অবশ্য সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য সংগঠন থেকে পৃথক ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ফরায়েযী-সংগঠনের একটা বিশিষ্ট প্রবণতা ছিল, কৃষক শ্রেণী হিসেবে ফরায়েযীদের নানা প্রতিরোধ এবং সংগ্রামের সঙ্গে তা উত্তরোত্তর সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছিল। বস্তুতঃ আদি ধর্মপ্রেরণা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছিল; ধর্মসংস্কারের উপর ঝোঁক একেবারেই দুর্বল হয়ে এল [১২] এমনকি, এ সংগ্রামের সাফল্যের উপর তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র রক্ষা নির্ভর করত। তাই আদি ফরায়েযী সংগঠন অনিবার্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল।

এ পরিবর্তন কৃষক-সংগ্রামের সংগঠনের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা ফরায়েযী সংগঠনের মৌল কাঠামোটা তাতেও অটুট ছিল। এ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য[১৩] মূল সংগঠন সব শাখা-সংগঠনকে নিয়ন্ত্রিত করত। সব নির্দেশের উৎস ধর্মগুরু। তার প্রতি অবিচল আনুগত্য ফরায়েযী-সংগঠনের প্রাণ শক্তি। মূল প্রবাহের সংঙ্গে শাখা ও উপশাখার বহুমুখী ও নিবিড় যোগ এ সংগঠনে এনেছিল ব্যাপ্তি এবং বলিষ্ঠতা। শাখা-সংগঠনগুলো আঞ্চলিক নানা প্রভাবে আড়ষ্ট হয়ে ফরায়েযীদের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সংগঠন সাধারণ কৃষকদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনড় অনুশাসনের অচলায়তনে পরিণত হয়নি। কৃষকদের সংগ্রামে শুরু হলে কেন্দ্রীয় সংগঠন তাই সক্রিয় ভূমিকা নিতে পেরেছিল। বিদ্রোহীদের নেতা অনেক ক্ষেত্রেই তাই ধর্মগুরু বা শাখা-সংগঠনের সংঙ্গে যুক্ত ধর্মগুরুর প্রতিনিধি।

কৃষক হিসেবে ফরায়েযীদের নানা সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি এবং তীব্রতার ফলে শুধু এ সাংগঠনিক পরিবর্তনই ঘটেনি। ধর্মগুরুরা স্থির করলেন নূতন ধরনের আচরণ-বিধি; কারণ তাছাড়া সম্প্রদায় হিসেবে ফরায়েযীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হত। এ বিধি প্রায় অলঙ্ঘনীয় ছিল, বিশেষ করে যখন ফরায়েযীরা নানা ভাবে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ত।

ফরায়েযী সম্পদায়-নিয়ন্ত্রিত প্রায় সব কৃষক আন্দোলনেই তাই মোটা-মুটি কয়েকটা সাদৃশ্য লক্ষণীয়, বিশেষ করে আন্দোলনের নেতৃত্ব, ও উল্লিখিত আচরণ-বিধির দিক থেকে। তুষখালীর জোট সম্পর্কে ঢাকা বিভাগের কমিশনার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন: [১৪] 'এ সব জোটের প্রধান শর্ত, আন্দোলনের স্বার্থ বিঘ্নিত করতে পারে এমন সব সাক্ষ্য প্রমাণ সবাই সর্বস্তরের আদালত থেকে গোপন রাখবে; জোটের কৃষকেরা

কেউ কারোর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেনা। এমন কি কোন ফরায়েযীর পিতা-মাতা খুন হলেও নয়"।

প্রায় দু দশক আগে (১৮৫৪—১৮৫৮) নোয়াখালীতে তাঁর অভিজ্ঞতা একই রকম ছিল[৭৫], "নোয়াখালীতে ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন মেঘনার নানা দ্বীপ একই ধরনের জোট আমাকে বিব্রত করেছিল...দলবদ্ধ কৃষকদের পবিত্র শপথ নিতে হত—তারা ফরায়েযী নেতাদের সব নির্দেশের প্রতি অনুগত থেকে কাজ করবে; সব ক্ষেত্রেই জেলাশাসক বা হাকিম থেকে সব প্রমাণ গোপন রাখবে; তাদের কোন সঙ্গীর বিরুদ্ধে আদলাতে সাক্ষ্য দেবেনা।"

মহকুমা শাসক হিসেবে কবি নবীন চন্দ্র সেন ফরিদপুরের মাদারিপুরে, প্রায় অভিন্ন ফরায়েযী-সংগঠন দেখেছিলেন। ফরায়েযীদের উপর দুদু মিঞার পুত্র নোয়া মিয়ার নিরংকুশ আধিপত্য এবং মাদারিপুরের ফরায়েযী সংগঠন সম্পর্কে কবির মন্তব্য এ কারণেই উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ[৭৬] "পূর্ববঙ্গের বিশেষতঃ ফরিদপুর অঞ্চলের প্রজা অধিকাংশই ফরায়েযী মুসলমান। নোয়া মিয়ার মুখের কথা তাহাদের পক্ষে বেদ। ধর্মগুরুর এমন দাসত্ব অন্য কোন জাতিতে নাই। এ অঞ্চলে নোয়া মিয়া ইংরাজ রাজ্যের উপর এক প্রকার আপনার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে তাহার এক সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও পেয়াদা নিয়োজিত ছিল, এবং ইহাদের দ্বারা সে ফরায়েযীদিগকে সম্পূর্ণ করায়ত্ব রাখিত। গ্রামের কোনও বিবাদ সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমতি ভিন্ন দেওয়ানী, কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত না। আগে তাহার কাছে বিচার হইত; এবং সে অনুমতি দিলে ইংরাজ পুলিশে, কি বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইত। ইহার অন্যথা কেহ করিলে তাহাকে ধর্মচ্যুত কাফের হইতে হইত। ইহার ফলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট যে পক্ষ অবলম্বন করিত, সে পক্ষ মিথ্যা হইলেও প্রমাণিত হইত। তাহার আদেশমত লোকে মিথ্যাসাক্ষ্য দিত, সাক্ষ্য দিত, এবং সে যাহার বিপক্ষে যাইত, তাহার অভিযোগ সত্য হইলেও শত পুলিশে, কি বিচারকে চেষ্টা করিয়াও বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাইত না...শুধু তাহা নহে। বিচারালয়ে বহু ব্যয়ে যদি কোন সম্পত্তি কেহ ডিক্রী পাইল, সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাহার প্রতিকূলে গেলে, তাহার সাধ্য নাই যে সেই সম্পত্তির নিকট যাইবে।"

১৭

এ সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দুটি প্রধান পর্যায়। গোড়ায় বিদ্রোহীদের মূল লক্ষ্য ছিল, তারা বর্দ্ধিত নিরিখে খাজনা দেবেনা। সম্পূর্ণভাবে

খাজনা বন্ধ করার কথা তারা এখন ভাবেনি। কিন্তু মোরেলের অনমনীয়তা ও একগুঁয়েমিতে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। তারা ঠিক করল, নিরিখের জটিল প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হলে, তারা কোন খাজনা দেবেনা। আন্দোলনের সংগঠনে পরিবর্তনও তাই অপরিহার্য হল। কৃষকদের কোন দ্বিধা এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে মোরেলের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা আন্দোলনের সংহতিকে দুর্বল করবে, এ আশংকায় আন্দোলন বিরোধিদের জন্য কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করতে হল। সব কৃষকেরাই আন্দোলনের মূল লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে—শুধুমাত্র এই নৈতিক বোধ আন্দোলনের তীব্রতার মুহূর্তে যথেষ্ট ছিল না।

প্রথম পর্যায়ে বিদ্রোহীদের প্রধান কৌশল ছিল, মোরেল পুরনো হারে খাজনা দিতে অস্বীকার করলে, তারা মুন্সেফের কাছে দেয় খাজনা জমা রাখবে। এর অর্থ সম্পূর্ণভাবে মোরেলের কর্তৃত্বের প্রত্যাখ্যান প্রজাদের উপর ইজারাদার বা জমিদারের যে স্বাভাবিক আধিপত্য, তার' বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ-ঘোষণা। বিদ্রোহীদের এ কাজ কিন্তু অবৈধ ছিল না। ১৮৬২ সালের ছ'নম্বর আইন এবং ১৮৬৯ সালের আট নম্বর আইন মত, নিরিখ নিয়ে জমিদারের সঙ্গে বিরোধের সময়ে প্রজারা মুন্সেফের তহবিলে খাজনা জমা রাখতে পারতো।

কিন্তু এ কাজের ঝুঁকিও ছিল অনেক। ঝামেলা ও কম নয়। ষ্ট্যাম্প বাবদ খরচ কৃষকদের পক্ষে অতিরিক্ত এক বোঝা। ফিরোজপুর মহকুমার সদর দপ্তরে গিয়ে প্রত্যেক কৃষককে আলাদা আলাদাভাবে খাজনা দিতে হত। প্রচলিত হারে খাজনা নিতে জমিদারের অসম্মতি প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল কৃষকদেরই। তা না হলে মিথ্যা হলফের অভিযোগে কৃষকদের শাস্তি ভোগ করতে হত। কারণ আইন মতে মিথ্যা হলফ[৭৭] দন্ডনীয় অপরাধ। বিদ্রোহীদের জব্দ করার জন্য প্রতিহিংসা পরায়ণ মোরেল নানা অপকৌশলে কৃষকদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিল। এতে সে খানিকটা সফলও হয়েছিল। মোরেলের সাক্ষ্য মেনে নিয়ে মুন্সেফ কৃষকদের খাজনা নেওয়া কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সহকারী জেলা শাসক টেভ্রেষ্ট্রা মোরেলের এ অপকৌশল সম্পর্কে কমিশনারকে বিস্তারিত জানান: পুরনো হারে খাজনা আদায়ে মোরেল আসলে কোন চেষ্টাই করেনি। নানা অজুহাতে কৃষকদের খাজনা সে প্রত্যাখান করে। মোরেলের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনি তাকে প্রস্তাব দেন, তিনি নিজেই পাঁচশ কৃষককে তার কাছে আনবেন। মোরেল এ প্রস্তাবে কোন সায় দিলনা। সে কথা দিয়েছিল, একটু ভেবে চিন্তে সে পরে তাঁকে লিখবে। কোন উত্তর না আসাতে তিনি আবার মোরেলকে

লিখলেন। উত্তর এল বটে, কিন্তু মূল প্রশ্নটাই সে এড়িয়ে গেল।[৭৮]

টেম্প্রোর ধারণা, তাঁর হস্তক্ষেপ মোরেলের একেবারে পছন্দ নয়। অথচ আইনের চুলচেরা বিচারে মুন্সেফের কাছে খাজনা জমা রাখার মত জটিল প্রশ্নের সমাধানও সম্ভব নয়। কৃষকেরা যে ভাবে খাজনা দিতে চেয়েছিল, তাতে হয়ত আইনের ফাঁক থেকে গেছে। টেম্প্রোর বিশ্বাস, প্রশ্নটিকে মোরেল-বিরোধি ব্যাপক বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে দেখাই সংগত। আইনের বিধানকে মোরেল অতি সহজে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারত। কৃষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা হলফের অভিযোগ প্রমাণে তাকে এমন কিছু কাঠখড় পোড়াতে হত না। গ্রামের তহশীলদারের অনুকূল সাক্ষ্যই তার পক্ষে যথেষ্ট। আর এ সাক্ষ্য জোগাড় করা সহজ-সাধ্য। তহশীলদারেরা নানা ভাবে মোরেলের অনুগ্রহের প্রত্যাশী। স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে মোরেলকে খুশী করার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য তো দিতেই পারে।

মুন্সেফের কাছে পুরানো হারে খাজনা দিয়ে দিতে কৃষকেরা আগ্রহী, অথচ নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে মোরেল সরকারকে বোঝাতে চেয়েছিল, কৃষকেরাই বজ্জাতি করে তার ন্যায্য পাওনা না দেওয়ার ফন্দি এঁটেছে। মোরেলের সঙ্গে আপোষের কোন পথই খোলা রইল না। দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের এই পটভূমিকা। আদালতে নিরিখ-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কৃষকেরা খাজনা সম্পূর্ণ বন্ধ করার সংকল্প নিল।

তাতে আন্দোলনে জটিলতাও বাড়ল। কারণ, আদালতের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত বর্ধিত নিরিখে খাজনা দিতে অস্বীকার করা আইনের চোখে দন্ডনীয় অপরাধ নয়; কিন্তু প্রচলিত হারে খাজনা না দেওয়ার জন্য আইনে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। বকেয়া খাজনা উশুল করার জন্য জমিদার কৃষকের জোতজমিও নীলামে বিক্রী করিয়ে দিতে পারিত। খাজনা-বন্ধের আন্দোলনে যোগ দিতে তাই স্বল্পবিত্ত কৃষকের অনেক দ্বিধা ছিল।

অথচ অটুট সংহতি ছাড়া এ ধরনের আন্দোলন সফল হতে পারতনা। তাই আন্দোলন-বিরোধিদের সম্পর্কে নেতাদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হত। বিরোধিতা প্রতিহত করার জন্য হিংসা প্রয়োগও সম্পূর্ণ সঙ্গত উপায় বলে গণ্য হত।

আন্দোলনের বিরুদ্ধাচারণের জন্য নানা ধরনের শাস্তির সংখ্যা থেকে বিদ্রোহীদের সংহতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব।

মোরেলের মতে, সাধারণ কৃষকেরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে জোর

জুলুমের ভয়ে, স্বেচ্ছায় নয়। বিদ্রোহীদের 'কুকীর্তি'র' একটা লম্বা ফিরিস্তি সে কালেক্টরের কাছে পাঠায়ঃ আশ্বিন বা পৌষ কিস্তির কোন খাজনাই যে আদায় হয়নি, তার আসল কারণ নেতাদের প্ররোচনা এবং জোরজুলুম। তাদের বদ্-পরামর্শ না শুনে যে সব কৃষকেরা খাজনা দিয়ে দিয়েছে, তারা সঙ্গে সঙ্গেই এ ধৃষ্টতার মূল্য দিয়েছে। বিদ্রোহীরা তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। মোরেলের অনুগত চাষীরা খাজনা দেবার জন্য যাতে তার কাছারীতে না যেতে পারে, তার জন্য বিশেষভাবে বাছাই করা লোক রাস্তায় রাস্তায় তাদের পথ আটকাচ্ছে। এমনকি তাদের দৈনন্দিন সওদার জন্য বাজারেও যেতে দেওয়া হচ্ছেনা। গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহীরা নিজেদের কাছারী বসিয়েছে; জোরজুলুম করে চাঁদা আদায় করছে। নেতাদের হুকুম অমান্য করে যারা কাছারীতে আসছেনা, তাদের জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। জবরদস্ত নেতাদের হুমকিতে সাধারণ কৃষক সন্ত্রস্ত। তাই প্রমাণের অভাবে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করাই সম্ভব হচ্ছেনা।[৭৯]

আসলে মোরেল এবং কোন কোন রাজকর্মচারীর প্রতিবেদন ছিল অতিরঞ্জিত। যাঁরা নানাভাবে বিদ্রোহীদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের ধারণা ছিল ভিন্ন। তুষখালীর মত বিশাল মহলে কোন কোন জায়গায় আন্দোলন-বিরোধিতা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপারে নয়। কিন্তু 'শান্তি-ভঙ্গে'র ঘটনা সংখ্যায় নগন্য। অবশ্য আন্দোলনের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে।

সহকারী জেলা শাসক ট্রেভেট্রা সরেজমিনে তদন্ত করে জানেন,[৮০] বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ অভিযোগই ভিত্তিহীন, বিদ্রোহ শুরু হবার একমাস পরেও তিনি 'শান্তি-শৃংখলা-ভঙ্গের' কোন নিদর্শনই পেলেন না। মোরেলের বিবরণে "উপদ্রুত" বলে উল্লেখিত সব অঞ্চল ঘুরে এসে তিনি জেলাশাসককে লিখলেনঃ 'মাত্র ক'দিন আগেই বলা হয়েছিল, আইন ভঙ্গকারী, অবাধ্য দুর্বৃত্তদলের কার্য-কলাপে এ সব অঞ্চলে বৈধ সব কর্তৃত্ব নাকি ভেঙ্গে পড়েছে; শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষদের নানাভাবে উত্যক্ত করা হয়েছে। আমি কিন্তু সর্বত্র শান্তিই দেখেছি। জনবহুল বাজার ও গ্রামে—এ দু'জায়গাতেই দেখেছি, একান্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ছাড়া কারো অন্য কোন বিষয়ে খেয়ালই নেই। আমার কাছে নালিশ জানানোর সব সুবিধে থাকা সত্ত্বেও আমি একটা অভিযোগও পাইনি"। পরে পরে যে কয়েকটা অভিযোগ এসে ছিল, তাদের অসত্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। তাঁর ধারণা, সবই সাজানো ব্যাপার। "আমার নৌকা তীরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই জনা

চারেক লোক ছুটে এল। দেখে মনে হল, তারা খুবই উত্তেজিত। বেশ খানিকটা চেঁচামেচি করে এমন, কি চোখের জল ফেলেও, তারা আমার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করল। তা না হলে তাদের নাকি এ গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটাই যে সাজানো এ ছল[৮১], সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই”।

আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখার জন্য হিংসা প্রয়োগ মাঝে মাঝে অনিবার্য ছিল। এ সম্পর্কে তুষখালীর প্রথম আন্দোলনের (১৮৫৮) সঙ্গে মোরেল-বিরোধি আন্দোলনের বিশেষ এক পার্থক্য আছে। কার্য-সিদ্ধির জন্য প্রিয়নাথের প্রধান নির্ভরশীল সহিংস বল-প্রয়োগ, ভাড়াটে লাঠিয়ালও লাগিয়েছিল। মোরেল তা করেনি, গোড়ায় তার ধারণা ছিল, কৃষকেরা স্বেচ্ছায় তার দাবী মানবে। নানা চেষ্টা করেও সে সফল হলনা। তা সত্ত্বেও কেন মোরেল জোরজুলুমের পথ এড়িয়ে চলেছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। গ্রামাঞ্চলে জমিদারেরা তো হামেসাই এ ভাবে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করেছে। সম্ভবতঃ ফরায়েযীদের বিপুল সংগঠনই মোরেলকে এ সুপরিচিত পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফরায়েযীদের মানসিকতা সম্পর্কেও তার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ পরিচয়। প্রতিপক্ষের হিংসাকে প্রবল-হিংসা দিয়ে ফরায়েযীরা প্রতিরোধ করবে এটা মোরেলের অজানা ছিলনা।

তাই বিদ্রোহীদের হিংসা প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। তাদের যা কিছু সহিংস কার্যকলাপ, তার প্রধান উদ্দেশ্য খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের সফলতা সুনিশ্চিত করা। এ সতর্কতা না থাকলে মোরেল অতি সহজেই আদালতের কাছে প্রমাণ করতে পারত, যে অন্তত কোন কোন চাষী তার দাবী অনুযায়ী খাজনা দিতে রাজী ছিল।

বিদ্রোহীদের চেতনায়, আন্দোলন–বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ ছিল দুটি ঃ জোটের নির্দেশ অমান্য করে চুপিসারে খাজনা দেওয়া, এবং মোরেলের কাছারীর সঙ্গে কোন রকম সংযোগ রেখে চলা। এ কাছারীবাড়ী মোরেলের আধিপত্যের প্রতীক; আন্দোলনের তীব্রতম মুহূর্তেও কাছারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা মোরেলের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি—এ ছিল বিদ্রোহীদের ধারণা। কাছারী যাতায়াত খাজনা দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহীদের চেতনায়, উদ্দেশ্য যাই হোক, কাছারীর সঙ্গে কোন সংস্রব তাদের আদর্শের বিরোধিতা।

টেম্প্রো এবং বেভেরিজ হিংসা-প্রয়োগের কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কাছারীবাড়ীর প্রতি বিদ্রোহীদের তীব্র বিদ্বেষ এবং আক্রোশের কথাই টেম্প্রো বিশেষভাবে বলেছেন।[৮২] একটি ঘটনায় শাস্তি পেল এক নির্দোষ লোক—কাছারীর এক আমলার পুত্র। সে মাঝে মাঝেই কাছারিতে

গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করত। একদিন যাবার পথে বিদ্রোহীরা তাকে আটকায়, এবং আর কাছারীতে না যেতে শাসানি দেয়।

তুষখালী "উপদ্রুত" অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, সেখানকার পরিস্থিতি "ভয়াবহ", "বিপজ্জনক"—তাঁর এ মতের সমর্থনে বেভেরিজ কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করেন।[৮৩] ঘটনার কাল প্রধানতঃ এপ্রিলের (১৮৭২) তৃতীয় সপ্তাহ।

তিনি প্রথম উল্লেখ করেন তাঁর তুষখালী আসার কয়েকদিন মাত্র আগেই তাঁর সহকারী (টেষ্ট্রো) তিনজন বিদ্রোহীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাদের অপরাধ, মোরেলকে খাজনা দেবার জন্য তারা এক কৃষককে মারধর করেছে, এবং জরিমানা করেছে।

১৮ই এপ্রিল: আরমান উল্লা বেভেরিজের কাছে নালিশ জানায়, কয়েকরাত আগে জোটের লোকেরা তার আখের খেত মাড়িয়ে দিয়েছে, অনেক আখ উপড়ে দিয়েছে। তার অপরাধ সে মোরেলকে খাজনা দিয়েছে। তদন্ত করে বেভেরিজ দেখেন, ক্ষতির পরিমাণ শ'খানেক টাকার মত হবে। এ ঘটনার চাক্ষুষ কোন প্রমাণ নেই। তবে বেভেরিজের নিশ্চিত ধারণা, এটা বিদ্রোহীদের কাজ।

১৮ই এপ্রিল: তিনি প্রমাণ পান, যে খাজনা দিয়ে দেওয়ার জন্য জোটের লোক জহী এবং বারু সর্দারকে নানাভাবে হেনস্তা করেছে, এবং জরিমানা দিতে বাধ্য করেছে।

১৯শে এপ্রিল: প্রধানতঃ চণ্ডাল-অধ্যুষিত এক গ্রামের মোড়ল সনাতন সমাদ্দার বেভেরিজকে বলে, আতংকের মধ্যে তার দিন কাটছে। তার ভয়, বিদ্রোহীরা তার বাড়ী পুড়িয়ে দেবে। তার ছেলে ঘরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত কাঠের কয়েকটা টুকরো দেখায়। তার বিশ্বাস, আগুন লাগানোই বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ছিল। সে অবশ্য বলে, তার পরিবার জোটের বিরোধিতা করেনি। সনাতনের সাক্ষ্যে কিন্তু এর সমর্থন মেলেনা। সে স্বীকার করল, মোরেলকে সে খাজনা দিয়েছে। সে অকপটে বলল, বিদ্রোহ চললে তার সমূহ ক্ষতি। সে অতি সচ্ছল কৃষক; মহাজনী কারবারে সে প্রচুর অর্থ লগ্নী করেছে। তার আশংকা, বর্তমানের অরাজক অবস্থায় তার এ ব্যবসা ভীষণভাবে মার খাবে। কেউ খাজনা দিচ্ছেনা; তার দেনা ও হয়ত অনেকে শোধ করবেনা।

১৯শে এপ্রিল: আমানুল্লার অভিযোগ, বিদ্রোহীরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে জোটের এক কাছারীতে আটকে রাখে। সেটা আসলে তাদের এক প্রধান নেতা জরীবুল্লার বসত বাটি। সেদিনই রহিমুদ্দীন নামে এক কনষ্টেবল বেভেরিজকে জানায়, বিদ্রোহীরা জোর করে জরী-

বল্লাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শান্তি ভংগের আশংকায় রহিমুদ্দীন তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার সহচরেরা পুলিশ বাহিনীকে বাধা দিলে জরীবুল্লা পালিয়ে যায়। বেভেরিজের চাপরাশীরা তার বাড়ী গিয়েও তাকে ধরতে পারলনা। বিশাল আকারের এক নাকাড়া মাত্র তারা উদ্ধার করতে পেরেছে। এ নাকাড়ার শব্দ শুনেই বিদ্রোহীরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হত। সে দিন মনিবালাও নালিশ জানাল। বিদ্রোহীরা তার বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, মোরেলের কাছারীর এক আমলা তার বাড়ীতে ঘুরে গেছে।

২০ শে এপ্রিল ঃ জয়চন্দ্র ধোবীর অভিযোগ, জোটের লোকেরা তার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে তাদের এক নেতা নিয়ামতুল্লার বাড়ীতে নিয়ে গেছে। বেভেরিজ নিজেই তদন্ত করে দেখেন, অভিযোগ সত্যি। নিয়ামতুল্লার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর চাপরাশীরা ভাঙ্গা বাড়ীর অংশ দেখতে পায়। খানিকটা দিয়ে গরুর গোয়াল বানানো হয়েছে। বাকী অংশ এক সুপুরী গাছের গায়ে হেলানো ছিল।

২০ শে এপ্রিল ঃ ফটিকের নালিশ, তার বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়েছে। তার বাহুতে এবং পায়ে পোড়া দাগ দেখাল বেভেরিজকে। তিনরাত্রি আগে এ ঘটনা ঘটে। বিদ্রোহীরা সামনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল বলে সে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পেছনের দিকে পালায়। তার জামাকাপড়ে তখন আগুন ধরে। বেভেরিজ পরীক্ষা করে দেখেন, বাহির থেকে, আগুন লাগানো হয়েছে। ছাদের উপর থেকেও আগুন দেবার প্রমাণ স্পষ্ট। বিদ্রোহীদের ভয়ে বাড়ীর ভেতরের উঠোনে সে তার মজুত ধানচাল রেখেছিল। তা না হলে তাও তারা জ্বালিয়ে দিত। ফটিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, জোটের জন্য ধার্য বিঘা প্রতি চার আনা চাঁদা সে দেয়নি।

১৮

বেভেরিজের ধারণা এমন অনেক হিংসা-প্রয়োগের ঘটনা তাঁর গোচরে আসেনি। তবুও মনে হয়, তুষখালীর মত বিশাল মহলের তুলনায় আন্দোলন-বিরোধিতা মোটেই ব্যাপক ছিলনা। বকেয়া খাজনার পরিমাণ থেকে তা অনুমান করা যায়।

মোরেলের সংগে বন্দোবস্তের আগে এ মহলের রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে তেষট্টি হাজার টাকা। মোরেল অতিরিক্ত পনেরো হাজার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বন্দোবস্তের প্রথম বছরের শেষে প্রায়-ষাট হাজার টাকা অনাদায়ী থাকে। পরবর্তী বছরেও প্রায় একই পরিমাণ। যাও কিছু আদায় হয়েছিল, তা প্রধানতঃ রাজকর্মচারীদের চেষ্টায়। ১৮৭৪ সালের নভেম্বরে

লেখা এক চিঠিতে ঢাকা বিভাগের কমিশনার তা অকপটে স্বীকার করেনঃ[৮৪] "মোরেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে তিন বছরেরও বেশী আগে। সরকারী কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ ছাড়া মোরেল কখনও শান্তি বজায় রাখতে পারেনি। ...মোরেলের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক যা দাঁড়িয়েছে, তাতে সরকারী কর্মচারীরা তুষখালী ঘুরে ঘুরে খাজনা না আদায় করে দিলে মোরেলের পক্ষে বন্দোবস্তের শর্ত পূরণের কোন আশাই দেখিনা। অথচ রাজস্বের কিস্তির ব্যাপারে সরকার মোরেলকে যথেষ্ট ঔদার্য দেখিয়েছে। কৃষকদের মনোভাব পাল্টানোর জন্য সরকারের আর কিছু করার নেই। মোরেলের স্বার্থের সঙ্গে কৃষকদের স্বার্থের সমন্বয় সাধন প্রায় অসম্ভব।

মোরেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েনি। সরকারের কাছে তার শেষ প্রস্তাব—জমি জরিপের ভিত্তিতে খাজনার নূতন হার এক করা হোক; সব খরচ সেই মেটাবে; বাড়তি খাজনার ভাগও সে সরকারকে দেবে। সরকার রাজী হয়নি। তাদের নিশ্চিত ধারণা ছিল, মোরেলকে না সরালে অবস্থার কোন হেরফের হবেনা।

১৮৭৫ সালের মার্চ থেকে তুষখালীর দায়িত্ব সরকার নিজের হাতে নিল। একেবারে শুরুতেই কৃষকদের বলা হল, খাজনার হার বাড়বেই[৮৫] জরিপের ভিত্তিতে নূতন নিরিখ স্থির করা হবে।

কৃষকেরা কিন্তু বিনা প্রতিবাদে এ নূতন ব্যবস্থা মেনে নেয়নি। তখনকার এক সরকারী চিঠিতে এ প্রতিরোধের বর্ণনা মেলে। "কৃষকেরা জরিপকারী আমিনদের মারধর করে; জরিপের সব যন্ত্রপাতি চুরি করে নেয়; যে সব চাষী তখনও আমাদের বিপক্ষে যায়নি, তাদের চোখের সামনে তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়; অনেক ক্ষেত্রে জরিপের সময় কৃষকেরা আসেইনি; কোন্‌টা তাদের জমি, তা দেখিয়ে দেয়নি। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা এ বিরোধিতাকে দমন করি। তারা শেষে বুঝল, আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুবেই; তাদের কোনো বিরুদ্ধাচারণ আমাদের সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবেনা বিরোধিতার ফল কঠোর শাস্তি, চূড়ান্ত ক্ষতি। শেষ পর্যন্ত তারা হার মানল।"[৮৬]

১৯

মোরেলের বিরোধী আন্দোলনের ফলাফল আলোচনায় নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক। এ সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণঃ (১) যে উপায়ে সরকার নূতন নিরিখ স্থির করল বিদ্রোহীদের লক্ষ্যের সঙ্গে তা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ? সম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর স্বার্থের দিক থেকে নূতন ব্যবস্থার তাৎপর্য কি? (২) মোরেল যেখানে ব্যর্থ হল সরকার

সেখানে সফল হল কি ভাবে ?

নূতন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ নূতন এক ভিত্তিতে নিরিখ বাড়ানো হল। কোন্ কোন্ শর্তে রায়তদের খাজনা বাড়ানো যাবে, ১৮৫৯ সালের এক আইনে সে সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ আছে। এ নির্দেশ মেনেই অদালত এদ্দিন নিরিখ-বৃদ্ধির যৌক্তিকতা বিচার করেছে। এ আইন অনুযায়ী তিনটে শর্তে খাজনা বাড়ানো বৈধ : (ক) যদি আবাদের প্রসার ঘটে; (খ) যদি কৃষিপণ্যের মূল্য বাড়ে; এবং (গ) যদি পাশাপাশি জমিদারীতে সমশ্রেণীর জমির খাজনার হার বেশী থাকে।

নূতন ব্যবস্থায়, প্রধানতঃ কোর্ফা চাষীদের নিরিখের ভিত্তিতে, 'রায়ত'দের নিরিখ স্থির করা হল। এ নূতন নীতি তখনকার ছোটলাট টেম্পলের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার ফল। বাংলার নানা জায়গায় তখন খাজনা নিয়ে জমিদার-প্রজা বিরোধ উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠছিল। টেম্পলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নিরিখ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকলে এ বিরোধের অবসান হবে, না এবং এ নূতন নীতির ভিত্তিতেই এক স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে।

টেম্পলের যুক্তি ছিল মোটামুটি এই :—যে 'প্রজা'দের সঙ্গে জমিদারের বিরোধ, তারা কোথাও কোর্ফা চাষী নয়; তারা 'রায়ত'। এ রায়তদের যদি কোন ধারণা থাকে যে তাদের নিরিখ চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থাকবে, তাহলে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বর্দ্ধিষ্ণু কৃষি-অর্থনীতিতে নিরিখ অবশ্যম্ভাবী। এ অর্থনীতির এক বৈশিষ্ট্য জমির সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি। প্রধানতঃ এ চাহিদাই খাজনার হারকে নির্ধারিত করে। [এ চাহিদার প্রভাব সর্ব শ্রেণীর চাষীর নিরিখের উপর] সমান নয়। কোর্ফাদের নিরিখের উপর এ প্রভাব অনেক বেশী প্রত্যক্ষভাবে আসে। কারণ সরকারী কোন আইন বা আঞ্চলিক কোন প্রথা বাংলাদেশের কোথাও এ প্রভাবকে ব্যাহত করেনি। স্বাভাবিক অবস্থায়, কোর্ফাদের নিরিখ তাদের আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ নিরিখ দিতে অসমর্থ হলে কোর্ফারা জমি ছেড়ে দিত; এতে জমির চাহিদা কমত এবং ফলে নিরিখও কমত। কোর্ফাদের নিরিখের ভিত্তিতে 'রায়ত' দের নিরিখ স্থির করা তাই অসঙ্গত নয়। এর অর্থ এ নয় যে খাজনার একটি মাত্র নিরিখ হবে কোর্ফাদের নিরিখ। এর অর্থ, কোন নিরিখ দিতে 'রায়ত'দের সামর্থ্য যাচাই করার জন্য কোর্ফাদের খাজনার হার অবশ্যই বিচার্য। দীর্ঘদিন গ্রামে বসবাসের ফলে এবং কোন কোন সামাজিক কারণে জমিতে 'রায়ত'দের বিশেষ অধিকার জন্মায়। তাদের খাজনার হার স্থির করার আগে রাজকর্মচারীদের তাই এ অধিকার সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে; বিশেষ করে কত বছর কোন নির্দিষ্ট জমি তাদের দখলে ছিল, সে সম্পর্কে।

নিরিখ স্থির করার মূলনীতি হিসেবে টেম্পলের এ প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। অধিকাংশ রাজকর্মচারীর ধারণা ছিল, এ নূতন নীতি গ্রামীণ সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাঁদের মতে, কোর্ফা জমির পরিমাণ কোথাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়; তাই কোর্ফাচাষীর নিরিখের ভিত্তিতে অন্য সব কৃষকের নিরিখ স্থির করা সম্পূর্ণভাবে অবাঞ্ছিত; খাজনা-সম্পর্কিত বিরোধ তাতে আরো ব্যাপক ও তীব্র হবে।

কিন্তু তুষখালীর ক্ষেত্রে এ নীতিই গৃহীত হল। এর ভিত্তিতে নূতন খাজনার হার স্থির করার দায়িত্ব দেওয়া হল তখনকার সুন্দরবন কমিশনার গোমেসকে। চার শ্রেণীর জমির ক্ষেত্রে তিনি অনুসন্ধান করে জানেন,[৮৮] রায়তদের জন্য স্থিরীকৃত রীতির হার (১৮৬০) এবং কোর্ফাদের হারের মধ্যে ফারাক বিস্তর। কোর্ফাদের হার এ চার ক্ষেত্রে যথাক্রমে, ৫৬.২৫, ৭০.৪৮, ১০০ এবং ১১০ শতাংশ বেশী।[৮৯] 'রায়ত'দের খাজনার হার বেশী বাড়ানোতে তাঁর আপত্তি ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কারণে কোর্ফারা চড়া হারে জমি নিতে রাজী ছিল। সাধারণ ক্ষেত্রে এ হার প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া, তাঁর মতে, তুষখালীর নূতন আবাদের জন্য সরকারের এক কপর্দকও খরচ হয়নি। এর সবটুকু হাওলাদার এবং সাধারণ কৃষকের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। বর্তমানের বহু কৃষক আসলে এদেরই বংশধর। এদের খাজনার হার হঠাৎ বেশী বাড়ানো তাই অসঙ্গত হবে। গোমেস সব শ্রেণীর জমির ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি চার আনা বাড়ানোর প্রস্তাব দেন।

টেম্পল কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজী হয়নি।[৯০] ভিন্ন শ্রেণীর জমির জন্য ভিন্ন হার ধার্য হল। গুণানুসারে জমিকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হল। নিরিখ বৃদ্ধির হার ঠিক হল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে ছ'আনা; তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রে চার আনা, এবং পঞ্চম শ্রেণীর ক্ষেত্রে তিন আনা।

নূতন নিরিখ তাই বিদ্রোহী কৃষকদের মূল লক্ষ্যের পরিপন্থী। মোরেল বিঘা প্রতি চার আনা অতিরিক্ত খাজনা দাবী করেছিল। অন্ততঃ দুই শ্রেণীর জমির ক্ষেত্রে নূতন নিরিখ আরো পঞ্চাশ শতাংশ বেশী। তাছাড়া এ বৃদ্ধি প্রচলিত কোন আইন অনুসারে হয়নি। বিদ্রোহীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ আইনের ভিত্তিতে মোরেল বা সরকারের কোন বৃদ্ধির দাবীই আদালতে গ্রাহ্য হবেনা।

নূতন ব্যবস্থা তুষখালীর কৃষক সমাজের পক্ষে আরো একটা কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষক সমাজে ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-বৈষম্যকে এতে মেনে নেওয়া হয়। ফলে এ বৈষম্যের ভিত্তি আরো দৃঢ় হয়। কৃষক-সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের বিকাশে দুটি বিশিষ্ট প্রবণতাকে সরকার স্বীকৃতি দেয়:

কোর্ফা প্রথায় জমি চাষ এবং কৃষকের জোতজমির হস্তান্তর।

কোর্ফা প্রথার ফলে গ্রামাঞ্চলে যে নূতন শ্রেণী-সম্পর্ক গড়ে উঠছিল, তার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। কোর্ফা হিসেবে চাষী যে জমি চাষ করত, তাতে তার কোন মালিকানা স্বত্ব ছিলনা। মালিক কোন রায়ত, বা সম্পন্ন চাষী বা জমিদার। মালিক কদাচিৎ দীর্ঘ সময়ের জন্য কোর্ফাদের জমির দখল দিত। অনেক ক্ষেত্রে একই কোর্ফা চাষী বছরের পর বছর এ জমি চাষ করে যেত। তবুও জমিতে তার কোন স্বত্ব জন্মাতনা। প্রচলিত আইনে তাদের জন্য কোন ব্যবস্থাই ছিল না। নিরিখ বাড়ানোর পরিপূর্ণ অধিকার ছিল মালিকের। কোর্ফারা যে সব ক্ষেত্রে ভূমিহীন চাষী তা মোটেই নয়। অনেক সময় তাদের নিজেদের গরু, বলদ আর হাল দিয়ে তারা যে পরিমাণ জমি চাষ পারত, তা তাদের ছিল না বলে তারা অন্যের জমি চাষ করতো। জমির পরিমাণ বাড়লে আয়ও বাড়ত; কিন্তু গরু-বলদ ইত্যাদির জন্য আলাদা কোন খরচ পড়তনা। কোর্ফারা পরবর্তী কালের ভাগচাষীও নয়। কোর্ফারা খাজনা ফসলের ভাগে দিতনা; মুদ্রাতে দিত।

তুষখালীতে কোর্ফাদের সংখ্যা কত ছিল, চাষের জমির কি পরিমাণ অংশ তারা চাষ করত—এ সব প্রশ্নের উত্তর সরকারী নথিপত্রের ভিত্তিতে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে রাজকর্মচারীদের ধারণা, তাদের সংখ্যা বাড়ছিল। প্রধানতঃ দুটি কারণে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই নূতন আবাদের সুযোগ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল; কিন্তু কৃষকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছিল। এ বৃদ্ধির আসল কারণ, অনেক চাষী পাশাপাশি মহলগুলো থেকে তুষখালীতে চলে আসছিল। গোড়ায় তারা থাকতো শুধু চাষের এবং ফসল উঠার সময়। পরে পরে তারা এখানে স্থায়ীভাবেই থেকে গেল। জমির মূল্য বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষখালীতে জমি নেবার আগ্রহও বাড়ে। সম্পন্ন চাষীরা এর পরিপূর্ণ সুযোগ নিল।

কোর্ফা প্রথার ভিৎ এখন আরো পাকা হল। নূতন ব্যবস্থা তাকে শুধু স্বীকারই করেনি। এ প্রথা তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেল; তার সাফল্যের জন্য অপরিহার্য হল। কোর্ফাদের উপর তাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য অব্যাহত না থাকলে 'রায়ত'রাও তাদের নূতন নিরিখে খাজনা দিতে সক্ষম হতনা। কোর্ফা নিরিখের সঙ্গে তাদের নিরিখের পার্থক্য হ্রাস পেল বলে সাময়িকভাবে তাদের আয় কমল।[৯১] কিন্তু এ ক্ষতি একান্তই সাময়িক। বিশ বছর সরকার তাদের নিরিখ আর বাড়াতে পারলো না কিন্তু কোর্ফা-নিরিখ-বৃদ্ধির উপর কোন বাধা নিষেধ আরোপ করেনি।

কৃষক সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য তাই উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। এক ধরনের অসাম্য কৃষক সমাজে বরাবরই ছিল। কারণ সবার জোতজমির

পরিমাণ সমান নয়। বিভিন্ন কৃষকের জমির মধ্যে গুণগত পার্থক্য তো ছিলই। সব কৃষক পরিবার সমান উদ্যোগীও নয়, কিন্তু এ অসাম্য নূতন শ্রেণী-বৈষম্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

নূতন ব্যবস্থায় কৃষক সমাজে আর এক সাম্প্রতিক পরিবর্তনের স্বীকৃতি এ বৈষম্যকে সম্ভবতঃ আরো ব্যাপক করেছিল। এ পরিবর্তন রীলির বন্দোবস্তের পর থেকে কৃষকের জমি-হস্তান্তরের সংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি। সুন্দরবন কমিশনার গোমেসের অনুমান, ১৮৬০ সালের পরের পনেরো বছরে প্রায় আর্ধেক জোত এ ভাবে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে।[৯২] আগের কোন আইন এ হস্তান্তরের বৈধতা মানেনি। সরকারী মহলে ধারণা ছিল, হস্তান্তরের সংখ্যা যাই হোক, সরকার তাদের মানতে বাধ্য নয়। রীলিরও তাই মত ছিল। অবশ্য খাজনা অনাদায়ী থাকার জন্য তিনি নিজেই কয়েকজন ফরায়েযী কৃষকের জমি বিক্রী করে ছিলেন। তা ব্যতিক্রম মাত্র[৯৩] এ ধরনের বিক্রীর সংখ্যা নগন্য। অন্য কোন ভাবে হস্তান্তরের বৈধতা রীলি স্বীকার করেননি।

এ অনিশ্চয়তা এখন সম্পূর্ণ দূর হল। সরকার সব হস্তান্তরের বৈধতা মেনে নিল। এতে সরকারের দ্বিধা ছিলনা তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীর মতে, ব্যাপক হস্তান্তরের, ফলে গত দু'এক দশকে তুষখালীর কৃষক সমাজের আদি রূপ প্রায় হারিয়েই গেছে। বিলুপ্ত স্বত্বের পুনপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অনর্থক জটিলতা বাড়বে। নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ও তাতে অনিশ্চিত থেকে যাবে।

কৃষক-সমাজে ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-বৈষম্য সম্পর্কে জমি হস্তান্তরের বৈধতা স্বীকারের তাৎপর্য মোটামুটি অনুমান করা যায়। অন্যান্য অনেক জায়গায় এ হস্তান্তরের একটা ফল বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। অনেক ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত জমির নূতন মালিক কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত—যেমন মহাজন, আইন-জীবি, সরকারী বা জমিদারী আমলা ও অন্যান্য নানা পেশার লোক। তুষখালীতে এধরনের বৃত্তিজীবি গোষ্ঠীর হাতে অতি সামান্য পরিমাণ জমিই এসেছে। প্রধানতঃ সম্পন্ন কৃষকেরাই এতে লাভবান হয়েছে। এর একটা প্রধান ফল কোর্ফাচাষের প্রসার।

তুষখালীর গ্রামীণ সমাজে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে-ছিল। তা হল—আবাদী তালুকদার, হাওলাদার, নিম-হাওলাদার, ইত্যাদি মধ্যবর্তী শ্রেণীর প্রভাবের দ্রুত হ্রাস। এটা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল নয়। এর সুরুও সাম্প্রতিক নয়। কিন্তু নূতন ব্যবস্থা তাকে ত্বরান্বিত করেছে। বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে এ পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য, কারণ মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি হ্রাসের ফলে সম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর সমৃদ্ধির

পথ সুগম হল।

সৈয়দপুর জমিদারের হয়ে এ মধ্যবর্তী গোষ্ঠীই তুষখালীতে নূতন আবাদের কাজে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠার পর সরকার এ মহলের বন্দোবস্ত তাদেরই দিতে চেয়েছিল। তারা নেয়নি, কারণ তার শর্ত তাদের মনঃপূত ছিলনা। টাকী জমিদার ইজারা নিল। নূতন ইজারাদারের সঙ্গে এ গোষ্ঠীর সংঘর্ষ তুষখালীর ইতিহাসের আদি পর্বের এক বিশিষ্ট দিক।[৯৪] প্রিয়নাথের আমলে এ বিরোধ চরমে উঠে। এ গোষ্ঠীর প্রতাপ বহুলাংশে খর্ব হল। রীলি তাঁর নূতন বন্দোবস্তে (১৮৬০) এ গোষ্ঠীকে কোন আমলই দেননি। বোর্ড অব রেভেন্যু খানিকটা আপোষ করতে রাজী ছিলেন। প্রথম আবাদের কাজে যে সব হাওলাদারের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এবং ইজারাদার-বিরোধী আন্দোলনের সময় যাদের আচরণ বোর্ড 'প্রশংসনীয়' মনে করেছেন' তাদের রাখা কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্যঃ একজন আউসাত তালুকদার, সতেরোজন হাওলাদার এবং একুশজন নিমহাওলাদার[৯৫] রাজস্ব-আদায় ছাড়া তাদের কোন ক্ষমতা রইলনা। আউসাত তালুকদার রাজস্ব আদায়ের খরচ বাবদ আদায়ের পনেরো শতাংশ আর 'মুনাফা' হিসেবে দশ শতাংশ পেত। হাওলাদার এবং নিমহাওলাদারের, মুনাফার হার ছিল যথাক্রমে পনেরো ও দশ শতাংশ। গোমেসের নূতন ব্যবস্থায়ও (১৮৭৫) তাদের রাখা হল। খরচা ও মুনাফার হারের ও কোন পরিবর্তন হলনা।

গোমেসের দেওয়া পাট্টা[৯৬] থেকে হাওলাদারদের জোতের পরিমাণ এবং ক্ষমতা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়। একটা পাট্টা অনুযায়ী, দু'জন হাওলাদার সুকুর মহম্মদের দুই পুত্র—জান মহম্মদ ও মদন। জোতের পরিমাণ দু'শ পাঁচ বিঘার মত; মোট রাজস্ব দু'পঞ্চান্ন টাকা। কৃষকদের কোন অধিকারে তাদের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অবৈধ। তাদের ক্ষমতার এক্তিয়ার—তারা কৃষকদের থেকে রাজস্ব আদায় করে সরকারকে দেবে। তারা আরো দেখবে, হাওলার অন্তর্গত কোন জমি যাতে চাষের অযোগ্য না হয়ে পড়ে। তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আরো একভাবে অনুমান করা যায়। যে জমি থেকে তাদের রাজস্ব-আদায়ের ভার ছিল তার পরিমাণ (১০, ২২৯ বিঘা) সমগ্র জমির (৬৮, ৮৩২ বিঘা) ১৪.৮ শতাংশ মাত্র। অবশিষ্ট অংশে (৫৮, ৬০৩ বিঘা) সরকারের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি সম্পর্ক। হাওলাদার-নিয়ন্ত্রিত জোতের সংখ্যা (৫৬০) সমগ্র জোতের (৩৯৭৪) মাত্র ১৪ শতাংশ। বাকী সব কৃষকদের অধিকারে। মাত্র ৬৭২টি জোতে কৃষকদের 'দখলী-স্বত্ব' ছিলনা।[৯৭]

তুষখালীর গ্রামীণ সমাজে হাওলাদার জাতীয় মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর

ক্ষীয়মান প্রভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নূতন আবাদের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা বহু দিন আগে থেকেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। কিন্তু কালীনাথের আমলেও (১৮৩৮-১৮৫৫) কৃষক শ্রেণীর উপর তাদের প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় ছিল না। পরে পরে তা দ্রুত হ্রাস পেল। রাজস্ব-আদায়ের ক্ষেত্রেও যদি তাদের কোন বিশেষ ভূমিকা থাকত, তাহলেও তাদের সামাজিক প্রভাবের বেশ খানিকটা অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু রীলি এবং গোমেসের নূতন ব্যবস্থায় তাদের স্থান একেবারেই গৌণ হয়ে গেল। এর একটা ফল, সম্পন্ন কৃষকশ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পথে একটা বড়ো বাধা দূর হল।

গোমেসের নূতন নিরিখের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন ব্যর্থ হল কেন? রাজকর্মচারীদের ধারণা, এর প্রধান কারণ নূতন নিরিখ সম্পর্কে সরকারের অনমনীয় মনোভাব। এ ধারণার যথার্থতা সন্দেহাতীত। এ নূতন নীতির প্রধান প্রবক্তা ছোটলাট টেম্পল। কৃষকদের পরিষ্কার ভাবে বলা হল— সরকার নিরিখের সামান্য হেরফের করতেও রাজী; কিন্তু তা ঠিক হয়ে যাবার পর সরকার কোন ওজর অজুহাত শুনবেনা; কারণ রাজস্বের মূল নীতি সম্পর্কে সরকারের কোনো দ্বিধা কৃষকদের কাছে সরকারের দুর্বলতা বলে মনে হবে; এর সুযোগ তারা নিতে ছাড়বেনা; এর অশুভ পরিণাম সব সরকারী মহলেই আস্তে আস্তে দেখা যাবে।

এ নীতির কোন বিরোধিতা তাই সরকার বরদাস্ত করেনি। জরিপের লোকদের উপর নানা ধরনের হামলা সরকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিহত করে। কৃষকেরাও প্রতিরোধের পথ পরিহার করল। কারণ, তারা বুঝল, সরকারের ক্ষমতা অবাধ; তাই এভাবে তারা সফল হতে পারবেনা। তা ছাড়া উদ্দেশ্যের দিক থেকে আগের আন্দোলনের সঙ্গে এবারের আন্দোলনের পার্থক্য মৌলিক। তুষখালীর ইজারা আবার নূতন করে পাবার জন্য প্রিয়নাথের চক্রান্ত যদি সফল হতো, তাহলে কৃষকদের অস্তিত্বই বিপন্ন হত। একদিকে ছে-ইজারাদারদের দৌরাত্ম্য, অন্যদিকে ভূমি স্বত্ব, জমির নিরিখ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে গভীর অনিশ্চয়তা। আন্দোলনের বিকল্প কিছুই ছিলনা। মোরেল প্রিয়নাথের মত জোরজুলুমের আশ্রয় নেয়নি; কিন্তু সম্পন্ন কৃষকদের কাছে তার খাজনা বাড়ানোর কায়দা মোটেই গ্রহণীয় ছিল না। তাদের সংশয় ছিল, মোরেল পরে পরেও এভাবে আইন-বহির্ভূত উপায়ে খাজনা বাড়াতে পারে। নিরিখের মত মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা সম্পন্ন কৃষকদের সমৃদ্ধির পথে একটা প্রধান অন্তরায় হতে পারে। গোমেসের নূতন ব্যবস্থায় তাদের নিরিখ বাড়ল বটে; কিন্তু তারা জানল, বিশ বছরের মধ্যে তার কোন পরিবর্তন হবেনা; কোর্ফাদের সঙ্গে

তাদের সম্পর্কেও সরকার কোন হস্তক্ষেপ করবেনা। তারা নিজেরাই সব সময় রাজকর্মচারীদের বলে আসছে, আদালত অনুমোদন করলে তারা বর্ধিত নিরিখ দেবে। গোমেসের নূতন নিরিখের বৈধতা সম্পর্কে আদালত কোন সন্দেহই প্রকাশ করেনি। অথচ সরকারী আদালতের স্বীকৃতি না থাকলে সম্পন্ন কৃষকদের ভূমিস্বত্বেরও কোন পাকা ভিত্তি থাকবেনা। এ স্বীকৃতি এ ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তুষখালী সরকারী জমিদারী। সরকারের কাছে বশ্যতা স্বীকার তাই এ ধরনের আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি।

২০

আমাদের বিশ্লেষণ থেকে বিদ্রোহী কৃষকদের পরিবর্তমান চৈতন্যের রূপ খানিকটা সম্পর্ক অনুমান করা যায়।

আন্দোলনের দুই পর্যায়ে বিদ্রোহীদের চিন্তা-ভাবনায় বিশেষ পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নিতে কৃষকেরা খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। দীর্ঘদিন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কোনো বিশেষ চেষ্টাই তারা করেনি। প্রতিরোধ শুরু হলেও বেশীদিন চলল না। প্রিয়নাথের মহল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অবশ্যই তাদের পক্ষে এক বড়ো জয়। কিন্তু তার পরে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ তারা এড়িয়ে চলল। এমনকি প্রিয়নাথের কুখ্যাত লাঠিয়াল বাহিনীর দুই দুর্ধর্ষ সর্দারকে সরানোর জন্যও তাদের কোন উদ্যোগ দেখা গেলনা। প্রিয়নাথের প্রজা-পীড়ণের মুখ্য হাতিয়ার ছে-ইজারাদারেরাও থেকে গেল। কৃষকদের দ্বিধার কারণ আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত। বিদ্রোহের ফলাফল অনিশ্চিত, বিশেষ করে যেখানে প্রিয়নাথের মত পরাক্রমশালী জমিদারের সঙ্গে তাদের লড়তে হবে। এতে ঝুঁকিও অনেক। তাই তারা একটা সহজ বিকল্প বেছে নিয়েছিল। প্রিয়-নাথের কুটিল চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর তারা আর এগুলনা। কারণ তারা জানতো, এক বছরের কিছু সময় পরে প্রিয়নাথের কর্তৃত্বের অবসান এমনিতেই হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্রোহীদের আত্ম-প্রত্যয় ছিল অনেক বেশী বলিষ্ঠ। তাদের সংকল্প টলেনি। এর কয়েকটা কারণ নির্দেশ করা যায়। ক্রমবর্ধমান আর্থিক সমৃদ্ধি সম্পন্ন কৃষকদের এ আত্মবিশ্বাসের মূলে। ফরায়েযীদের সামাজিক সংগঠনও তখন অনেক বেশী দৃঢ় ও সংহত হয়। এ সংগঠনের প্রাণশক্তি প্রবলতর শ্রেণী-শত্রুকে প্রতিহত করার সংকল্প। আদি ধর্মবিশ্বাসও এ সংহতিবোধকে নিঃসন্দেহে দৃঢ় করেছিল। তাছাড়া গ্রাম-শাসনের জন্য কোন নিপুণ ব্যবস্থা মোরেল গড়ে তুলতে পারেনি। যাও ছিল, তা টাকী-

বাবুদের তুলনায় অনেক দুর্বল, বিক্ষিপ্ত। মোরেলের কর্তৃত্বের ভিত্তি প্রধানতঃ তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা; আর সরকারের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক। গ্রামীণ সমাজের উপর যে নিয়ন্ত্রণ টাকীপরিবারের ছিল, মোরেলের তা ছিলনা।

তুষখালীর আন্দোলনের সঙ্গে ফরায়েযীদের আগের অন্যান্য আন্দোলনের তুলনা করলেও কৃষকদের চেতনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গোড়ায় ফরায়েযী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি অনেক ব্যাপক ছিল। কৃষকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য গোষ্ঠীরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল—যেমন খুদে দোকানদার, গরীব জোলা ইত্যাদি। কৃষকদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল প্রধানতঃ প্রান্তিক এবং গরীব চাষী। ফরায়েযী-মতবাদ এদেরই বেশী আকর্ষণ করেছিল। ফরায়েযীগুরুদের এক বিশেষ সমাজদর্শন ধর্মান্তরিত কৃষক। জোলাদের বাস্তব অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। তাঁরা বলতেন সব জমি ভগবানের দান; এতে তাই সবারই সমান অধিকার; জমির উপর কোন বিশেষ গোষ্ঠীর এক-চেটিয়া মালিকানা ভগবানের বিধান লংঘনের সামিল; এ মালিকানা অবৈধ বলেই খাজনা, আবওয়াব ধার্য করার কোনো অধিকার জমিদারের নেই। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন সংস্কারের কথা তাঁরা ভাবেননি; তাঁরা চেয়েছিলেন আমূল পরিবর্তন—বিশেষ করে জমিদার এবং নীলকরদের শোষণ-ব্যবস্থার অবসান। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই ফরায়েযীরা বুঝতে পেরেছিল, সরকারী শাসন-যন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এ ব্যবস্থা টিকতনা। ফরায়েযীদের বৃটিশ শাসন-বিরোধিতার মূল কারণ এ ধারণা। এ বিষয়ে অবশ্য ওয়াহাবীদের সঙ্গে তাদের খানিকটা পার্থক্য ছিল। ওয়াহাবীদের মূল লক্ষ্য ছিল বিধর্মী ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভূত্বের অবসান ঘটানো। ফরায়েযীদের আন্দোলন প্রধানতঃ জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে। কোন কোন সময়ে আঞ্চলিক বৃটিশ প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এরই একটা ফল। তাছাড়া, যদিও এ দুটো আন্দোলন দুই ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল, ওয়াহাবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে ফরায়েযীদের রাজনৈতিক চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

আদি ফরায়েযী আন্দোলনের অনেক বৈশিষ্ট্যই পরে আর দেখা যায় না, বিশেষ করে তুষখালীর দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্রোহে। যে সমাজ দর্শন খুদে চাষী ও নিঃস্ব জোলাদের এককালে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার প্রভাব প্রায় থাকলইনা। এর মধ্যে এক সম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। প্রধানতঃ তাদের স্বার্থই বিদ্রোহের মূল ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জমিদার-বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকল; কিন্তু বৃটিশ-

বিরোধিতা ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে এল। এর একটা কারণ, বৃটিশ আইন-কানুন ও আদালতের স্বীকৃতিই সমৃদ্ধ কৃষকদের ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে সব অনিশ্চয়তা দূর করতে পারত। আইন এ স্বত্ব সৃষ্টি করেনি; কিন্তু আইনের স্বীকৃতি তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করল। শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতাই এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগীর একটি মাত্র কারণ হয়ত নয়। মুসলিম সমাজে নানা সংস্কার আন্দোলনেও সে সময় এক নূতন প্রবণতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বৃটিশ শাসনের প্রতি গোড়াকার তীব্র বিরাগ আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল। এমন কি ওয়াহাবীদের ক্ষেত্রেও বিধর্মী শাসনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন জেহাদ ধর্মবিশ্বাসের মূল অংগ বলে গণ্য হলনা। এ বিশিষ্ট প্রবণতা ফরায়েযীদেরও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।[৯৮]

তথ্য নির্দেশ

১. সুন্দরবনের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সরকারী মহল তুষখালী বাকেরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত। উত্তরে সৈয়দপুর পরগণা, দক্ষিণে বিস্তৃত সুন্দরবন 'লট' দেবনাথ-পুর, পূর্বে ভাগীরথপুর নদী, এবং পশ্চিমে বালেশ্বর নদী। প্রথমে সৈয়দপুরের জমিদার নূতন আবাদের কাজে প্রধান ভূমিকা নেয়। ১৮৩০ সালের মার্চ-মাসে সরকার প্রথম এ সমৃদ্ধ অঞ্চলের সন্ধান পায়, কিন্তু তুষখালীর উপর সৈয়দপুরের দাবী মেনে নেয়নি। জমিদারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা আনে (১৮১৯ সালের দু'নম্বর আইন এবং ১৮২৮ সালের তিন নম্বর আইন অনুসারে)। আদালতের রায়ে (১৮৩৩ সালের ২৫শে নভেম্বর) সৈয়দপুরের দাবী নাকচ হয়ে যায়। জমিদার এ রায় মানলনা বলে আবার মামলা হয়। চূড়ান্ত রায়েও (১৮৩৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর) জমিদারের হার হল।
১৮৩৩ সালের নভেম্বর থেকে পাঁচ বছরের মত এ মহল সরকারী পরিচালনায় ছিল। কিন্তু আবাদী তালুকদার, হাওলাদার ইত্যাদি মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষের জন্য সরকার এ মহল ইজারা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। টাকী জমিদারের সঙ্গে বিশ বছরের জন্য (বাংলা সাল ১২৪৬-১২৬৫; খৃষ্টাব্দ ১৮৩ /৪০—১৮৫৯/৬০) বন্দোবস্ত হয়। এর মেয়াদ শেষ হলে তদানীন্তন সুন্দরবন কমিশনার রীলি জমি জরিপের ভিত্তিতে রাজস্বের নূতন নিরিখ স্থির করেন। ১৮৭১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত সরকার নিজেই এ মহল পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এর মধ্যে প্রায় আট বছর মোরেল পরিবার সরকারের হয়ে রাজস্ব আদায় করে। তারপর মোরেল ইজারা নেয় বিশ বছরের জন্য। প্রজা-বিদ্রোহে বিব্রত হয়ে মোরেল ১৮৭৫ সালে সরকারকে মহল ফিরিয়ে দেয়।

২. তুষখালীর দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের সময় (১৮৭২-১৮৭৫) হেনরী বেভেরিজ

(Henry Beveridge) ছিলেন বাকেরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। ঢাকা বিভাগের কমিশনার ও ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিসের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্র এ আন্দোলন-সম্পর্কিত মূল উপকরণের একটা বড়ো অংশ। অথচ তাঁর বইতে (*The District of Bakarganj*, London, 1876) এর উল্লেখমাত্র আছে। এ আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর বইতে প্রত্যাশিত ছিল। কৃষক বিদ্রোহের উপর সুপ্রকাশ রায়ের বিশাল গ্রন্থে ("ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম", তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা, ১৯৮০) এ বিদ্রোহের কোন উল্লেখই নেই। আবদুল জলীলের "সুন্দরবনের ইতিহাস" (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা সাল ১৩৭৬)—বইতেও মূল বিদ্রোহের কোন আলোচনা নেই। টাকী জমিদার কালীনাথের আমলে (১৮৩৮-১৮৫৫) অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য একবার কি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, এতে তারই শুধু উল্লেখ আছে। কালীনাথ মিথ্যা গুজব রটিয়ে দিলেন, এবার সৈন্য আনা হবে। প্রজাদের বিভ্রান্ত করার জন্য আনুষঙ্গিক আয়োজনও করা হল। "সমগ্র এলাকা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া বর্গা কবুলতি দিয়া জমিদারের নিকট আত্মসমর্পণ করিল", (পৃঃ ৪১৯-৪২০)। সরকারী দলিলে এ ঘটনা সম্পর্কে আমি কোন উল্লেখ পাইনি।

৩. টাকী চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত।

৪. কৃষকেরা প্রিয়নাথকে এ নামেই ডাকত। এ নামকরণ সম্ভবতঃ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয়নাথের পরাক্রম বোঝানোর জন্যই কি এ অভিধা? তার সম্পর্কে প্রজাদের সম্ভ্রমবোধ কি এতে সূচিত হচ্ছে?

৫. Bengal Board of Revenue Proceedings, 17 November 1858; Prog No 64; J. H. Reily, Commissioner of Sunderbuns to the Commissioner of Revenue, Nadia Division, 12 May 1858; Para 13. তুষখালীর প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন (১৭৫৫-১৮৫৮) সম্পর্কে আমাদের প্রধান নির্ভর রীলির এ দীর্ঘ চিঠি। বিদ্রোহীদের নিজেদের কোন বিবরণ আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে রীলির চিঠিতে উল্লেখ আছে, বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে কৃষকদের মনোভাব জানার জন্য তিনি কয়েকবার তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

৬. মোরেল সম্পর্কে আনুষঙ্গিক অনেক তথ্য এ প্রবন্ধেই দিয়েছি। সুন্দরবনের নানা 'লট' মোরেল পরিবার আবাদের জন্য সরকার থেকে নেয়। সুন্দরবনের যে কয়েকটা মহল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত ছিল, তাদের মধ্যে হালতা এবং সোনাখালী মোরেলের জমিদারীতে। (H. Beveridge, op. cit, p 144). ১৮৬০ সালে সরকার খাজা আবদুল গণির দু'টি বিস্তীর্ণ লট, কৈলা এবং ফুলঝুরি, ফিরিয়ে নেয়। মোরেলকে তাদের রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়। তার প্রাপ্য ছিল আদায়ের পঁচিশ শতাংশ। ১৮৬০-৭০, এ সময়কালের মধ্যে আট বছর মোরেল তুষখালীরও রাজস্ব আদায় করে।

1875. Collection 7—1/2. F. R. Cockerell, Dacca Commissioner to the Board of Revenue. L. P. 25 Nov 1875. ১৮৭২ সালের ১৫ই জানুয়ারী ঢাকা বিভাগের কমিশনার F. B. Simson স্থানীয় শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় মোরেলের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। Bengal Revenue Dept. Progs, March 1872, Prog No. 5. তাঁর চিঠির অনুচ্ছেদ নং ৫। ফরায়েযীরা নাকি তখন রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করেছিল।

৩৬. বোর্ড অব রেভেন্যু একটি চিঠিতে (১৯ জুলাই, ১৮৭০) ছোটলাটের কাছে বিভিন্ন মতের এক সংক্ষিপ্তসার পাঠান। Bengal Revenue Dept. Progs; Oct 1870, Prog No. 6.

৩৭. Bengal Revenue Dept. progs; (Survey & Settlement), Sept. 1877: A. D. B. Gomess, Commissioner of Sunderbuns to Dacca Commissioner, 23 June 1877. Para 5. এ চিঠিতে একেবারে শুরু থেকে মোরেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত পর্যন্ত তুষখালীর বিবরণ পাওয়া যাবে। মোরেলের বন্দোবস্তের আগে এ মহলের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৬৩,৬৫৬ টাকা। মোরেল আরো পনেরো হাজার টাকা দিতে রাজী হয়।

৩৮. "It is understood that Messrs. Morrell consider that the cancelment of the lease would be destruction to them, by shutting them out from the market, where alone they can procure their labour for the Sunderbun estates in the neighbourhood which they have reclaimed from waste." Para 10 of the Board of Revenue's letter to the Govt. of Bengal, Revenue Dept., 8 Dec 1874. (Bengal Revenue Dept. Progs. Jan 1875, Colln No. 7—1/2).

৩৯. ১৮৫৯/৬০ সালের ব্যাপক নীলকর-বিরোধী কৃষক আন্দোলনের কারণ, ব্যাপ্তি, চরিত্র ইত্যাদি অনুসন্ধানের জন্য Indigo Commission গঠিত হয়।

৪০. *Report of the Indigo Commission (1860)*; প্রশ্ন সংখ্যা ২৩২৬, ২৪০৬-২৪১০।

৪১. পাদটীকা নং ৩৫ দ্রষ্টব্য। F. R. Cockerell এর চিঠির অনুচ্ছেদ নং ৪।

৪২. পাদটীকা নং ৩৮ দ্রষ্টব্য। বোর্ডের চিঠির অনুচ্ছেদ নং ১১।

৪৩. Report of the Indigo Commission (1860). প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৬০৯-২৬১৪।

৪৪. পাদটীকা নং ৩৭ দ্রষ্টব্য। গোমেসের চিঠির অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২৭-২৮।

৪৫. এ চারটে বাজার হল—গাবতলী, তুষখালী, মোটবাড়ী ও সাপ্পা।

৪৬. Bengal Revenue Dept. Progs (Misc) March 1872, Prog No. 58, Dacca Commissioner to the Govt. of Bengal, Rev.

Dept : 4 March 1872, Para 6.

৪৭. ১৮৫৯ সালের ১০ নম্বর আইনে এ অধিকারকে Occupancy Right বলা হয়েছে। ১২ বছর ক্রমান্বয়ে জমি দখলে থাকলে এ স্বত্ব অর্জন করা যেত।

৪৮. Bengal Revenue Dept. Progs, March 1872, Progs Nos. 56-59. D. M. Testro, Assistant Magistrate & Collector of Backergunje, to the Magistrate of Backergunje, 15 Feb 1872, Para 15.

৪৯. এ বিষয়ে আলোচনার জন্য এ প্রবন্ধের অধ্যায় (Section) ১৭ দ্রষ্টব্য।

৫০. Bengal Revenue Dept. Progs, March 1872, Prog No. 6 ; Deputy Collector and Deputy Magistrate of Perozepore to the Collector of Backergunje, 30 Jan 1872, Para I.

৫১. মোট খাজনার পরিমাণ (টাকা ১২·৪১) ÷ বিঘা প্রতি খাজনার হার (টাকা ১·২৫)=৯·৯৬ বিঘা।

৫২. একটা সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করা সম্ভব: প্রিয়নাথের স্বৈরাচারের পর রীলির নূতন ব্যবস্থা কৃষকদের চেতনায় এক মৌলিক পরিবর্তন বলে মনে হয়েছিল। আগে ছিল সব কিছু অনিশ্চিত; সবই নির্ভর করত প্রিয়নাথ আর তার আমলাদের খেয়াল খুশির উপর। যেভাবে রীলি নূতন ব্যবস্থা চালু করেছিল, তাতে কৃষকদের ধারণা হয়েছিল, তা মোটামুটি স্থায়ী হবে। ১৮৬০ এর দশকে নিরিখের কোন পরিবর্তন হয়নি বলে এ ধারণা আরো দৃঢ় হয়।

৫৩. পাদটীকা নং ৪৮ দ্রষ্টব্য। টেস্ট্রোর চিঠির ১১ নং অনুচ্ছেদ। "I find they have an admirable understanding of the facts and the bearings on them . . . It is not as if the men were wavering between two opinions, ignorant of their own interest, and in need of good advice. They seem to understand their own position just abut as well as either you or I could explain to them."

৫৪. এ প্রবন্ধের অধ্যায় ১৭ দ্রষ্টব্য।

৫৫. Bengal Revenue Dept. Progs : August 1871.

৫৬. Bengal Revenue Dept Progs ; (Survey & Settlement). Jan 1875, Collection 7—112 ; Messrs Morrell & Lightfoot to the Collector of Backergunje. 1o Sept, 1874, Para 3.

৫৭. Bengal Revenue Dept. Progs ; March 1872, Prog No. 6 ; Messrs Morrell and Lightfoot to M. S. Obedulla Khan, Deputy Magistrate of Perozepore ; Para 3. তাদের চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য : "You will agree with us in thinking it

necessary to put a summary stop to the complete subversion of all constituted authority that at present exists in this estate, where the property and liberty of a large body of peaceable villagers is entirely at the disposal of a gang of lawless and turbulent men."

৫৮. তখন কমিশনার ছিলেন F. B. Simson.

৫৯. Bengal Revenue Dept. Progs. March 1872, Proge Nos 56-59 ; Dacca Commissioner to the Govt. of Bengal, Revenue Dept, 26 Feb 1872.

৬০. একই। Para 10 বর্ধিত নিরিখের দাবী না মানলে আবদুল গণি সম্ভবতঃ কি করতেন, সে সম্পর্কে কমিশনার লিখছেন ঃ "In case of refusal, he would at once have proceeded to oust them, and in matters of resort to force, management of lawsuits, preparation of evidence, he would have played them off with their own weapons, backed by a very heavy purse of some 8 lacs per annum and the use he could make of his influence over a vast area of neighbouring property where the inhabitants are all under his will."

৬১. Bengal Revenue Dept. Progs, March 1872. Prog No. 6, H. Beveridge offg. Magistrate of Backergunje to Dacca Commissioner, 3 Feb 1872. Para 2. তাঁর সিদ্ধান্ত ঃ . ."I think I am bound to support the farmers in collecting the rents to which they are entitled and also to see that the weaker party be not tyrannized over." স্পষ্টতঃ তাঁর মতে মোরেলই "দুর্বলতর পক্ষ" কেননা "The ryots are now nearly all of one mind, and Messrs Morrell and Lightfoot are not powerful enough to compel the ryot to pay enhanced rent even if they had the wish to do so."

৬২. একই ; Prog No. 7 ; Board of Revenue, L. P. to the Govt. of Bengal, Rev. Dept, 23 Feb 1872. Para 3. বোর্ড অব রেভেন্যু এ ধরনের আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্যের উপর জোর দেন ঃ 'The most serious political consequences among the excitable Mohamedan ryots of the neighbouring parts of the country.'

৬৩. একই ; Prog No 8, Secretary to the Govt. of Bengal to Dacca Commissioner, 29 Feb 1872. ক্যাম্পবেলের সিদ্ধান্ত ঃ "The farmers of the estate should be fairly supported in their

legitemate right. But on the other hand, the Government is not bound practically to enhance their rents for them since the farm appears to have been given to them with the view of avoiding the difficulty of Government management" para No. 2. পরবর্তী এক চিঠিতে (Govt. of Bengal to Dacca Commissioner. 12 March 1872 ; source একই : Prog No. 59) ছোটলাট আরো দৃঢ়ভাবে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেন : 'Campbell . . . wishes it to be distinctly understood that he will never Consent, on the part of Government, to one sided bargains, to which Govt is to be held only if they prove profitable to the other party. . . .If the ryots think proper to Contest the enhancement question through every Court in the Country, they are quite entitled to do so, and they cannot be branded as rebels and conspirators on that account'' (Paras 3-4).

৬৪. একই, Prog No 58. Dacca Commissioner to the Secretary to the Govt. of Bengal. Rev. Dept, 4 March 1872 ; Para 15.

৬৫. কৃষক আন্দোলনের সময় গুজবের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার জন্য Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* (Oxford University press, New Delhi, 1983) দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৫১-৭৭।

৬৬. H. Beveridge, Op. cit. (Reprint, Barisal, 1970, পৃঃ ১৮৪)। জিম্মাপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা পৃঃ ১৭৯-৮১। নীল তদন্ত কমিশনারের কাছে রীলির মন্তব্য উদ্ধৃতি যোগ্য : জমিদারদের পারস্পরিক বিরোধের প্রায় সবগুলির মূলে এ জিম্মা প্রথা। প্রতিপক্ষ কোন জমিদার যাতে এ প্রথার সুযোগ না নিতে পারে সেজন্য স্থানীয় ইজারাদার বা জমিদার তাদের অধীনস্থ প্রজাদের ভূমি-স্বত্ব নানা কৌশলে কিনে নিতে চেষ্টা করত। *Report of the Indigo Commission* প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৬০৪।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়, বিদ্রোহীরা যে পার্শ্ববর্তী কোন কোন জমিদারের সাহায্য নেবার কথা ভাবছিল, সরকারী দলিলের তার কোন উল্লেখ নেই। বেভেরিজ নিঃসন্দেহে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছেন।

৬৭. এ প্রথা প্রধানতঃ বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের শক্তিশালী সংগঠন সত্ত্বে যে ফরায়েযীরা এ প্রথার মাধ্যমেই মোরেলের প্রয়াসকে ব্যর্থ করার কথা ভেবেছিল। তা প্রমাণ করে তারা আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি।

৬৮. পাদটীকা নং ৬১ দ্রষ্টব্য ; Prog No 5 ; Dacca Commissioner to

Govt. of Bengal, Rev. Dept, 15 Jan, 1872; Para 3. কমিশনারের মতে, ফরায়েযীরা সে সময় আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করে।

৬৯. ফরায়েযীদের ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে Muin-ud-Din Ahmad Khan এর *History of the Fara'idi Movement in Bengal 1818-1906* (Karachi, 1965) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Rafiuddin Ahmed ও *The Bengal Muslims, 1871-1906: A Quest for Identily, Oxford University Press, Delhi, 1981* এ বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন. Chs 2 & 3.

৭০. Bengal Revenue Dept. Progs; March 1872, Progs Nos 56-59; Dacca Commissioner to Govt. of Bengal, 26 Feb, 1872; Para. 12. তাঁর মতেঃ "These Combination are the sign of Ferazee action among the Mahomedans, the leaders almost invariably being conspicuous also as Ferazee authorities and the relative position of Mahomedan tenants and landlords either European or Hindu, was connected with most of the old Ferazee disturbances."

৭১. মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ১৮৫০ এর দশক থেকে ফরায়েযী সংগঠন এক সুস্পষ্ট রূপ নেয়।

৭২. এর আগেও ফরায়েযী মতবাদের প্রতি কৃষকদের আর্কষণের কারণ শুধুমাত্র নূতন ধর্মবিশ্বাস নয়। "The reform movements achieved great fame . . . primarily because they wakened in the oppressed peasantry a consciousness of social injustice and economic oppression and thus threatened the status quo in the rural society, affecting not only the wealthy landlords or moneylenders but even the petty *mullahs*" Rafiuddin Ahmed, Op. cit. P. 50.

৭৩. Muin-ud-din Ahmad Khan, Op. Cit, Ch. VIII.

৭৪. পাদটীকা নং ৭০ দ্রষ্টব্য। অনুচ্ছেদ নং ৩।

৭৫. পাদটীকা নং ৬১; Prog No 5; অনুচ্ছেদ নং ৩।

৭৬. নবীন চন্দ্র সেন, "আমার জীবন" (নবীন চন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা, ১৩৬৬) পৃঃ ১০৬-১০৭। নোয়ামিয়ার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য পৃঃ ১০১-১০৬।

৭৭. আইনের ভাষায় 'perjury' ১৫ ই জানুয়ারী ১৮৭২-এ অভিযোগে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার প্রস্তাব করেনঃ "All who have tendered rents under such circumstances to the moonsiff, and have falsely stated that they tendered their full rents to the Morrells,

should be prosecuted for perjury by Government, and if Convicted, should be punished with maximum sentences" অনুচ্ছেদ নং ৫।

৭৮. পাদটীকা নং ৭০ দ্রষ্টব্য। D. M. Testro, Assistant Magistrate and Collector & Backergunje to the Magistrate and Collector of Backergunje, 15 Feb, 1872.

৭৯. পাদটীকা নং ৬১। Messrs Morrell and Lightfoot to the Deputy Magistrate of Perozepore ; 27 Jan 1872 ; and 29 Jan 1872 ;

৮০. পাদটীকা নং ৭৮ টেস্ট্রোর চিঠির অনুচ্ছেদ নং ৬।

৮১. একই। টেস্ট্রোর মন্তব্য : 'I have no hesitation in characterizing this whole proceeding as a manouevre. It was melodramatic an not real ; it was badly managed moreover, and altogether, premature ; Considerations of time and distance showed plainly that these men have been drawn up at the farmer's *Cutcherry* awaiting my arrival"

৮২. একই। টেস্ট্রোর চিঠির অনুচ্ছেদ নং ৮।

৮৩. Bengal Revenue Dept. Progs, (Misc), May 1872, Prog No 59. H. Beveridge, offg Magistrate & Collector of Backergunje to the Inspector General of police, Calcutta, 28 April, 1872 ; "Memorandum", 29 April, 1872.

৮৪. Bengal Rev. Dept. (Survey & Settlement) Progs ; Jan 1875, Colln 7—1/2 ; F. R. Cockerell, Dacca Commissioner to Board of Revenue, L. P. 25 Nov 1874 ; Para 10। কমিশনারের সিদ্ধান্ত : "To continue such efforts after all that has passed is in my opinion, to place the Government and its' officers in a false position."

৮৫. একই। Collection 7—3 ; Minute by the Lieutenant Governor of Bengal, I January, 1875. রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাব : 'We have a right to make...a fresh Settlement with the ryots ; . . . a demand thus fixed should be exacted in a manner quiet and considerate, but still firm, so firm indeed that the ryots who are reputed to be of a somewhat turbulent character may at once see that we are not going to be trifled with.'

৮৬. Bengal General Dept. Progs, September, 1876 ; File 129—1/2 ; Annual Report of the Dacca Commissioner, 1875/76,

7 Aug 1876 ; Para 83.

৮৭. 'কোর্ফা' চাষী তারা, যারা, 'রায়তদের থেকে জমি নিয়ে চাষ করত। জমিদার যাদের থেকে সরাসরি খাজনা আদায় করত, আইনের ভাষায় তাদের বলা হত ''রায়ত''.

৮৮. Bengal Revenue (Survey & Settlement) Progs April 1876 ; Collection No 7—37 ; A. D. B. Gomess, Sunderbun Commissioner to Dacca Commissioner, 16 March 1876, Para 11.

৮৯. সাধারণ কোর্ফা নিরিখ যেখান এক টাকা নয় আনা থেকে আড়াই টাকা পর্যন্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে কোর্ফারা তিন টাকা দু'আনা পর্যন্ত দিতে রাজী ছিল। গোমেস্ এর দুটো কারণ নির্দেশ করেছেন। (১) বাইরের কোন চাষী যদি অন্য গ্রামে অল্প সময়ের জন্য জমি নিতে চাইত, তাদের ঐ চড়া হার দিতে হত। (২) অনেক সময় চাষীদের গরু, বলদ হাল ছিল, কিন্তু সে অনুপাতে যথেষ্ট জমি ছিলনা। তারা চড়া হারে খাজনা দিয়েও কিছু অতিরিক্ত জমি কোর্ফা প্রথায় চাষ করতে নিত। গোমেসের মতে, কোর্ফা নিরিখ সাধারণ চাষীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অসংগত; যে সব চাষীদের জমির পরিমাণ খুবই অল্প, এবং যারা তাদের সবটুকু সময় ও যত্ন ঐ জমিতে দিতে পারে, শুধুমাত্র তাদের পক্ষেই ঐ চড়া হারে খাজনা লওয়া সম্ভব। (গোমেসের চিঠির অনুচ্ছেদ নং ১২)

৯০. পাদটীকা নং ৮৮ ; Secretary to the Board of Revenue L. P. to the Dacca commissioner, 1 April, 1876 ; Para 5. টেম্পলের একটা যুক্তি ছিল : "An increase of four annas all round would fall very unequally upon different qualities of soil and the man whose holding contained much of the inferior quality of soil would lose a larger percentage than he fairly should."

৯১. একই। বোর্ড অব রেভেনুার চিঠিতে এ পাঁচ শ্রেণীর রায়তদের ''মুনাফা'' কতটুকু কমল তা দেখানো হয়েছে। এ পাঁচ শ্রেণীতে আগে মুনাফা ছিল যথাক্রমে—বিঘা প্রতি এক টাকা ছ আনা, এক টকা তিন আনা, এক টাকা, বারো আনা, এবং ন' আনা। হ্রাস পেয়ে দাঁড়ালো যথাক্রমে—একটাকা, তেরো আনা, বারো আনা, আট আনা এবং ছ'আনা

৯২. Bengal Revenue (Survey & Settlement) Prog ; April 1876 Collection 7-3 ; Gomess to Dacca Commissioner, 16 March 1876 ; গোমেসের মন্তব্য : "Nearly half the estate has changed hands by sale and purchase". (Para 18)

৯৩. Bengal Revenue (Survey and Settlement) Progs ; Sept 1877 ; A. D. B. Gomess, Sunderbun Commissioner to

Dacca Commissioner, 23 Jan, 1877. এ চিঠির ১৪ নং অনুচ্ছেদ।

১৪. একই ; Para No.3-তে তদানীন্তন সুন্দরবন কমিশনার কেম্প (Kemp) এর এ সম্পর্কে একটা চিঠি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১৫. একই। গোমেসের চিঠির অনুচ্ছেদ নং ১৯।

১৬. একই। গোমেসের চিঠির Appendix No. T.।

১৭. একই ; এ চিঠির অনুচ্ছেদ নং ২৪।

১৮, Rafiuddin Ahmed, *op. cit*, pp. 51-53.

মফিজুল্লাহ কবীর

নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১)

ইতিহাসের উপাদান

সশস্ত্র প্রতিরোধ হিসেবে নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করার আগে নীল বিদ্রোহের মূল উপাদান এবং সেই ভিত্তিতে রচিত গ্রন্থাদি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। নানা কারণে নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর সরকারী আর্কাইভ, প্রামাণ্য দলিলাদি ও অন্যান্য প্রকাশনা হাজার হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে মুদ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। এসব দলিলের অধিকাংশ ইংলন্ডে এবং কিছু কিছু কলকাতায় অবস্থিত। কাজেই আমাদের এখানে বসে নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রামাণ্য উপকরণের ভিত্তিতে গবেষণা দুরূহ। এ সবের ভিত্তিতে ইংরেজী ও বাংলায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে এ বিষয়ে একক গ্রন্থ হিসেবে নীল বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত প্রমোদ রঞ্জন সেন গুপ্তের 'নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ' এবং ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইলেনয় থেকে প্রকাশিত ব্লেয়ার বি ক্লিং এর গবেষণাগ্রন্থ 'দি ব্লু মিউটিনি' প্রধান। প্রথমোক্ত বইয়ের তথ্যনির্দেশনা ও দ্বিতীয় বইয়ের গ্রন্থপঞ্জী থেকে মূল প্রামাণ্য দলিল পত্র ও অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। স্থানীয় উপকরণের মধ্যে দেশীয় পত্র-পত্রিকায় সেকালে প্রকাশিত তথ্যাদিও এসব বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে একটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, নীল চাষকে কেন্দ্র করে নানা উপাখ্যান, প্রবাদ গান, গাঁথা, ছড়া ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। ক্লিং তাঁর প্রতিটি অধ্যায় গ্রাম্য প্রবাদ ও ছড়া দিয়ে আরম্ভ করেছেন। পদ্ধতিগত দিক থেকে এটা আকর্ষণীয় হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর কোনটাই নীল এলাকার কোন বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত নয়। এগুলি শুধু গ্রাম্য ছড়া ও গাঁথা। আমার বিশ্বাস এখনো যদি প্রচেষ্টা চালানো যায় তাহলে নীল এলাকা থেকে এসব পুরনো প্রবাদ, কবিতা ও গাঁথা উদ্ধার করা যায়। এ জাতীয় ছড়া ও গাঁথাগুলো তখনকার যুগের মানসিকতা ও চৈতন্য চেতনা নির্ভুল ও সুস্পষ্টভাবে

আমাদের সামনে তুলে ধরে।

বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রায় এক শতাব্দীর মত সময় ধরে নীল চাষ প্রচলিত ছিল। এবং এসব এলাকায় প্রচলিত প্রবচন, কবিতা ও গাঁথা এখনো উদ্ধার করা সম্ভব। এ ধরণের কিছু ছড়া ও কবিতা আমি নমুনা হিসেবে উদ্ধৃত করছিঃ

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত পাদ্রী হিল সাহেবের জবানবন্দীতে উল্লিখিত ছড়াটিতে নীল চাষের অপকারিতা বিধৃতঃ

জমিনের শত্রু নীল
কর্মের শত্রু ঢিল
তেমনি জাতের শত্রু পাদ্রী হিল[১]

'নীল দর্পনে'র ইংরেজী তর্জমা প্রকাশ করার অপরাধে পাদ্রী লং এর কারাদন্ড এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মানহানির মোকদ্দমা ও তাঁর আকস্মিক মৃত্যু নিম্নলিখিত গানে অমর হয়ে আছেঃ—

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মইলা লং এর হলো কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।[২]

যশোরের শিশিরকুমার নীল বিদ্রোহের সময় নিয়মিত ভাবে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় নীল আন্দোলনের সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখতেন। রায়তরা তাঁকে সিদ্ধ পুরুষ ভেবে উপাধি দিয়েছিলেন "সিন্নিবাবু"[৩]। আবার ছোটলাটের ওপর টিপ্পনী কেটে 'দি ইংলিশ ম্যান' বিদ্রূপাত্মক কবিতা প্রকাশ করেঃ

John Peter. John Peter. Beware of the day,
When the friends of the planters shall all have
their say,
Ha loughest thou John Peter my vision to scorn.
Base bird of the dunghill, thy plume shall be torn ;
Down, down must thou stoop from thy perch upon high ;
Ah. hence must thou speed, for the spoiler is nigh[4]

খুলনার নীলকর রেণী সাহেবের লাঠিয়ালদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন শিবনাথ ও সাদেক মোল্লা, যেমন নীচের কবিতায় বর্ণিত হয়েছে--

গুলিগোল্লা সাদেক মোল্লা, রেণীর দর্প করল চুর
বাজিল শিবের ডঙ্কা, ধন্য বাঙ্গালা বাঙ্গালী বাহাদুর[৫]

নীলকর ডানলপের অত্যাচার ও হত্যাকান্ডের প্রত্যুত্তরে তাঁর কর্মচারী

কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঘটনা ফারায়েযীদের একটি পুঁথিতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ফরিদপুর জিলাধীন পাচ চড় (চর ?) পর
বাঙাপার নীলকুঠী ছিল তথা বড়।
কালী কাঞ্জলিরা ছিল কর্মচারী বড়।
উৎপীড়ণ করিত বর (বড় ?) মোসলমান পর।।
একদিন মিঞার শিষ্য কাদের বক্সাজান।
দুদু মিঞার এসারায় লিয়া মুরিদান।
বেঈমানের তরে সবে মারিয়া ফেলিল।[৬]

নীলকরদের জীবন স্মৃতি সম্পর্কে তীর্যক ইংগিত নীচের ছড়ায় ও গানে। এটি ডেভিস নামক নীলকর সম্পর্কে ঃ

বজরা চলে এলোমেলো ডিঙা চলে সাথে
দেবী সাহেবের নীল ঘোড়া চলে ভাঙা পথে।[৭]

পূর্বোক্ত রেণী সাহেবের তথা নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে অতি সম্প্রতি একটি ছড়া আমার হাতে এসেছে। বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক। পথিক যাচ্ছিল পথ দিয়ে তাকে রেণী সাহেবের লোকেরা ধরে বেগার খাটাচ্ছে ঃ

কপালের ফের
যাচ্ছিলাম শউর বাড়ী
কাটতি বসলাম রেণী সাহেবের খের।[৮]

১৮৫৯-৬০ সালে নীল বিদ্রোহের সময় যখন নদীয়ার মোল্লাহাটির নীলচাষ বন্ধ হয়ে গেল এবং নীলকুঠির লাঠিয়ালদের বড় বড় লাঠি বেকার পড়ে রইল তখন রাইয়তদের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে নীচের কবিতায় ঃ

মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি রইল পড়ে হুদোর আঁটি
কলকাতার বাবু ভেয়ে এল সব বজরা চেপে লড়াই দেখবে বলে।[৯]

তাছাড়া নদীয়ার মোল্লাহাটির নীলকর লারমার রাইয়তদের প্রহার করার জন্য এক প্রকার লগুড় তৈরী করে নীল বিদ্রোহের স্হানীয় নেতার নামানুসারে এর নাম দেন "রামকান্ত বা শ্যামচাঁদ"[১০]

জোর করে নীল চাষে বাধ্য করার জন্য কৃষকদেরকে শুধু যে গুদামে বন্দী করা হতো তাই নয় তাদের আত্মীয় স্বজনেরা যাতে এ হতভাগ্যদের কোন খোঁজ খবর করতে না পারে সেজন্য তাদের এককুঠি থেকে অন্য কুঠিতে ঘুরানো হত। প্রজাদেরকে নীলকররা তাই "চোদ্দ কুঠির জল খাওয়ানোর" ভয় দেখাতো। নীল দর্পনে আছে ঃ "এ কনসারনে আর কত কুঠি আছে না জানি, দেড়মাসের মধ্যে চোদ্দ কুঠির জল খেলেন...।"[১১]

কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন যে

১৮৪৩ সালে বাগমারীর নীল কুঠির অধ্যক্ষ কিং সাহেব নীল বুনতে অস্বীকার করায় একজন প্রজার মাথা মুড়িয়ে তাতে কাদা মেখে নীলের বীজ বুনে দিলেন।[১২] ১৮৫৮ সালে যখন কোম্পানী শাসনের অবসান হয় তখন প্রজারা সুবিচারের আশায় আশান্বিত হয়ে বলাবলি শুরু করল যে দেশে "মহারাণীর হাওয়া" বইতে শুরু করেছে।[১৩]

এমনকি নীল বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার তিন বছর পরে 'ঢাকা প্রকাশে' (৭ই এপ্রিল, ১৮৬৪) এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে সিরাজগঞ্জের হিলি নামক নীলকর বগুড়ার সিমুলিয়া গ্রামের জমিদার দ্বারিকানাথ বিশ্বাসের নামে নীলকরের একজন লোককে গুম করার অভিযোগ আনেন। যদিও দ্বারিকানাথ বিশ্বাসের কথিত 'গোম' করা লোক দ্বারা একটি ঘোষণা দিয়ে মামলা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন, তথাপি হিলি সাহেব দলবল নিয়ে জমিদার বাড়ি লুন্ঠন করেন। সংবাদ-দাতা নীলকরের এ কৌশলকে "একটি নীলকরী উপায়" বলে অভিহিত করেছেন। নীলকরের বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রের এই ভাষা প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।[১৪] ১৮৬৫ সালের ৬ই জানুয়ারী 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদকীয়তে নীলকরদিগকে "আমাদের দেশের দ্বিতীয় গর্ভণমেণ্ট"[১৫] বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় নীলচাষের শতাব্দীর অভিশাপ ও যাতনা-বঞ্চনার ইতিহাস কিভাবে বাঙালীর মন-মানস ও জীবন-যাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল, স্থানীয় কিংবদন্তী, উপাখ্যান, কবিতা, ছড়া ইত্যাদিতে তার যে নিদর্শন বিদ্যমান তারই নমুনা হিসেবে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলাম মাত্র।

বিদ্রোহের পটভূমি ও বিস্তার

নীল বিদ্রোহের পটভূমি হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় সংঘটিত দুটি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করতে হয়। এ দুটি আন্দোলন বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে দুভাবে প্রভাবিত করেছিল। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে মুসলমানদের মধ্যে রক্ষণশীল মোহাম্মদী (ওয়াহাবী) ও ফরায়েযী আন্দোলন এবং হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাবজনিত রাজনৈতিক সচেনতা। প্রথমোক্ত আন্দোলন প্রায় সারা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিশেষতঃ উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বংগের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করেছিল এবং তা ছিল প্রধানতঃ গ্রাম ভিত্তিক, দ্বিতীয় আন্দোলন কলকাতা কেন্দ্রিক। ১৮৫৯-৬১ সালের ব্যাপক নীল-বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহের পর পরই সংঘটিত হয়। বাংলার চাষীরা সিপাহী বিদ্রোহের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলনা। কিন্তু সরকার পক্ষ

থেকে নীল চাষীদের সম্পর্কে বিশেষতঃ ফরায়েযীদের সম্পর্কে নীলকারখানা আক্রমণের আশংকা করা গিয়েছিল এবং ফরায়েযীদের তখনকার নেতা দুদু মিয়াকে সরকার সিপাহীবিদ্রোহের সময় আটক রেখেছিল, এর কারণ তিতুমীরের নেতৃত্বে বারসতের মোহাম্মদীগণ ১৮৩১ সালে নীল কারখানা আক্রমণ করেছিল।[১৬] উল্লেখ্য যে মোহাম্মদী আন্দোলন উত্তরে দিনাজপুর থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা ও বরিশাল এবং পূর্বে ঢাকা পর্যন্ত এলাকায় পরিব্যপ্ত ছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র দুদু মিয়ার সময় ফরায়েযী আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল পূর্ব ও দক্ষিণ বংগে। এ উভয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বাংলার কৃষক ও কারিগরগণ। আবার প্রায় সারা উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বংগ জুড়েই সিপাহী বিদ্রোহের পরপরই নীল বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। বারাসতের কৃষকগণ তিতুমীরের নেতৃত্বে ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে এবং পূর্ববংগের কৃষকগণ দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ১৮৩৮ থেকে জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। তাই সময়ানুক্রমে তীতুমীরের বিদ্রোহ, ফরায়েযী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ পর্যায়ক্রমে বাংলার কৃষকদের মধ্যে যে জাগরণ ও সচেতনতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল পরবর্তী-কালে তাই সম্প্রসারিত কৃষক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আর নীল-করদের বিরুদ্ধে রাইয়তদের সংগ্রাম ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের সম্মিলিত সংগ্রাম। এ সংগ্রামে প্রধান নেতৃত্ব ছিল শহুরে হিন্দু বুদ্ধিজীবী, জমিদার ও গ্রামীণ উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে। আন্দোলন যখন চরমে পৌঁছে তখন শত শত সম্পন্ন মোড়ল ও প্রজারাই সম্মিলিতভাবে আন্দো-লনকে বিরাট একটি গণ আন্দোলনের রূপ দেয়।

বাংলায় নীলচাষ ও উৎপাদন নানা উঠতি পড়তি সহ চালু থাকে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ১৮৫৯ সালে নীল বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় নীল চাষের অবস্থা, কৃষকদের সুবিধা অসুবিধা বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি। ইন্ডিগো কমিশনের মতে ১৮৫৯ সালে বাংলায় প্রায় পাঁচশত নীলকর মোট ১৪৩টি ইন্ডিগো কনসার্নে কাজ করত। এ ফার্মগুলোতে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হত এবং কলকাতা থেকে রফতানীকৃত মোট নীলের ৬০ শতাংশ এরাই রফতানী করত। আবার বাংলায় উৎপাদিত নীলের অর্ধেক আসতো নদীয়া এবং যশোর জেলা থেকে। বাংলায় যে যে অঞ্চলে নীল চাষ হত এবং যে সব স্থানে কারখানা স্থাপিত হয়েছিল তা নীচে উল্লেখ করা হলো। তখনকার নদীয়া বিভাগে মুর্শিদাবাদ, বারাসত, যশোর, খুলনা ও নদীয়া জেলায়; বর্ধমান বিভাগে বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলী

ও হাওড়া জেলায়; রাজশাহী বিভাগে রাজশাহী, পাবনা, রংপুর ও বগুড়ায়, চট্টগ্রাম বিভাগে শুধুমাত্র ত্রিপুরা জেলায় এবং ঢাকা বিভাগে ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে নীল কারখানা স্থাপিত ছিল। এক এক বড় কোম্পানীর বিভিন্ন কারখানা বহু জিলা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বড় বড় কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষগণ নীল ব্যবসা সূত্রে বহু ম্যাজিস্ট্রেট ও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান। প্রধান প্রধান নীল স্বত্বাধিকারীর নাম এখানে দেওয়া হলো। জেমস্ হিলস্ নিশ্চিন্তপুরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে যুক্তভাবে প্রথম ফার্মের মালিক হলেন। সর্ববৃহৎ নীল স্বত্বাধিকারী ছিল বেংগল ইন্ডিগো কোম্পানী যাদের ফ্যাক্টরী নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বারাসতে অবস্থিত ছিল। জে, পি, ওয়াইজ পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ত্রিপুরা, বাকরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় অদ্বিতীয় প্রতাপের সঙ্গে প্রায় একচেটিয়া নীল উৎপাদন করতেন। নদীয়ার উত্তরে সর্ববৃহৎ স্বত্বাধিকারী রবার্ট ওয়াটসন এন্ড কোম্পানী মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী ও পাবনায় মোট সাতটি ফ্যাক্টরীর মালিক ছিল।[১৭] এছাড়া দেশীয় জমিদারদেরও নীলের চাষ ছিল। সবচেয়ে বেশী নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, যশোর, নদীয়া, পাবনা ও মালদহ জেলায়। এ বিদ্রোহের পটভূমি হিসাবে কলকাতায় ১৮৫০ সালের দিকে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী জাগরণের কথা উল্লেখ করতে হয়। কলকাতা নগরীর অনেক উত্তাপ ও উত্তেজনা কলকাতায় অধ্যয়নরত গ্রামীণ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া অন্যান্য নীল চাষের এলাকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জাগরণের সূত্রপাত হয়। বলা বাহুল্য এ জাগরণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ঢাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১ সালে, কৃষ্ণ নগরে ১৮৪৫ সালে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ১৮৫৩ সালে। এ ছাড়াও বহু নীল চাষের এলাকায় ১৮৫২ থেকে ১৮৫৪ সালে ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮] রেভারেন্ড লং প্রজাসাধারণের মধ্যে সচেতনতার কারণ হিসেবে দেশীয় ভাষা বাংলায় লিখিত পত্র পত্রিকার প্রসারের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৯] বারাসত জেলা সম্পর্কে ইডেনের জবানবন্দীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি কলকাতার অতি নিকটে, এখানকার প্রজারা অন্য জেলার প্রজাদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান, তাদের সাথে কলকাতার সওদাগর ও ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তারা দমদমে ও বারাকপুরে অবস্থিত সৈন্যদের ছাউনীতে পণ্যাদি সরবরাহ করত, কেউ কেউ নূতন রেলওয়ে লাইনে কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা

নিজেদের অধিকার ও সুযোগসুবিধা সম্বন্ধে বেশ সজাগ ছিল। তাছাড়া এখানকার লোকেরা ছিল 'শরাওয়ালা (অর্থাৎ ফরায়েযী)।[২০] নদীয়ার চারঘাটে অবস্থিত বহু সহস্র ফারায়েযী সম্পর্কেও ইডেন নদীয়ার কমিশনারকে ১৮৫৮ সালে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, যদি প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলচাষের জমি জরিপ করার জন্য নীলকরের কর্মচারীরা জমিতে পদার্পন করে তা হলে সংঘবদ্ধ মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের প্রকৃত অথবা কল্পিত অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রাণ পণ সংগ্রাম করবে এবং অন্যতম বৃহৎ দাঙাহাঙ্গামার সূত্রপাত হবে।[২১]

রাইয়তদের অভিযোগ

বর্তমান প্রবন্ধে নীল ফ্যাক্টরীর সংগঠন, নীল চাষযোগ্য জমির প্রকার ভেদ (নিজাবাদ, এলাকা, বে এলাকা, পত্তনী, দরপত্তনী প্রভৃতি), নীল চাষের পদ্ধতি, নীল উৎপাদনের প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই যদিও এসব সমস্যার আলোচনা ছাড়া নীলের সমস্যা ও প্রজার অভিযোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে প্রধানতঃ নীলের চাষ নীলকরের নিজ মালিকানাধীন জমি (নিজাবাদ), নিজ জমিদারীর জমি (এলাকা) এবং অন্য জমিদারের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত জমি (বে এলাকা) এই তিন রকম জমিতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং নীলের সমস্যা শেষোক্ত দু রকমের জমি নিয়ে। নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রজাদের প্রধান অভিযোগ এই ছিল যে নীলচাষ রাইয়তের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে অলাভজনক* এবং দিন দিন ক্রমাগত লোকসানে পরিণত হতে যাচ্ছিল। বহু মত পার্থক্য, নানা হিসেব নিকেশ এবং পরিসংখ্যানের কথা বাদ দিয়ে ১৮৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত এক হিসেবে অনুযায়ী কৃষক এক বিঘা নীল চাষ করে বিশ বান্ডিল নীলের গাছের জন্য পেত ৪ টাকা। আর এ গাছে উৎপাদনের জন্য তার খরচ পড়ত ৩ টাকা তিন আনা। কাজেই বিঘা প্রতি তার লাভ থাকত মাত্র ১৩ আনা।[২২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব হিসেবে অনেক হেরফের ছিল এবং কৃষকের যৎসামান্য লাভের কথা শুধু কাগজে কলমেই সত্য ছিল। উল্লেখ্য যে প্রথমে নীল-চাষীকে বিঘা প্রতি দু টাকা (অথবা ওই রকম একটা অংক) দাদন দেওয়া হত। নীলের চাষ অলাভজনক (কিংবা লোকসানজনক) বলে কেউ স্বেচ্ছায় দাদন নিতে চাইতো না, জোর করে রাইয়তকে দাদন নিতে বাধ্য করা হত। একবার দাদন নিলে হিসাবের হের ফেরে এই ঋণ তার পরিবারে বংশানু-

* "The whole system is vicious in theory, injurious in practice and radically unsound" Indigo Commission Report, p.5.

ক্রমিক হয়ে পড়ত, পুত্রকে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার দাদনের হিসেব টানতে হত। অনেক সময় সাদা স্ট্যাম্প কাগজে সই নেওয়া হত, শর্তাদি পরে পূরণ করে নেওয়া হত, শর্ত লেখা থাকলেও নীলের জমির সীমানা তাতে উল্লেখ করা হত না। এতে নীলকর ও তার আমলা যে কোন ভাল দামী জমি নীল চাষের জন্য চিহ্নিত করতে পারত। কোন কোন সময় রাইয়ত নিজের অন্য ফসলের জন্য জমি তৈরী করলে ফ্যাক্টরীর আমলারা সেটাই নীলের জন্য চিহ্নিত করত। রাইয়তদেরকে নীলের ক্ষেতে এমন সময় কাজ করতে বাধ্য করা হত যখন নিজেদের অন্যান্য ফসলের জমির কাজ অবহেলিত হত।[২৩] বাধ্যবাধকতার দিকটি বাদ দিলেও মাপেও অনেক হের ফের ছিল। নদীয়ার জজ স্কন্স (Sconce) বাংলা সরকারের সচিবকে ১৮৫৪ সালের ২০শে এপ্রিল লিখেছিলেন যে নীল চাষের ব্যবস্থা অন্যায় ও জবরদস্তীমূলক। বাধ্যবাধকতা ও ভয় জনিত কারণে তারা নীল চাষ করে। তারা তাদের সীমিত শ্রম ও গবাদি নিয়ে নীল বপনে ব্যাপৃত থাকায় নিজের চাষবাসের ক্ষেতে সময়মত যেতে পারেনা। কোন জমিতে নীল বুনতে হবে সেটার এখতিয়ার ছিল নীলকরের। জমি মাপের সময় প্রচলিত আড়াই বিঘায় এক ফ্যাক্টরী বিঘা ধরা হত। নীল গাছ জমা দেওয়ার সময় দুই বান্ডিলে এক ফ্যাক্টরী বান্ডিল ধরা হত। প্রতি বিঘায় যে দুটাকা দাদন দেওয়া হত সেটা ফ্যাক্টরী আমলাদের উৎকোচ দিতেই চলে যেত। "আমাকে বলা হয়েছে যে রাইয়তদের কিছুই নেই, তাদের কিছুই থাকতে পারেনা। তারা শ্রমের বলদ, লাভের আশায় খুশী হয়ে শ্রমদানকারী মানুষ নয়।" তিনি একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগের কথা বলেছিলেন কিন্তু এজন্য তিনি ছোট লাট কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন।[২৪]

চাষীরা অন্য মহাজনের কাছ থেকেও ঋণ নিত। তার জন্য তারা একতরফাভাবে নির্ধারিত মূল্যে কোন ফসল দিতে বাধ্য ছিলনা। মহাজন ও তার দাদন ও সুদের ব্যাপারেই আগ্রহী ছিল। কিন্তু নীলকর বছরের পর বছর একই ন্যূনতম মূল্যে সকল নীল নিয়ে দাদনের বিপরীতে জমা করত। অজন্মার বছর সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাষীদের ঘাড়েই পড়ত। ১৮৫৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী নদীয়ার দায়ীত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ল'ফোর্ড বাংলা সরকারকে প্রদত্ত এক চিঠিতে প্রস্তাব করেন যে অজন্মার বছরের দায়িত্ব নীলকরকেই বহন করতে হবে কারণ নিজাবাদী জমির নীল নষ্ট হলে তার ক্ষতি নীলকরেরই বহন করতে হয়। সুতরাং রাইয়তী জমিতে ফসল নষ্ট হলে চাষীকে দায়ী করা ঠিক হবে না। তার হিসেব থেকে সে বছরের দাদন মুছে ফেলতে হবে।[২৫] ১৯৬০ সালে ইন্ডিগো কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদানের সময় রাণাঘাটের বাবু জয়চাঁদ পাল চৌধুরী বলেন আগে

চাষীরা অল্প জমিতে নীল চাষ করত, ক্ষতি স্বীকার করেও তারা এক বিঘা জমিতে নীল বুনত, তখন অন্য জমিতে ফসলাদি বুনে তার সে ক্ষতি পুষিয়ে যেত কিন্তু এখন তাকে ৬ বিঘায় নীল চাষ করতে হয় অন্য চাষ উপেক্ষা করে।[২৬] অনিচ্ছা সত্ত্বেও গত বিশ বছর ধরে তারা কেন নীলচায করে আসছে ? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অনেক অত্যাচার ও বল প্রয়োগ, তাদেরকে গুদামে আটক করা, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ও মারপিটের ফলে।[২৭]

নীল কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট এসলি ইডেন ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত ৪৯টি ঘটনা ও মামলার তালিকা পেশ করেছিলেন। নীলকরগণ কি ধরনের অপরাধে লিপ্ত ছিল এ ঘটনাগুলি থেকে তা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নীলকুঠির লোকেরা দেশীয় লোকদেরকে খুন, হত্যা, জখম, গুম, গুদামে আটক, তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ, গৃহ লুন্ঠন, নীল চাযে বাধ্য করার জন্য আটক, গ্রামবাসীদের গরু চুরি ও আটক, পূর্ববর্তী ঘটনায় আপোষে বাধ্য করার জন্য আটক, দলিলে জোর করে সই করানোর জন্য আটক, রাজস্ব বৃদ্ধি ও নীল বুনতে বাধ্য করার জন্য কুঠির লাঠিয়ালদের দ্বারা গ্রাম আক্রমণ, লুন্ঠন, অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি ঘটনায় নির্বিচারে লিপ্ত হওয়ায় এবং গ্রামের লোকের সঙ্গে দাংগা সংঘটিত হওয়ায় কুঠির লোকদের ও দেশীয় রাইয়তদের ও লাঠিয়াল-দের নানা রকম শাস্তি দেওয়া হয়। এসব ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও ইউরোপীয়দের কোন বিচার হতনা, বিচার হলেও শুধু জরিমানা হত। কোন জেল দেওয়ার ক্ষমতা মফস্বলের ম্যাজিস্ট্রেটের ছিলনা। সুপ্রিম কোর্টের সে ক্ষমতা থাকলেও এবং দুএকটি মামলায় ইউরোপীয় কদাচিৎ অভিযুক্ত হলেও তারা প্রভাব খাটিয়ে খালাস পেয়ে যেত।[২৮] ১৮৫৯ সালে তিনজন রাইয়তকে জোর করে নীল চাষে রাজী করানোর জন্য মীরগঞ্জ ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ মেকার্থার দুমাস ধরে গুদামে আটক করে রাখেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মেকার্থীরের সঙ্গে তাঁর ফ্যাক্টরীতে আহার করতে গিয়ে খবর পেয়ে ওই তিনজন প্রজাকে মুক্ত করেন এবং বিচারে মেকার্থীরের ৫০০ টাকা জরিমানা হয়। এবং ফেক্টরীর লোকজনের জেল হয়। সেশন জজ সেটনকার যিনি পরে কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন, রায় ঘোষণা করার সময় আইনের এই বৈষম্যের কঠোর সমালোচনা করে বলেন ঘটনায় একজন ইংরেজ শুধু জরিমানা দিয়েই খালাস হয়ে গেলেন আর একই অপরাধে তাঁর দেশীয় অনুগত আমলারা কারাদন্ড পেল, আদালতের এই রায় সম্পূর্ণ মেনে নিতে তাঁর খুব বাধে।[২৯]

১৮৪৭ সালে ডি·লাটুর ফরিদপুরের ডেপুটি কালেক্টর হয়ে আসেন। তিনি ফরিদপুরে বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে নীল কমিশনের সামনে যে সব তথ্য উদঘাটন করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ফরিদপুরে তখন এক বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি। নীলকরের হাতে প্রজার জানমাল প্রতিনিয়ত বিপন্ন। প্রজারা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত। এধরনের অত্যাচার ও অবিচারের দৃষ্টান্ত তার ভারতীয় অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। এ রকম অবস্থায় পৃথিবীতে কোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা আসমানে খোদার কর্তৃত্ব স্বীকৃত হত বলে মনে হয়না। নীলকর ডানলপ, তাঁর গোমস্তা ও অন্যান্য 'বাবুরা' সাত আটশত লোক লসকর নিয়ে, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত হয়ে দুদু মিঞার বাড়ি আক্রমণ করে, তাঁর চারজন চাকরকে হত্যা করে, আহত অনুচরদের মধ্যে আমিরুদ্দীন হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে। দাংগাকারীরা দুদু মিয়ার বার লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করে। দুদু মিয়া এবং তাঁর শিষ্যেরা আদালতে এর কোন প্রতিকার না পেয়ে ১৮৪৬ সালের শেষের দিকে ডানলপের কাসিমপুরের কুঠি পুড়িয়ে দেয় এবং তাঁর গোমস্তা কানাইলালকে ধরে নিয়ে যায় (পূর্বে ফারায়েযী পুঁথিতে এ গোমস্তার নাম কালি কাজলিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে)। ম্যাজিস্ট্রেট ডানলপের কুঠিতে যান, তাঁর সঙ্গে আহার করেন এবং তাঁরই সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কোন বিচার ও তদন্ত ছাড়াই দুদু মিয়াকে শাস্তি দেন। এর ভিত্তিতে সেশন জজ দুদু মিয়াকে শাস্তি দিলেও সদর আদালতে দুদু মিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ বিষয়টিকে একজন ব্রিটিশ জজের পক্ষে ন্যাক্কারজনক বলে তিনি মনে করেন। ১৮৪৪ সালে তিনি প্রজাকে গুম করা, লাঠিয়াল পাঠিয়ে প্রজার শস্যক্ষেত নষ্ট করা, এর প্রতিবাদ করায় প্রজাকে বর্শাবিদ্ধ করা, সম্পূর্ণ গ্রাম আক্রমণ করা এবং গ্রামের মধ্য দিয়ে রাস্তা করার জন্য গাছ গাছাড়া কেটে নষ্ট করার জন্য নানা কুঠির লোককে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি বিধানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি হান্টার কোম্পানীর একজন ইউরোপীয় সহকারীকে লাংগল দিয়ে চষে প্রজার ফসল নষ্ট করার জন্য ছয় মাসের কারাদন্ড দিয়েছিলেন। সেশন জজের আদালতে কিংবা নিয়ামত আদালতে আপীলের ফলে এ শাস্তি মওকুফ হয়নি। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে আরো বলেন যে হান্টার কোম্পানীর অধ্যক্ষ টিসেন্ডিকে লোক গুম করার জন্য তিনি পাঁচশত টাকা জরিমানা করেন। তিনি আরো বলেন মিশনারীদের প্রতি একটি কথা প্রায়ই আরোপ করা হয়, ''মানুষের রক্তে রঞ্জিত না হয়ে এক সিন্দুক নীলও ইংলন্ডে পৌঁছায়নি।'' এতে মিশনারীদের অনেক সমালোচনা হয়েছে। তিনি বলেন ''ফরিদপুরের

ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই বাক্যটিকে পূর্ণ ও প্রশস্ত অর্থে গ্রহণ করি। এ বাক্যটি আমারই ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বহু রাইয়তকে আমার কাছে পাঠাতে দেখেছি যাদের এপিঠ ওপিঠ বর্শাবিদ্ধ; অন্যদেরকে বর্শাবিদ্ধ করে গুম করা হয়েছে। এ রকম নীল পদ্ধতিকে আমি রক্তপাত পদ্ধতি মনে করি।"[৩০] ১৮৬০ সাল পর্যন্ত নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার হার্শেলের রিপোর্টে ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে ৫৪টি ঘটনা ও মামলার উল্লেখ রয়েছে। এসব ঘটনা ও মামলা ইডেন কর্তৃক উল্লিখিত বারাসতের ঘটনার সদৃশ।[৩১]

নীলকরদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের মধ্যে ছিল নারীর অবমাননা অপহরণ ও ধর্ষনের নানা জনশ্রুতি। বিষয়টি বিতর্কিত এবং এ বিষয়ে তখনো নানামুনির নানা মত ছিল। সমসাময়িক দারোগা ও সাহিত্যিক গিরিশচন্দ্র বসু নীল বিদ্রোহের সময় (১৮৫৩-১৮৬০) নদীয়ার কোতোয়ালী থানার দারোগা ছিলেন। তিনি 'নীল দর্পণে' উল্লিখিত অপবাদ খন্ডানোর চেষ্টা করেছেন।[৩২] সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন যে নীলকরদের মধ্যে এমন দুবৃত্ত ছিল ছিল যারা কৃষক কন্যাদেরকে কুঠিতে ধরে এনে অপমান করত।[৩৩] নদীয়ার কাচি কাটার ম্যানেজার হিলসের গোমস্তারা কৈবর্ত বধু হারামনিকে নদীর ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরবার সময় সকালে অপহরণ করে প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্র পর্যন্ত কুঠিতে আবদ্ধ করে রাখে, ম্যাজিস্ট্রেট হার্শেল সাক্ষ্য প্রমাণাভাবে মামলাটি বাতিল করে দেন। পাদ্রী বোমওয়েশ (Bomwetsch) কমিশনের সামনে ঘটনাটি পরোপুরি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন লোকেরা মান সম্মানের ভয়ে এসব ব্যাপারে আদালতে কিছু প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিল। তিনি আরো বলেন অনিন্দ্যসুন্দরী হারামনির ঘটনা সে অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে সুবিদিত।[৩৪] হারামনির ঘটনা হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় হিলস হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মানহানির মোকদ্দমা করেন। এ ঘটনাই 'নীল দর্পণের' 'রোগ' নামক ইউরোপীয় চরিত্রের ভিত্তি। সরকারি কাগজপত্রে ম্যাকার্থি নামক যশোরের একজন নীল করের দুশ্চরিত্র সম্পর্কে চিঠি প্রকাশিত হওয়ায় নীলকরগণ ছোটলাট পিটার গ্র্যান্টের বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করে। মামলায় ছোট লাটের এক টাকা জরিমানা হয়েছিল।[৩৫] কমিশনরে সদস্যগণ প্রমাণাভাবে নীলকরগণকে নারী ধর্ষনের অপবাদ থেকে অব্যাহতি দিলেও হারামনির অপহরণ ও গুদামে আটকের ঘটনার তারা কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন।[৩৬]

নীলচাষীদের অসহায় অবস্থা ও তাদের প্রতি অবিচারের সুযোগ

করে দিয়েছিল ১৮৩৭ সালের চতুর্থ আইন। এই আইনে যে কোন ব্রিটিশ প্রজা স্থায়ীভাবে ও যে কোন মেয়াদে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যে কোন অঞ্চলে জমির মালিক হতে পারত। তখন থেকে নীলকরগণ জমিদারী কিনে তাদের এলাকা জমি বৃদ্ধি করতে থাকে। নীলকর ও জমিদার ভিন্ন হলে প্রজাদের সুবিধা ছিল। এখন নীলকর একাধারে কুঠির মালিক, মহাজন ও জমিদার। তারা এখন এসব 'এলাকা' জমিতে নীল বুনতে শুরু করে। উল্লেখ্য যে নীল বিদ্রোহের অধিকাংশই সংঘটিত হয় এসব 'এলাকা' জমিতে। অন্য জমিদারের জমিতে তারা যে নীল চাষ করত তাকে বলা হত 'বে এলাকা'। দুএকটি উদাহরণ থেকে এটি স্পষ্ট হবে। বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানী নীল চাষের ৭৫,০০০ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র ১৭০০ বিঘা ছিল 'বে এলাকা' এবং জেমস হিলস কনসার্ণের ৬৭,০০০ নীল চাষের জমির মধ্যে 'বে এলাকা' ছিল মাত্র ১৪,০০০ বিঘা।[৩৭] আগে নীল-করে নীলকরে বিবাদ ছিল। ক্রমে বিশেষতঃ ১৮৫০ সালে নীলকর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ কমে গেল। নীলকররা আপোষে সমস্ত দেশটাকে ভাগ করে নিল এবং নিজ নিজ অঞ্চলে একচেটিয়া নীল চাষে প্রবৃত্ত হল। আগে প্রজারা পাশাপাশি নীলকরদের মধ্যে দামাদামি করার সুযোগ পেত এখন আর সে সুযোগ নেই। হাংগামার সময় তারা এক নীলকরের বিরুদ্ধে আরেক নীল-করের সাহায্য পেতে পারত সে সম্ভাবনাও এখন তিরোহিত হল। ১৮৫৯-৬০ সালে জিনিষ পত্রের দাম গত ৫/৭ বছরের তুলনায় দেড়গুণ বেড়ে গেলেও নীলের দাম স্থির থাকল। বছরের পর বছর নীল গাছ জমা করেও দাদনের টাকা অনাদায়ী পড়ে থাকত। প্রজার হিসেবে দেনাই বাড়ত। প্রজা ভূমিদাসে পরিণত হল।

নীলচাষের উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাইয়তগণ যখন যাবতীয় অত্যাচার ও অভিযোগের আইন সম্মত প্রতিকারে বঞ্চিত হয়ে নিদারুণ হতাশার মধ্যে দিন যাপন করছিল তখন পর্যায়ক্রমে কয়েকজন প্রশাস-কের কার্যকলাপে উৎসাহিত হয়ে ১৮৫৯ সালের হেমন্তের দিকে তারা নীলচাষে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানায়। বারাসতের কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি খুব দীর্ঘ হলেও অতি-সংক্ষেপে এ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কলকাতার নিকটবর্তী বলে যে সব অফিসার এখানে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা প্রভাবশালী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। এঁদের মধ্যে তিনজন নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের ন্যায্য অধিকার সমর্থন করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সর্বাগ্রে যিনি নীলকরদের কোপানলে পড়েছিলেন তিনি হলেন কলারোয়ার ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ। ঐ মহকুমার কুলাই গ্রামের কয়েকজন কৃষক তাঁর কোর্টে হাজির হয়ে ঝিঙ্গারগাছা ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ হেনরী ম্যাকেঞ্জীর লোকদের নামে তাদের ধানী জমি জোর করে নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করার এবং দাদন নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় গ্রেফতার মারধর ও ঘরবাড়ি লুটপাটের জন্য হুমকীর অভিযোগ আনয়ন করে। হাকিম প্রতিবাদীকে আদালতে হাজির হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপিত করার নোটিশ দেন। তিনি প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরকন্দাজ পাঠিয়ে দেন (১৮৫৪)। ম্যাকেঞ্জী আবদুল লতিফের বিরুদ্ধে চাষীদের প্ররোচনা দেওয়ার এবং পরোয়ানায় তাঁকে 'তুমি' ও 'তোমাকে' বলে অভদ্রজনোচিত সম্বোধনের অভিযোগ আনয়ন করেন। আবদুল লতিফ অভিযোগ অস্বীকার করে কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব দেন যে বড়ছোট সকলকে সম্বোধন করার আদালতের ভাষা ঐ রকম। কমিশনার মোটামুটি আবদুল লতীফের জবাব সন্তোষজনক মনে করলেও বাংলা সরকারের সচিব তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বদলীর আদেশ দেন।৩৮

দ্বিতীয় প্রশাসক যিনি বারাসতের রাইয়তদের পক্ষে কথা বলেছিলেন তিনি বারাসেতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট জে এইচ, ম্যাংগলস্। তিনি ১৮৪৫ সালে মত প্রকাশ করেন যে রাইয়তকে দাদন নিতে বাধ্য করা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীল চাষে বাধ্য করা যাবেনা। এর ফলে চাষীরা সে বছর নীল চাষ করতে অস্বীকার করে এবং বেঙল ইন্ডিগো কোম্পানীর বারাসত শাখায় নীলের উৎপাদন অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। এজন্য লেঃ গবর্ণর হ্যালিডে ম্যাংগলসকে তিরস্কার করেন।৩৯ নীলকরদের চাপের মুখে ম্যাংগলসকেও অন্যত্র বদলী করা হয়। ম্যাংগলস বলেছেন যে এখন জমিদারগণ রাইয়তদেরকে নীল বপন না করার জন্য উস্কানী দিচ্ছে। তারা নিজেদের কারখানা উঠিয়ে দিয়েছে। নীলচাষ যাতে না করতে হয় তার জন্য রাইয়তগণ জমিদারদেরকে বাৎসরিক কিছু সেলামী দিচ্ছে।৪০ বারাসতে ম্যাংগলসের উত্তরাধিকারী এ্যাশলী ইডেন তাঁর উদারতা, সহনশীলতা, ও মানবিকতার জন্য একদিকে যেমন প্রজাসাধারণের কাছে খুবই আদরণীয় হয়ে ওঠেন অন্যদিকে এ তার নীতির ফলশ্রুতিতে প্রজারা ১৮৫৯ সালের হেমন্তের দিকে নদীয়া বারাসতে নীল বিদ্রোহ আরম্ভ করে। (ইনি পরে লেঃ গবর্ণর পদে উন্নীত হয়েছিলেন।) বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর মফঃস্বল ম্যানেজার লারমারের অভিযোগের উত্তরে ইডেন নদীয়ার কমিশনারকে লেখেন (২৯ এপ্রিল ১৮৫৮) যে লারমার সাহেব দাদন দিলেও প্রজার জমিতে নীল বুনবার কোন অধিকার তাঁর নেই। রাইয়তরা নিজেরাই নীল বুনবে। তিনি তাঁর ভৃত্যদের সাহায্যে নীল বুনতে পারবেননা

অথবা চুক্তি পূর্ণ করার জন্য পুলিশের সাহায্য দাবী করতে পারবেন না। তাঁর একমাত্র প্রতিকার দেওয়ানী আদালত। উল্লেখ্য যে ১৮৩০ সালের আইনে নীলের চুক্তি ভংগের জন্য নীলকর যে ফৌজদারী-আইনের আশ্রয় নিতে পারত বেন্টিংক ১৮৩৫ সালে সে আইন তুলে দিয়েছিলেন। নীলকররা সে রকম একটি আইন পুনঃ প্রবর্তনের জন্য চাপ দিতে থাকে। বারাসতের হোবরা কনসার্ণের মালিক প্রেষ্টউইচ নদীয়ার কমিশনার ও লেঃ গবর্ণর হ্যালিডের কাছে ইডেনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপন করেন যে তিনি ব্যক্তিগত কথাবার্তায়, চিঠি পত্রে এবং পত্রপত্রিকায় নীল চাষ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইডেন ছোট লাটের নির্দেশ মত নীল পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে একটি রবকারী (২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯) প্রচার করেন। এর মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রজারা নীলকরদের সঙ্গে পূর্বের দেনাপাওনার হিসেব মিটিয়ে ফেলে ইচ্ছা থাকলে নতুন দাদন নেবে, কাউকে দাদন গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। রাইয়তরা অভিযোগ করল যে কুঠিতে গেলেই তাদেরকে গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হবে। তখন তাদেরকে থানার মুহুরীর সঙ্গে কুঠিতে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল। আদালতে হাজির হওয়ার সময়ও মুহুরী যেন তাদের সঙ্গে থাকেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিধান করেন। প্রেষ্টউইচ অতঃপর অভিযোগ করে বলেন যে উক্ত রুবকারীর ফলে প্রজারা ভীষণ আস্কারা পেয়ে যায় এবং চাষযোগ্য জমির এক চতুর্থাংশ জমিতে নীল বোনা হয়।[৪১] লেঃ গবর্ণর ইডেনের পক্ষ সমর্থন করে বলেন যে 'এ রুবকারীতে এমন কিছু নেই যা প্রকৃত অথবা আপাত নিরপেক্ষতার পরিপন্থী।'[৪২] প্রজারা এখন বারাসতের হোবরা কনসার্ণের লারমার সাহেবের বিরুদ্ধে জবরদস্তি-মূলক নীলচাষ করানোর অভিযোগ উত্থাপন করে। ইডেন প্রজাদের দরখাস্ত-খানা মিতার হাটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে আদেশ দেন যে প্রজাগণ তাদের জমিতে তাদের ইচ্ছামত যে কোন ফসল বুনতে পারে। জবরদস্তিমূলক নীল চাষ বন্ধ করার জন্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যেন প্রজার জমিতে পুলিশ পাঠিয়ে দেন। লারমার নদীয়ার কমিশনারের কাছে ইডেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। কমিশনারকে নীলকরকে সমর্থন করে কাগজপত্র লেঃ গবর্ণরের কাছে পাঠিয়ে দেন। এবারেও লেঃ গবর্ণর ইডেনকে পুরোপুরি সমর্থন দেন (২১ জুলাই ১৮৫৯)।[৪৩] ইডেন কমিশনারকে লিখিত বাংলা সরকারের সচিবের পত্রের অংশ বিশেষ বারাসতের তিনজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে দেন (১৮৫৯ সালের ১৭ আগষ্ট)। এর ফলশ্রুতিতে কলারোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু হেমচন্দ্র কর কলারোয়ার দারোগার নিকট ইডেনের পূর্বানুমতি

ব্যতীত একটি ঘোষণা প্রেরণ করে বলেন যে নীল চাষ সম্পর্কিত কোন বিবাদে চাষীরাই তাদের জমির দখলে থাকবে। তাদের ইচ্ছানুযায়ী তারা ফসল বুনবে। এ ব্যাপারে নীলকরের কোন হস্তক্ষেপ চলবেনা। নীল চুক্তি সম্পাদন করে থাকলেও নীলকর ঐ সব জমিতে জোর করে নীল বুনতে পারবেনা। নীলকরের একমাত্র প্রতিকার দেওয়ানী আদালত, ফৌজদারী আদলতের কোন এক্তেয়ার এ ব্যাপারে নেই।[৪৪]

ইডেনের রুবকারী, ইডেনের নিকট প্রজাদের দরখাস্তের ভিত্তিতে মিতারহাটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাঁর আদেশ এবং সর্বশেষে তাঁর পত্রের ভিত্তিতে কলারোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোষণা ঐ অঞ্চলে এক দারুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রজাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে সরকার নীলচাষের বিপক্ষে প্রজাদেরকে সমর্থন করছেন। এর পরেই ১৮৫৯ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে লেঃ গবর্ণর পিটার গ্রান্ট জলপথে পূর্ববংগ সফরে আসলে নদীয়ার প্রজারা বাঁশবাড়িয়া কনসার্ণের স্বত্বাধিকারী উইলিয়ম হোয়াইটের বিরুদ্ধে লুন্ঠন, গাছপালা কাটা, ও অন্যান্য অত্যাচারের অভিযোগ আনয়ন করে। তারা অখিল চন্দ্র বিশ্বাস ও শীতল তরফদার নামক দুজন জোতদারের অপহরণ ও বেআইনী আটকের কথা উল্লেখ করে। লেঃ গবর্ণর তদন্তের আদেশ দেন এবং কিছু কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে একথা পরে সন্দেহাতীত রূপে জানা যায় যে শীতল তরফদারকে এক কুঠি থেকে অন্য কুঠিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রহার জনিত আঘাতে সে মিয়াসের্র যশোরের সিন্দুরী ফ্যাক্টরীতে পরে মৃত্যু বরণ করে। তার শব নবগংগা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।[৪৫]

নীল বিদ্রোহঃ সশস্ত্র প্রতিরোধ

রাইয়তদের অভিযোগ শিরোনামে আমরা ইতিপূর্বেই প্রজাদের বিভিন্ন রকমের প্রতিরোধের বিষয় আলোচনা করেছি। স্থানে স্থানে সশস্ত্র প্রতিরোধের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। তবে নানাস্থানে ব্যাপক সশস্ত্র প্রতিরোধ আরম্ভ হয় ১৮৫৯ সালের হেমন্তে। নদীয়া, বারাসত, পাবনা ও মুর্শিদাবাদে কৃষকরা দাদন নিতে অস্বীকার করে এবং নীলকর ও প্রজাদের মধ্যে উত্তরোত্তর দাংগা-হাঙ্গামা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসবই নতুন লেঃ গবর্ণরের (১লা মে ১৮৫৯ সাল থেকে) সহানুভূতিশীল মনোভাবের ফলশ্রুতি। শীতকালে পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত থাকলেও ১৮৬১ সালের নীলবপনের মওসুম আসন্ন হলে পুনরায় গোলমাল দেখা দেয়।[৪৬] সরকার নীল চাষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদগ্রীব হয়ে ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে নীল চাষের জেলাসমূহ

থেকে সাপ্তাহিক রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। এসব রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে প্রজারা নদীয়া জেলার নীলকর ও তার দেশীয় কর্মচারীদেরকে নীলের জমি পরিমাপ ও চিহ্নিত করতে গেলে বাধা দেয় এবং দেশীয় কর্মচারী-দেরকে বন্দী করে রাখে। জমিদারগণ এতে প্রজাদেরকে উৎসাহিত করে, বহু-স্থানে প্রজারা নীলচাষ করবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার হার্শেলের (২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬০ থেকে) জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে শান্তিপুর মহকুমা ও ভাগিরথীর দুটি থানা ছাড়া পুরো জিলা অশান্ত ছিল। তাঁরা একটা অত্যাচারমূলক পদ্ধতি থেকে আসন্ন মুক্তি সম্পর্কে বেশ আশান্বিত ছিল। এই মুক্তির প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে বলে তারা অস্থির ও অশান্ত হয়ে পড়ে। তাদের ধারণা সরকার নীল চাষ বন্ধের আদেশ দিয়েছে। কিন্তু ১৮৬০ সালের বিশেষ আইন তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে নীলচাষ আর বন্ধ হবেনা। এতে তারা নীল চাষ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।[৪৭]

প্রজারা বেঙল ইন্ডিগো কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী লারমার এবং তাঁর সহকারী হাইডকে অপমান ও প্রহার করে। ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে অভি-যোগ করা হয় যে রানাঘাটের জমিদার শ্যামচন্দ্রপাল প্রজাদেরকে এসব ব্যাপারে উস্কানী দেয়।[৪৮] এ সময় নীলকর ও রাইয়তদের কাছ থেকে নানা অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের দরখাস্ত আসতে থাকে। নানাস্থানে প্রজাদেরকে তিন থেকে ছয়মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর পরবর্তী রিপোর্টে নদীয়ার প্রজাদেরকে নীলচাষের বিরুদ্ধে আরো সংঘবদ্ধ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়। তার এখন দাদন গ্রহণের প্রশ্ন এড়িয়ে যায়, নীল চুক্তির অন্যায় প্রসঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয় এবং দাদনকে দাদন না বলে পূর্ববর্তী কাজের জন্য তাদের প্রাপ্য বলে দাবী করে। নীলকরদের রাজস্ব বা অন্যান্য পাওনা রাইয়তদের কাছ থেকে আদায়ের ব্যাপারে অসুবিধার কথাও এসব রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। নদীয়ার পরে মুর্শিদাবাদ জেলায় শান্তিভংগের আশংকা বেশী বলে মনে করা হয়।[৪৯]

১৮৬০ সালের ১০ই মার্চ লেঃ গবর্ণর পিটার গ্র্যান্ট বিহার থেকে দীর্ঘ সফর শেষে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে যে সকল গোলযোগ আরম্ভ হয়েছে তার রিপোর্ট তাঁর দফতরে এসে স্তুপাকার হতে থাকে। ১৩ই মার্চ পূর্ববংগের সর্ব বৃহৎ নীল স্বাত্বধিকারী জে পি ওয়াইজ প্রমুখ নীলকরদের নেতৃত্বে ইন্ডিগো প্ল্যানটার্স এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধিদল লেঃ গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে নীলচুক্তি ভংগের শাস্তি বিধানের জন্য ফৌজদারী বিধি প্রনয়ণের

জন্য পীড়াপীড়ি করেন। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নদীয়ার উত্তরাঞ্চলে আশংকাজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এসব এলাকায় স্থানে স্থানে জন সমাবেশ হতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা হোয়েল (Hoyle) নামক জনৈক রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে আরো বলা হয় যে সারা জেলায় চার পাঁচ জন লোক গোপনযোগে উস্কানী দিচ্ছে। তন্মধ্যে পূর্বোল্লিখিত রানাঘাটের জমিদার শ্যামচন্দ্র পাল চৌধুরী, হাবীবুল হোসেন নামক আর একজন জমিদার (যিনি পরে নীলকরদের বিরোধিতা প্রত্যাহার করেন), যশোরের জমিদার রামরতন মল্লিক, বৃন্দাবন সরকার, খুবই বিপদজনক বলে কথিত রামমোহন মিত্র, এবং যশোরের প্রজা মহেশচন্দ্র চাটার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তজন সাধারণ প্রজা হলেও শিক্ষিত ছিলেন এবং ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারতেন। তিনি জমিদার রামরতন মল্লিকের সরকার ছিলেন। জমিদার রামরতন মল্লিককে জনসাধারণ 'নীলবংশ বিনাশক' উপাধিতে ভূষিত করে। এতে সরকারি মহলে বিশেষ উৎকন্ঠার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে কোন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ম্যাজিস্ট্রেট এ সব লোকের গ্রেফতারের সুপারিশ করেন। নদীয়ার গ্রামে পাঁচ জনের অধিক লোক একত্রে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৭০] দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণের প্রতিরোধের জন্য লেঃ গভর্ণর স্থানে স্থানে মিলিটারী পুলিশ মোতায়েন করেন। মুর্শিদাবাদের আওরঙ্গাবাদে, মালদহে, এবং নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে মিলিটারী পুলিশ মোতায়েনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৭১] এ সব সাবধানতার ফলে শান্তিভঙ্গের এলাকা খুব সীমিত থাকে। নতুন আইন প্রণয়ন ও কার্যকরী হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি মোটামুটি আয়ত্তে থাকে।

১৮৬০ সালের একাদশ আইন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে মুর্শিদাবাদের আওরঙ্গাবাদ কনসার্নে, ও মালদহের বাকরাবাদ কুঠিতে এবং আইন প্রকাশিত হওয়ার পর নদীয়ার অন্যান্য কুঠিতে প্রজাদের বিপুলভাবে সংঘবদ্ধ সশস্ত্র প্রতিরোধ অভূতপূর্ব আক্রোশে ফেটে পড়ে। নীলচাষের অর্ধশতাব্দী ইতিহাসে প্রজাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও অবিচারের মুখে এমন সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও সশস্ত্র প্রতিরোধ ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। আমরা সংক্ষেপে এগুলি বর্ণনা করব। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার আওরঙ্গাবাদ কনসার্নে আংকুরা ফ্যাক্টরীর একজন গোমস্তাকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে প্রজা আন্দোলন সামগ্রিকভাবে অগ্রগতি লাভ করে। আওরঙ্গাবাদ কনসার্নের মালিক ছিলেন ডেভিড এ্যান্ড্রু এবং

ম্যাকলিওড ছিলেন তাঁর ম্যানেজার। ১৮৬০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী আংকুরা ফ্যাক্টরীর পাশ্ববর্তী প্রজারা গোমস্তা তোফাজ্জল হোসেন মীরকে প্রহার করে। কারণ প্রজারা গোমস্তার নানাবিধ অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। তাছাড়া ম্যানেজার ম্যাকলিওডের সঙ্গে প্রজাদের বিবাদ হয় নীল চাষাধীন জমির পরিমাণ নিয়ে। ম্যাকলিওড দাবী করেন বিগত বছর সমূহে এ জমির পরিমাণ ছিল ২২০০ বিঘা কিন্তু প্রজারা মাত্র ১৮০০ বিঘা চাষ করতে রাজী হয়। এ ব্যাপারে ম্যানেজারের হঠকারিতার ফলে প্রজারা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। এর পর ২১শে মার্চ ডংকা নিনাদের মাধ্যমে সমবেত হয়ে জনতা লিওং নামক নীলকরের বন্যগাঁও কুঠি আক্রমণ করে। ভীত সন্ত্রস্ত লিওং গুলি ছুড়ে তাড়াতাড়ি ঘটনাক্রমে আগত একটি সরকারি স্টীমারে করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার তাঁর মন্তব্যে বলেন পাশ্ববর্তী এলাকার সকল শ্রেণীর লোক নীল প্রজা হোক আর নাই হোক সকলে একতাবদ্ধ এবং দাঙ্গায় সকলের সমর্থন রয়েছে। জমিদার ও তাদের এজেন্টগণ, পুলিশ ও গ্রাম্য চৌকিদারগণ তাদেরকে সহায়তা করে। চব্বিশ জন দাঙ্গাকারীকে সনাক্ত করে শাস্তি দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রজারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ডেভিড এ্যান্ড্রুর মোক্তারের মাধ্যমে (সম্ভবতঃ ম্যানেজার ম্যাকলিয়ডের অজান্তে) একটি সমঝোতায় পৌঁছুতে সক্ষম হয়। এই সমঝোতায় কলকাতাবাসী এ্যান্ড্রুর সমর্থন ছিল। এই সমঝোতা নীলকর রাইয়তদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কৃতকার্যতার শীর্ষ বিন্দুর সূচক ঃ

১। গোমস্তা তোফাজ্জল হোসেনকে বরখাস্ত করতে হবে।
২। আংকুরা ও কালাপানি কুঠির সহকারী ম্যানেজার রাইসকে বরখাস্ত করতে হবে।
৩। তোফাজ্জল হোসেন প্রজাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক যে সকল উৎকোচ ও টাকা পয়সা গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।
৪। রাইয়তদের পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে তাদের ঘাস, বাঁশ, গাছ ও মুরগী ইত্যাদি নেওয়া যাবেনা, নিলে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে।
৫। আংকুরা ফ্যাক্টরী এলাকায় পূর্ববর্তী ম্যানেজার মাসাইক (Massayk) সাহেবের আমলে চাষকৃত নীলজমির অতিরিক্ত জমি নেওয়া যাবেনা।
৬। স্থানীয় আন্দোলনের নেতা জগবন্ধু রায়ের ভাই দ্বারকানাথকে তোফজ্জল হোসেনের পরিবর্তে গোমস্তা নিয়োগ করতে হবে, ম্যানেজার ম্যাকলিয়ডের মিস্ট্রেস পূর্ণ বিবি যেন কুঠির ব্যাপারে অথবা জমিদারীর ব্যাপারে রাইয়তদের কাছে হস্তক্ষেপ না করে।

ম্যানেজার সমুদয় শর্ত মেনে নিলেও জমি নিয়ে আবার বিবাদ বাধে এবং দশ বার হাজার প্রজা ২৭শে মার্চ পুনরায় আংকুরা ফ্যাক্টরী আক্রমণ করে। ফ্যাক্টরীর সঙ্গে সংঘর্ষে চার পাঁচ জন প্রজা নিহত হয়। তখন নীল চাষের বিরুদ্ধে নিয়মিত সংঘ গঠন করা হয়। হিন্দু ও মুসলমান প্রজা সকলে মিলিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। তারা চাঁদা সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করে। কোন পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রজা নীলকরদের দ্বারা আক্রান্ত হলে কিংবা নীল চাষে তাদেরকে বাধ্য করা হলে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধে পরস্পরকে সাহায্য করবে। 'ডংকা ও টমটমের সাহায্যে' লোক জড় করা হত। ডেপুটি কমিশনারের রিপোর্টে। আরো বলা হয় যে পুলিশের লোকেরা এতে ভয় পেয়ে যায় এবং রাইয়তদের পক্ষাবলম্বন করে।[৫২]

প্রায় একই সময় (২২শে মার্চ ১৮৬০) সংঘটিত অনুরূপ আরেকটি ঘটনা থেকে তখনকার রাইয়তদের সংঘবদ্ধতা ও একতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যায়। লোকনাথপুর কনসার্নের স্বত্বাধিকারী জর্জ মিয়ার্স অভিযোগ করেন যে তাদের নদীয়ার সিন্দুরী ফ্যাক্টরীর অধীনস্থ বহু গ্রামের দুই থেকে তিন হাজার প্রজা দলবদ্ধ হয়ে তাঁর ফ্যাক্টরীর নিজাবাদ, রায়তী ও কট জমিতে চাষকৃত জমির শস্য নষ্ট করতে অথবা চাষযোগ্য জমির চাষে বাধা দিতে উদ্যোগী হয়েছে, এমনকি প্রজারা তাঁর তহশিলদার, আমীন, তাগিদগীর ও অন্যান্য কর্মচারীকে গ্রামে গিয়ে রাজস্ব ইত্যাদি আদায়ে বাধা দিচ্ছে।[৫৩] নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হার্শেলের বিরুদ্ধে নীলকরদের অভিযোগে ৩রা মে ১৮৬০ নদীয়ার প্রজাদের সংগঠন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে প্রজারা সরকারের কাছে দরখাস্ত করার জন্য প্রত্যেকে আট আনা চাঁদা দিচ্ছে, মুসলমানরা আল্লাহর নামে এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন দেবতার নামে শপথ করছে নীলচাষ বন্ধ করার জন্য। প্রতিদিন ঢোলের আওয়াজের মাধ্যমে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে এবং বার চৌদ্দ মাইল দীর্ঘ বিশাল এলাকায় মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোকজনকে উত্তেজিত করা হত। যশোরের কাঠগড়া কনসার্নে চৌগাছার বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্ব প্রথম নীল বিদ্রোহ হয় বলে সতীশ চন্দ্র মিত্র দাবী করেছেন।[৫৪]

ঠিক এমন সময় নীলকরদের চাপের মুখে সরকার স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা অন্তিমে নীল চাষের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারচ্ছন্ন করে দেয়। ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে বাংলা সরকার একটি আইন প্রবর্তন করে (একাদশ আইন)। এতে একদিকে একটি তদন্ত কমিশন গঠন ও সঙ্গে সঙ্গে নীলচুক্তি ভঙ্গের দায়ে ফৌজদারী দন্ড বিধানের ব্যবস্থা থাকে।

এই ফৌজদারী আইন ৪ঠা এপ্রিল থেকে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত ছয়মাস বলবৎ থাকবে। নীল চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে নীলকর বা তার গোমস্তার শপথ ক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন ও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করতে পারেন। দোষী সাব্যস্ত হলে দাদনের পাঁচগুণ পর্যন্ত জরিমানা অথবা তিনমাস জেল দিতে পারবেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কোন আপীল গ্রাহ্য হবেনা।[৫৫] দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ক্যালকাটা মিশনারী কনফারেন্স এই আইন সমর্থন করেনি। ভারত সচিব উড দেওয়ানী ব্যাপারে ফৌজদারী আইনের প্রয়োগের বিরোধী হলেও ছয়মাসের জন্য কার্যকর হবে বলে জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য তিনি এতে সমর্থন দেন। ১৮৬০ সালের ৯ই এপ্রিল গবর্ণর জেনারেল ক্যানিং বিলটিতে অনুমোদন দেনঃ "নীল চুক্তির অঙ্গীকার পূর্ণ করতে বাধ্য করা ও একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য আইন।" তিনি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলটি সই করেন।[৫৬]

নতুন আইন নীলকর ও সরকারের সকল আশা ভরসা ধূলিসাৎ করে দিয়ে অধিকতর অশান্ত ও বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির জন্ম দেয়। তারই ফলশ্রুতিতে অন্যায় ও জবরদস্তিমূলক নীল চাষ পদ্ধতি বিপ্লবের প্লাবনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে নদীয়ায় এক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সরকার পক্ষ আশা করেছিল ছয়মাসের অন্তবর্তীকালে প্রজারা তদন্ত কমিশনের সুবিচারের আশায় আগের নীল চুক্তির অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয় যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক, নীল বপন ভাল ভাবেই চলছে।[৫৭] কিন্তু অচিরেই নীলকরগণ নীলচুক্তি ভঙ্গের অজুহাতে হাজার হাজার প্রজাকে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত করে জেলে পাঠাতে আরম্ভ করল। ১৪ই এপ্রিল ১৮৬০ থেকে ১২ই মে ১৮৬০ পর্যন্ত চার সপ্তাহে দুহাজার প্রজাকে জেলে পুরা হয়, চুক্তি ভংগের জন্য ১২৫২ জনকে, নীলের চারা নষ্ট করার জন্য ৩০১ জনকে এবং ভীতি প্রদর্শন করে নীল চাষ বন্ধ করার জন্য ২৪৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।[৫৮] প্রথম সপ্তাহে (১৪ই এপ্রিল থেকে ২১শে এপ্রিল) ২৭৯ জনকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে ২৫শে এপ্রিল নদীয়া ও যশোরের প্রজারা হোয়াইট ও ফার্লং প্রমুখ নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলা সরকারের সচিবের কাছে এক দীর্ঘ আর্জি পেশ করে। এই আর্জির অভিযোগগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে নীলকরদের সাথে একাত্ম বলে অভিযোগ করা হয়। এতে আরো বলা হয় হাকীমরা একজোট হয়ে তাদের ওপর জুলুম চালায়, পুলিশের দারোগারা নীলকরদের গৃহ ভৃত্যের মত তাদেরই লাঠিয়াল নিয়ে মিথ্যা অজুহাতে দরখাস্তকারীদের অনেককে ধরে

নিয়ে যায়...বিচারের সময় হাকীম নীলকর পরিবৃত অবস্থায় রায় দেন, তাদেরই আমলা ও মোক্তার দ্বারা আদালত কক্ষ পরিপূর্ণ থাকে। গরীব দরখাস্তকারীদের পক্ষে একটি প্রাণীও নেই। কেউ তাদের পক্ষাবলম্বন করলে মিথ্যা অভিযোগে তাকে হাজতে বন্ধ করা হয়। কোন মোক্তার তাদের পক্ষ সমর্থন করতে চায়না কারণ মোক্তার তিতুরাম চক্রবর্তী রাইয়তদের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে মিথ্যা মামলায় ছয়মাস জেল ও ২০০ টাকা জরিমানার সাজা প্রাপ্ত হন। অনুরূপভাবে কেদারনাথ নামে আরেক মোক্তার তিনমাস কারাদন্ড ভোগ করেন। ব্যাপার এত চরমে পৌঁছেছে যে সকল মোক্তার ও ভদ্র সন্তানেরা নদীয়া জেলা ছেড়ে চলে গেছেন। লেঃ গবর্ণর অবিলম্বে মোক্তারদের মুক্তির আদেশ দেন এবং নতুন আইনের অর্থ ও উদ্দেশ্য প্রজাদেরকে যথাযথ বুঝিয়ে দেবার জন্য নদীয়ার কমিশনারকে নির্দেশ দেন। মোক্তারদের হাজতবন্দী হওয়াকে লেঃ গবর্ণর কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন।[৫৯] প্রজারা যশোরের কাঠগড়া কুঠির স্বত্বাধিকারী লারমার ও সুপারিন্টেডেন্ট ককশটের বিরুদ্ধে লেঃ গবর্ণরের কাছে অনুরূপ অভিযোগ পেশ করে (১১ জুন, ১৮৬০)। তাদের অভিযোগ মোটামুটি পূর্ববর্তী অভিযোগের মত তবে এতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারের কাছে আবেদন করে কোন ফল হয়নি। বনগাঁয়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর সেপাই, নীলকর ও তার লাঠিয়াল এবং শড়কীওয়ালারা বাববারী গ্রামের নয় জন প্রজার ধন সম্পদ লুঠ করে, বাগদা থানার দারোগার সামনে কুঠির লোকেরা দুর্গাপুর ও ধন বাড়িয়া গ্রামের প্রজাদের সম্পত্তি লুন্ঠন করে এবং শেষোক্ত গ্রামের কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। তাদের, ধান চনা ও অন্য ফসল ভেঙ্গে নীল বুনে দেওয়া হয়। ২০শে এপ্রিল নীলকর লারমার ও ককশটের উপস্থিতিতে তাদের পাইক পেয়াদারা আটজন প্রজার গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারের কাছে আবেদন করে কোন ফলোদয় হয়নি। দারোগা ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগণ নীলকরদের পক্ষে।[৬০] এসব জুলুমের ফলে প্রজারা মরিয়া হয়ে আবার নীল চাষের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াল। নদীয়ার কমিশনারের ১০ই মে তারিখের রিপোর্টে জানা যায় যে, প্রজারা এখন বলছে, "আমরা কোন দাদন নেইনি"[৬১] নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নীল কমিশনের কাছে দাখিলকৃত রিপোর্টে দেখা যায় বাগদা থানার দারোগার সামনে লারমারের নায়েব সরকারের ২৯ মার্চ ও ৯ই এপ্রিলের নীলচাষ সম্পর্কিত পরোয়ানা ২৫ জন রাইয়তের সামনে পাঠ করলে তারা বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসে এবং শপথ করে বলে যে তারা এসব মান্য করবেনা। দারোগা ৪ জন লোককে গ্রেফতার করলে ২০০ জন প্রজার পক্ষের লাঠিয়াল তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এর পর মিলিটারী পুলিশ এসে ১৮/১৯ জন লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কয়েকজনের বিভিন্ন মেয়াদের জেল ও জরিমানা হয়। দুর্গাপুরের প্রজাদেরকে কাঠগড়া গিয়ে নীলের বীজ গ্রহণ করতে বলা হলে তারা কুঠির লোকদেরকে আক্রমণ করে। এসব লোকের বিভিন্ন মেয়াদে জেল ও জরিমানা হয়। একজন চৌকিদার এ সংগে যোগ দিয়েছিল বলে তারও জেল হয় ও পরে চাকরি চলে যায়।[৬২]

ম্যাজিষ্ট্রেটের পরবর্তী রিপোর্টে বলা হয় যে প্রজারা এক হাজার বার মরতে রাজী আছে কিন্তু আর এক বিঘা জমিতেও নীল চাষ করবেনা। নদীয়ার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট হার্শেলের সাক্ষ্যে জানা যায় যে নতুন আইনের পূর্বে প্রজারা নীলচাষ বন্ধের ব্যাপারে এত আশাবাদী ছিল যে তারা প্রায় নীলচাষযোগ্য জমির ¾ অংশে নীল বপন সম্পন্ন করেছিল কিন্তু নতুন আইন কার্যকর হওয়ার পর তারা নিশ্চিত হল যে নীল চাষ বন্ধ হবেনা তাই তারা আর নীল চাষ করতে রাজী হলনা এবং পূর্ববর্তী বোনা গাছ সম্পর্কে তারা খুবই উদাসীন হয়ে পড়ল।[৬৩] পাবনার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের ২৬শে এপ্রিলের রিপোর্টে জানা যায় যে ওখানকার প্রজারা নীলচাষের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করে বলছে তারা নীল বুনবেনা এবং আরো বলছে "তোমাদের কেইস প্রমাণ করে আমাদের জেলে পাঠাও"।[৬৪] তাঁর ২৯শে জুনের রিপোর্টে বলা হয় যে প্রজারা দাদন নিয়ে নীল বুনেছিল, গাভী ও নৌকার জন্যও আগাম নিয়েছিল কিন্তু ফ্যাক্টরীওয়ালারা দশ বছরের জন্য প্রজাদেরকে চুক্তিবদ্ধ করতে চাইলে তারা আর কোন কাজ করতে অস্বীকার করে।[৬৫] আগষ্ট মাসে তিনি জানাচ্ছেন যে প্রজারা নীলগাছ জমা দিয়ে কোন কর্তন ছাড়া নগদ অর্থ চাচ্ছে আর ম্যাজিষ্ট্রেট গোলমালের ভয়ে নীলকর-দেরকে আপাততঃ প্রজাদের এ দাবী মেনে নিতে অনুরোধ করছেন।[৬৬] অন্যপক্ষে নীলকরদের সার্বিক অভিযোগ ছিল যে প্রাজারা সংঘবদ্ধ হচ্ছে, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধতাকে সার্বজনীন করার চেষ্টা করছে, ফ্যাক্টরীর গোমস্তাদের ও চাকরদের গ্রামে যাওয়ার পথঘাট বন্ধ করে দিচ্ছে, এবং মারধর করে তাদেরকে ইউরোপীয়দের চাকুরী ছেড়ে দিতে বলছে।[৬৭]

আগষ্টের শেষের দিকে ছোট লাট গ্র্যান্ট সিরাজগঞ্জের রেলওয়ে পরিদর্শনে যান। পথে কুষ্টিয়ার কাছে কুমার ও কালিগংগা নদীর তীরে অগণিত রাইয়ত দলে দলে সমবেত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায় যেন সরকার এক আদেশ বলে তাদেরকে নীল চাষ থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি যখন পাবনার সালগামুদিয়া ফ্যাক্টরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নদীর উভয় তীরে দু'শ রাইয়ত হাতজোড় করে বিলাপ ধ্বনি

উচ্চারণ করে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে। গ্রান্ট তাদের দরখাস্ত গ্রহণ করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় কুষ্টিয়ার নিকট নদীর উভয় তীরে হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুর সমাবেশ ও তাঁর কাছে তাদের সুবিচার প্রার্থনা তাঁকে বিস্মিত করে। এ সম্পর্কে তিনি ভারত সচিব উডকে লিখেছিলেন ঃ এই ক্ষোভ প্রদর্শন

"দিল্লীর বিগত দিনগুলোর পর অন্য কোন ঘটনার চেয়ে আমার জন্য বেশী উদ্বেগের কারণ হয়েছে...যে জন গোষ্ঠি এ রকম করতে পারে, তারা দুর্বল হতে পারে এবং ব্যক্তিগতভাবে নির্বিরোধ হতে পারে কিন্তু দলগতভাবে তাদেরকে সামলানো কষ্টকর।......সেদিন থেকে আমার মনে হল কোন একজন নির্বোধ নীলকর কর্তৃক ক্রোধ বা ভয়জনিত একটি গুলি বর্ষণ নিম্নবাংলার প্রতিটি ফ্যাক্টরীতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।"[৬৮]

যে সময় নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকে তখন প্রজারা নীলকর জমিদারদের বিরুদ্ধে রাজস্ব অনাদায়ের আন্দোলনে যোগ দেয়, এর ফলে প্রজাদের নতুন বিপদ দেখা দেয়। জমিদার-নীলকরগণ নতুন বিপদের মুখে প্রজাদেরকে খাজনাবৃদ্ধি ও জমি থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দিতে থাকে। প্রজারাও আদালতে মামলা দায়ের করতে থাকে। তারা ফ্যাক্টরী আমলা-দেরকে নানাভাবে হয়রানি করে এবং তাদেরকে সমাজ ও জাতিচ্যুত করার চেষ্টা করে।[৬৯] ধীরে ধীরে ১৮৬৩ সালের মধ্যে নীল জেলা সমূহে শান্তি ফিরে আসে। তবে নীল চাষের পূর্বাবস্থা আর ফিরে আসেনি। কিন্তু সে আরেক প্রসংগ। নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব সম্পর্কে আমাদের আলোচনার মধ্যে মাঝে মাঝে ইংগিত ছিল। নীল বিদ্রোহের মধ্যে ও সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্রোহীরা অনেক তুলনা উপমা টেনেছেন। তথাপি কর্তৃপক্ষের আংশা কিংবা নেতাদের আশা কোনটাই সত্য প্রমানিত হয়নি। সতর্কতা ও কঠোরতার ফলে বিদ্রোহ কেটে গেল ১৮৬১ সালের মধ্যেই। নীল চাষেরও স্বাভাবিক পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটল এর অন্তর্নিহিত অযৌক্তিকতার কারণে।[৭০] জার্মানী থেকে সস্তা কৃত্রিম নীল আমদানী হল। সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন 'শত আন্দোলনে যাহা হয় নাই বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহা হইল' (পৃ ৭১০)। নীলকরগণ নীলের ব্যবসা তুলে নিলেন ধীরে ধীরে। তবে এই বিদ্রোহ বাঙ্গলী শিক্ষিত মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পূর্বসূরি আর কৃষকদের অনাগত দিনের বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জনক।

তথ্য নির্দেশ

১. নীল কমিশন রিপোর্ট, উত্তর, ১৬৯৩।
২. সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭৫, পূর্ণ কবিতার জন্য দেখুন, সাহিত্য, ১২শ বর্ষ ১৩০৮, পৃঃ ৪০৬।
৩. পূর্বোক্ত, সতীশ চন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৭৮০।
৪. Englishman, March 15, 1861 as quoted by Kling p. 216.
৫. পূর্বোক্ত, সতীশ চন্দ্র মিত্র, ৭১০-১২।
৬. Muinuddin Ahmad Khan, *History of the Faraidi Movement in Bengal,* p. 35. f. n.
৭. সতীশ চন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭২।
৮. সচিত্র সন্ধানী, ১ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যা ১৩ই অক্টোবর ১৯৭৮, পৃঃ ২৮, 'রেণীর খড় কাটা' প্রবাদের জন্য দেখুন, পূর্বোক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৭৯১।
৯, পূর্বোক্ত, সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৭৭৯।
১০. ঐ, পৃঃ ৭৭৫।
১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭৯ পাদটিকা।
১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩।
১৩. Kling, 177.
১৪. ঢাকা প্রকাশ, ৭ই এপ্রিল, ১৮৬৪, মুনতাসীর মামুন কর্তৃক সংকলিত, ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ববঙ্গের সমাজ, অর্থনীতি খণ্ড (অপ্রকাশিত), পৃঃ ৬৭৮।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭।
১৬. ইন্ডিগো কমিশন রিপোর্টে ১৮৩২ সালের উল্লেখ রয়েছে, উত্তর, ৩৬২৮।
১৭. Kling, 26.
১৮. ,, 61.
১৯, নীল কমিশন রিপোর্ট, (সংক্ষেপে RIC), A 1689।
২০. RIC, A 3629.
২১. Selections from the Records of the Government of Bengal Papers Relating to Indigo Cultivation pts. I & II. এর পরে সংক্ষেপে Indigo Papers, p. 171.
২২. Indigo Papers, p. 233.
২৩. বাবু দি, কে, টেগোরের সাক্ষ্য RIC, A 3752।
২৪. Indigo Papers, 3-9 AISO 46, Cf. RIC, A 1221-22.
তুলনা করুন, "ধানের ন্যায় নীলের বাজার দর ছিলনা। সাহেবেরা যে একদর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই হারে চিরকাল ধরিয়া জম্মা অজম্মার তারতম্য বিচার না করিয়া প্রজাদিগের নিকট নীলের গাছ লইবেন . . . ইহাতে কৃষকদের কখনও লাভ না হইয়া বরং বৎসর বৎসর সাহেবের নিকট

তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত।" গিরিশচন্দ্র বসু, সেকালের দারোগার কাহিনী, ২য় সংস্করণ কলিকাতা, ১৯৮৩।

২৫. Indigo Papers, 75, 93.

২৬. RIC, A 178-9.

২৭. RIC, A 186 প্রজাদের গুদামে আটকে রেখে প্রহারের জন্য নানা যন্ত্র উদ্ভাবন করা হত, এর নাম বিদ্রোহীদের নামানুযায়ী "শ্যামচাদ" বা রামকান্ত প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, ৭৭৫, গিরিশচন্দ্র বসু, (সেকালের দারোগার কাহিনী পৃঃ ৮৩) শ্যামচাঁদ, রামচাঁদ বলেছেন। কমিশনের সামনে সাক্ষ্যে নদীয়ার জয়রামপুর ফ্যাক্টরীতে ব্যবহৃত এ রকম একটি যন্ত্র তিনি কমিশনের সামনে জমা দিয়েছিলেন। এটি ছিল চামড়ার তৈরী (A 3469)।

২৮. RIC App. 21 & A 3578, 359, 3598.

২৯. Kling p. 82.

৩০. RIC, A 3918 RIC, Appendix, II.

৩১. ঐ।

৩২. ঐ।

৩৩. ঐ।

৩৪. ঐ।

৩৫. ঐ।

৩৬. ঐ।

৩৭. Kling p. 53-4.

৩৮. Indigo Papers, 21-25.

৩৯. RIC, 3608, 3636.

৪০. Indigo Papers. 98-99.

৪১. Indigo Papers, 141-2.

৪২. *Ibid*, 159.

৪৩. Kling p. 72.

৪৪. Indigo Papers I & II, 173.

৪৫. Indigo Papers, III, 721-723.

৪৬. Kling, 78-79.

৪৭. RIC, A 2819.

৪৮. Indigo Papers, 405-408.

৪৯. Indigo Papers, 405-408.

৫০. Indigo Papers, 456-466, 440-450.

৫১. *Ibid*, 440-1, 446. 449-50.

সতীশচন্দ্র মিত্র এসব পদাতিক বাহিনী ছাড়াও আরো উল্লেখ করেন যে "দুইখানা রণতরী দুই জেলার (যশোর ও নদীয়ার) নদী পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল।" যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮৪।

৫২. Indigo Papers Pt. III, pp. 731-766.
৫৩. ঐ, 1114-1115, 1042.
৫৪. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭৭।
৫৫. Indigo Papers, Pts. I & II, 367-370.
৫৬. Kling, 135-137.
৫৭. Indigo Papers, 475.
৫৮. *Ibid*, 476, 836, 849, 862.
৫৯. Indigo Papers, Pt. III, 781-794. হাকীমদের সাথে নীলকরদের একাত্মতা সম্পর্কে সমসাময়িক দেশীয় পত্রিকায় বহু উল্লেখ আছে। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় এ সম্পর্কে বহু সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। একটি সম্পাদকীয়তে নিম্নলিখিত মন্তব্য মনোযোগ আকর্ষণ করার মত ঃ "আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি শাদা হাকিমের দ্বারা নীলকরেরা কোন মতে শাসিত হইবেনা। কালা ব্যতীত প্রজাদিগের ঐ জ্বালা নিবারণ হইবার নাই।" (বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র। প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২, সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় ১. ১০. ১৮৬৫) এদের অভিমত ছিল যে দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারাই দেশীয়দের সুবিচার হতে পারে।
৬০. *Ibid* 808-810.
৬১. ঐ, 819 : ছয়জন রাইয়তের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা জাল চুক্তির কারণে হার্শেল ডিসমিস করে দিয়েছিলেন, RIC, 2870.
৬২. RIC, Appendix.
৬৩. RIC, A 2819.
৬৪. Indigo Papers, 959.
৬৫. *Ibid*, 999.
৬৬. Indigo Papers, 1021.
৬৭. Indigo Papers, 1019.
৬৮. Kling, 168-169.
৬৯. Kling, 173- 178.
৭০. গিরিশচন্দ্র বসু, যিনি নীল বিদ্রোহের সময় নদীয়ার কোতোয়ালী থানার দারোগা ছিলেন। নীল প্রথা বিলোপের তিনটি সহায়ক কারণের উল্লেখ করেছেন ঃ (১) লেঃ গবর্ণর পিটার গ্র্যান্টের সহানুভূতি (২) হিন্দু প্যাট্রিয়টের হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা এবং (৩) প্রজার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। (সেকালের দারোগার কাহিনী, পৃঃ ৮৮, "ঐ ত্রিবিধ অস্ত্রে প্রজাদিগের চিরশত্রু সংহারিত" হলো)।

চিত্তব্রত পালিত

পাবনা বিদ্রোহের স্বরূপ

১৮৭৩ সালে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে পাবনা জেলায় যে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয় তার চরিত্র নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। একটি গোটা বই এবং একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও সব প্রশ্নের নিরসন হয়নি।[১] তাই আবারো উৎস সন্ধানে যাবার এবং ঘটনাপঞ্জী বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

পাবনার খাজনার হার বরাবরই নীচু ছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় এই জংলা অঞ্চলে বন কেটে বসত করার ইচ্ছেকে উস্কে দেবার জন্য এই কম খাজনার টোপ গেঁথেছিলেন জমিদারেরা। ইচ্ছুক চাষী বসতি করবে। গ্রামের পত্তন হলে অনাবাদী জমি ফসল দেবে। মাথাপিছু খাজনা, ফসল এবং টুকিটাকি আদায়ে জমিদারের প্রাথমিক লোকসান হলেও আখেরে লাভ হবে। আবাদ বাড়ল, গ্রামে গড়ে উঠল। মাথাপিছু খাজনার যোগফলে আয়বৃদ্ধি হলেও জমি বা ফসলের অর্থমূল্যের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর হয়ে এল। কালে কালে উপরি আদায় বা আবওয়াবই হয়ে উঠল জমিদারদের খাজনা বাড়াবার পরোক্ষ হাতিয়ার। দীর্ঘকাল ধরে সর্বস্তরের প্রজা এই আবওয়াব দিতে নারাজ হয় নি। কিন্তু এই অলিখিত বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে জমিদার যখনই লোভের হাত বাড়িয়ে চাষীর সর্বস্ব গ্রাস করতে চেয়েছেন, তখনই বেধেছে লড়াই।

এর মধ্যে সরকারেরও ভূমিকা আছে, স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের শাসন-কালে ১৮৭২ সালে আইন করে আবওয়াব বন্ধ করা হয়। জমিদারেরা প্রমাদ গণেন এবং আইন বলবৎ হবার আগেই নিচু হারের খাজনা এবং আবওয়াবের সমস্ত আদায় জুড়ে নতুন পরগণা হার চালু করতে উদ্যোগী হন। ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের বলে যে সমস্ত প্রজা এই স্বত্ব পেতে পারেন এবং নতুন কর দিতে বাধ্য নন, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উপক্রম করেন। বারো বছরের দখলীস্বত্ব ছিল এমন কিছু প্রজা প্রথমে স্থানীয় মুন্সেফের আদালতে মামলা লড়ে জিতে যান। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা একটি কৃষক

সংগঠন গড়ে তোলেন এবং চাঁদা তুলে মামলার খরচ চালানো, ধর্মঘট, বাড়তি খাজনা দিতে অস্বীকার করা সশস্ত্র প্রতিরোধ ইত্যাদি সমস্ত আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। ক্রমশঃ আন্দোলন আদালতের আঙিনা পেরিয়ে ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহে পরিণত হয়। নেতৃস্থানীয় বিত্তশালী জোতদারেরা এবং সম্পন্ন চাষীরা ১৮৫৯ ও ১৮৭২ এর আইনের সুযোগ নিয়ে আবওয়াব দিতে অস্বীকার করেন এবং বর্তমান গ্রামীণ সম্পদের সবটুকুই আত্মসাৎ করতে থাকেন। এর ফলে পাবনার কৃষকবিদ্রোহ সহজ শ্রেণী-সংগ্রামের বদলে এক জটিল সামাজিক আলোড়নের আকার ধারণ করেছে।[২]

ঘটনাপঞ্জী

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে সদর মহকুমার গোপালনগর এবং ফরিদপুর গ্রামে ১৮৭৩ সালের ২৭ শে জুন। স্থানীয় জমিদার মজুমদারের জমিদারিতে বিদ্রোহী কৃষকেরা প্রথমে হানা দেয় এবং অবস্থা আয়ত্বে আনতে দারোগার অধীনে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী পাঠাতে হয়। এর ফল হয় উল্টো। মারমুখী প্রজা ধুবুড়ী নাকালিয়াতে দুবান কনস্টেবলকে পেটায় এবং পরে প্রায় হাজার জন মথুরা থানা আক্রমণ করে। বারোশ' জনের আরেক দল শাগুরকাঁদিতে জনৈক গোবিন্দ দত্তর বাড়ীতে চড়াও হয়। কিন্তু সরকারী সূত্রে এই হাঙ্গামা প্রধানতঃ পুরনো জমিদারী বিরোধ বা ব্যক্তিগত কলহের ফল বলে জানা যায়। খাজনার প্রশ্ন এই আক্রমনের হেতু নয়।

সিরাজগঞ্জের সংঘর্ষই প্রকৃতপক্ষে পাবনা বিদ্রোহের সূচনা বলে অভিহিত হতে পারে। সালপে সংগঠক চাষীদের এক সভা বসে এবং তাদের কিছু স্বেচ্ছাসেবী আশেপাশের গ্রামের চাষীদের আন্দোলনে সামিল না হবার জন্য ধমকায়। উলীপাড়ায় বিদ্রোহী চাষীদের সভা ডাকা হত শিঙা বাজিয়ে এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ভীতির সঞ্চার করা। জমিদারের কাছারির লোকজন বিনা রক্তপাতেই পালাতে শুরু করেছিল। মৌপুরের সমস্ত প্রজাই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল তাই সেখানে কোন সংঘর্ষ বাধে নি। শাজাদপুরের ঠাকুর জমিদারেরা খুবই ভীত হয়ে পড়েন এবং নিরাপত্তার জন্য পুলিসের কাছে সরাসরি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারের কাছে বারবার আবেদন করতে থাকেন। কিন্তু প্রাধান ঘটনা একটিই। নাকালিয়ার চাষীরা স্থানীয় শাকতলার চাষীদের আন্দোলনে সামিল হবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। এর পিছেনের ঘটনা জটিল। স্থানীয় জমিদার পাকড়াশীরা নাকালিয়ার দুজন মুসলমান ভূস্বামীকে বিঘা প্রতি দু'আনা বেশী খাজনায় তিন বছরের জন্য কোন্

জমি লীজ দেন। তাঁরা আবার বিঘা প্রতি চার আনা বেশীতে সেই জমি অপরকে লীজ দেন। তখন শাকতলার চাষীরা লীজ অস্বীকার করে এবং পুরনো জমিদারের পক্ষে দাঁড়ায়। তখন দুই ইজারাদার সম্মিলিত-ভাবে আন্দোলনে সুযোগ নিয়ে শাকতলার উপর হামলা করে এবং চাষীদের জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য উস্কানি দেয় কিন্তু স্থানীয় চাষীরা রাজী হয় নি। এর ফলে গ্রামে লুঠতরাজ হয় এবং বাড়ী ঘর ধ্বংস করা হয়। জামিরতা গ্রামের ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় জমিদার ঠাকুরেরা প্রচার করেন যে সেখানে লুঠতরাজ এমনকি নারী ধর্ষণ পর্য্যন্ত ঘটে গেছে। কিন্তু মহকুমা শাসক নোলান পরে অনু-সন্ধান করে জানান যে এর অনেকটাই অতিরঞ্জিত এবং পাকড়াশী ঠাকুরদের জমিদারী কোঁদলের ফল।

গোপালপুর গ্রামে দুই ইজারাদার ব্রজ ভাদুড়ী এবং ঈশান রায়ের মধ্যে তিনবছর ধরে বিবাদ-বিসংবাদ চলছিল। কৃষক আন্দোলন দেখা দিলে কৃষক সংগঠনের অন্যতম নেতা বিদ্রোহী রাজা ঈশান রায় সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হন কিন্তু প্রতিপক্ষের গুলিতে তাঁর দলের দুজন চাষী নিহত হয়। এ ঘটনাকেও কৃষক আন্দোলনের অংশ বলা যায় না। আন্দো-লনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত কলহ নিষ্পত্তির কৌশল বলতে হয়। ইতস্ততঃ হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেও তার মূলে বাড়তি খাজনা রদের আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না। আন্দোলনের প্রধান ধারাটি পরিচালিত হয় রায়ত সংগঠনের মাধ্যমে। এই সংগঠন রায়তদের দেওয়ানী মামলার খরচ তোলার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে, তুরীভেরী বাজিয়ে চাষীদের জমায়েত আহ্বান করে এবং চর ও চিঠি পাঠিয়ে গ্রামে গ্রামে রায়ত-সংগঠন গড়ে তোলে। রায়ত সংগঠনের জোরে চাষীরা জমিদারের বাড়তি খাজনা দিতে এবং নতুন কবুলিয়তে সই দিতে অস্বীকার করে। একে একধরনের খাজনার ধর্মঘট বলা যেতে পারে। চাষীদের ধরপাকড় হলে সংগঠন তাদের হয়ে আদালতে মামলা চালায় এবং বহু ক্ষেত্রে জয়ী হয়।[৩]

এই কৃষক আন্দোলনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শরিকই ছিলেন মুসল-মান চাষী। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তালুকদার, জোতদার, মোড়ল, প্রামানিক ব্যবসায়ী, সম্পন্ন চাষী, উকিল, মোক্তার সবরকম প্রতিনিধিকেই পাওয়া যায়। বিদ্রোহী রাজা বলে খ্যাত ঈশান রায় ছিলেন তালুকদার এবং ব্যবসায়ী। তাঁর সহকারী শম্ভুনাথ পাল ব্যানার্জী জমিদার কাছারীর কর্ম-চারী এবং গ্রামের মোড়ল। গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলাই ছিল তাঁর কাজ। মুসলমান জোতদার খুদি মোল্লা তাঁর জমিদারের সঙ্গে বিবাদকে কেন্দ্র করে সালপের সান্যালদের বিরুদ্ধে প্রজাদের পরিচালিত

করেন। ধর্না, ধর্মঘট, মামলা মোকদ্দমা এবং গণসংগ্রাম বছর না ঘুরতেই থিতিয়ে আসে। শাজাদপুরের ঠাকুরেরা এবং সালপের সান্যালরা আপোষ মীমাংসা করে নেন। ইউসুফ শাহীর ব্যানার্জীরা লাঠিবাজি এবং মামলা যুগপৎ চালিয়ে যেতে থাকেন। মোড়লদের ঘুষ দিয়ে বশ করাও চলতে থাকে। মামলাতে বিপুল ব্যয় স্বীকার করেও ব্যানার্জীরা রায়তদের সর্বস্বান্ত করতে কৃতসংকল্প থাকেন। অবশেষে ১৮৭৩-৭৪ এর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চাষীরা আত্মসমর্পণ করে। জয়পরাজয়ের বিচারে দু'পক্ষেরই আংশিক জিত হয়।[৪]

বিশ্লেষণী বিতর্ক

পাবনা বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে গবেষক মহলে বিতর্ক সুবিদিত। এই বিদ্রোহের ইতিহাসকার কল্যাণ সেনগুপ্তের মতে এই সংগ্রামের উপলক্ষ্য ছিল বাড়তি খাজনা রদ এবং মূল লক্ষ্য ১৮৫৯ এর প্রজাস্বত্ব আইনের বলে প্রজাস্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। একই খাজনায় বারো বছরের মেয়াদী দখলীস্বত্ব বজায় রাখা ছিল এর রক্ষাকবচ। বাড়তি খাজনা দিলে এবং এক জমি থেকে অন্য জমিতে চালান হলে সেই স্বত্ব বেদখল হয়ে যায়। জমিদারের সেই প্রয়াসকে ব্যর্থ করা রায়ত সংগঠনের অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।

১৮৭২ সালের সরকারী আইনে আবওয়াব বা উপরি পাওনা নিষিদ্ধ হলে জমিদারেরা এই আবওয়াব পুরনো নীচু হারের খাজনার সঙ্গে জুড়ে নতুন বাড়তি খাজনা চালু করায় উদ্যোগী হন আইন বলবৎ হবার আগেই। সেই সুযোগে চাষীদের নতুন কবুলিয়তে জবরদস্তি সই করাতে থাকেন। পাবনা জেলায় ১৮৭২-৭৩ সালে ১৬৭২ টি নতুন কবুলিয়ত রেজিস্ট্রী হয় যার ফলে স্বাক্ষরকারীদের প্রজাস্বত্ব লোপ পায়। এছাড়াও খাজনার রসিদ দিতে অস্বীকার করা এবং স্বল্পমেয়াদী ইজারা দেওয়া ইত্যাদির মধ্যেও প্রজাস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করা হয়। এর ফলে ইচ্ছামত প্রজাবিতাড়ণ এবং খাজনা বাড়ানো সম্ভব এবং প্রজাদের উপর সম্পূর্ণ অধিপত্য করা যায়।[৫]

সেনগুপ্ত প্রজাস্বত্ব এবং স্বাধিকারের প্রশ্নটিকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, বিনয়ভূষণ চৌধুরী তার চেয়ে জমিদারী নিপীড়ন এবং বাড়তি খাজনা আদায়ের অছিলাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। আবার সেনগুপ্ত অহিংসাত্মক, আইনগত অধিকার আদায়কেই সংগ্রামের প্রধান ধারা মনে করলেও চৌধুরী হিংসাত্মক ঘটনাবলীকেই মূল সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও সেনগুপ্ত যাকে রায়তদের অপরাধ প্রবণতার পরিচয় বলে মনে করেছেন সেই অর্থে চৌধুরী খোলামাঠের লড়াইকে ব্যাখ্যা করেন,

নি। তবে দুজনেই এক মত যে সাংগঠনিক এবং অংশগ্রহণের দিক থেকে পাবনা বিদ্রোহ ছিল নিঃসন্দেহে সর্বস্তরের চাষীদের অন্যতম বৃহৎ সম্মিলিত সংগ্রাম।[৬] হয়ত লড়াই, লুঠতরাজের চেয়ে আইনগত পন্থায় এই সম্মিলিত প্রয়াস বেশী প্রকাশ পেয়েছিল বা বাড়তি খাজনা রদের চেয়ে প্রজাস্বত্ব বাঁচাবার দায় ছিল তীব্রতর, কিন্তু এইসব আপাতঃ বিরোধ একই দাবীর এপিঠ-ওপিঠ।

কিন্তু গ্রামবাংলার কৃষি-অর্থনীতির আরো কিছু কূট প্রশ্নের নিরসন এঁদের রচনায় অনালোকিত বা স্বল্পালোকিত থেকে গেছে। সেই প্রশ্নে ফেরা যাক্।

পাবনা বিদ্রোহের কুশীলব

ক. জমিদার

১৮৭০ এর দশককে জমিদারী রমরমার বদলে তার দুর্গতির কাল বললে অত্যুক্তি হয়না। এই সময়কার কোর্ট অফ ওয়ার্ডের রিপোর্টে বেশ কয়েকটি বড় জমিদারীর সংকটের বিবরণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগরের রায়, রানাঘাটার পালচৌধুরী এবং উত্তরপাড়ার মুখাজীরা এই সময়ে যথেষ্ট বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। চট্টগ্রামের কমিশনার লোরিস জমিদারদের দুর্গতির এক সমকালীন বিবরণ দিয়েছেন। জমির উৎপাদন থেকে আয়ের সিংহভাগ এই সময়ে জোতদারের ভোগে চলে যাচ্ছিল আর জমিদার ক্রমশঃই অনাদায়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। এর কারণ, জমিদারের বাড়তি উৎপাদনের যে ন্যায্য অংশ প্রাপ্য সরকার তার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। দিনাজপুর, রংপুর, পাবনার বর্ধিষ্ণু চাষী এবং জোতদারেরা অনেকে জমিদারের চেয়ে বিত্তবান এবং ক্ষমতাশালী। সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, ঢাকা, ফরিদপুরের অর্ধ শতাংশ জমিদার ঋণগ্রস্ত ছিলেন অথচ তাঁদের অধীনস্থ অনেক জোতদার এবং সম্পন্ন চাষী মহাজনীতে লিপ্ত ছিলেন। সমসাময়িক কেদার দাস এবং ললিত মোহন রায় প্রভৃতির রচনায় জমিদারদের দুর্গতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়।[৭]

খ. জোতদার

মধ্য উনিশ শতক থেকে জোতদার শ্রেণীর বিকাশের যথেষ্ট বিবরণ সরকারী নথিতে পাওয়া যায়। পণ্য শস্য ফলনের প্রসারের সঙ্গে এই শ্রেনীর যোগাযোগের প্রসঙ্গ নথিপত্রে আলোচিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বন কেটে বসত করার সময় থেকেই এই শ্রেণীর সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। খতিয়ানে রায়ত বলা হলেও এঁরা আধিয়ার রেখে জমি চাষ, মহাজনী এবং ধান-

চালের কারবার করে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ও বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৫৯ সর প্রজাস্বত্ব আইনের প্রাক্কালে এঁদের উদ্যোগ ও কর্মশক্তির প্রশংসা করা হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে গম, তামাক, ধানচাল এবং স্বর্ণতন্তু পাট উৎপাদনে এঁদের বিশেষ ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। যে সমস্ত রায়ত একশ' টাকা খাজনা দেন এবং বারো বছর কোন জমিতে চাষ করছেন বলে চিহ্নিত তাঁদের প্রজাস্বত্ব এই আইনে স্বীকৃত হয়। অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থকরা বিলেতের সংসদে এঁদের অধিকার বিধিবদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি দেখান যে এই শ্রেণীর স্বার্থে মূলধন সঞ্চয় এবং ক্রয়-ক্ষমতা প্রসারের আইনগত ব্যবস্থা নিলে তবেই ঔপনিবেশিক অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এদেশের পণ্যশস্যের রপ্তানী বাড়বে এবং বিলেতি মিলের কাপড়ের কদর হবে। কৃষি অর্থনীতিতে জোতদারের এই নতুন ভূমিকা এবং আইনের স্বীকৃতি এই শ্রেণীকে গ্রামাঞ্চলে প্রভাবশালী করে তুলেছিল। ম্যাকনীল তাঁর ১৮৭৩ সালের রাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে জোতদারের সামাজিক ঊর্ধ্বগতির কথা চিত্রিত করেছেন। তিনি লিখছেন, ভূস্বামীদের মধ্যে নতুন রক্ত সঞ্চালিত হয়েছে। এতে দেশের কল্যাণ হবে। এই শ্রেণী নতুন উদ্যম ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁদের যথাযোগ্য বিকাশ ঘটিয়েছেন। এঁরা জমিতে পলাতক, গোমস্তা-নির্ভর, অলস এবং কৃষিতে অমনোযোগী স্বভাবের জমিদারদের মত নন।[৮] এই ধরনের শিরোপা ক্যাম্বলের ১৮৭৪ সনের প্রশাসনিক প্রতিবেদনেও রয়েছে।[৯] দিনাজপুরের কালেক্টর ওয়েস্টম্যাক্ট ১৮৭৬ সালে তাঁর এক রিপোর্টে জোর দিয়ে বলেছেন যে একজন জোতদার তাঁর ঊর্ধ্বতন জমিদারকে যা খাজনা দেন তার তিনগুণ তিনি নিজের অধস্তন প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করেন। কিন্তু তবু কৃষির উন্নতিতে তিনি কিছু বিনিয়োগ করে থাকেন। তাই জমিদারের স্বার্থে এঁদের খর্ব করা অনুচিত। কারণ তাতে জমিদার ও প্রজা উভয়েরই আখেরে ক্ষতি হবে।[১০] কোর্ট অফ ওয়ার্ডের ১৮৭৫-৭৬ সালের রিপোর্টে বহু জমি-দারীতে বেশ কিছু উগ্র কৃষক শ্রেণীর আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে যারা স্থানীয় জোতদারদের সহায়তায় আন্দোলনে উদ্যোগী এবং সামান্য ছুতোতেই ধর্মঘট করতে প্রস্তুত। প্রজাস্বত্ব আইনে বারো বছরের কায়েমী জোতের মৌরসী পাট্টা স্বীকৃত হলে নানা পেশার বহু ভদ্রলোক সেই সব জোতের মালিক হন।[১১] বেঙ্গল ইন্ডিগো কম্পানীর লারমুর সাহেব ১৮৬২ সনে কমিশনের কাছে তাঁর জবানবন্দীতে নদীয়াতে এই সব কমিটির কর্তাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ময়মনসিংহের জমিদার কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ১৮৬৩ সনে অনেক ডেপুটি কালেক্টর এবং মোক্তারদের প্রজা-স্বত্ব ভোগী রায়ত বলে বর্ণনা করেছেন।[১২]

জোতদার হওয়া ছাড়াও মোক্তার হিসেবেই এঁরা গ্রামবাংলার জেলা আদালতগুলিতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং প্রসার জমাবার জন্য সম্পন্ন চাষীদের আইনগত অধিকার আদায়ের জন্য মদত দিতে থাকেন। খাজনার প্রশ্নে অনেক মামলা এঁরা পরিচালনা করেন শতকরা পঁচিশ ভাগ কম ফি-তেও। রাজশাহীর জজ কোর্টের উকীল কিশোরীলাল সরকার অনেক রায়তের হয়ে খাজনার মামলা লড়েন এবং স্বীকার করেন যে পাবনা বিদ্রোহের পিছনে মোক্তারদের প্ররোচনা আছে। জোতদার-মোক্তার মোর্চা বিদ্রোহের আইনী-বেআইনী দুই দিকেরই পৃষ্ঠপোষক।[১৩]

গ. অধস্তন প্রজা, কোর্ফা, আধিয়ার

অলস জমিদারের প্রতি তুলনায় জোতদারকে আমলার চোখে অনেক বেশী প্রগতিশীল, উন্নতিকামী কৃষি সংগঠক মনে হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে এঁদের প্রকৃত রূপ ছিল অন্য রকম। অন্যত্র ম্যাকনীল তাঁর ১৮৭৩ এর রিপোর্টে স্পষ্টই লিখেছেনঃ এইসব বর্ধিষ্ণু ভূস্বামীরা তাঁদের অধস্তন প্রজাদের জমি মহাজনী ও অন্যান্য ব্যবসার পাওনা আদায়ের জন্য হাসিল করে নিয়ে রপ্তানীযোগ্য পণ্য শস্য ফলনে মন দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলে এঁরাই সবচেয়ে ক্ষমতাবান।[১৪] ১৮৭৫ এ লোরিস তাঁর রিপোর্টে এই মন্তব্যের সমর্থন করেছেন। কৃষির বাড়তি আয় সমস্তই জোতদারেরা আত্মসাৎ করেছেন। ১৮৭৬ এর রোড সেস্ নথিপত্র থেকে তিনি ১৫০,০০ জন জোতদারের সন্ধান দিয়েছেন। এই সব জোতদারেরা হাওলা, নিমহাওলা ইত্যাদি নানারকম জোতের মালিক। এঁরা শুরুতে স্বয়ং চাষ করলেও এখন অনেকেই চাষ ছেড়ে দিয়ে প্রজা বসিয়েছেন। লোরিস লক্ষ্য করেছেন যে এঁরা জমিদারের বাড়তি খাজনা দিতে বিদ্রোহী হলেও নিজেদের অধস্তন প্রজাদের কাছ থেকে উপরি আদায় নিংড়ে নিতে কসুর করেন না।[১৫] রংপুরের অভিজ্ঞ কালেক্টার গ্লেজিয়ার ১৮৭৬ সালের উত্তর বঙ্গের জোতদারদের তলায় পাঁচ থাক পর্যন্ত অধস্তন প্রজা এবং আধিয়ারদের লক্ষ্য করেছেন এবং আধিয়ারেরা দেশের আসল রায়ত বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু কায়েমী রায়তদের আইনগত অধিকার দিলে অর্ধেকেরও বেশী প্রকৃত চাষী অরক্ষিত থেকে যায়। এই আইনের ফলে কায়েমী রায়তেরা অচিরেই আরো নিপীড়ক ছোট জমিদারে পরিণত হবে এবং অধস্তন প্রজাদের ভূমিদাসে পরিণত করবে। আগেই বলা হয়েছে জোতদারেরা জমিদারকে দেয় খাজনার তিনগুণ এই সব কোর্ফা, আধিয়ার, চুকানি প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করছিল।[১৬]

বিদ্রোহের স্বরূপ

বাংলার গ্রামীণ সমাজের কাঠামো সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে ধারণা করা যেতে পারে এবং তবেই পাবনা বিদ্রোহের স্বরূপ নির্ধারণ সহজ হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে কোম কৃষক বিদ্রোহকে অতি সহজেই জমিদার-প্রজার দ্বিমাত্রিক সংঘর্ষ বলা মুশকিল। বিদ্রোহের মূল সূত্র ১৮৭২ এর আইনে আবওয়াব নিষিদ্ধ হলে জমিদারের চলিত খাজনার সঙ্গে ঐ চালু আবওয়াব জুড়ে নতুন খাজনা আদায়ের চেষ্টা এবং সেই কবুলিয়ত মানলে দখলী প্রজার প্রজাস্বত্ব নষ্ট হবার সম্ভাবনা। জোতদার এবং অন্যান্য দখলী বিত্তশালী প্রজা এই নতুন খাজনা দিতে নারাজ। তাই নিয়ে আদালতের মামলা, খোলা মাঠের লড়াই।

জমিদারের প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করা যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে দিনাজপুর, পবানা, রাজশাহী, রংপুরের আবাদী খোদকস্তা চাষীদের সঙ্গে চুক্তি করেন যে তাদের বন কেটে চাষের জমি নিষ্কাশন এবং গ্রামের পত্তন ইত্যাদি ভূমিকার জন্য আবাদ অঞ্চলে খুব নিচু হারে খাজনা নেওয়া হবে। কিন্তু জনবসতি এবং চাষাবাদের প্রসার হওয়ায় গ্রামীণ সম্পদ অনেক বেড়ে গেল। জমিদার এর কিছু ভাগ চাইলেন কিন্তু খাজনা বাড়ানোর উপায় নেই। তাই আবওয়াব বা কিছু উপরি পাওনা আদায় করা হতে থাকল সমস্ত প্রজাদের কাছ থেকে এতে গ্রামীণ সব প্রজাই আক্রান্ত হলেন। শুধু খতিয়ানের রায়ত জোতদার নয়, তাঁর অধীনস্থ প্রজা, কোর্ফা, আধিয়ার ও মাথাপিছু এই উপরি জমিদারকে দিতে বাধ্য হলেন। মুঘল আমলেও খাজনা না বাড়িয়ে আবওয়ার আদায় করে ভূমি বা উৎপাদনের অতিরিক্ত আয়ের ভাগ নেবার রীতি ছিল। জমিদার তাই প্রয়োগ করলেন। ফলে অনেক নীলামদার জমিদার আসল জমাজমীর খবরও রাখতেন না। মাথাপিছু কোন প্রজা কত দেন তা খাজনাই হোক আর আবওয়াবই হোক, তারই আদায় হত। ম্যাকনীল ১৮৭৩ সালে লিখছেন: যদি আবওয়াব দেওয়া হয়, তাহলে জমাজমীতে কারচুপি হবে না। জমিদার-প্রজার মধ্যে এ ব্যাপারে পারস্পরিক বোঝাপড়া আছে। তাই তাঁর মতে, সরকার এই অলিখিত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করলে আপত্তি বাড়বে। দু'পক্ষই আদালতে মামলা চালাবে এবং তা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সংগ্রামের রূপ নেবে। ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে বিপজ্জনক অধ্যায় হবে সেটা। এই বিবাদ এড়াতে হলে অল্পসল্প উপরি আদায় উপেক্ষা করে কেবলমাত্র অতিরিক্ত শোষণ দমন করা যেতে পারে। ম্যাকনীলের ভবিষ্যৎবাণী পাবনা বিদ্রোহের বিস্ফোরণে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। ক্যাম্বেল প্রশাসন তাঁর উপদেশ না শুনে[১৭] ১৮৭২ এর আইন অনুযায়ী

আবওয়াব নিষিদ্ধ করে খাজনার পরগণা হার বলবৎ করতে উদ্যোগী হন। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। সরকারের এই জমিদার বিরোধী বা আপাতঃ প্রজাদরদী নীতি পাবনা বিদ্রোহের প্রধান কারণ ১৮৭২-৭৩ সালের প্রশাসনিক রিপোর্ট পড়লে একে জোতদার দরদী নীতিও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ জোতদারেরা যাদের শোষণ করে স্ফীতি হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রযত্নে ক্যাম্বেল উদাসীন ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নতুন জমিদারদের খাজনা নির্দিষ্ট হারে চিরতরে বেধে দিয়ে অবধি সরকার আয়বৃদ্ধির পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই বন্দোবস্তের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ক্রমশঃ জমিদারদের শ্রীবৃদ্ধি তাঁদের চোখ টাটায়। নানা আইনের অছিলায় জমিদার শ্রেণীকে খর্ব করা হতে থাকে। লাখেরাজ হরণ, নীলকর তোষণ, চৌকিদারীকর আয়কর, বেড়ে শেষ ইত্যাদি খাজনার উপর আবওয়াবের মত চাপান হয়। প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৫৯) থেকে ১৮৭২ এর আবওয়াব লোপের সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত জমিদারের দৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ সুবিধাগুলি নাকচ করার হাতিয়ার মাত্র। পণ্যশস্যের প্রসার থেকে যে বিপুল আয় জোতদারের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হয়েছিল জমিদার তার অংশ দাবী করতে থাকেন। আবওয়াব বাড়তি খাজনা ইত্যাদি সেই ন্যায্য দাবীরই বহিঃপ্রকাশ। লোয়িস ১৮৭৬ এর রিপোর্টে এই দাবী সমর্থন করে নোট পাঠান।[১৮] একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারপুষ্ট বিত্তবান জোতদারের মামলার খরচ চালাবার পক্ষে অনেক জমিদারের চেয়েও সম্পন্ন ছিলেন। সত্তরের দশকে পাবনা, রাজশাহী, ঢাকায় পাটের চাষ করে এঁরা প্রভূত অর্থশালী হয়ে ওঠেন।[১৯] পেশাদার মোক্তার-জোতদার মোর্চার কথা আগেই বলা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের ছোট আদালতে জনৈক জমিদারের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রথম জয়লাভের পর থেকেই এই মোর্চা মামলার পথে এগোতে থাকেন। একদিকে জমিদারেরা বাড়তি খাজনার সমর্থনে মামলা চালাতে থাকেন, অন্যদিকে পক্ষপাতদুষ্ট ক্যাম্বেল সরকারের নিন্দা করে তাঁদের মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়টে ১৮৭৪ সনে বিরাট প্রবন্ধ ছাপেন এবং পরে তা পুস্তকাকারে বিলি করেন।[২০]

জোতদারেরা এবং সম্পন্ন চাষীরা রায়ত সংগঠনের মাধ্যমে চাঁদা তুলে মামলা চালাতে থাকেন। এই মামলার লড়াই পাবনা বিদ্রোহকে স্বাতন্ত্র দিয়েছে। বিদ্রোহের এই দিক অবশ্যই বিপর্যস্ত, অত্যাচারিত চাষীর বাঁচামরার প্রশ্নে আখেরের লড়াই নয়। অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য আইনের প্যাঁচ খেলা। আদালতে প্রথমিক দরখাস্তের খরচই ছিল আট আনা এরপর উকীল, মোক্তার, সাক্ষীসাবুদ, আপীলের খেসারত দরিদ্র

নিপীড়িত, সর্বহারা চাষীর কর্ম নয়। বিদ্রোহী রাজা ঈশান রায় গোপাল-পুরের তালুকদার কয়েকখানা গ্রাম জুড়ে তার প্রতিপত্তি। বিধবাদের সম্পত্তির অভিভাবক। সিরাজগঞ্জের সহকারী শাসক টেলর তাঁকে স্থানীয় 'ধনিক-বনিক' বলে বর্ণনা করেছেন। হুকুমনামা জারী করে ঈশান রায় এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছেন। ব্যানার্জী জমিদারের সঙ্গে ছিটতালুক নিয়ে বিবাদ থেকে প্রতিশোধ স্পৃহায় তিনি এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন। শম্ভুনাথ পাল ব্যানার্জীদের কর্মচারী এবং গ্রামের মোড়ল। কোন কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগঠিত করেছেন। খুদি মোল্লা একজন বর্ধিষ্ণু জোতদার। সালপের সান্যাল জমিদারদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন স্বার্থগত কারণে। জেতাদের সামাজিক সংস্থানও পাবনা বিদ্রোহকে শোষিত মানুষের সংগ্রাম থেকে অন্য বৃত্তে স্থান নির্দেশ করে।[২১]

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাই পাবনা বিদ্রোহকে জমিদারের বিরুদ্ধে বিপর্যস্ত অত্যাচারিত কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম বলতে কুণ্ঠা জাগে। জোতদারের পরস্পর বিরোধী সামাজিক, অর্থনৈতিক ভূমিকা স্পষ্টই ধরা পড়ে। একদিকে সাধারণ চাষী, আধিয়ারদের সঙ্গে একজোট হয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে দাবী আদায়ের জন্য প্রগতিশীল সংগ্রাম চালান। কোর্ফা, আধি-য়ারেরা আবওয়াবের অত্যাচারে আক্রান্ত বলে জমিদার বিরোধী সংগ্রামে গ্রামাঞ্চলে অত্যাচারের পরিচিত প্রতীক জমিদারের বিরুদ্ধে সহজেই সাড়া দেয়। যদিও বাড়তি খাজনা রদের আন্দোলন জমিদারী খাতার রায়তদের, তাদের নয়।

অপরদিকে জোতদার শ্রেণী তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় তাঁদের অধীনস্থ কোর্ফা, 'আধিয়ারদের চূড়ান্ত শোষণ চালিয়ে যান। সেই স্তরে বাড়তি খাজনা জমিদারী খজনার তিনগুণ। পণ্যশস্যের অতিরিক্ত লাভের যৎসামান্যই এই নিম্নকোটির মানুষদের হাতে পৌঁছায়। উপরন্তু মহাজনী তেজারতি কারবারের ফাঁসে লটকে সেই সব বিপন্ন চাষী জোতদারের ভূমিদাসে পরিণত হয়। অথচ এই সব আধিয়ারেরা জোতদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না। এর থেকে মনে হয় যজমানী সম্পর্কের জোরে জোতদার এই আন্দোলনে সামান্য চাষীকে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। এখনও এই নিচুতলার মানুষদের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয় নি।

গ্রামীণ সমাজের কাঠামো এবং ধনসংস্থানের বিচারে ১৮৭৩ এ পৌঁছে জমিদারকে আর একমাত্র শোষক, খল নায়ক বলে সনাক্ত করা যায় না। জমিদার সনাতন নগণ্য খাজনার উপরে রোজগার বাড়াবার জন্য

অলিখিতভাবে আবওয়াব এবং পরে তা রদ হলে, খাজনার সঙ্গে জুড়ে নতুন খাজনা চেয়ে গ্রামের বাড়তি সম্পদ থেকে তাঁর প্রাপ্য দাবী করেছেন এবং এতে যে শোষণের পরিচয় দিয়েছেন, জোতদার তাঁর অধস্তন প্রজাদের ভূস্বামী, মহাজন, ব্যবসায়ী হিসেবে সুদে-আসলে অর্থে ফসলে অনেক বেশী শোষণ করেছেন। ১৮৭৩ এ তা প্রকট। বিশ শতকে এসে পাবনার বিদ্রোহী নেতাদের এ পরিণতি হয় নি। জমিদার যখন বাধা খাজনা, বাঁটোয়ারা, মামলা-মোকাদ্দমায় নিম্নগামী, উত্তরবঙ্গের জোতদার তখন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির তুঙ্গে। তাদের নিপীড়িত প্রজাদের মহান নেতা এবং তাদের আন্দোলনকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিভূ জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রেণী ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রাম বলে গণ্য করলে ইতিহাসের অপলাপ হবে। ব্রিটিশ শাসকদের সবচেয়ে কাঙ্খিত কার্য্যটি জোতদার গ্রামাঞ্চলে করে চলেছিলেন। ছোট চাষীদের অন্ন কেড়ে পণ্যশস্য নিষ্কাশন করে ব্রিটিশ শাসক তথা বণিকদের যোগান দিয়ে দস্তুরী থেকে দস্তুরমত আয়ের ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছিলেন। এই পছন্দসই ভূমিকা পালন করার জন্যই জোতদার শাসককুলের নয়নের নীলমণি হয়ে ওঠেন। পক্ষান্তরে জমিদার অবহেলিত হন। ১৮৫৯ এবং ১৮৭২ এর আইন এবং পাবনা বিদ্রোহে সরকারের মনোভাব এ কথাই প্রমাণ করে। গ্রামীণ সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির টানাটানিতে জোতদারের কাছে জমিদারের আত্ম-সমর্পণের একটি প্রক্রিয়া প্রথমোক্তদের একটি নির্দিষ্ট হারে পাটানীর মত চিরতরে জোত মৌরসী পাট্টা দিয়ে দেওয়া। ১৮৮৪-৮৫ তে এরকম ৬৯৩২৩টি জমা দেওয়া হয় যার অর্থমূল্য ১৫৪৩৪২৫ টাকা। ১৮৭৩-৭৪ এ শুধু পাবনার জমিদারেরা ৬২৭টি পাট্টা দেন, ১৮৭৬-৭৭ এ দেন ১৬৩৩টি।[২২]

পাবনা বিদ্রোহের একটি বিশিষ্ট দিক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর বিদ্রোহী প্রজাদের স্বপক্ষে লেখনীধারন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বেঙ্গল ম্যাগাজিন পত্রিকায় রমেশ চন্দ্র দত্তর পাবনা বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন। বিশেষ করে জমিদারী মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়টের জবাবে যেন এই মসীযুদ্ধ। তিনি লেখেন, সমস্ত পত্র পত্রিকা এক তরফা পাবনার প্রজাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। পলাতক জমিদারেরা কলকাতায় ভীড় করেছেন এবং তাঁদের পরিচালিত পত্রিকায় প্রজাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন। যে হিংসাত্মক ঘটনার নিন্দা করা হয়েছে পাবনার বিদ্রোহের মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তা অনিবার্য। ব্রিটিশ শাসনের সুফল, সভ্য জীবন যাপনের সুযোগ সামান্য চাষীর ঘটে নি। জমি ও ফসল তার একমাত্র অবলম্বন। তাতে ভাগ বসালে তার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব নয়।[২৩] শুধু রমেশ

দত্ত নন, অনেক চাকুরীজীবী ভদ্রলোক, জেলার আইনজীবীরা প্রজাস্বত্ব আইনের ভরসায় জোতজমিতে তাঁদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করেন। এঁরা সহজেই জোতদারের স্বার্থে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করেন। আন্দোলনে সহায়তা করেন এবং পত্রপত্রিকায় প্রজাদরদী প্রবন্ধ লেখেন। বাগল লিখেছেন, ১৮৮৪-৮৫তে এঁদের গড়া ভারতসভা (ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন) জেলায় জেলায় রায়ত সমিতি গড়ে তোলেন। পাবনা বিদ্রোহের সময় থেকেই এর শুরু। ১৮৮১তে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ভারতসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় দূর গ্রামাঞ্চল থেকে চাষীরা যোগ দিতে আসেন।[২৪]

মনে রাখতে হবে ১৮৮৫তে দ্বিতীয় দফায় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হবার পর রমেশ চন্দ্র ক্রমশঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বড় সমর্থক হয়ে ওঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাম্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধ প্রত্যাহারের স্বপক্ষে লেখেন যে এই আইনের পরে ঐ রচনা কালাতিক্রান্ত হয়ে গেছে। যদিও '১৮৮৪'র আইনেও কোর্ফা, আধিয়ার ইত্যাদি নিম্নবর্গের প্রজাদের কোন অধিকারই দেওয়া হয় নি।[২৫]

তবু পাবনা বিদ্রোহে এই নিম্নবর্গের প্রজাদের অংশ গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এমনকি জোতদারী পরিচালিত হলেও তাদের সংগ্রামী সংগঠন, ধর্মঘট এবং চাঁদা তুলে মামলা চালান ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলন অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য।

ভদ্রলোক পরিচালিত রায়ত সভায় এই নিম্নবর্গের রায়তদের যোগদান এবং সাময়িক মোর্চাও স্মরণীয়। এই ধারা বেয়েই পরবর্তীকালে কিষাণ সভা গঠিত হয়। পাবনা বিদ্রোহের চাপেই প্রজাস্বত্ব আইন বারবার পরিশোধিত হয়। ১৮৭৯ এ ব্যাপারে যে কমিশন (রেণ্ট ল কমিশন) বসে এবং যার অনুমোদনে ১৮৮৫'র আইন প্রণীত হয়, তা এই বিদ্রোহেরই অবদান। ১৮২৮ এর আইন, ১৯৪০ এর ফ্লাউড কমিশন এবং ১৯৪৬ এর তেভাগার আন্দোলন এরই জের এর চূড়ান্ত পরিণতি।

তথ্য নির্দেশ

১. কল্যাণ সেনগুপ্ত, "পাবনা ডিস্টার্বেন্সেস এ্যাণ্ড দি পলিটিক্স অফ রেণ্ট", দিল্লী, ১৯৭৪ ; প্রবন্ধ : বিনয়ভূষণ চৌধুরী, 'পেজেণ্ট মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল (১৮৫০-১৯০০)' "নাইন্টিনথ সেঞ্চুরী স্টাডিজ", ১৯৭৩, ১ম খণ্ড ; সুপ্রকাশ রায়, "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম", কলকাতা, ১৯ .৬, দ্রঃ সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ, সুণীল সেন, "পেজেণ্ট স্ট্রাগল ইন পাবনা", নিউ এজ ২য় খণ্ড, ১৯৫০ এবং "এ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশন্স্ ইন ইণ্ডিয়া", নিউ দিল্লী,

১৯৭৯, পৃঃ ১৬৬-৭২ ; চিত্তব্রত পালিত, "পার্সপেক্টিভস্ অন এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল", কলকাতা, ১৯৮২ পৃঃ ৩৭-৪৫।

২. ডব্লু, ডব্লু, হান্টার, "স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল" : পাবনা ১৯৭৬, পৃঃ ১১৫-২৫ ; "বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট", (১৮৭২-৭৩), কলকাতা. ১৮৭৪, পৃঃ ২১-৩০।

৩. কল্যাণ সেনগুপ্ত, পাবনা ডিস্টার্বেন্সেস্, পৃঃ ৩০-৫০ এবং 'পেসেন্ট স্ট্রাগল ইন্ পাবনা, ১৮৭৩, ইট্স লিগ্যালিস্টিক ক্যারেক্টার' "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী স্টাডিজ", ৯ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা, ১৯৭৩।

৪. চিত্তব্রত পালিত, "পার্সপেক্টিভস্", পৃঃ ২৮-৩৩।

৫. কল্যাণ সেনগুপ্ত, "নাইন্টিন্থ্ সেঞ্চুরী স্টাডিজ", ১ খণ্ড ৩য় সংখ্যা।

৬. বিনয়ভূষণ চৌধুরী তদেব।

৭. ললিত মোহন রায়, "ডিগ্রেডেশন অফ বেঙ্গল জমিদারস্", কলকাতা ১৮৯৩ ; কেদারনাথ দাস, "জমিদার শ্রেণীর প্রতি পরামর্শ", কলকাতা, সন দেওয়া নেই।

৮. ডি, জে, ম্যাকনীল, "মেমোর‍্যাণ্ডাম অন্ দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন বেঙ্গল", কলকাতা, ১৮৭৩, পৃঃ ১৬ পালিত, পার্সপেক্টিভস্ পৃঃ ৩৯।

৯. "বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট", ১৮৭৪-৭৫, কলকাতা, ১৮৭৫ পৃঃ ৮১২।

১০. পালিত, "পার্সপেক্টিভস্" পৃঃ ৪০।

১১. পালিত, "টেনশনস্ ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি", কলকাতা, ১৯৭৩ পৃঃ ১৯১।

১২. তদেব।

১৩. পালিত, "পার্সপেক্টিভস্" পৃঃ ৪৩।

১৪. ডি, জে, ম্যাকনীল, "মেমোর‍্যাণ্ডাম", পৃঃ ১৬।

১৫. পালিত, "পার্সপেক্টিভস্", এ উদ্ধৃত পৃঃ ৪১।

১৬. তদেব।

১৭. ম্যাকনীল, "মেমোর‍্যাণ্ডাম", পৃঃ ৪২-৪৪।

১৮. পালিত, "পার্সপেক্টিভস্", পৃঃ ৪২।

১৯. "হিন্দু পেট্রিয়ট", ২০ জুলাই ১৮৮৪।

২০. "এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ স্যার জর্জ ক্যাম্বেল", কলকাতা, ১৮৭৪।

২১. পালিত, "পার্সপেক্টিভস্", পৃঃ ৪৩ ; পাবনা বিদ্রোহ সংক্রান্ত গোপনীয় কাগজ-পত্র রাজশাহীর কালেক্টর টেলরের বিবৃতি থেকে উধৃত।

২২. কল্যাণ সেনগুপ্ত, "পাবনা ডিস্টার্বেন্সেস" পৃঃ ৮৮ ; পালিত, "পার্সপেক্টিভস্", পৃঃ ৫০ সারণী।

২৩. রমেশচন্দ্র দত্ত (আরসিডি), 'অ্যান এ্যাপলজি ফর দি পাবনা রায়টার্স' "বেঙ্গল ম্যাগাজিন", সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩।

২৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, "হিস্ট্রী অফ দি ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন", কলকাতা, ১৯৫৩, পৃঃ ২৯, ৫৩।

২৫. রত্নশ্রী সেন, ''ল্যাণ্ডেড মিডল ক্লাস এ্যাণ্ড দেয়ার পলিটিক্স ইন বেঙ্গল'', ১৮৫৯-৮৫। রেন্ট কোয়েশ্চেন অধ্যায় (অপ্রকাশিত থিসীস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)।

মুনতাসীর মামুন

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (১৯০০-১৯১৮)

'সন্ত্রাস' এমন একটি শব্দ যে শব্দের সর্বজন গ্রাহ্য কোন অর্থ নেই। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় শব্দটি পরিচিত হয়ে উঠেছিল ব্যাপকভাবে এবং সে থেকে এর সংজ্ঞা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক যার অবসান হয়নি এখনও, বরং সৃষ্টি হয়েছে জটিলতার।

সাধারণ ভাবে, নিছক সন্ত্রাস বলতে বোঝায় কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর শারিরীক হামলা যা অন্তিমে ঘটায় তার মৃত্যু।[১] আসলে সন্ত্রাস কে কি ভাবে ব্যবহার করছে তার ওপর নির্ভর করে সন্ত্রাসের চরিত্র। এ পরিপ্রেক্ষিতে উইলকিনসন সন্ত্রাসকে কয়েকভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, 'ক্রিমিন্যাল টেররিজম'। এ সন্ত্রাস ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিগত স্বার্থে যা কোন-ভাবে সমর্থনযোগ্য নয়, আছে 'রিলিজও-ম্যাজিকাল টেররিজম', যার মাধ্যমে ওঝা, গুণীন, মনস্তাত্বিক ভয়ের সৃষ্টি করে। আমরা আমাদের আলোচনায় এ ধরনের 'সন্ত্রাস'কে বাইরে রাখবো। আমরা সে ধরনের সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা করবো যা উইলকিনসনের ভাষায় 'পলিটিক্যাল টেরিজম' বা রাজনৈতিক সন্ত্রাস।[২]

কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে সন্ত্রাস ব্যবহার নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। যেমন, র‍্যাডিকালরা মনে করেন, এমন কার্যকলাপ যার সঙ্গে সন্ত্রাসের 'কনভেনশনাল ইমেজ' এর কোন মিল নেই, কিন্তু যার কারণে সৃষ্টি হতে পারে যাতনার, হতে পারে মৃত্যু, তাও সন্ত্রাস, যেমন, দারিদ্রও সন্ত্রাস। কিন্তু এধরনের সংজ্ঞা সন্ত্রাসকে নির্বস্তুক পর্যায়ে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী সমাজে সন্ত্রাস সম্পর্কে ধারণা খানিকটা রক্ষণশীল যা আবার জনপ্রিয় কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা সন্ত্রাসকে পূর্ণসংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন এ ভাবে—'So that it both *excludes* legalized violence yet *includes* many forms of non-legal or non-authorized action which are quite potently non-violent...'[৩]

অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে যোগ আছে

বিপ্লবের। কারণ বিপ্লবের কোন না কোন পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় সন্ত্রাস, কিন্তু বিপ্লব তখনই সম্পন্ন হয়েছে যখন সন্ত্রাস সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করতে পারে সরকারের রূপ. সৃষ্টি করতে পারে নতুন 'বডি-পলিটিক', পরিবর্তন যেখানে সূচনা করে নতুন যুগ এবং নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্য হয় স্বাধীনতা।[৪]

উইলকিনসন রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সামগ্রিক ভাবে, বিশ্বের বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির কার্যাবলী পর্যালোচনা করে তিনি এ বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পেয়েছেন, বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. এ ধরনের সন্ত্রাস ব্যবহার করে একটি গ্রুপ; হতে পারে সে গ্রুপ খুব ক্ষুদ্র। ব্যক্তিগত কারণে ব্যবহৃত হয় না সন্ত্রাস
২. থাকে এ গ্রুপের একটি বিপ্লবী আদর্শ বা কর্মসূচী যা সন্ত্রাসের যৌক্তিক ভিত নির্মাণ করে
৩. নেতৃত্ব যা জনগণকে সন্ত্রাসের প্রতি 'মবিলাইজ' করতে সক্ষম
৪. বিপ্লবী সন্ত্রাস বিকল্প প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী করে
৫. এ আন্দোলনের প্রধান গুণ হচ্ছে অস্ত্র সংগ্রহ, সে অস্ত্র যত সনাতন পদ্ধতিরই হোক না কেন এবং
৬. পরিকল্পনা এদের সব সময়ই গোপন থাকে।[৫]

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে বাংলার সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন বা গুপ্ত সমিতিগুলির অমিল নেই। কম বেশী এ বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলাদেশের সব গুপ্ত সমিতিগুলির বা যাঁরা এ দর্শনে বিশ্বাসী তাঁদের ছিল।

ফাননের তত্ত্ব

সন্ত্রাসের পথ কেন বেছে নেওয়া হয় ? এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আছে। তবে, আমরা এ পরিপ্রেক্ষিতে ফাননের তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করবো। কারণ, ফানন তাঁর তত্ত্বে গ্রামাঞ্চল ও সন্ত্রাসে কৃষকদের ভূমিকার ওপর অধিক গুরুত্ব অরোপ করেছেন। আর কৃষকের সংখ্যাধিক্য তৃতীয় বিশ্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সন্ত্রাসের অন্যসব তত্ত্ব (যেমন সার্ত্র, আরণ, আরেনডাথ) নির্মাণ করা হয়েছে ইউরোপীয় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, একটি উপনিবেশে (যথানে কৃষকের সংখ্যাই বেশী) বসবাসের অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না যা ছিল ফাননের। ফাননের জন্ম যদিও মার্টিনিকে কিন্তু তিনি বসবাস করেছেন আলজিরিয়ায় যা তখন ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। স্বাধীনতার জন্য আলজিরিয়া যখন বিদ্রোহ করেছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তখন ফানন নির্মাণ করেছিলেন এ তত্ত্ব। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, ফাননের তত্ত্বই সন্ত্রাসকে দিয়েছে ব্যাপক ও গভীরতর অর্থ যার ফলে

সন্ত্রাস হয়ে উঠেছে মুক্তি অর্জনের মাধ্যম। বাংলাদেশের (বা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বোঝার জন্য এ তত্ত্ব আমাদের সাহায্য করবে।

ফাননের তত্ত্বের পটভূমি ঔপনিবেশিক শাসন। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি শক্তি ও বিজয় যার মূল হচ্ছে সন্ত্রাস (প্রায় একই ধরনের কথা বলেছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়)। ঔপনিবেশিকবাদ হল সন্ত্রাস—রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক। প্রতি-সন্ত্রাসই শুধুমাত্র রোধ করতে পারে ঔপনিবেশিক সন্ত্রাসকে। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যক্তি মাত্রকেই হীনমন্য ও অধস্তন করে তোলে। সন্ত্রাসই ব্যক্তিকে শুদ্ধকরে হীনমন্যতা ও অধস্তনতা থেকে। সে জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম মাধ্যম সন্ত্রাস; ব্যক্তি শুদ্ধ. সমাজ মর্যাদাদীপ্ত হলে স্বাধীনতা যথার্থ হয়।

ফাননের মতে, তৃতীয় বিশ্বে সাচ্চা বিপ্লবী শ্রেণী হচ্ছে কৃষকরা যারা বসবাস করে চরম দারিদ্রের মধ্যে কিন্তু জাতীয় স্বার্থ, নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বস্ততা যাদের সবসময় অটুট। রক্ষী বাহিনী যে শহুরে সন্ত্রাসবাদীদের পিছে হানা দিয়ে ফিরছে সে সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয় এই কৃষকরা এবং তৈরী থাকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিজেদের জমি ও সম্মান পুনরুদ্ধারে। তাঁর মতে, 'প্রয়োজন' (need) ও 'অভাব' (scarcity) হচ্ছে ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে সন্ত্রাসের মূল কারণ।

জাতীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস 'সম্প্রদায়'কে ঐক্যবদ্ধ করে এবং 'ট্রাইবালিজম' ও 'আঞ্চলিকতা'কে প্রতিহত করে। অস্ত্রের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক বসতি-কারীকে উৎখাত করে দেশীয়রা ঔপনিবেশিক নিউরোসিস থেকে মুক্তি পায়। একজন ইউরোপীয়কে হত্যা (বসতি স্থাপনকারী) মানে এক ঢিলে দু'টি পাখী মারা—'to destroy an oppressor and the man he oppresses at the same time.'

ব্যক্তিগত পর্যায়ে সন্ত্রাস এক শুদ্ধিকরণ শক্তি, সন্ত্রাস একজন দেশীয়কে তার কর্মহীনতা, হীনমণ্যতা ও হতাশা থেকে মুক্তি দেয়।[৬]

সন্ত্রাসের এই যৌক্তিক ভিত্তি প্রদানের পর ফানন তার সংগঠনিক রূপের কথা তুলেছেন। কারণ ঐ সাংগঠনিক রূপে সন্ত্রাসকে নিতে না পারলে সেই সন্ত্রাসের পরিণত হওয়ার আশংকা থাকে নিছক সন্ত্রাসে এবং তা জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পর্যবসিত হতে পারে অসাফল্যে। এ ক্ষেত্রে তাঁর কিছুটা মিল আছে আরো দু'জন বিপ্লবী চেগুয়েভারা ও দেব্রের সঙ্গে।

ফানন বলেছেন, 'স্বতস্ফূর্ত' বিদ্রোহ'কে সঙ্গে সঙ্গে 'replace'

করতে হবে 'systematic' সংগঠনও কৌশল দ্বারা। সন্ত্রাস যাদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে সেই বিচ্ছিন্ন গেরিলা ইউনিটগুলিকে অন্তিমে পরিণত করতে হবে জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে। এই বাহিনী নিয়ন্ত্রিত হবে কেন্দ্রীয় কৌশল দ্বারা। চে গুয়েভারা মনে করেন, শুধু সন্ত্রাস বিপ্লবী কার্য-ক্রমকে ক্ষতি করতে পারে; সে জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি 'অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ',[৭] বা 'স্যাবোটাজ'-এর ওপর যা পরিচালনা করবে গেরিলারা। দেব্রে, ফাননের মতই মনে করেন, শহরে সন্ত্রাস থেকে গ্রামাঞ্চলে গেরিলাদের কার্যকলাপ বেশী কার্যকর কারণ তা শত্রুর বিশাল সেনাবাহিনীকে স্থবির করে দেয়।[৮]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, ফাননের তত্ত্বই সন্ত্রাসকে ব্যাপক ও গভীরতর অর্থ দিয়েছে যার ফলে সন্ত্রাস পরিণত হয়েছে মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে। এ সন্ত্রাসের ভিত্তি সে জন্য একটি মতাদর্শ ও সংগঠন।

আলজিরিয়া ও তৎকালীন বাংলার সমাজ গঠন

আলজিরিয়া ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ, আর ফরাসীরা ঔপনিবেশিক নীতি হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করেছিল আলজিরিয়ার সভ্যকরণ (civilizing mission)। উনিশ এবং বিশ শতকে এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় শক্তিসমূহের মত অঞ্চল, কাঁচামাল এবং বাজার দখলই নয়, সরবোনের বাণী প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মীদের 'ধর্মান্তরিত করণ'। আবার তারা এও চাইতেন যে, ফ্রান্সের মহত্ত্ব শুধু এর উপনিবেশের বিস্তৃতির দ্বারাই নিরূপিত হবে না, হবে উপনিবেশের আনুগত্যেও।[৯]

ফরাসী শাসনের প্রথম সত্তর বছর চিহ্নিত সামরিক বিজয় এবং প্রাক ১৮৩০ মুসলিম সমাজের প্রায় ধ্বংস সাধন। এ সময় পুরনো তুর্কী শাসক এলিট ও শহুরে আরব মধ্যশ্রেণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাদের জায়গা দখল করে নিল ক্রমে 'কোলন'রা। ধর্মীয় এবং অন্যান্য জমির বাজেয়াপ্তকরণ 'disrupt' করল গ্রামীণ জনসাধারণকে। সাধারণ আলজিরিয়রা একেবারে হয়ে গেল নীরব। সরব হয়ে উঠলো 'কলোন'রা।

'কলোন'রা ছিল—

'a mixture of adventurers, speculators, poor mediterranean peasants and labour, political exiles.'[১০] এদের অধিকাংশ ছিল শ্বেতাঙ্গ এবং স্বাভাবিক ভাবেই ঔপনিবেশিক শক্তির মিত্র। এরা ঘৃণা করতো আদিম

আরবদের এবং ভীত থাকতো এ ভেবে যে তাদের মাঝে তারা হারিয়েযাবে। এরা, 'generous ferment of a a disinterested culture' এর চেয়ে আগ্রহী ছিল বেশী জাতিদ্বেষে। 'কলোন'রা প্রথমে নিজেদের মুক্ত করেছিল ফরাসী সামরিক এলিট এবং পরে সুদূর প্যারিসের রাজনীতিবিদদের তৈরী আইনের নিয়ন্ত্রণ থেকে। ১৯০০-এর মধ্যে এরা হয়ে উঠলো নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। নিজেদের তারা আলজিরিয় বলে ভাবতো না, আলজিরিয়দেরও স্বীকার করতো না।[১১]

এ প্রসঙ্গে ১৮৯২ সালে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জুল ফেরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য যিনি নিজেও ছিলেন আলজিরিয়ার খামার মালিক—

'It is hard to make the European *colon* understand that other rights exist besides his own, in an Arab country and that the native is not a race to be enslaved and indentured at his whim.'[১২]

ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার গ্রামাঞ্চলে প্রতিরোধ চলেছিল ১৮৩০-৭১ পর্যন্ত। এ সময় আবার উঠতি আলজিরিয় মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ব্যাহত হল এবং ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে তারা দেশ ত্যাগ করেছড়িয়ে পড়েছিল মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে। ১৮৭০ এর পর Kabylia বিদ্রোহের পর শেষ হয়ে গেল গ্রামাঞ্চলের প্রতিরোধ এবং শুরু হল শহুরে জনগণের শান্তিপূর্ণ উপায়ে শাসকের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা। এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক এলিটরা 'still remain fused'। তাই ফরাসীদের বিরুদ্ধাচরণ প্রায় ক্ষেত্রেই পর্যবসিত হতো ধর্মীয় রূপে। এরি মধ্যে 'কলোন'রা মোট্রোপলিটন থেকে নিজেদের অনেকটা বিযুক্ত করতে পেরেছিল। ফলে, তারপর দ্বন্দ্বটা শুরু হয়েছিল আলজিরীয় মুসলমানদের মর্যাদা নিয়ে যেখানে তারা সম অধিকারী ছিল না।[১৩]

১৯৪৭ সালে এক অধ্যাদেশে ফরাসীরা আলজিরিয়দের 'কলোন'দের মত সমমর্যাদা দিলেও বাস্তবে কিন্তু তা ছিল না। তখনও আলজিরিয়দের কাছে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভিত্তির মূলে ছিল অসাম্য—সংস্কৃতি, ভাষা, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে জীবনের সব বিষয়ে। এর পিছে ছিল ফরাসী সামরিক শক্তি। এ কারণে দেখি আলজিরিয়রা ছিল colonial stereoytype অশিক্ষিত, উচ্চাশাহীন, বেকার, দরিদ্র, মনস্তাত্ত্বিক ভাবে শত্রু ভাবাপন্ন। আলজিরিয় ব্যক্তিত্বের দমন ক্রমান্বয়ে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল শিক্ষিত আলজিরিয়দের যাদের ফরাসীরাও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেনি। একই সঙ্গে এলিটরা নিজেদের আবিষ্কার করেছিল গ্রাম থেকে অনেক দূরে। সংস্কৃতিগত ভাবে তারা—

'torn between an awakening Arab Muslim World and the west, and often possessed a resultant inferiority conplex.'[১৪] সুতরাং তার প্রতিবাদ ছিল বিদ্যমান সমাজে তার মর্যাদার বিরুদ্ধে। সুতরাং 'ভায়োলেন্ট' হওয়াই ছিল তার জন্য স্বাভাবিক। রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল সে হতাশা কারণ রাজনৈতিক প্রতিকারের মাধ্যমগুলি ছিল তার অচেনা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে ছিল বেঁচে থাকার পর্যায়ে, অনেক ক্ষেত্রে তারও নীচে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য তার হাতে ছিল না অর্থনৈতিক উপায় বা অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তি। তাই **'every Algerian was in this context a latent rebel.'**[১৫]

তবে আলজিরিয়দের কৃতিত্ব এই যে, সন্ত্রাসকে তারা সাংগঠনিক রূপ দিয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে পেরেছিল, মুক্তির মাধ্যম হিসেবে সন্ত্রাসকে পরিচিত করে তুলেছিল সাধারণ আলজিরিয়দের মাঝে। গ্রামাঞ্চলকে যুক্ত করতে পেরেছিল তারা শহরের সঙ্গে যে কারণে তাদের বিপ্লব সফল হতে পেরেছিল।

আলজিরিয়ার এই সমাজ কাঠামোর সঙ্গে বাংলার মিল ছিল খানিকটা উনিশ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে। ইংরেজরাও ফরাসীদের মত, সামরিক শক্তির মাধ্যমে করায়ত্ত করেছিল বাংলা। দখল করেছিল কাঁচামাল ও বাজার। ইংল্যান্ড থেকে মিশনারীরা এসেছিল 'হিদেন'দের সভ্য করতে আর হেইলিবারি কলেজের আমলারা এসেছিল প্রশাসন গড়তে।

বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রথম বছরগুলি চিহ্নিত ছিল সামরিক বিজয়, মোগল আমলে গড়ে ওঠা আমলাতন্ত্র, ভূমি রাজস্ব প্রথা, অভিজাত ও ফার্সী শিক্ষিত এলিটদের বিলুপ্তি। বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পরবর্তীকালের ভূমি সংক্রান্ত নতুন আইন কানুন সমাজে হেনেছিল গভীর প্রতিক্রিয়া। এই ভূমি ব্যবস্থার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল রাজস্ব ভোগী মধ্য শ্রেণীর যারা ছিল ইংরেজ শাসকদের সহযোগী ও অনুগত।

ঔপনিবেশিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে ছিল ইংরেজ শাসক ও শ্বেতাঙ্গরা। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ছিল নীলকর ও অন্যান্য পেশার লোকেরা যাদের আলজিরিয় কলোনদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এরপর ছিল রাজস্ব-ভোগী, মধ্যশ্রেণী এবং সবশেষে সাধারণ মানুষ বা কৃষকরা।

কিন্তু বাংলায় সম্প্রদায়গত একটি সমস্যা ছিল যা জটিল করে তুলেছিল সবকিছু। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ইংরেজদের পর সম্প্রদায় হিসেবে স্থান ছিল হিন্দুদের এবং সবশেষে মুসলমানদের। রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বা রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা থেকে সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা ছিল অনেক দূরে এবং এর অধিকাংশই ছিল কৃষক। ফলে সম্প্রদায়গত ভাবে হিন্দুদের থেকে

এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিক থেকে মুসলমানদের দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল যা পরবর্তীকালে সব রাজনৈতিক আন্দোলনে সৃষ্টি করেছিল সংকট। অন্যদিকে আবার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও রাজস্বভোগীদের স্বার্থ ছিল কৃষক বিরোধী।

উনিশ শতকের শেষের দিকে রাজনীতির শুরু এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা ছিল শাসনতান্ত্রিক [constitutional] রাজনীতি। ইংরেজ আইনের প্রতি ছিল বাঙ্গালীর অবিচল ভক্তি যদিও অনেক ক্ষেত্রে তাতে সাম্য ছিল না। যেমন, গুরুতর অপরাধের জন্য কোন শ্বেতাঙ্গের গুরুদণ্ড হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ইলবার্ট আইনের ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিক্রিয়া এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে জাতীয়তাবোধেরও বিকাশ হচ্ছিল যা আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে, রাজনৈতিক আন্দোলনে সৃষ্ট দুর্বলতাও এই সময় হয়ে উঠেছিল প্রকট। এ ছাড়া, উল্লেখ্য যে, আলজিরিয়ায় ফরাসীদের সহযোগী ছিল শুধু 'কলোন'রা কিন্তু বাংলায় ইংরেজ শাসনের সহযোগী ছিল রাজস্ব ভোগী ও মধ্যশ্রেণী। এই রাজস্বভোগী মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। শ্বেতাঙ্গরাতো ছিলই। সে কারণে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে শুধু সাধারণ মানুষ থেকেই নয়, মধ্যশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রয়াস হিসাবে চিহ্নত করে সরকারের পক্ষে দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

উনিশ ও বিশ শতকে, গ্রামাঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হয়েছে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ এর প্রমাণ। কিন্তু সব সরকার ও সরকার সমর্থকদের দ্বারা দমিত হয়েছিল।

বিশ শতকেও শহরবাসী চাকুরিজীবীর সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু গ্রাম থেকে এলিটদের বিচ্ছিন্নতারও শুরু তখন থেকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শহুরে মধ্যশ্রেণীর এলিট তখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে শাসকের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছিল, পরবর্তীকালে গান্ধী ও তার অহিংস আন্দোলনেও যা লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন, শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির ব্যর্থতা, শ্বেতাঙ্গ শাসকের নিপীড়ণ ও অপমান ক্রমেই ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল মধ্যশ্রেণী ভুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু যুবকদের। এর ফলশ্রুতি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

তৎকালীন বাংলায় সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি

ক. পটভূমি, বৈদেশিক প্রভাব ও তাৎক্ষনিক কারণ

সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন এবং এ কারণে ভারতের গুপ্ত সমিতির আয়োজন প্রথম শুরু হয়েছিল পুণাতে। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক ১৮৯৭ সালে ইংরেজ হত্যার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এ কাজ। এক্ষেত্রে নাসিকের সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়ের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গভঙ্গের পর এ ঢেউ এসে লেগেছিল বাংলায়।

বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি-- শুরু থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায় এবং ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন পর্যন্ত। জি, অধিকারীর মতে, ১৯১৬ পর্যন্ত বা প্রথম পর্যায়ে জাতীয় বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা ছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ।[১৬] তবে মনে হয়, উনিশ শতকের শেষার্ধে উজ্জীবিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিবাদী প্রবক্তরা বেশী অনুপ্রাণিত করেছিলেন যুবকদের। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বঙ্কিম, তিলক, অরবিন্দ যাঁরা 'নতুন জেনারেশনের' কাছে একটি বাণীই তুলে ধরেছিলেন—তা হল 'ধর্মযুদ্ধ',[১৭] বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।[১৮] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং পরে প্রধান হয়ে উঠেছিল গীতার দর্শন।

বাংলায় এ পটভূমির সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ভাবে আরো কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিতে। এর প্রথমটি হলো কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি মোহভঙ্গ। এই মোহভঙ্গ আরো বেদনাদায়ক করে তুলেছিল বঙ্গভঙ্গ। এ ছাড়া ছিল, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি। বঙ্গভঙ্গের দরুণ মুসলমানরা চাকুরি ক্ষেত্রে বেশী সুবিধা পাবে—এ ভয়ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ, এমন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যা ছিল গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার অনুকূলে। ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল, বরিশাল শহরে অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন পুলিশ ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং চালিয়েছিল প্রচন্ড নিপীড়ন। পুলিশ গ্রেফতার করেছিল সুরেন্দ্রনাথকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নাকি বলেছিলেন উল্লাসকর দত্ত, 'বরিশাল কনফারেন্স পুলিশের অকথ্য অত্যাচার থেকেই আমাদের বিপ্লব সাধনা'।[১৯]

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপোষকামী নীতি কি ভাবে তরুণদের হতাশ করে তুলেছিল সে সম্পর্কে লিখেছেন ত্রৈলোক্যনাথ—'...সে সময় আমরা

প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দিতাম না। কারণ, যেখানে স্বাধীনতার কথা উঠিবে না, শুধু আবেদন নিবেদনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইবে সেখানে যাওয়া আমরা বৃথা সময় নষ্ট মনে করিতাম।'[২০]

সমসাময়িক ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু ঘটণাবলীও আকৃষ্ট করেছিল তরুণদের। ফরাসী বিপ্লব ও আইরিশদের স্বাধনীতা যুদ্ধের প্রচেষ্টা প্রভাবিত করেছিল যুবকদের। অনুপ্রাণিত করেছিল ইতালীর ঐক্য প্রচেষ্টায় মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা, ভারতীয় ঐতিহাসিক চরিত্র বা মীথ, স্বদেশ কি ভাবে লাঞ্ছিত, শোষিত হয়েছে তার বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা। রুশ-জাপান যুদ্ধে, জাপানের মত ক্ষুদ্র একটি দেশ যখন রাশিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল তখন যুবকেরাও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। এ যুদ্ধকে ভারতীয় যুবকরা দেখেছিলেন হীনবল এশিয়াবাসী কর্তৃক, প্রাধান্য বিস্তারকারী ইউরোপ বা শ্বেতাঙ্গ প্রভু শক্তির পরাজয় হিসেবে। শ্রীশচন্দ্র নামে একজন বিপ্লবী বলেছিলেন, জাপানের বিজয়ের 'দোলা আমার রক্তে ও লাগল। আমরা গুপ্ত সমিতি গড়ায় মন দিলাম।'[২১]

বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা যায় কিনা তা দেখার জন্য, অরবিন্দ ১৯০২ সালে তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়। যতীন্দ্রনাথও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। হয়ত ইউরোপীয় গুপ্ত সমিতিগুলির কার্যকলাপ আকৃষ্ট করেছিল অরবিন্দকে। বারীন্দ্র কলকাতায় এসে আলাপ শুরু করেছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে। কিন্তু পরের বছর ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন বরোদায়। তবে এর আগে (যদিও সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন উদ্দেশ্য ছিল না) ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ১৮৯৭ সালে স্থাপন করেছিলেন 'অনুশীলন সমিতি' যেখানে ১৯০৪ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বারীন্দ্র ও যতীন্দ্রকে। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন চলাকালে আবার তাঁরা ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। শুরু করেছিলেন প্রচার কাজ, অনুসারীও পেয়েছিলেন কিছু।[২২] প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকা যার বিশেষ ভূমিকা সবার অবিদিত।

বারীন্দ্র ও তাঁর অনুসারীদের নেতৃত্বে অচিরেই 'অনুশীলন সমিতি' হয়ে উঠেছিল একটি শক্তিশালী সংগঠন। বিভিন্ন অঞ্চলে সে সময় স্থাপিত হয়েছিল আরো কিছু সমিতি। ১৯০৮ পর্যন্ত এ ধরনের সমিতিগুলি প্রকাশ্যে সভ্যদের দৈহিক ও নৈতিক ট্রেনিং প্রদান করত। স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করা, সমাজ সেবা, স্কুল, কারা সমিতি গঠন ছিল উদ্দেশ্য।[২৩] এরপর ক্রমে সমিতির কাজ বিভক্ত করা হয়েছিল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'ভাগে। গুপ্ত সমিতির কাজ ছিল অপ্রকাশ্য। ত্রৈলোক্য নাথের মতে,

স্থানে স্থানে পাঠশালার পাশাপাশি পাঠাগার ও 'আশ্রম' স্থাপন করিয়াছি। ঐ আশ্রম আর স্কুল ছিল আমাদের এক একটি কেন্দ্র।'[২৪]

বাংলায় গুপ্ত সমিতি ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বিশেষ ভাবে ইন্ধন যুগিয়ে ছিল দু'টি পত্রিকা—'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর'। পত্রিকা দু'টি কি ভাবে উদ্দীপ্ত করত যুবকদের তার দু' একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—'অত্যাচার সহ্য করা সমস্ত জাতির অপমানের নামান্তর। প্রতিহিংসা সকল সময়েই পাপ নয়; জীবন সংগ্রামে এর যথেষ্ট মূল্য আছে।...অপমানের প্রতিশোধ নেবার কথা এখন ভাবতে হবে। আর ফিরিঙ্গীদের কাছে দরবার না করে প্রতিবিধানের জন্য গোপনে যে প্রস্তুতি হচ্ছে এটাই বর্তমানের প্রধান লাভ।'[২৫] বা—
'প্রত্যেক গ্রামাঞ্চল, হাট, বাট, আবাস দুর্গে পরিণত করতে হবে। লাঠি, সড়কি, গুন্ডি, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র প্রতি হাতের শোভাবর্ধন করবে। তীর ধনুক এবং 'কালী মায়ির বোমা' প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতে হবে।... অতএব সাহসে ভর কর, আকাঙ্খিত দিন আগত প্রায়।'[২৬]

আর ছিল 'যুগান্তর' যা পালন করেছিল এক বিশেষ ভূমিকা।[২৭] সিলেট থেকে উদ্দীপ্ত হয়ে লিখেছিল এক ছাত্র যে, একবেলা আহার যোগাড় করা তার জন্য কষ্টকর, তাই ইচ্ছে থাকা সত্বেও 'যুগান্তর' কিনে তার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। 'ভিক্ষুকের মত' তাই সে মিনতি জানিয়েছিল সম্পাদককে যেন তাকে নিয়মিত পাঠান হয় 'যুগান্তর'। ভবিষ্যতে কর্মক্ষম হলে পুরো টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছিল।[২৭ক] এ পটভূমিকায় গড়ে উঠেছিল বাংলায় গুপ্ত সমিতি।

খ. শ্রেণী, সম্প্রদায় স্তর বিশ্লেষণ

আজ আশীবছর পর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ অনেকের চোখে অসার মনে হতে পারে কিন্তু ঐ সময় বৃটিশ বাংলার মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত যুবকদের একাংশ আন্তরিকতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এতে। কারণ, লিখেছেন গোপাল হালদার, যিনি নিজেও একসময় ছিলেন এ ধরনের বিপ্লবী—ঐ সময়টা ছিল এক উন্মাদনা, ঘোরের যুগ; 'তখন অগ্নিযুগ, আগুনের আঁচ তার বাতাসে।'[২৮] 'দেশের মধ্যে তখন যে প্রবল উত্তেজনা স্রোত বহিতেছিল তাহাই আধার বিশেষে ঘুর্ণ্যাবর্ত্তে পরিণত হইয়া বিপ্লব কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।'[২৯] ১৯১৫-১৭ সালে নোয়াখালীর মত ঝিমন্ত শহরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন গোপাল হালদার—'চোখে পড়ে এমন যুবক সে সব শহরে স্বদেশী দলের বাইরে থাকতে পারেনি।'[৩০]

সরকারী এক হিসেবে জানা যায় ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত অভিযুক্ত ১৮৬ জন সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে ৬৮ জন ছিলেন ছাত্র, ১৬ জন শিক্ষক, ভূস্বামী ১৯ জন, ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ২৩ জন, কৃষক মাত্র ১ জন এবং বাকীরা অন্যান্য পেশার সঙ্গে জড়িত।[৩১]

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ছাত্রদের যোগই ছিল বেশী এবং তা স্বাভাবিক। একই তথ্য অনুযায়ী তাদের মধ্যে বাইশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সী যুবকের সংখ্যা ছিল বেশী (৭৬ জন) এবং তারপর ছিল ১৬ থেকে বিশ বছর বয়সীদের সংখ্যা (৪৮ জন)। ছাত্রদের মধ্যেও ধরে নিতে পারি, অধিকাংশ এসেছিলেন সম্পন্ন বা মোটামুটি সম্পন্ন পরিবার থেকে। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন জনের আত্মজীবনী পড়ে অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।[৩১ক] ঐ একই তথ্য অনুযায়ী আবার দেখা যায়, (এবং অন্যান্য সূত্রও তাই সমর্থন করে) সম্প্রদায়গত ভাবে সন্ত্রাসবাদীদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উচ্চ বর্ণের সংখ্যা ছিল বেশী। সেই অভিযুক্ত ১৮৫ জনের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৫, ১৩ এবং ৭, শূদ্র ছিলেন মাত্র ১ জন।[৩২]

সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানরা গুপ্ত সমিতিতে প্রায় যোগ দেননি বলেই চলে। গুপ্ত সমিতির নানাবিধ রিচুয়াল ছিল এর একটি প্রধান কারণ যা আমরা পরে আলোচনা করব। চট্টগ্রাম ও ঢাকার কিছু মুসলমানের যোগ ছিল গুপ্ত সমিতির সঙ্গে। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মাষ্টার সাহেব বা সৈয়দ আলিমউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নাজিমউদ্দিন এবং আবদুল জব্বার। ১৯০৫ সালে 'মুক্তি সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন আলিমউদ্দিন। শুভড্যার বিখ্যাত ডাকাতিতে তিনি ছিলেন উপ-নেতা, ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় জানিয়েছেন, মাস্টার সাহেব ঢাকা শহরে নিজে একটি আখড়া খুলেছিলেন যার মাধ্যমে 'বহু মুসলমান এবং অনেক হিন্দু তরুণ বিপ্লবী দলে ভিড়ে যান' এবং তাঁর সংগঠিত মুসলমান বিপ্লবীদের সংস্থা ঢাকা শহর ও মানিকগঞ্জে 'বিশেষ দানা বেঁধে উঠে।'[৩৩] ১৯১৫-১৯২০ সাল পর্যন্ত যখন ঢাকা শহরে অধিকাংশ বিপ্লবী জেলে ছিলেন তখন আলিমউদ্দিনের চেষ্টায় দলের নিউক্লিয়াস টিকে ছিল। জব্বার সম্পর্কে হেমচন্দ্র বলেছিলেন, 'জব্বারের মত ছেলে আরো ক'টা জন্মালে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঐ দুর্দিনে আরো সুন্দর হত—হিন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে বহু মুসলমান তরুণ পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তি সংগ্রামে আত্মদান করতে পারত। কিন্তু বিধাতা অকালে জব্বারকে ছিনিয়ে নিয়ে তা ঘটতে দিলেন না।'[৩৪]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, গুপ্ত সমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল একটি বিশেষ সাম্প্রদায়ের উচ্চ বর্ণের কিছু সভ্য নিয়ে এবং এর সঙ্গে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ।

সন্ত্রাসবাদ ঃ বাংলায়

সন্ত্রাসবাদ ব্যাপকতা লাভ করেছিল পূর্ববঙ্গে। গুপ্ত সমিতিগুলির অধিকাংশ ছিল পূর্ববঙ্গে এবং এ অঞ্চলেই তাদের প্রভাব ছিল বেশী। কিন্তু বাংলার এই অঞ্চলেই কেন এমনটি হয়েছিল তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। নলিনীকিশোর লিখেছেন, মধ্যশ্রেণীই এই আন্দোলন করেছিল তবে তা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ছিল না, তা ছিল দেশের মুক্তির জন্য। 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের ফলে স্বভাবতঃই আন্দোলন মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বারা প্রসার লাভ করে। বাংলায় বিভিন্ন বিপ্লবী দল এই সকল যুবকগণের দ্বারাই পুষ্টিলাভ করে। সেই কারণে যে জেলায় বা যে অঞ্চলে এই মধ্যবিত্ত সমাজ অধিক পুষ্ট সেই জেলার বা সেই অঞ্চলের বিপ্লবী সংস্থা অধিকসংখ্যক কর্মীর দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইহা কোন দল বা দলপতির বিশেষ যোগ্যতা বা অযোগ্যতার পরিচয় নহে। পূর্ববঙ্গে এই মধ্যবিত্ত সমাজ পুষ্ট ছিল বলিয়াই পূববঙ্গে বিপ্লবী কর্মী অধিক জুটিয়াছে।'[৩৫]

হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন, 'সকল শ্রেণীর লোক ভজাতে গিয়ে দেখেছিলাম, স্বল্প শিক্ষিত যুবকরা বেশীরভাগ এই কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাতো। পরেও লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের এই কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাতো। পরেও লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের এই কাজে কত যুবক ঝাঁপিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে খাস কলকাতাবাসী কম ছিল তাদের পনেরো ভাগই কলকাতার বাইরের ছেলে। নতুন ভাব গ্রহণের প্রবৃত্তি (Innovation) কলকাতার মত বড় শহরের যুবকদের চাইতে পল্লী যুবকদের অনেক বেশী বলে আমায় মনে হয়।'[৩৬]

দু'টি কারণই হয়ত ঠিক। তবে মনে হয় শাসনের কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত পূর্ববঙ্গে গুপ্ত সমিতির প্রসারই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, কেন্দ্রের তুলনায় প্রশাসন এখানে ছিল শিথিল।

ক. সংগঠন

ইউরোপীয় বিপ্লবী সমিতিগুলির কথা শুনে বা সে সম্পর্কে পড়ে, চেষ্টা করা হয়েছিল বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলি গড়ে তোলার। আগেই উল্লেখ করেছি এগুলির শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল পূর্ববঙ্গ। বাংলার প্রধান

দু'টি দল ছিল যুগান্তর ও অনুশীলন। 'অনুশীলন' প্রথমে কলকাতায় গঠিত হলেও পরে ঢাকা শাখা হয়ে উঠেছিল যাবতীয় গুপ্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এবং তখন (১৯০৫-এর পর) 'অনুশীলন দল' বোঝাতে ঢাকা অনুশীলনকেই বোঝানো হত। এ ছাড়া ছিল (সবগুলিই পূর্ববঙ্গের) যশোর খুলনা সমিতি,[৩৭] মাদারীপুর সমিতি,[৩৮] স্বদেশ বান্ধব সমিতি,[৩৯] ব্রতী সমিতি,[৪০] সাধনা সমিতি,[৪১] পাবনা সম্মিলনী,[৪২] মুক্তি সংঘ[৪৩] এবং সুহৃদ সমিতি।[৪৪] এ ছাড়া হয়ত আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দল ছিল যার সম্পর্কে আমরা জানি না।[৪৫]

১৯০৭ সালের পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে এ ধরনের সমিতির প্রকাশ্য সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৪৮৫ জন যার মধ্যে ঢাকা ও বাকরগঞ্জে ছিল ২৬০০ করে ৫২০০ জন।[৪৬] তবে 'অপ্রকাশ্য' বা গুপ্ত সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সদস্য সংখ্যা ছিল নিশ্চয় আরো কম! ১৯০৮-৯ সালে সরকার এসব সমিতির বিরুদ্ধে কার্যক্রম নেওয়া শুরু করলে 'প্রকাশ্য' সমিতিগুলি বিলুপ্ত হয়েছিল (যেমন 'স্বদেশ বান্ধব') বা পরিণত হয়েছিল গুপ্ত সমিতিতে।[৪৭]

গুপ্ত সমিতিগুলির সাংগঠনিক দিক, আদর্শ, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না একমাত্র অনুশীলন সমিতি ছাড়া। 'অনুশীলন' যেহেতু বাংলাদেশের প্রধান দল ছিল, এবং যেহেতু এ দল সম্পর্কেই কিছু নথিপত্র পাওয়া গেছে সেহেতু 'অনুশীলন' সম্পর্কেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে গুপ্তসমিতিগুলির সাংগঠনিক কাঠামোর একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবো।

অনুশীলনের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন। বিপ্লবের মাধ্যম ছিল সন্ত্রাস বা হত্যা। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার সময় বিপিনচন্দ্র পাল ও প্রমথনাথ মিত্র এসেছিলেন ঢাকায়। বক্তৃতায় তারা ছাত্রদের প্রাণোৎসর্গের আহবান জানিয়েছিলন। সরকারী মতে, ঐ সব বক্তৃতার প্রত্যক্ষ ফল ছাত্র ধর্মঘট, ন্যাশনাল স্কুল ও অনুশীলন সমিতি গঠন।[৪৮]

অনুশীলন সমিতি প্রথম পরিচিত হয়ে উঠেছিল লাঠি খেলা, যুযুৎসু, সমাজ সেবার মাধ্যমে। ১৯০৮ সালে সমিতিকে অবৈধ ঘোষণা করলে পরিণত হয়েছিল তা গুপ্তসমিতিতে। ১৯০৮ সালে, ঢাকা অনুশীলন সমিতির অফিস তল্লাস করে পুলিন বিহারী দাসের একটি সার্কুলার পাওয়া গিয়েছিল যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল, সমিতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এর সাংগঠনিক কাঠামোও সংহত করা দরকার। পুলিন চেয়েছিলেন একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে যার অধীনে কাজ করবে পরগণা, জেলা, মহকুমা সমিতি এবং ঠিক জায়গায় বসাতে হবে ঠিক লোককে।[৪৯] কিন্তু

পুলিন অনুশীলন সমিতির এরকম সাংগঠনিক রূপ দিতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় নি। ১৯১০-এর পর কোন কমিটিও সেখানে ছিল না।[৫০] পুলিন যদিও বলতেন অনুশীলনের শাখা সারা বাংলাদেশে ছিল পাঁচশো, কিন্তু তা যাচাই করা কঠিন। সরকারী তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে ৫৭টি শাখার নাম।[৫১]

গুপ্তসমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করতে হত। কি ভাবে দীক্ষা দেওয়া হত তা দেখা যাক অনুশীলনের নেতা পুলিন দাসের ভাষায়—

'পি, মিত্রের আদেশমতে একদিন একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি, মিত্রের বাড়ীতে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইলাম। ধূপ দীপ নৈবদ্য পুষ্প চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্যোপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ পি, মিত্র যজ্ঞ করিলেন। পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম। আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল। তদুপরি অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি, মিত্র আমার দক্ষিণে দন্ডায়মান হইলেন। উভয় হস্ত ধারন করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নিকে ও পি, মিত্রকে নমস্কার করিলাম।'[৫২] পরবর্তীকালে পুলিন দাশও তাঁর শিষ্যদের একই ভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

অন্যান্য গুপ্ত সমিতির কথা জানা যায় নি তবে, অনুশীলনের সদস্য-দের দীক্ষা গ্রহণের পর চার রকমের প্রতিজ্ঞা করতে হত—আদ্য প্রতিজ্ঞা, আন্ত প্রতিজ্ঞা, প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা।[৫৩] প্রতিজ্ঞার সময় তা করানো হত কালীবাড়ী বা দেবী মূর্তির সামনে।

ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন, সমিতির সদস্যদের প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন যারা বিপ্লবের জন্য ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছেন। এঁদের অনেকেই ছিলেন পলাতক আসামী। সাধারণ সভ্যরা ছিলেন পরবর্তী শ্রেণীর। এদের সম্পর্কে আশা করা হত প্রয়োজনে এরাও বাড়ীঘর ত্যাগ করবেন। শেষ শ্রেণীতে ছিলেন 'সংসারী এবং বাড়ীঘরে থাকিয়া বিপদের সম্মুখীন না হইয়া যতটা পারিতেন সাহায্য করিতেন।'[৫৪]

গুপ্ত সমিতি কাউকে অন্তর্ভুক্ত করার আগে তাকে যাচাই করে নেওয়া হত। লিখেছেন ত্রৈলোক্যনাথ 'সমিতির সভ্যেরা সাধারণতঃ চরিত্রবান ও ধর্ম-ভাবাপন্ন ছিল। সেই যুগে কোন ছেলেকে উন্নত চরিত্র দেখিলে অভিভাবকগণ মনে করিতেন, সে নিশ্চয় সমিতির সভ্য হইয়াছে।'[৫৫] কোন সদস্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে তার জন্য অপেক্ষা করত কঠোর শাস্তি—মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত।

খ. আন্দোলন

গুপ্ত সমিতিগুলি চেয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা। বঙ্গভঙ্গের পর থেকে পরবর্তী তিন দশক সন্ত্রাসবাদীদের কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল, বিচ্ছিন্ন ভাবে। এর দু'টি ধারা লক্ষ্যণীয়। একটি হচ্ছে, ইংরেজ কর্মচারী ও তার সহযোগীদের হত্যার মাধ্যমে ত্রাসের সৃষ্টি করা যাতে প্রশাসন পঙ্গু হয়ে পড়ে। আরেকটি ছিল, অস্ত্র যোগাড় করে, স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গড়ে লড়াই করে দেশকে মুক্ত করা। অস্ত্র এবং বিদেশী মিত্রের জন্য অনেক জায়গায় দূত পাঠানো হয়েছিল, এবং এ ধারার কর্মকান্ডের চরম উদাহরণ হল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন।

প্রাথমিক ভাবে খানিকটা ত্রাসের ও উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও ব্যাপক জন সাধারণ থেকে সরকার সন্ত্রাসবাদীদের আলাদা করে দমন করতে পেরেছিল।

গ. সংগঠন ও আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

সুদীর্ঘ তিন দশকের কর্মকান্ডের পরও সন্ত্রাসবাদ তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। যদিও গুপ্ত সমিতিগুলি কাজ শুরু করেছিল ইংরেজ বা শত্রু ও তার সহযোগীদের হত্যার মাধ্যমে কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে শত্রুপক্ষে হত হয়েছিল গুটি কয়েকজন, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ তারা নন। সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে নিহত ও আহতের সংখ্যা অনেক বেশী। সাংগঠনিক ব্যর্থতা, জনবিচ্ছিন্নতা, পরিকল্পনাহীন হত্যা এবং দূরদৃষ্টির অভাব এ সব কিছুই ছিল এর কারণ। নীচে এ সব সীমাবদ্ধতা নিয়েই আলোচনা করব।

ইউরোপীয় বিপ্লবী সমিতিগুলির কথা শুনে বা সে সম্পর্কে পড়ে, চেষ্টা করা হয়েছিল বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলি গড়ে তোলার। কিন্তু এর মধ্যে তফাৎ ছিল। এখানকার গুপ্ত সমিতিগুলি শুরুতেই গ্রহণ করেছিল সংকীর্ণ মনোভাব এবং এই সীমাবদ্ধতাই পরবর্তীকালে ডেকে এনেছিল সংকট। ইতালীয় গুপ্ত সমিতিগুলির (যেগুলির কথা বিপ্লবীরা ভেবেছিল, যেমন, ইতালীর 'কারবোনারি') ছিল একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, সমিতির সদস্য হতে হলে ধর্মীয় রীতিনীতি ব্যবহার করে দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল না এবং সমিতি গুটিকয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তাও তারা বিশ্বাস করত না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অস্ত্র সরবরাহ এবং অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে ছিল তাদের সম্যক ধারণা।

অন্যদিকে বাংলার দলগুলি ছিল নানা দল উপদলে বিভক্ত, সদস্যপদ

গ্রহণে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি,[৫৬] যে কারণে, গুপ্ত সমিতিগুলি ছিল গুটিকয় হিন্দু যুবকেরই সমিতি।

প্রথমেই দেখা যাক দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারটি যার ওপর গুপ্ত সমিতি বেশ গুরুত্ব আরোপ করত। গোপাল হালদার লিখেছেন, তাঁকে দীক্ষা দেওয়া হয়নি, এটা ব্যতিক্রম। মোটামুটি সবাইকে দীক্ষা নিতে হত এবং আমরা দেখেছি তা হত বিশুদ্ধ হিন্দু মতে। ফলে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেওয়া হয়ে উঠেছিল প্রায় অসম্ভব। তাই বাংলাদেশের গুপ্ত সমিতিগুলিতে দেখা যায়, সেগুলি ছিল একটি সম্প্রদায়েরই এবং সেখানেও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ছিল প্রাধান্য।

একমাত্র দেখা যাচ্ছে, অনুশীলনের উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শক্তিশালী একটি সংগঠন গড়ে তুলতে, যেখানে শাখা সমূহ কেন্দ্রকে মেনে চলবে। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। শাখাসমূহ অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত বিচ্ছিন্নভাবে। তা'ছাড়া লক্ষ্য যদিও ছিল তাদের স্বাধীনতা কিন্তু এর বাস্তবভিত্তিক কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। বাংলাদেশ নিয়ে ছিলেন তারা ব্যস্ত। কিন্তু বাংলাদেশ যে কেন্দ্র দ্বারা শাসিত এবং কেন্দ্রেরই একটি স্তম্ভ এটা তারা ভাবেন নি। 'অনুশীলন' ছাড়া অন্যান্য দলগুলির ছিল নিজস্ব কর্মপদ্ধতি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠিত হতে পারত যদি সকলে মিলে কেন্দ্রীয় একটি কমিটি গঠন করতে পারত।

গুপ্ত সমিতিগুলির কাজ শুরু হয়েছিল ইংরেজ ও তার সহযোগীদের হত্যার মাধ্যমে। কিন্তু এ ব্যাপারেও নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় না। বরং মনে হয়, এ সব ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। তা'ছাড়া 'বিপ্লব' যদি সম্পন্নই হয় তারপর কি ধরনের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করা হবে সে সম্পর্কেও তেমন স্পষ্ট কোন ধারণা সন্ত্রাসবাদী নেতাদের ছিল না। এ প্রসঙ্গে অনুশীলন সমিতির ঘোষণা প্রণিধানযোগ্য—

'অনুশীলনের নেতারা এরূপ একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা করিয়াছিলেন যে সমাজের প্রত্যেকটি নরনারীর মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে। ···মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই হইতেছে মনুষ্যত্ব, এবং উহার বিকাশ শুধু অনুশীলন দ্বারাই সম্ভবপর।...'অনুশীলন' পরিকল্পিত সমাজে নিরক্ষর, দুর্নীতিপরায়ণ, চরিত্রহীন, ভীরু লোক থাকিতে পারিবে না···মানব সমাজ হইতে ধনবৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, প্রাদেশিক বৈষম্য দূর করিয়া সকল মানুষের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। ইহা একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেন্ট দ্বারাই সম্ভবপর,

তাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনুশীলনের বিদ্রোহ ঘোষণা, অনুশীলন চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।'[৫৭]

উপরোক্ত ঘোষণাও স্পষ্ট নয়, তা'ছাড়া এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কারা একত্রিত হয়েছিলেন? সরকারী এক হিসেবে দেখা যায়, যা আগেই উল্লেখ করছি, সংখ্যা গরিষ্ঠ বিপ্লবীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, একজন মাত্র চাষী। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় গুপ্ত সমিতিগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের কোন সম্পর্ক ছিল না। সংখ্যা গরিষ্ঠের জন্য বিপ্লব অথচ সংখ্যা গরিষ্ঠের সঙ্গেই সম্পর্ক নেই—এ বৈপরীত্য নিয়ে আর যাই হোক সফল বিপ্লব সম্ভব ছিল না। তাই এ'দের কার্যকলাপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মালরোর ভাষায় বলতে গেলে—

'Since he saw no hope for the world, exemplary revolts were the utmost he could hope from anarchism.'[৫৮] বিভিন্ন দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া, সদস্যদের অনুগত্য ছিল যতটা না দলের প্রতি তার চেয়েও বেশী যিনি তাকে রিক্রুট করলেন তার প্রতি। গুর্ডনের ভাষায় এই বিপ্লবী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল দু'টি—'দল' এবং 'দাদা' বা 'দলের নেতা'।[৫৯] এবং দাদার সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কটা ছিল এক ধরনের ধর্মীয় কনসেপ্ট—গুরু শিষ্যের মত।[৬০] আসলে গর্ডন বলতে চেয়েছেন, যে অঞ্চলে যিনি রিক্রুট করতেন, দাদা হিসেবে তিনি পরিচিত থাকতেন সেখানে এবং রিক্রুট থাকতেন সাধারণতঃ তারই অনুগত।

সন্ত্রাসবাদীদের ছিল গন্ডীবদ্ধ জীবন। পুলিশের হামলার কারণে, অধিকাংশ সময়ই তাদের পালিয়ে বেড়াতে হত। বহির্বিশ্ব সম্পর্কে হয়ত ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল তাঁদের।[৬১] নিজ দেশ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আত্মজীবনী সমূহ পড়লে কি ধরনের অস্ত্রের সঙ্গে তারা পরিচিত ছিলেন সে সম্পর্কে জানা যায়। অস্ত্রের মধ্যে লাঠির (খেলা) ছিল প্রাধন্য। পুলিন বিহারী অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে। মাঝে মাঝে তাঁরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন পুরনো পিস্তল, দেশী বন্দুক। এ ছাড়া ছিল দেশী বোমা। এ সব দিয়ে হয়ত মাঝে মাঝে কারো ওপর হামলা করা যেত কিন্তু সম্ভব ছিল না ব্যাপক কিছু করার। অবশ্য অস্ত্র সংগ্রহের বিভিন্ন প্রচেষ্টা যে গ্রহণ করা হয়নি তা নয় কিন্তু সফল হয়নি সে সব প্রচেষ্টা। ইউরোপীয় গুপ্তসমিতি গুলির কিন্তু এ ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল না। আর কিছু না হোক, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে ধারণা তাদের ছিল, ব্যবহারও তারা জানতো।

গুপ্ত সমিতিগুলি পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল অর্থের। এবং অর্থ সংগ্রহের প্রধান উপায় ছিল ডাকাতি। ডাকাতির বিকল্প হিসেবে মাঝে মাঝে অর্থ জাল করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি।[৬২] ফলে ডাকাতির দিকেই সমিতিগুলি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। বরিশাল সমিতির দু'বছরের কাজের ফিরিস্তি এর প্রমাণ। দু'বছরে তাদের মোট তেরটি কর্মকান্ডের মধ্যে বারোটি ছিল ডাকাতি ও একটি হত্যা।[৬৩] এটা ঠিক যে, এ ডাকাতিকে প্রথমদিকে 'স্বদেশী ডাকাতি' বলে সাধারন ডাকাতি থেকে আলাদা করা হত। এ অভিধা দিয়েছিল মধ্যশ্রেণী। কিন্তু প্রায় নিঃস্ব গ্রামবাসীর কাছে এই সূক্ষ্ম তফাৎ ধরা পড়েনি। তাই বিপ্লবীদের আত্মজীবনী পড়লে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা ডাকাতিকে ডাকাতি হিসেবেই ধরে নিয়েছিল বা নিছক সন্ত্রাস হিসেবে এবং ডাকাতির সময় তাড়া করেছিল সন্ত্রাসবাদীদের। এর কারণ, বিপ্লবীরা তাদের কর্মকান্ডের আওতায় কৃষকদের আনেন নি যারা ঐ সংকট মুহূর্তে তাদের সহায়তা করতে পারতেন।

সন্ত্রাসবাদী এই আন্দোলন দমন করতে ঔপনিবেশিক সরকারের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। প্রথমে ১৯০৮ সালের ১৪ নং ফৌজদারী সংশোধনের মাধ্যমে সরকার বন্দোবস্ত করেছিল এই আন্দোলন দমনের। আইনের প্রতি ছিল ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও ভয়। তা'ছাড়া ভারতবাসীর আনুগত্যও সহায়তা করেছিল সরকারকে। এ ছাড়া আতংক সৃষ্টির জন্য বৃটিশ সরকার ব্যবহার করেছিল নিছক সন্ত্রাস। আগেই দেখিয়েছি প্রধানত মধ্যশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকায় তা হয়ে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন। ফলে ঔপনিবেশিক সরকার ও তার সহযোগীদের পক্ষে একে মোকাবেলা করতে বেগ পেতে হয়নি।

সন্ত্রাসবাদের স্বরূপ ও অন্যান্য রাজনীতি

ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলায়, এ শতকের শুরু থেকে তৃতীয় দশক পর্যন্ত সন্ত্রাস ব্যবহৃত হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে। এই সন্ত্রাসের প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ আছে ঐতিহাসিকদের মধ্যে। অনেক একে মহিমান্বিত করেছেন, অনেকে আবার একে সামগ্রিক ইতিহাসে ফুটনোটের বেশী মর্যাদা দিতে চান নি।

বৃটিশ সরকারের মতে, এ সন্ত্রাস পরিচালিত হয়েছিল একটি লক্ষ্যে এবং তা ছিল শক্তির মাধ্যমে বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করা। ঔপনিবেশিক সরকার সব সময় এ সব প্রচেষ্টাকে স্বাভাবিক ভাবেই হত্যা বা ডাকাতি বা নিছক সন্ত্রাস বলে উল্লেখ করেছে।

পরবর্তীকালে, সন্ত্রাসবাদীরা আবার বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের আন্দোলনের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর আত্মজীবনীতে সন্ত্রাস প্রচেষ্টাকে হাস্যকর বলে চিহ্নিত করে সমালোচনা করেছেন এর নেতৃত্বের।[৬৪] বারীন্দ্রও তাঁর আত্মজীবনীতে এমনভাবে সে যুগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন যেন পুরো ব্যাপারটা ছিল ছেলেমানুষী।[৬৫] কিন্তু অধিকাংশ বিপ্লবী বা যাঁরা পরে সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ করে মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা, এমনকি ঐতিহাসিকরাও বাংলার সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এর সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

প্রখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ সন্ত্রাসের উপযোগীতার যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে মিল আছে খানিকটা ফাননের তত্ত্বের। অর্থাৎ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিকরাই এবং তার উত্তরও দিতে হয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে। লিখেছেন উপেন্দ্রনাথ, যে, সন্ত্রাসবাদীদের অনেকেই 'এনারকিষ্ট বলেন কিন্তু তা ঠিক নয়। বাঙালীদের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল দেখেই তা প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়েছিল।[৬৬]

একই মত প্রকাশ করেছেন, এক সময়ের স্বদেশী দলের সভ্য ও পরে মার্কসবাদী, গোপাল হালদার-'আন্দোলনের কথা বলতে হলে বলা— উচিত—'জাতীয় বিপ্লববাদ', 'মিলিটান্ট ন্যাশনালিজম' 'বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন'—এরূপ কিছু বলাই সমীচীন—টেররিজম নয়'।[৬৭]

ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষে প্রথম কে সন্ত্রাসবাদ প্রবর্তন করিয়াছে ? বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শঠতা-কপটতা-বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা, অন্যায় ভাবে বল প্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া সন্ত্রাসবাদ দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণ করিতেছে নাকি?...একটা শান্তিপ্রিয় জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা সন্ত্রাসবাদ নয় কি ? হত্যা করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি ?'[৬৮]

আসলে, রাজনীতির নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল সেই রাজস্বভোগী বা মধ্যশ্রেণীর শহুরে এলিট তারা শান্তিপূর্ণভাবে আবেদন নিবেদন করে চাচ্ছিলেন কিছু সুবিধা আদায় করতে। কিন্তু স্বদেশের লাঞ্চনা সৃষ্টি করেছিল জাতীয়তাবাদী চেতনার। অন্যদিকে 'বাংলার বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রধান অংশ যখন আবেদন নিবেদনের অবমাননাকর পদলেহী নীতি গ্রহণ করেছিল তখনই বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালী তরুণ'[৬৯] এর জাতীয়বাদী চেতনা প্রকাশের তাৎক্ষণিক মাধ্যম ছিল সন্ত্রাস। একই কথা লিখেছেন ত্রৈলোক্যনাথ—'গভর্ণমেণ্টের টেররিজমের ফলে যখন দেশবাসীর মধ্যে ডিমরেলিজেসন আসিয়াছিল তখন আমরা বিপ্লবীরা

কাউণ্টার টেররিজম চালাইয়াছি। আমরা টেররিজম চালাইয়াছি দেশবাসীকে এই আশ্বাস দেওয়ার জন্য-অত্যাচারীর শাস্তি বিধানের লোক এ দেশেই আছে। আমরা টেররিজম চালাইয়াছি, গভর্ণমেণ্টকে জানানোর জন্য—অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়া হইবে। এক তরফা কিছুই চলিবে না। আমরা সফল মনোরলথন হইয়াছি, আস্তে আস্তে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছে।"[৭০]

ব্যাপক হারে বৃটিশ দমননীতির শিকার হয়ে জেলে যাবার আগে সন্ত্রাসবাদীরা রাজনৈতিক মুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন শুধু, অর্থনৈতিক মুক্তির নয়। জেলে যাবার পর তাদের অনেকেই মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হন, নতুন ভাবে পড়াশোনা শুরু করেন যা তাদের পক্ষে আগে সম্ভব ছিল না। ফলে, অনেকে দীক্ষিত হন মার্কসবাদে, অথবা পরবর্তীকালে নিজেদের যুক্ত করেন গণসংগঠনের সঙ্গে। কারণ, তাদের পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের অসারতা তাদের কাছে ততদিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। আরেক অংশ 'তখন জীবনের আরাম আয়েসের মধ্যে নিজেদের এলিয়ে দেন এবং নিজের জীবনে দেশের মুক্তির জন্য আত্মদানের যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, সেই আদর্শ ক্রমে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে এবং ক্রমে তারা অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষে পরিণত' হন।[৭১]

মূল্যায়ণ

প্রথমে, আমরা যে সন্ত্রাস তত্ত্ব, বিশেষ করে ফাননের তত্ত্বের কথা আলোচনা করেছি এখন তার আলোকে বাংলার সন্ত্রাসবাদ আলোচনা করে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ণ করবো। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, সে সময় রুশ বিপ্লব হয়নি, মার্কসবাদ শব্দটিও অচেনা। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা কি ভাবে আশা করবো যে, তারা, ঐ পদ্ধতিতে কাজ করবেন? তাই এখানে বলে রাখা ভালো যে, আমরা এখানে যুগের তুলনামূলক আলোচনা করছি না। আমরা চেতনার বিচার এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধতার কথা আলোচনা করবো।

ফাননের তত্ত্বের মূল হচ্ছে জনগণ ও মুক্তির মাধ্যম সন্ত্রাস। এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের জরুরী প্রশ্নগুলির প্রতি নজর তাঁর তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক শাসনের আলোকে তিনি উপনিবেশের কথা আলোচনা করে তাঁর তত্ত্বে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এর ভিত্তি ছিল আলজেরিয় অভিজ্ঞতা।

ফাননের মতে, ঔপনিবেশিক শ্রেষ্ঠতার নির্যাস হচ্ছে, উপনিবেশের রাজনীতি, সমাজ সংস্কৃতি—সবক্ষেত্রে প্রচন্ড নিপীড়ন। এ ব্যবস্থাকে

ধ্বংস করতে পারে একমাত্র সন্ত্রাস—শোষকের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শোষিতের সন্ত্রাস, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সন্ত্রাস ব্যক্তিকে শুদ্ধ করে এবং মুক্তি দেয় কর্মহীনতা, হীনমন্যতা এবং হতাশা থেকে। ফানন জাতীয় চেতনার জাগরণের কথা বলেছেন, বিরোধিতা করেছেন জাতীয় শভিনিজম এর।

সমাজতন্ত্রের শ্লোগান তিনি কখনও দেননি। জনগণের মুরুব্বী হওয়ার প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়েছেন। লিখেছেন তিনি, মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা শুরু তারপর যুদ্ধ শুরু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে কখনও তিনি প্রশ্রয় দেননি।

ফাননের তত্ত্বে শ্রেণী দ্বন্দ্বের কথা আসেনি। ঔপনিবেশিক শ্রেষ্ঠতার শ্রেণীচরিত্রও তিনি বিশ্লেষণ করতে চাননি, 'For him it was ethnic rather than class contradictions that were concentrated in colonialism.'[৭২]

ফানন সন্ত্রাসকে তুলিত করেছেন বিপ্লবের সঙ্গে। সন্ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পদ্ধতির ওপর গরুত্ব আরোপ করেন নি। কৃষকদের ওপর তিনি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটা ঠিক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গেরিলা বা জনযুদ্ধের আকারে শুরু হয় এবং পরে কেন্দ্রীভূত হয় গ্রামাঞ্চলে। কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্র বা দুর্গ হচ্ছে শহর। কিন্তু শহরের মজুর শ্রেণীর কথা তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। বিপ্লবে দু'শক্তিরই সমন্বয় দরকার। বুর্জোয়া এবং প্রলেতারীয় দু'ধনের অধিপত্যের তিনি বিরোধী। তাঁর চিন্তাধারা সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে—তিনি মার্কসবাদের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন কিন্তু মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব প্রভাবিত করেছিল আলজিরীয় বিপ্লবীদের এবং তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধও হয়েছিল সফল।

বাংলার সন্ত্রাসবাদের কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল না ঠিকই। তবে, ত্রৈলোক্যনাথ, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের লেখা পড়ে বোঝা যায় কেন তারা উজ্জীবিত হয়েছিলেন সন্ত্রাসে। শোষণটা তাদের কাছে তেমন স্পষ্ট ছিল না যতটা স্পষ্ট ছিল দেশীয়দের প্রতি শাসকদের অপমান, বর্ণগত বিদ্বেষ। এ থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সন্ত্রাসে।

মুক্তির মাধ্যম হিসেবে হয়ত তা ঠিক কিন্তু তাৎক্ষনিকতার পরের পর্যায়গুলির কথা তারা তেমন ভাবেন নি। অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ, জনগণের মাধামে রাজনৈতিক প্রচার ইত্যাদি। এর একটি কারণ, জীবন জগৎ সম্পর্কে তাদের সীমিত ধারণা। বই-পত্র পড়া বা বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাদের

ধারণা যে কত স্বল্প ছিল সে কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি।

ঔপনিবেশিক সমাজ গঠন বাংলায় এক সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত সংস্থা, তার রিচুয়াল সেটিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছিল। এ সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল, যদি অর্থনৈতিক মুক্তিও গুরুত্ব পেত। কিন্তু মধ্যবিত্ত পটভূমি, সম্প্রদায়গত সমস্যা ইত্যাদির কারণে তা গুরুত্ব পায় নি। অনেক পরে, বিপ্লবীদের অনেকে যখন মার্কস-বাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন তখন তারা এ সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এবং নিজেদের সে আলোকে সংশোধন করেছিলেন।

সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় যে মাধ্যম অস্ত্র—সে সম্পর্কেও বাংলার সন্ত্রাস-বাদীরা খুব সজাগ ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের অস্ত্র ছিল পুরনো রিভলবার। এটা ঠিক যে ,পরবর্তীকালে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে তা সফল হয় নি।

সবচেয়ে বড় কথা সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষকের কথা তারা কখনও বলেন নি। কারণ, অর্থনৈতিক শোষণের কথা তারা তেমন ভাবে ভাবেন নি। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, যখন সন্ত্রাসবাদ চলছে [লাহিড়ী তখনও ছাত্র, রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন নি] তখন তাঁর এক সোশালিষ্ট মনোভাবাপন্ন দাদা বলেছিলেন সন্ত্রাসবাদ 'শুধু ব্যক্তির বীরত্বের ওপরই নির্ভরশীল, গণ আন্দোলনের ওপর তাদের ভরসা নেই। সে জন্যই ঐ আন্দোলন সফল হবে না।'[৭৩]

এই ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখাতে গিয়ে, অর্থ সংগ্রহের জন্য সন্ত্রাসবাদী-দের ডাকাতি করতে হয়েছিল। ডাকাতি করে যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা গিয়েছিল তা নয়। বরং এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে সিনফিন আন্দোলনের সময় বিপ্লবীরা জনগণের ওপর ভরসা করেছিলেন, আইরিশরা তাঁদের সমর্থন দিয়েছিল। সিনফিনরা সেনাবাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। রুশ নিহিলিস্টরা সেনাবাহিনী তৈরী করতে পারে নি, কিন্তু জনসমর্থন তারা পেয়েছিলেন খানিকটা।

জনসমর্থনের কথা ভেবেই ফানন কৃষকদের গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ তৃতীয় বিশ্বে তারা একটি বড় ফ্যাক্টর। শ্রেণী দ্বন্দ্বের কথা না বলেও, সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশকে গুরুত্ব দিয়ে ফানন সমস্যাটির সমাধান করেছিলেন। ১৯৭১ সালে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও শ্রেণী দ্বন্দ্বের কথা আসে নি, এসেছিল একদিকে ঔপনিবেশিক শাসন অন্যদিকে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন। এবং মধ্যবিত্ত নেতারাও ব্যাপারটিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন সবার মধ্যে। যদি ঐ সময় এ ধরনের ব্যাপার

হতো তা' হলে সন্ত্রাসবাদ অন্য রূপ নিতো। এখানে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের একটি প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করা যায়। অস্ত্রাগার লুন্ঠনের পর, পুলিশ যখন কয়েকজন বিপ্লবীকে তাড়া করছিল তখন বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল কৃষকরা।[৭৪] বিপ্লবীরা ছিলেন হিন্দু। কৃষকরা মুসলমান, বিপ্লবীদের দেশপ্রেম বা সম্প্রদায় তাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করেনি। বিপ্লবী-দের তারা বিপ্লবী হিসেবেই দেখেছিলেন।

এ সমস্ত বিচার করে বলা যায়, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলায় সন্ত্রাস-বাদ পরিণত হয়েছিল একটি বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু তরুণের সন্ত্রাসে। যার ফলে, ঔপনিবেশিক শক্তির একে দমন করতে বেগ পেতে হয় নি।

কিন্তু সন্ত্রাস বা বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ একেবারে মূল্যহীন ছিল না। হেমচন্দ্র কানুনগো সন্ত্রাসীদের নানা সমালোচনা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন—'এই বিপ্লব অনুষ্ঠানের একটা ক্ষুদ্র অংশ বা দিক আছে যা বাংলার মত দেশের পক্ষে একটু গৌরবজনক।'[৭৫] মার্কস-বাদীরাও তা স্বীকার করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে যাঁরা মার্কসবাদ দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা শ্রেণী সংগ্রামের পথ দিয়ে বাংলায় সেক্যুলার রাজনীতি তৈরী করেছিলেন।

বাংলার সন্ত্রাসবাদ ব্যর্থ হলেও তা আঘাত হেনেছিল বৃটিশ শাসনের মূলে। বৃটিশ শাসন যে অমোঘ নয় এই বোধ জাগ্রত করেছিল দেশবাসীর মধ্যে। এবং কংগ্রেসের আপোষকামী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের যারা সমর্থক তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এবং তারা যে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা পরবর্তীকালে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তার পিছে যে এ চাপ কাজ করেছিল এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যাবে না।

তথ্য নির্দেশ

১. Anthony Arblaster, 'What is Violence?' Ralph Miliband and John Saville (ed.), *The Socialist Register 1975*, London, 1975, p. 232.

২. Paul Wilkinson, *Political Terrorism*, U. K. 1974.

৩. Anthony Arblaster, *Ibid*. p. 234.

৪. Hannah Arendt, 'The Meaning of Revolution', *On Revolution*, London, 1979, p. 35.

৫. Paul Wilkinson, *Ibid*, pp. 36-37.
৬. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, (Trans : Constance Farrington) London. 1973 ; Irene L. Gendzier, *Frantz Fanon : A Critical Study*, London, 1973 ; David Caute, *Fanon*, U.K. 1970.
৭. Paul Wilkinson, *Ibid*, p. 79.
৮. *Ibid.*
৯. Joan Gillespie, *Algeria, Rebellion and Revolution*, London, 1960, p. 4.
১০. *Ibid*. p. 173,
১১. *Ibid*.
১২. *Ibid*. p. 12.
১৩. *Ibid*. p. 72.
১৪. *Ibid*. p. 28.
১৫. *Ibid*. p. 24.
১৬. G. A. Adhikari, 'Development of Ideology of National Revolutionaries', *Challenge : A Saga of Indian's Struggle for Freedom*, New Delhi. 1984, p. 3-4.
১৭. Gopal Haldar, 'Revolutionary Terrorism', A. C. Gupta (ed), *Studies in the Bengal Renaissance*, Calcutta, 1958, p. 231.
১৮. 'Hindu Nationalism gave it a new life and vigour over the two widely separated but politically advanced regions, Bengal and Maharastra. Men like Aurobindo touched the two ends ; while Bankim and Vivekananda, and to some extent, Rabindranath strengthened the new forces in Bengal.' *Ibid*, p. 233.
১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন, "অগ্নিযুগের ইতিকথা" ঢাকা ; ১৯৭৯ ; পৃঃ ৩০।
২০. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক্‌ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম", ময়মনসিংহ, ১৯৬৮, পৃঃ ৭৩।
২১. ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, "ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব", কলকাতা ১৩৭৭, পৃঃ ৫৫৪।
২২. বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী", কলকাতা, ১৯৭৯।
২৩. Sumit Sarkar, *Modern India*, Delhi, 1983, p. 119.
২৪. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী "প্রাগুক্ত" পৃঃ ২৩।
২৫. 'সন্ধ্যা', ২১.৪.১৯০৬, উদ্ধৃত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, "বাংলা দেশের ইতিহাস",

চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, পৃঃ ১৯৩।

২৬. 'সন্ধ্যা', ১৪.৫. ১৯০৭, "ঐ", পৃঃ ১৯৬-১৯৫।

২৭, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন ঃ 'যুগান্তরের ক্রেতার ভীড়ে রাস্তায় লোক বা বা গাড়ী চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম।'

৯. ৬. ১৯০৮ সালে লিখেছিলো ইংলিশম্যান—'গত শনিবার [৩০. ৫. ১৯০৮] কয়েক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর 'যুগান্তর' আবার প্রকাশিত হইল। মাত্র দুই পয়সার আধখানা কাগজ ৩০ মে তারিখে বাহির হইয়াছে এবং অতি আগ্রহে লোক তাহা কিনিতেছে। প্রতি বাঙ্গালী হাতে একখানা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহারা পথে চলিতে চলিতেই উৎসাহ ভরে পড়িতেছে। বাড়ী গিয়া তাহার স্ত্রী ও মাতার হাতে দিবে এইভাবে অন্তঃপুরেও বিপ্লবের বার্তা পৌঁছিবে।' উদ্ধৃত, 'ঐ'।

২৭ক. ছাত্রটি লিখেছিল—

'From your advertisement, articles and your bold writings, I understand that he alone who has the subversion of Feringhi government of heart, should by all means read Jugantor. I, a school boy, living in a hilly country, don't feel any oppression of the Feringhi, and I give way before people for want of information. I am therefore, in need of Jugantar, for it acquaints us to a great extent with the desire of driving away the Feringhis and also makes us alive to wrongs. I am extremely in strained circumastances, hardly able to procure one meal a day, nevertheless my desire for newspaper reading is extremely strong. Hence I approach you as a begger. Ah ! do nt disappoint such an eager hope of mine. I shall pay the price when I shall please have the means . . . submitted by Sri Debendra Chandra Bhattacharji, p. o. Machihadi, Mirasi, Syllet, *Sedition Chmmittee Report, p. 76.*

২৮. গোপাল হালদার, 'রূপনারাণের কূলে", প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৭৩।

২৯. উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "নির্বাসিতের আত্মকথা", কলকতা, ১৩২৯, ভূমিকা।

৩০. গোপাল হালদার, 'প্রাগুক্ত গ্রন্থ', পৃঃ ৬০।

৩১. *Sedition Committee Report,* Annexure II.

৩১ ক সিডিশন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, সেকেণ্ডারী ইংলিশ স্কুল এবং কলেজগুলি ছিল বিপ্লবী সমিতির সদস্য যোগাড় করার উৎস। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য

ছিল বিক্রমপুরের সোনারং ন্যাশনাল স্কুল। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৮ সালে এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার সময় ৬৮/৭০ জন ছাত্র পড়াতো সেখানে। 'ঐ'।

৩২. *Ibid*

৩৩. ভুপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, ''প্রাগুক্ত'', পৃঃ ৪১৯, ৪২৯।

৩৪. ''ঐ'', পৃঃ ৫২০।

৩৫. নলিনী কিশোর গুহ, ''বাংলার বিপ্লববাদ'', কলকাতা, পৃঃ ৩২৯।

৩৬. হেমচন্দ্র কানুনগো, ''বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'', কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৬-১৭।

৩৭. যশোর-খুলনার প্রথম বৈপ্লবিক সংগঠন গঠন করেন খুলনার ফুলতলার অলকাগ্রামের সুধীর চন্দ্র দে। তিনি ছিলেন কলকাতা অনুশীলনের প্রথম দিককার সদস্য এবং অনুশীলনের পরিচালকদের নির্দেশে তিনি স্থাপন করেছিলেন এই শাখা। পরে এই শাখা অনুগামী হয়েছিল যুগান্তরের। তবে, ঢাকা অনুশীলনের সহযোগিতা নিয়ে এই শাখা কাজ করতো। সুপ্রকাশ রায়, ''ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'', কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ২৫২।

৩৮. 'মাদারীপুর সমিতি'র নাম পাওয়া যায় ১৯১২ সালে। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, খুব সম্ভব প্রথম দিকে যুগান্তর বা অনুশীলনের অধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে তারা কাজ করতো। আদর্শ ও কর্মপন্থা ছিল এর অনেকটা অনুশীলনের মত। ১৯১২ সালে ডাকাতি করে তারা প্রায় লুট করেছিল এগারো হাজার টাকা। ''ঐ'', পৃঃ ২৩৯।

৩৯. বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতির কিছুটা গণ-ভিত্তি ছিল। ১৯০৯ সালে তাদের শাখা ছিল ১৭৫টি গ্রামে। তাদের সেবামূলক কাজের জন্য হিন্দু মুসলমান কৃষকের কাছে সমিতিটি ছিল প্রিয়। সুমিত সরকার, ''প্রাগুক্ত'', পৃঃ ১২০।

৪০. ব্রতী সমিতি ছিলো ফরিদপুরের।

৪১. হেম আচার্য ছিলেন সাধনা সমিতির নেতা। সুপ্রকাশ রায়, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৩১৭।

৪২. পাবনা সম্মিলনী ১৯০৫ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো অবিনাশ চক্রবর্তী ও অন্নদা কবিরাজ প্রমুখের চেষ্টায়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এদের বেশ কিছু শাখা ছিলো। ''ঐ'', পৃঃ ১৫৫।

৪৩. ঢাকায়, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষকে, 'পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে পরাস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।' বিবেকানন্দের এই উক্তি, বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও রুশ জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়—এসব কিছু প্রভাবিত করেছিলো হেমচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র ও রাজকুমার গুহকে 'মুক্তসংঘ' প্রতিষ্ঠায় (১৯০৫)। এই সংগঠন পরে পরিচিত হয়ে উঠেছিলো 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামে। ১৯১৪ সালে

রভা-অস্ত্র লুণ্ঠনে এ দলের সদস্যরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র বলেছিলেন, 'মেজর সত্যগুপ্ত, জ্যোতিষ জোয়ারদার প্রমুখের অনলস চেষ্টায় আমাদের কর্মীরা সুভাষচন্দ্রের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স মুভমেন্টকে' আন্দোলনের পর্যায় থেকে বৈপ্লবিক সত্ত্বায় কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় করাতেই কালক্রমে পুলিশের তালিকায় ঐ দলের ব্যক্ত নাম হয়েছিলো 'বি. ভি.'। অজানিত মুক্তি সংঘের সর্বজন জনিত নাম 'বি. ভি.।'
হেমচন্দ্র ঘোষের সাক্ষাৎকার, ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, ''ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব'', কলকাতা, ১৩৭৭, পৃঃ ৫৪৪-৫৪৭।

৪৪. পরেশ লাহিড়ীর উদ্যোগে গঠিত হয়েছিলো সুহৃদ সমিতি। পি. মিত্রের পরিচালনাধীন ছিলো সমিতি। অনুশীলন সমিতি দু'ভাগ হয়ে গেলে, সুহৃদ সমিতির মূল অংশ প্রমথনাথ মিত্র এবং অন্য অংশ সাধনা সমিতি নাম নিয়ে বারীন্দ্র ঘোষের আনুগত্য স্বীকার করেছিলো। সুপ্রকাশ রায়, ''প্রাগুক্ত'', নলিনী কিশোর গুহ জানিয়েছেন, সরলা দেবী চৌধুরাণী ছিলেন সুহৃদ সমিতির নেত্রী।
নলিনী কিশোর গুহ, ''বাংলার বিপ্লববাদ'' কলকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৬১৪।

৪৫. চট্টগ্রামেও একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছিলো বলে জানা যায়। আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার কিছু পলাতক আসামী চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো এবং 'চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলের এক অংশ এঁদের আগ্রহের সঙ্গে লুকিয়ে রাখেন। এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চট্টগ্রামে 'প্রথম একটি বিপ্লবী সংগঠন' স্থাপিত হয়েছিলো যার সদস্য ছিলেন চারজন। ১৯০৮ সালে যুগান্তর দলের সঙ্গে এক বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো—'যেহেতু তখনও চট্টগ্রাম বিভাগকে রাজনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা, কাজেই চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সন্দীপ ইত্যাদি জায়গায় পলাতক বিপ্লবীদের জন্য আশ্রয়স্থল এবং বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র রাখার গোপন ঘাটি করতে হবে।' পূর্ণেন্দু দস্তিদার, ''স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম'', চট্টগ্রাম, ১৩৭৬, পৃঃ ১৮-১৯।
বরিশালেও এক সমিতির নাম জানা যায়, যারা ১৯১০-১৯১২-এর মধ্যে তেরটি ডাকাতি করেছিলো Annexure I, p. viii, *Sedition Committee Report.*

৪৬. সুমিত সরকার, ''প্রাগুক্ত'', পৃঃ ১১৯-১২০।

৪৭. ''ঐ''।

৪৮. প্রথম ধর্মঘটটি হয়েছিল ঢাকা কলেজে। বঙ্গ ভঙ্গের কারণে, কলেজের ছাত্ররা শোক প্রকাশের জন্য বিশেষ কাপড় পড়ে এসেছিল। কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কাপড় পড়তে বারণ করেছিল ছাত্রদের। ফলে, ছাত্রদের করা হয়েছিল জরিমানা। প্রতিবাদে ছাত্ররা করেছিল ধর্মঘট। এ কারণে, বহিষ্কার করা হয়েছিল কিছু ছাত্র যাঁদের মধ্যে ছিলেন ললিত মোহন

রায়, আশুতোষ দাশগুপ্ত যাঁরা পরবর্তীকালে পরিণত হয়েছিলেন অনুশীলন নেতা পুলিন বিহারীর বিশ্বস্ত কর্মীতে।

বহিষ্কার যাদের করা হয়েছিল তাঁদের শিক্ষার জন্য ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে ললিত মোহন রায়ের বাড়ীর কাছে স্থাপিত হয়েছিল 'জাতীয় স্কুল', ললিত মোহন ছিলেন যার প্রধান উদ্যোক্তা, পরে, তা স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ৫১, ওয়ারীতে, পুলিনবিহারীর বাসায়।

পুলিন থাকতেন ৫০ নং ওয়ারীতে। এখানেই তিনি লাঠি খেলা শিক্ষা দেওয়া শুরু করেছিলেন। ৫০ ও ৫১ নং বাড়ীর যোগাযোগ থেকেই পুলিনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল অনুশীলনের গুপ্ত নিউক্লিয়াস। দেখুন, W. S. Coults, *Emperor Vs Pulin Behari Das and Others : Judgement*, Dacca, 1911.

৪৯. *Sedition Committee*, p. 61.

৫০. নলিনীকিশোর গুহ, "প্রাগুক্ত" পৃঃ ৭৯।

৫১. ঢাকা শহরের শাখাগুলি ছিল—

স্বামীবাগ, রাজার দেউড়ি, গেণ্ডারিয়া, লক্ষ্মীবাজার, আর্মেনীটোলা, চাঁদনীঘাট, জিন্দাবাহার, কামারনগর, ধোবাখোলা, ঠাটারী বাজার ও ইম্পিরিয়াল সেমিনারী। মফস্বলে ছিল—

তেঘরিয়া, হাজরা, ষোলঘর, মালখানগর, তৌরী, লৌহজং, ব্রাহ্মণ গাঁ, সেনহাটি, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মধ্যপাড়া, নারায়ণগঞ্জ, মাছিমপুর, ঘোষগ্রাম পাঁচদোনা, মালবদিয়া, বজ্রযোগিনী, রাউৎভোগ, সতীর পাড়া, শিলামন্ডী, ভাটপাড়া, সোনামগ্নী, নয়াপাড়া, গুণের বাড়ী, শেরপুর, টাঙ্গাইল, রাণীগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চিকনদি, গঙ্গানগর, উলপুর, পালং, হোগলা, কার্তিকপুর, শালদা, কুমিল্লা, দাঁরোরা, মৌলবী বাজার, ইকরাম, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, আজমিরী গঞ্জ, সিলেট, ছাতক ও সুনামগঞ্জ। সমিতি ছদ্মনামও ব্যবহার করত। যেমন, মধ্যপাড়ার 'জ্ঞানবিকাশিনী সমিতি' বা বরিশালের 'বান্ধব সমিতি,' এ সবই ছিল অনুশীলনের শাখার ছদ্মনাম।

Sedition Committee Report.

৫২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, "প্রাগুক্ত", পৃঃ ১০৯-১১০। পুলিন দাশ আবার কি ভাবে দীক্ষা দিতেন তাঁর শিষ্যদের, সে বর্ণনাও রেখে গেছেন—'পি. সি. আমাকে যে পদ্ধতিতে দীক্ষা দিয়াছিলেন, আমি সেই পদ্ধতিতে আমার নিজের বাসাতেই দীক্ষা দিতাম; এক সঙ্গে বহু যুবককে দীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইলে সাধারণত তৎকালীন ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে-ঈষৎ জঙ্গলাকীর্ণ পুরাতন ও নির্জন 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির'—এ যাইয়া একটু জাঁকজমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। দীক্ষা প্রার্থীগণ এবং আমি, সকলেই পূর্বদিন একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও যথাবিধি সংযম করিয়া দীক্ষার দিনে উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া পবিত্রভাবে কালী মূর্তির সম্মুখে

যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া প্রত্যেককে 'প্রতিজ্ঞা-মন্ত্র' পাঠ করাইয়া লইতাম। তৎকালে যথাসম্ভব রুদ্রভাব অবলম্বন করিবার মানসে আমি উত্তরীয় সহ কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে, হস্তে, বাহুতে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ধারন করিতাম। প্রত্যেকেই দীক্ষান্তে ও কালী মূর্তিকে প্রণাম করিয়া আমাকে প্রনাম করিত।... দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকেই পর্যায়ক্রমে বিশুদ্ধ ঘৃত ও চিনিযুক্ত টাটকা (কাঁচা) দুগ্ধ সেবন করিতে দিতাম।' উদ্ধৃত, পুলিন দাশের গ্রন্থ থেকে, সুপ্রকাশ রায়। "প্রাগুক্ত", পৃঃ ১৬৫।

৫৩. আদ্য প্রতিজ্ঞার মধ্যে উল্লেখ্য ছিল—'আমি সমিতি থেকে কখনও নিজেকে আলাদা রাখবো না, আমি সব সময় সমিতির আইনের অধীন থাকব, বিনা বাক্যব্যয়ে নেতার নির্দেশ মানব, নেতার কাছে কখনও কিছু গোপন করবো না ও সত্য ছাড়া তার কাছে মিথ্যা বলব না। অন্ত্য প্রতিজ্ঞা ছিল সংগঠনের গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত। প্রথম বিশেষ ও দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞার শুরু ছিল 'ওম বন্দে মাতরম'। দেখুন, পঞ্চম অধ্যায়, *Sedition Committee Report*.

৫৪. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, "প্রাগুক্ত", পৃঃ ৯০।

৫৫. "ঐ", পৃঃ ৯১।

৫৬. বিশের দশকে 'সোমনাথ লাহিড়ী যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়েন তখন একদিন কলেজের নোটিশ বোর্ডে এক ছাপানো ইশতেহারের মাথায় দেখেন মা কালীর ছবি, নীচে লেখা 'In the name of mother Kali we warn all Indian Inspectors and Sub-Inspectors of Police !' অর্থাৎ ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে মা কালীর নামে তাদের হত্যা করা হবে। লাহিড়ী লিখেছেন, যদিও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর তখন সম্পর্ক ছিল না—'প্রচণ্ড হাসি পেল, সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা উবে গেল। শেষকালে মা কালীর নামে! পৌত্তলিকতার মতো প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাকে যে আন্দোলন প্রণতি জানায় তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ থাকতে পারে কি করে।'—সোমনাথ লাহিড়ী, 'আত্মজীবনীর খসড়া', "পরিচয়", ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃঃ ৯।

৫৭. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, "প্রাগুক্ত", পৃঃ ১১৩।

৫৮. Andre Malraux, *Days of Hope*, London, 1968, p. 23.

৫৯. Leonard Gordon, *Bengal, The Nationalist Movement 1876-1940*, New Delhi, 8-136.

৬০. *Ibid.* p. 142.

৬১. এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে তারা কি ধরনের বই পড়তেন তার তালিকা দেখলে। ঢাকার অনুশীলন সমিতির আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ বেশ কিছু বই বাজেয়াফত করেছিল যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মুক্তি কোন পথে' [যুগান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন] 'বর্তমান রাজনীতি' ও 'গীতা'

[১৬ কপি]। বই ইস্যুর রেজিস্টারে যে সব বইয়ের তালিকা পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি হল—

জালিয়াত ক্লাইব	— ইস্যু	হয়েছিল	১২	বার
মহারাজ নন্দকুমার	— ,,	,,	৯	,,
প্রতাপ সিংহ	— ,,	,,	৮	,,
শিখের বলিদান	— ,,	,,	৮	,,
জাল প্রতাপ চন্দ	— ,,	,,	৮	,,
বঙ্কিম রচনাবলী	— ,,	,,	৬	,,
আনন্দী বাঈ	— ,,	,,	৫	,,
দেবী চৌধুরাণী	— ,,	,,	৪	,,

W. S. Coults, *Judgement*, pp 52-53

৬২. নলিনী-কিশোর গুহ, ''প্রাগুক্ত'', পৃঃ ৯২।

৬৩. ডাকাতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছিল— '. . . স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা ডাকাতি করিতে বাধ্য হই। ডাকাতি লব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় না করিয়া সমস্ত নেতার হস্তে অর্পণ করিব। তিনি প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া যাহা আমাদের দিবেন, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব। যাহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী সরকারের গুপ্তচর, প্রতারক, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি উৎপীড়নকারী যাহারা জাতি বা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, যাহারা অতিরিক্ত সুদখোর এবং ধনী অথচ কৃপণ, কেবলমাত্র তাহাদের বাড়ীতেই ডাকাতি করিব।' হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'ভারতের বিপ্লব কাহিনী', উদ্ধৃত, সুপ্রকাশ রায়, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ১৭৫ এবং দেখুন, *Sedition Committee Report*.

৬৪. হেমচন্দ্র কানুনগো ''প্রাগুক্ত''।

৬৫. বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, ''প্রাগুক্ত''।

৬৬. উপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর আত্মকথায় –
'আমার শুধু একই বক্তব্য যে এ দেশের বিপ্লবপন্থীরা অনারকিস্ট নহেন। . . . বাঙ্গালীদের আত্মসম্মানবোধ রাজপুরুষদিগের ব্যবহারে প্রতিপদে ক্ষুণ্ণ হইতেছিল বলিয়াই ইংরাজাধিকারে তাঁহাদের মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই বাঙ্গালীরা তাহাদের ক্ষীণ প্রাণের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া ইংরাজদের দুর্জয় শক্তি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। . . . সমস্ত বাংলাদেশ লর্ড কার্জনকৃত অপমানে যে যাবৎ বিক্ষুব্ধ সাগর বক্ষের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল সেই চাঞ্চল্য হইতে প্রকৃত পক্ষে বাংলায় বিপ্লববাদের উৎপত্তি।' উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাগুক্ত'', ভূমিকা।

৬৭. গোপাল হালদার ''রূপনারায়ণের কূলে'', পৃঃ ৮৮।

৬৮. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, "প্রাগুক্ত", পৃঃ ২৫৩।

৬৯. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম", চট্টগ্রাম, ১৯৭৬।

৭০. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, "প্রাগুক্ত", পৃঃ ২১৪।

৭১. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, "প্রাগুক্ত", পৃঃ ২৭৮।

৭২. *Fighters for National Liberation*, Moscow, 1983, pp. 134-135.

৭৩. সোমনাথ লাহিড়ী, পৃঃ ৯।

৭৪. ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সঙ্গে জনাব আবদুস সালাম ও ওহিদুল আলমের কথোপকথন।

৭৫. হেমচন্দ্র কানুনগো, "প্রাগুক্ত", পৃঃ এ-ট।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

১৯১৯ থেকে চট্টগ্রামে বিপ্লবী দলের মধ্যে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ছাড়াও দুইটি চিন্তাধারার সংঘাত শুরু হয়। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে জার্মানীকে বৃটিশরা পরাজিত করেছে, এই কথাই সরকারী মহল থেকে নানাভাবে, ঘোষণা করে, এই দেশের সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছিল যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করা ঠিক হবে না। তারা কেমন শক্তি ধরে এই যুদ্ধে কি তার প্রমাণ হল না? কিন্তু তাদেরই মুর্খতা বশতঃ পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, চাঁদপুরের কুলী নিগ্রহ ইত্যাদি বর্বরতা তারা যখন অনুষ্ঠান করে, তখন থেকে বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে তার প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবতে থাকে এবং তার আয়োজন শুরু করে।

বিপ্লবীনেতা সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী তখন চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান বাজার দেওয়ানজী পুকুর পাড়ে 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে ওখানে থাকেন। সেখানে গোপনে বিপ্লবীরা জমায়েত হয়। এখানে উল্লেখ যোগ্য যে তখনও চট্টগ্রামে বিপ্লবীদল একটিই ছিল। বাংলার যে প্রধান বিপ্লবীদল "যুগান্তর" এবং "অনুশীলন" এর কোনটির সঙ্গেই একেবারে মিশে যাওয়ার কোন সিদ্ধান্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল তখনও গ্রহণ করেনি। বরং চট্টগ্রামদল স্বতন্ত্র বিপ্লবীদল হিসাবে কাজ করে যাবে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা শ্রীযুত চারু বিকাশ দত্ত ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে, "অনুশীলন" দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের মধ্যে প্রথম ভাঙ্গন আসে। বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব এই কাজের জন্য তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করে। কিন্তু তিনি কোন কৈফিয়ত দেন না, সেই জন্য বিপ্লবীদলের জুলু সেন, অনুরূপ সেন, অনন্ত সিংহ ইত্যাদি চারুবাবু সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানান।

কিন্তু সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ প্রমুখ নেতারা তা সমর্থন করেন না। কেবল দল থেকে তাঁর বহিষ্কারের সিদ্ধান্তই পরে সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

এইভাবে চট্টগ্রামেও বাংলার অন্যান্য জেলার মত দুইটি বিপ্লবী-দল গড়ে ওঠে। এই দুই দলের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ না থাকলেও, অনেকটা চক্র বা গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। বিপ্লবীদলের অন্যতম কার্যসূচী ছিল, দলের জন্য নূতন সদস্য সংগ্রহ। বিশেষতঃ নৈতিক চরিত্রে উন্নত এবং সুস্থ ও সাহসী তরুণদেরই দলে নেওয়া হত।

দুই দলে বিভক্ত হওয়ার পর চট্টগ্রামে যে বিপ্লবী দলটি নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে, কংগ্রেসের প্রকাশ্য আন্দোলনে কলিকাতার 'যুগান্তর" দলের সঙ্গে সহযোগিতা করত, সেই দলের একটি কমিটি গঠিত হয়। চট্টগ্রামে সেই বিপ্লবীদলের কর্মকর্তা ছিল নিম্নরূপ ঃ—

সভাপতি—সূর্য সেন,

সহ-সভাপতি—অম্বিকা চক্রবর্তী; তাঁর কাজ ছিল বাংলার ও ভারতের অন্যান্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা।

শহর সংগঠনের দায়িত্ব—গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। গ্রামের সংগঠনের দায়িত্ব নির্মল সেন।...

পরে লোকনাথ বলকে ও ছাত্র আন্দোলন ও ব্যায়ামাগার গঠন প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ঐ বিপ্লবী কমিটির পূর্ণ সদস্য প্রথমে ছিলেন না। কমিটির দায়িত্ব সমষ্ঠিগত এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের মতই সকলের বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রহণীয় ছিল।...

একটি বিশেষ জরুরী সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে গ্রহণ করা হয়। তা হল, বিপ্লবী কাজের জন্য অতীতের পরৈকোড়া ডাকাতি বা পাহাড়তলী রেলওয়ে ডাকাতির মত আর-কোন ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ প্রস্তাবিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য করা হবে না। দলের সদস্যরা নিজ নিজ পরিবারের অর্থভাণ্ডার থেকে, পরিবারের সম্মতি বা অসম্মতি দ্বারা যেমনই হোক না কেন, অর্থ সংগ্রহ করবে। নিজের মা, বোন বা অন্য নিকট আত্মীয়ার নিকট থেকে বিপ্লবের কাজের কথা তাদের বুঝিয়ে তাদের ব্যবহৃত সোনার অলঙ্কার নেওয়ার কথাও এই বৈঠকে স্থির হয়। নেহাৎ বুঝিয়ে নেওয়া সম্ভব না হলে, চুরি করে নেওয়া হবে, এটাও ঠিক হয়। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এইসব কাজ নৈতিক দিক থেকে যে কোন অন্যায় হবে না তাও সাধারণ সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার কথা স্থির হয়।

বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য সদস্য সংগ্রহের নূতন কৌশল ঠিক হয়। সদরঘাটে বর্তমান "পি কে সেন অয়েল মিলের" পাশেই সদর রাস্তা থেকে পূর্বদিকে একটি খালি মাঠ ছিল। তাতে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলের পরিচালনায় একটি বড় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করা স্থির হয়। "সদরঘাট ক্লাব" নাম দিয়ে এই ব্যায়ামাগার অল্পদিনের মধ্যেই স্থাপিত হয়। তাছাড়া শহরের উত্তরাংশে দেব পাহাড়ের উপর যে ব্যায়ামাগার আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দলের মুক্ত তরুণ সদস্যদের উদ্যোগে তাকে নীচে সমতলে চন্দন পুরায় চট্টগ্রাম কলেজের উত্তর পূর্বদিকে যে বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল তাতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়। পরে শহরে এবং সম্ভব হলে গ্রামেও এই রকম ব্যায়ামাগার আরও প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে স্থির হয়।

এইসব ব্যায়ামাগার শহরের স্কুল কলেজের সচ্চরিত্র সাহসী ও বুদ্ধিমান ছাত্রদের আনতে হবে এবং তাদের ভিতর থেকেই বিপ্লবীদের সদস্যবাহিনী গড়ে তুলতে হবে স্থির করা হয়। এই সিদ্ধান্ত যে বাস্তবে পরে ভালভাবেই রূপায়িত হয়, তা ভবিষ্যৎ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। ১৯৩০ এর অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ যুদ্ধ ও পরবর্তী বহু খণ্ড যুদ্ধে এইসব ব্যায়ামাগারে গড়ে তোলা ছাত্র ও যুবক বিপ্লবীরাই প্রধান অংশগ্রহণ করে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেয়।...

বিপ্লবায়োজনের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। কঠোর গোপনীয়তার জন্য যার যার নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছাড়া অন্য কিছু কেউ জানতে পারে না এবং দলের নিয়মানুবর্তিতার জন্য কেউ জানবার ইচ্ছাও প্রকাশ করে না। এই সময় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজ নিজ পরিবার থেকে অর্থ, অলঙ্কার ও লাইসেন্স করা বন্দুক চুরি করার কাজ বেশ উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকে।

এই সময় দলের নির্দেশ অনুসারে কিছু লাইসেন্স করা বন্দুক ও নিজ নিজ পরিবার থেকে চুরি করা হয়। তার মধ্যে রণবীর দাশ গুপ্ত, হরিপদ মহাজন, ধীরেন দস্তিদার, রজত সেন, মাখন ঘোষাল, সুবোধ রায়, মধু দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী দলের সদস্যরা বাড়ী থেকে বন্দুক আর গুলী চুরি করে দলের দফতরে দেয়।

এই অবস্থায় চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা গোপনে আয়োজন করছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের। তাঁরা যখন বাংলার বিভিন্ন জেলায় এক সঙ্গে চাঞ্চল্যকর অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বোক্ত নেতাদের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তাঁদের অনেকের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার প্রভাব পড়েছে। কেউ কংগ্রেসের বড় নেতাও হয়েছেন এবং সুভাষ

চন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনকে সমর্থন করা, এক পক্ষ অন্য পক্ষের আয়োজিত জনসভা ভাঙ্গা, কোন জেলা কংগ্রেস একে অপরের কাজ থেকে ভোটে বা লাঠির জোরে দখল করা ইত্যাদি ছাড়া আর কোন বৈপ্লবিক কাজ করেন না। কেউ খোলাখুলি বললেন এখন অন্য কিছু করে লাভ নেই, এই আইন অমান্য আন্দোলনেই বিপ্লবীদের কাজ করা উচিত। একজন বড় নেতা বললেন, বিপ্লব আমাদের করতে হবে ঠিকই, কিন্তু গান্ধীজীকে একবার সুযোগ দেওয়া যাক। অন্য একজন বললেন, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের উপযুক্ত সময় ও অবস্থা আসেনি, এখন ওসব না করে, আইন অমান্য আমরা করি কেবল লবন আইন ভঙ্গ নয়, অন্য আইনও আমরা ভঙ্গ করব তারপরে ক্রমে ক্রমে বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে, তখনই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উপযুক্ত সময়।

মোট কথা চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্ব অন্য কোন জেলার বা কলিকাতার বিপ্লবী নেতাদের তাঁদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার নীতিতে সামিল করতে পারলেন না।

নিজেরা পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, আর কেউ যদি তাঁদের সঙ্গে যোগ না দেয়, চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা সূর্য সেনের নেতৃত্বে এই জেলার সদরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করবে এবং এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত সময় হ'ল আইন অমান্য আন্দোলনের চাঞ্চল্য, যখন ইংরেজ সরকারও থাকবে খুব বিব্রত আর জনসাধারণও দেশ প্রেমের অভিব্যক্তিতে সঞ্জীবিত।

তা ছাড়া এই কথাও আলোচনায় ওঠে, শুধুমাত্র একটি জেলায় এই অভ্যুত্থান করলে, প্রচুর ক্ষমতাশালী বৃটিশ সরকার অতি সহজেই বিপ্লবীদের দমন করতে পারবে এবং তাতে রাজনৈতিক লাভ বিশেষ কি আর হবে? স্বাধীনতা যদি সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারাই আনতে হয়, তার জন্য সংগঠন, আত্মদানের ইচ্ছা ও সাহস-এসব দরকার। অন্য জেলায় বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলাপে দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে এমন নিস্ক্রিয়তা এসে গেছে যে তাঁদের নিজ নিজ বিপ্লবী দলগুলিকে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরী করার কাজকেই তাঁরা অবহেলা করছেন, সেদিকে তাঁদের কোন লক্ষ্যই নেই। বিপ্লবী আন্দোলনের উৎপত্তি স্থান বাংলাদেশেরই যখন এই অবস্থা, তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিই বা আশা করা যায়?

যদি চট্টগ্রাম জেলায় আগে থেকে সুপরিকল্পিত উপায়ে এমন কোন সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থান করা যায়, যার ফলে অল্পদিনের জন্য হলেও এই জেলাকে যদি বৃটিশ শাসনমুক্ত করা সম্ভব হয়, যদি এই কাজ

সফল করতে গিয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সংগ্রামের মুখে আপন প্রাণ হেলায় বিলিয়ে দিতে পারে তাহলে একটি বিরাট প্রেরণা ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে, লুপ্ত শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে, বেদনা দায়ক নিস্ক্রিয়তা দূর হবে। ভারতে মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে, নিজেদের প্রাণ দিয়ে শত্রুর সঙ্গে সংঘবদ্ধ সংঘর্ষ ও শক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশ দ্বারা স্বল্প কালের জন্যও যদি জয়লাভ হয়, তার ফলে শেষ জয়ের পথে, বৃটিশ সরকারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মুক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সফলতার পথে এগিয়ে যাবার নব প্রেরণায় দেশ উদ্বুদ্ধ হবে, অন্য বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে উঠবে—এই ছিল চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার দখল ও অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন প্রমুখ প্রধান বিপ্লবী নেতারা কখনও ভাবেন নি যে নিজেদের শক্তি বলে চট্টগ্রামকে বৃটিশ কবলমুক্ত করার দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হবে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার কঠোর সংগ্রামে বিরাট এক ধাপ এগিয়ে যাবার জন্যই সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সুপরিকল্পিত এই আয়োজন করেছিল।

সারা দেশে আইন অমান্য আন্দোলন তখন শুরু হয়ে গেছে। জিলা কংগ্রেসের নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হলেও চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা মহিমচন্দ্র দাস ও তাঁদের সহকর্মী লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করে, সমুদ্রতীরে গিয়ে লবণ তৈরী করবেন স্থির হয়েছে। গোপনে যদিও অতি দ্রুতগতিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সব আয়োজন চলছে, তবু প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে সূর্য সেনের পক্ষেও ঐ ব্যাপারে কোন কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। আর আসন্ন অভ্যুত্থানের ব্যাপারে পুলিশকে বিভ্রান্ত করা দরকার।

১৯৩০-এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও তার কয়েকদিনের মধ্যে জালালবাদ পাহাড়ে কয়েকশত নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের যে সম্মুখ-যুদ্ধ হয়, তাতেই বৃটিশ শাসনের প্রায় দেড় শত বৎসরের মধ্যে সাময়িক ভাবে হলেও, ইংরেজ শাসন গোষ্ঠী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এই দেশের মানুষের কাছে পরাজয় বরণ করে এবং পলায়ন করে। এই দিক থেকে চটগ্রাম বিপ্লবীরা সূর্যসেনের নেতৃত্বে যেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। চটগ্রাম স্বাধীন করার পর ইংরেজের পদাতিক, গোলন্দাজ বা বিমান বাহিনী এসে বিপ্লবী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করবে তা বিপ্লবী নেতারা ঠিক জানতেন। কিন্তু ঐ সাময়িক জয় দ্বারা বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে গণ অভ্যুত্থানের দ্বারা মুক্ত হবার জন্য শেষ আঘাত হানার যে প্রেরণা জাগাবে, স্থায়ী জয়লাভের

দিকে যে সকল পদক্ষেপ হবে, এই সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই বিপ্লবী নেতৃত্ব সমস্ত পরিকল্পনা করেছিল। দেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস এই সব শহীদের নাম বুকে নিয়ে ধন্য হয়েছে।

চটগ্রামের বিপ্লবীরা বহু আলোচনা ও চিন্তার পর যে কার্যক্রম স্থির করলেন, তা ইতিপূর্বে কেউ কল্পনাও করেনি। এই বিষয়ে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির নেতা মাইকেল কলিনস, ডি-ভ্যালেরা ইত্যাদির সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিকল্পনা তাঁদের রচিত পুস্তকাদি এই জেলার বিপ্লবী নেতারা পড়তেন এবং বিশিষ্ট সহকর্মীদের পড়াতেন। তাঁরা আয়ারল্যান্ডের ঐ পার্টির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে, নিজেদের দলের নাম এই অভ্যুত্থানের পূর্বে পরিবর্তন করে রাখেন, "ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মি—চট্টগ্রাম শাখা।" আর আইরিশ বিপ্লবীরা যেমন "ইষ্টার রাইজিং" (ইষ্টার কালীন অভ্যুত্থান) শুরু করেছিলেন "গুড ফ্রাইডের" দিন, এই চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলও ঠিক "গুড ফ্রাইডের" দিনই তাঁদের অভ্যুত্থানের তারিখ স্থির করেছিলেন।

আলোচনায় স্থির হয়েছিল, অভ্যুত্থানের আগে জনসাধারণের কাছে প্রচুর ইস্তাহার ছাড়া হবে। শাসকরা ইংরেজ বলেই সম্ভবতঃ ইংরেজীতেই ইস্তাহার ছাপা হয়েছিল। কলিকাতায় চট্টগ্রাম দলের এক গোপন ঘাঁটি ছিল কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে তখনকার দিনের কলিকাতা হোটেলের নীচের তলায়। অবশ্য বাইরে থেকে এই ঘাঁটির রূপ ছিল, কাপড় কাচার দোকান "আমেরিকান লণ্ড্রী"। অন্যান্য দোকানের মত এই দোকানেও স্বাভাবিক ব্যবসা চলত। যতদূর মনে হয় চট্টগ্রামের নিতান্ত স্বল্পভাষী অন্যতম প্রধান নেতা নির্মল সেনই ঐ দোকান তথা আস্তানা করার জন্য প্রধানতঃ নিজ পরিবার থেকে টাকা এনে দিয়েছিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর এই দোকান বিক্রী করে দিয়ে, সেই টাকা দিয়ে নির্মল সেন কলিকাতা থেকে দলের জন্য একখানা- "হ্যান্ড-প্রেস" (হস্তচালিত ছাপাখানা) কিনে নিয়ে আসেন। এই ছাপা-খানা থেকেই বিপ্লবী দলের ইস্তাহার ছাপা হয়।

বিপ্লবী দলের কার্যসূচী স্থির হয়

(১) টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করতে হবে সবার আগে। কারণ সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ধ্বংস না করলে চলবে না। তার পরবর্তী কাজগুলির কোন খবর কোথাও যখন শত্রুরা দিতে পারবে না, তখন সহজেই তাদের কাবু করা যাবে।

(২) তারপর পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখল। এখানে সরকারী ও রেলওয়ের রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল, মেসিনগান, লুইস গান ও সমস্ত অস্ত্রের

উপযোগী বহু গুলী জমা ছিল।

(৩) ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ। এই ক্লাবের নাম বর্তমানে "চট্টগ্রাম ক্লাব"। এখানে তখন শুধু ইউরোপীয় নরনারীরাই যেতে পারত। এই ক্লাব আক্রমণ দ্বারা অনেক ইংরেজকে এক সঙ্গে হত্যা সম্ভব হবে বলে এটা আক্রমণের সিদ্ধান্ত করা হয়।

(৪) উপরোক্ত কাজগুলি সফলভাবে করার পর সংগৃহীত অস্ত্র ও পূর্বে সংগৃহীত অস্ত্রের সাহায্যে জেলার রিজার্ভ পুলিশ ঘাঁটি আক্রমণ— প্রয়োজন হলে সম্মুখ সমর এবং ওদের পরাজিত করে সেখানকার ছোট অস্ত্রাগার থেকে রাইফেল রিভলভার ইত্যাদি সংগ্রহ।

(৫) এই কাজ সফলভাবে করতে পারলে পরে চট্টগ্রাম শহরকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা এবং প্রধান নেতা সূর্য সেনকে এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি পদে বরণ করা।

(৬) চট্টগ্রাম থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে রেললাইন তুলে দেওয়া— যাতে সামরিক বাহিনী সহজে এসে না পৌঁছতে পারে।

(৭) এই কাজগুলি সফল হলে, এই সাফল্যকে স্মরণীয় ও জনপ্রিয় করার জন্য চট্টগ্রাম জেলের সব কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া, শহরের বন্দুকের দোকানগুলি লুট করা, সরকারী ইম্পিরিয়াল ব্যাংক লুট করা এবং ঐ অর্থ বিপ্লবের কাজে ব্যবহার করা।

(৮) চট্টগ্রাম শহর দখল করে, কাছারী পাহাড়ে বিপ্লবীদের (ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি—চট্টগ্রাম শাখা) পতাকা উত্তোলন করা ও জেলায় প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য বড় সরকারী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করে সভাপতি সূর্যসেনের কাছে কোর্ট পাহাড়ে প্রকাশ্য বিচার করা।

এই সব কাজের পরে প্রধান নেতা সূর্যসেনকে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক চট্টগ্রামের সভাপতি হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত করারও এক অলিখিত পরিকল্পনা তাঁর অনুবর্তীদের ছিল।

এই কার্যসূচী গ্রহণের পরে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে সব কাজ দরকার তা অতি দ্রুততা ও সতর্কতার সঙ্গে করার ব্যবস্থা হয়। কিছু খাকী পোশাক, বিশেষতঃ নেতাদের জন্য, গুর্খা ভোজালী, জলের বোতল (ওয়াটার কেরিয়ার) ইত্যাদি অনেক যোগাড় করা হয়। জেলের সব কয়েদীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য নানা কৌশলে জেলের প্রধান ফটকের তালার বিকল্প চাবী তৈরী করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা ও নিজ নিজ পরিবার থেকে চুরি-করা বন্দুক ও সংগৃহীত অন্য সব জিনিস শহরের বিভিন্ন গোপন ঘাঁটিতে ভাগ ভাগ করে রাখা হয়,

যাতে পুলিশের তরফ থেকে কোন বিপদ যদি আসে সব যেন একসঙ্গে ধরা না পড়ে। এইভাবে আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে চরম ক্ষণটির জন্য এই মুক্তিকামী সাহসী বীরদের মানসিক প্রস্তুতিও চলতে থাকে। দেশের মুক্তির জন্য নিজের অমূল্য প্রাণ আর অল্পদিনের মধ্যেই উৎসর্গ করতে হবে, নিজের পিতামাতা ভাইবোন, পরম প্রিয়জনকে চিরতরে ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন, সব কিছু ফেলে রেখে, সমষ্টির জন্য, গোটা দেশের মানুষের সুখ, শান্তি ও মুক্তির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবে, এই উন্মাদনা তখন বিপ্লবীদের মনকে চঞ্চল করে রেখেছে।

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০—এই দিন চট্টগ্রামের বুকে যে আগুন জ্বলেছিল তার আভা ছড়িয়ে গিয়েছিল সারা ভারতের মুক্তিকামীদের মনে, সেই দেশপ্রেমের রঙ্গীন আভা আজও দেশপ্রেমিকদের মনকে প্রেরণার আলোকে উদ্ভাসিত করে। এই দিন রাত সাড়ে দশটায় বিপ্লবীদের পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু হবে স্থির হয়। অভ্যুত্থানের পূর্বে নীচের তিনটি ইস্তাহার জনসাধারণের কাছে বিলি করার সিদ্ধান্ত হয়ঃ

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী

(ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি)

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছে যে, যুগ যুগ ধরিয়া যে বৃটিশ এবং তাহার সরকার ভারতের ত্রিশ কোটি জনসাধারণকে তাদের হিংস্র শোষণ নীতি দ্বারা নিপীড়িত করিয়াছে, তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সামান্যতম উন্মেষকেও নির্মূল করিতেও জাতি হিসেবে তাহাদের বৈশিষ্ট্য যাহাতে স্বীকৃত না হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম ঘোষিত হইল।

ভারতবর্ষের জনসাধারণই ভারতের প্রকৃত অধিকারী। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের মূল দায়িত্ব ভারতীয় জনগণের উপর। একটি বিদেশী সরকার ও বিদেশীদের দ্বারা জনসাধারণের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। আজ ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী অস্ত্রের মুখে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা সারা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিতেছে এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যে ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে, তাহাকে বাস্তবে এইরূপেই রূপায়িত করা হইবে। এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সদস্য স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, কল্যাণের জন্য এবং উহার সঙ্গে অন্যান্য জাতির জন্য নিজকে উৎসর্গ করিবে। বৃটিশ সরকার যেভাবে ভারতের জনসাধারণের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছে, বন্দুকের গুলীর

মুখে নারীজাতিকে পর্যন্ত উড়াইয়া দিয়াছে, বহু দেশবাসীকে ফাঁসীতে ও অন্যায়ভাবে খুন করিয়াছে, নিষ্ঠুর বৃটিশ বুটের তলায় শিশুদেরও পিষ্ট করিয়াছে; ভারতের ব্যবসা ও শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতেছে —তীব্র ঘৃণার সহিত তাহা আজ আমরা স্মরণ করি এবং দেশবাসীর রক্ত শোষণের চরম প্রতিশোধ নেওয়ার কঠোর শপথ ঘোষণা করিতেছি।

জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর এই শাখা জনসাধারণের নিকট পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করিতেছে এবং এই আশা প্রকাশ করিতেছে যে, কর্তব্যে অবহেলা, কাপুরুষতা বা অমানুষিকতা দ্বারা কখনও জাতীয় মর্যাদা ও সম্মানের অবমাননা কেহ করিবেন না। আজিকার এই চরম মুহূর্তে চট্টগ্রামের জনসাধারণকে তাঁহাদের সাহস ও দেশপ্রেম লইয়া পরম আত্মদানের জন্য এমনভাবে যাইতে হইবে যাহাতে এই পবিত্র দায়িত্বের জন্য তাঁহাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারেন।

আদেশক্রমে
প্রেসিডেণ্ট
সপারিষদ, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী,
চট্টগ্রাম শাখা।

চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ঃ

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

বৃটিশের জনসাধারণ ও তাহাদের সরকারের নিষ্ঠুর জোয়াল ও অত্যাচার হইতে দেশকে মুক্ত করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী এক প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বিগত দুইশত বৎসরের অত্যাচারের রাজত্বে ভারতীয়রা—যখনই স্বাধীনতার যে কোন প্রচেষ্টা করিয়াছে, তখনই বৃটিশরা তাহা নির্মম হস্তে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এইবারও তাহারা তাহাদের রক্তক্ষয়ী নিপীড়ন ও নির্যাতনে অন্যায় শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবে না।

আসুন ভাইসব, এই অবস্থার অবসানের জন্য আগাইয়া আসুন, পরাধীনতার বেদনা অন্তরে অনুভব করুন। দেশকে শোষণের ফলে কি রকম অধঃপতনের পর্যায়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করুন—জার্মানী, রাশিয়া আর চীনের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় কেমন ভাবে আগাইয়া যাইতেছে তাহা দেখুন। আপনাদের অন্তরে ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালান।

দলে দলে আপনারা ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর সদস্যভুক্ত হউন। আমাদের মাতৃভূমিকে ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করুন—স্বাধীনতার সৈনিকদলে আসুন।

আদেশক্রমে
প্রেসিডেন্ট
সপারিষদ, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী

এই ইস্তাহারের বক্তব্য থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বিপ্লবীরা প্রাথমিক জয়ের পরে অর্থাৎ চট্টগ্রাম শহরের সরকারী সকল ক্ষমতাকে অস্ত্রের জোরে পর্যুদস্ত করার পরে, যখন অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করে সরকারী বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে লড়তে আসবে, সেই সময় ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী যাতে সাহসী ও শক্তিশালী যুবক ও ছাত্রদের সক্রিয় সাহায্য পায়, সে জন্যই উপরোক্ত ইস্তাহার তাদের জন্য ছাড়া হবে।

চট্টগ্রামের নাগরিকদের প্রতিও একটি ইস্তাহার দেওয়া হয়ঃ

চট্টগ্রামের নাগরিকের প্রতি

এতদ্বারা ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী চট্টগ্রামের প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুকে এই আদেশ ও নির্দেশ দিতেছে যে, আমাদের জাতীয় আশা-আকাংখার বিরোধী সমস্ত ইংরেজ ও শ্বেতচর্ম ইঙ্গ-ভারতীয়কে অবিলম্বে জীবিত ও মৃত অবস্থায় ধৃত করিয়া প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর সদর দফতরে হাজির করিতে হইবে। ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক ঘোষণা করিতেছে, ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে যাহারা ধরিয়া আনিবে তাহাদের যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আদেশক্রমে
প্রেসিডেন্ট
সপারিষদ, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী

আসন্ন অভ্যুত্থানের আভাসে বিপ্লবী কিশোর আর তরুণদের প্রাণে লেগেছে মরণের দোলা। প্রধান নেতৃত্ব কি কি কার্যক্রম স্থির করেছেন, তার জন্য কার কার নাম নির্বাচিত তালিকায় আছে, অভ্যুত্থানের আগে তা কেউ জানত না। নামগুলি ঐদিন সকালে ও তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা নির্বাচিত বিপ্লবীদের একে একে জানিয়ে দেওয়া হয়। তখন আসে জীবনের এক চরমক্ষণ। নিজ নিজ প্রিয়জন, পিতামাতা, ভাইবোন ইত্যাদির স্নেহ-মমতার পরম বন্ধন স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ছিঁড়ে যেতে হবে। এই অভ্যুত্থানের পরে এই সুন্দর ধরণীর আলো, বাতাস প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য আর

তাদের সামনে প্রতিভাত হবে না। জীবনকোরক অনেকের প্রস্ফুটিত হয়নি. তবু কত রঙ্গীন আশা তাদের—কাল রাত্রে সব শেষ হয়ে যাবে, আর আমি আমার মায়ের স্নেহ, বোনের দরদ পাব না, জীবনের ভবিষ্যৎ সব সুখের কল্পনাকে কাল নিঃশেষ করে দেব। আমাদের দেশের মানুষের জন্য, তাদের মুক্তির জন্য, বৃটিশকে এদেশ থেকে দূর করে দেবার জন্য ক্ষুদিরাম, কানাইলালের মত মরব। মরতে আমাকে হবে। নির্বাচিত বিপ্লবীরা নিজ নিজ বাড়ীতে মায়ের কাছে অযথা আবদার করে, বিভিন্ন প্রিয় জিনিস খাওয়ার কথা বলে। ছেলের, ভাইয়ের এ চাঞ্চল্য অনেক মা বোনের কাছে ধরা পড়ে যায়, কিন্তু কোন আভাসে, কেউ বুঝতে পারে না যে নিজেদের প্রিয় এই মানুষটি আর কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরতে চলছে—স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী হতে চলেছে। যে ছেলে, যে যুবক ছিল অগণিত জনসমুদ্রে অজানা-অচেনা সামান্য একটি মাত্র তরঙ্গ, ঐ রাত্রির সংঘর্ষে আর তার পরবর্তী কর্মপ্রবাহে, সে কুলপ্লাবী যে বিরাধ মহাতরঙ্গে পরিণতি লাভ করতে চলেছে, বিস্মৃতি থেকে ইতিহাসের পাতায় যে চিরস্মরণীয় হতে চলেছে, অমরত্ব লাভ করতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা প্রিয়জনদের কেউ তখন বুঝতে পারেনি।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ ইং। ঐদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের বুকে বিভিন্ন কেন্দ্রে পূর্বে নির্ধারিত কৌশল অনুসারে একে একে বিপ্লবীরা সমবেত হতে থাকে। গৃহত্যাগের পূর্বে বিপ্লবীরা অনেকে নিজের মার কাছ থেকেই বিদায় নেয়। হঠাৎ হেসে হেসে ছেলে মায়ের পদধূলি নেয়—মা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, হঠাৎ এমন করে বিদায় নেবার মত ভাব কেন ? ছেলে জবাব দেয়, কিছু না, হঠাৎ তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছা করল। তারপর আস্তে আস্তে বিপ্লবী কিশোর বা যুবক গৃহত্যাগ করে। তাতেও মা-বোনের কোন সন্দেহ হয় না, কারণ, প্রায় রোজই তারা এমন করে বেরিয়ে যায়। এ যাওয়া অনেকেরই যে চিরবিদায় তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি।

বিভিন্ন কাজের জন্য আগে থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে নিজেদের তৈরী করা হয়েছিল; তার মধ্যে শহরের বিপ্লবীদের মধ্যে অনন্তলাল সিংহ আগে থেকেই মোটর চালাতে শিখেছিলেন কারণ তাঁদের নিজেদের একখানা "বেবী অষ্টিন" গাড়ী ছিল। ঐ গাড়ী দিয়ে দলের অনেকেই মোটর চালানো শিখেছিল। অস্ত্রাগার দখল ও অন্যান্য কাজে যেতে আরও গাড়ী দরকার। তাই নির্ধারিত দিনের কয়েকদিন পূর্বে সদরঘাটের মটর ব্যবসায়ী রায় চৌধুরীদের কাছ থেকে দলের টাকা দিয়ে অন্যতম অম্বিকা চক্রবর্তীর নামে একখানা "শেভ্রোলেট" গাড়ী কেনা হয়।

আগের দিন থেকে শহরের উত্তরাংশে প্যারেড গ্রাউণ্ডে মুসলিম

কনফারেন্স আরম্ভ হয়েছে। বিশিষ্ট মুসলিম নেতা মরহুম এ, কে, ফজলুল হক, মৌলানা আক্রাম খাঁ, আসাদ উল্লা সিরাজী প্রমুখ সেই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। ১৮ই এপ্রিলের সন্ধ্যায় পাক-ভারতের অন্যতম কুস্তিগীর গামার সঙ্গে ঐ সম্মেলন মন্ডপে অন্য এক বিখ্যাত পালোয়ানের প্রতিযোগিতা। শহরের কিছু দৃষ্টি সে দিকে নিবদ্ধ। অন্যদিকে লবণ সত্যাগ্রহের কাজ চলছে কুমিরায় সমুদ্রতটে।

নির্বাচিত বিপ্লবী যোদ্ধারা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন অংশে সমবেত হয়। প্রধান ঘাঁটি ছিল বিপ্লীনেতা গণেশ ঘোষের পিতার* (বিপিন ঘোষ) দোকানে। দ্বিতীয় দল আসকার খাঁর দিঘীর পশ্চিমপাড়ে কংগ্রেস আপিসে, তৃতীয় দল বিপ্লবী রজত সেনের পিতার (জজ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত রঞ্জন সেন) ফিরিঙ্গিবাজার বাসায় এবং চতুর্থ দলটি প্যারেড মাঠের (বর্তমানে চট্টগ্রামে সরকারী কলেজের খেলার মাঠ) দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় ব্রাহ্ম মন্দিরের পিছনে টিলার উপর বিপ্লবী ছাত্র দেবপ্রসাদ ও আনন্দ গুপ্তের পিতা শ্রীযুত যোগেন্দ্র গুপ্তের বাসায়।

যেই আরও একখানা মোটরকার পাওয়া যাবে এক রকম স্থির ছিল, শেষ মুহূর্তে ঐখানা মেরামত শেষ না হওয়ায় তা পাওয়া গেল না। তখন সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন বহু কষ্টে অত্যন্ত দ্রুত বিশ্বস্ত সংবাদদাতাদের দিয়ে সব কেন্দ্রে জানিয়ে দেন যে, সংঘাত আর কিছু পরে শুরু হবে। মৃত্যুপাগল বীর তরুণ বিপ্লবীদের পক্ষে, সামান্য অপেক্ষাও তখন অসহ্য। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য মৃত্যুহীন প্রাণ দুই হাতে অঞ্জলি ভরে তুলে নিয়ে উৎসর্গ করার জন্য তারা উন্মুখ। তবুও নেতার নির্দেশ পেয়ে তারা সংগ্রামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

বিপ্লবী নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করেছিলেন, অভ্যুত্থান শুরু হবে ঠিক রাত সাড়ে আটটায়। বিভিন্ন দলের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য আগে থেকে খাকি হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট, জলের টিন (ওয়াটার ক্যারিয়ার) ইত্যাদি তিন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবীরা এসে পোশাক পরিবর্তন শুরু করে। গণেশ ঘোষের বাসায় এসময় একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। প্রায় তিন মাস আগে আসকার খাঁর দিঘীর পাড়ে কংগ্রেস অফিসে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল, তাতে তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু দস্তিদার ভীষণভাবে পুড়ে যায় বলে

* ইনি ১৯২১-এর আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটের অন্যতম নেতা ছিলেন। ধর্মঘট শেষ হলে অন্যান্য রেল কর্মচারীরা কাজে যোগ দিলেও, যে কয়েকজন রেলকর্মচারী আর কাজে যোগ না দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন, তাঁদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি সদরঘাটে "স্বদেশী বস্ত্রালয়" নামে একটি স্বদেশী কাপড়ের দোকান খোলেন। এঁদের পৈত্রিক বাড়ী ছিল যশোর জেলায়।

তাদের নাম তালিকায় দেওয়া হয়েছিল না। তারা গ্রামে গোপন আশ্রয়-কেন্দ্রে ছিল এবং তখনও তারা দুইজনই বেশ অসুস্থ ছিল বলেই নেতারা জানতেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে গণেশ ঘোষের বাসায় গোপন আশ্রয় স্থল থেকে অর্ধেন্দু গিয়ে হাজির হয়। তখনও পোড়া ঘায়ের লাল চামড়া প্রায় কাঁচা, মাত্র ঘা শুকিয়েছে। তার গায়ের রং কালো, মুখে পোড়া ঘায়ের লাল লাল দাগ। তাই প্রথমটা তাকে উপস্থিত বিপ্লবীদের অনেকেই চিনতে পারে নি। সে সোজা গিয়ে নেতা গণেশ ঘোষকে বলে, সেও তাঁদের সঙ্গে যাবে। কয়েক মাস পূর্বে তার পিতার সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে গৃহত্যাগ করার পর থেকে অর্ধেন্দু দস্তিদার যে ভাবে কংগ্রেস অফিসে নেতা সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে ছিল এবং এক রকম "সর্বক্ষণের" কর্মীর মত নীরবে কাজ করত, তার মুখের উপর তাকে নেওয়া হবে না বলা নেতার পক্ষেও সম্ভব হল না। অর্ধ-সুস্থ অর্ধেন্দুকে জানিয়ে দেওয়া হল, সেও যেতে পারবে। শুনে তার চোখে, মুখে ফুটে উঠেছিল উৎসাহ ও দেশপ্রেমের আলো। সেদিন যে কয়টি বিপ্লবী কিশোর ও তরুণ স্বাধীনতার জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করার জন্য তৈরী হয়েছিল তাদের মধ্যে এই একজনই ছিল শারীরিক দিক থেকে অযোগ্য অথচ মনের শক্তিতে সে অন্য সব সাথীর সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে গিয়েছিল।

মোটর গাড়ীর সংখ্যা অভ্যুত্থানের জন্য প্রয়োজন মাফিক ছিল না। তাই স্থির হয়, যে কোন উপায়ে অভ্যুত্থানের বিভিন্ন দলের জন্য মোটর যোগাড় করে নিতে হবে। শহরের মাঝখানে লালদিঘীর পাড়ে ট্যাক্সির আড্ডা। ওখান থেকে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে আনবার জন্য হিমাংশু সেনকে পাঠানো হয়। সে একখানা ট্যাক্সি সদরঘাটের কেন্দ্র গণেশ ঘোষের বাসায় এনে ড্রাইভারকে ভিতরে ডেকে নেয়। বাড়ীর কর্তা তার সঙ্গে দর নিয়ে আলাপ করতে চায় এই অজুহাতে ড্রাইভারকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ভিতরে যেতেই অনন্ত লাল সিংহ তার বুকের সামনে রিভলভার তুলে ধরেন। ড্রাইভার ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাকে হাতপা বেঁধে ফেলে রাখা হয়, কিন্তু ক্লোরোফরম দিয়ে অজ্ঞান না করা পর্যন্ত তাকে বিপ্লবী নেতারা বলেন যে, তার কোন ভয় নেই। তাকে কেবলই হাতপা বেঁধে রাখা হবে, তাকে প্রাণে মারা হবে না, এটা অবশ্য আগে থেকে স্থির ছিল। এভাবে বদ্ধ অবস্থায় ভিতরের কামরায় একটি ড্রাইভার পড়ে রইল।

যে সব পরিকল্পনা, তার সাফল্যের জন্য সর্বপ্রথম দরকার সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা বিকল করা। তাই ১৮ই এপ্রিলে চট্টগ্রাম "ইস্টার" অভ্যুত্থানের প্রথম দল বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একখানা মোটরে

করে যাত্রা করল টেলিফোন আর টেলিগ্রাফ আপিসের দিকে। নন্দনকাননের উচু পাহাড়ের উপরে এই আপিসগুলির যে সিঁড়ি দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে খাড়া উঠে গেছে তাদের গায়ে আজও বুঝি সেই দিনের অগ্রগামী দলের পায়ের চিহ্ন রঙ্গীন হয়ে আছে। বিপ্লবী কিশোর আনন্দ গুপ্ত শহরের মিউনিসিপ্যাল স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। সেও মোটর চালনা শিখেছে, কিন্তু গাড়ীর ষ্টীয়ারিং তার পক্ষে বেশী উঁচুতে, তাই দু'টি বালিশ দিয়ে তার বসবার যায়গাকে উঁচু করা হয়েছে। সে তার উপর বসে মোটর চালিয়ে এসে গাড়ী থামায় টেলিগ্রাফ আপিসের পাহাড়ের গায়ে।

অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দগুপ্ত ও অন্য তিনজন বিপ্লবী যখন দ্রুত পদক্ষেপে অফিসে প্রবেশ করে তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা। পাহারারত সশস্ত্র রক্ষী কিছু বুঝতে পারার পূর্বেই রিভলভারের গুলীর শব্দে ধরাশায়ী হল। বিপ্লবীরা ঘরের মধ্যে তড়িৎগতিতে ঢুকেই অপারেটারদের দিকে অগ্নিনালিকা এগিয়ে ধরতেই তারা তাদের আসন ছেড়ে সভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘন কালো শশ্রুমন্ডিত একটি মানুষের হাতে ধরা রিভলভার আর কণ্ঠ থেকে কঠিন আদেশ ঘোষিত হল, কেউ যেন একটুও না নড়ে। নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর সেই রুদ্র মূর্তির সামনে তারা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে আর অন্য বিপ্লবীরা সঙ্গে যেসব বড় বড় হাতুড়ি ইত্যাদি নিয়েছিল তা দিয়ে টেলিগ্রাফ. টেলিফোনের যন্ত্রপাতি সব আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে নিয়ে তাতে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে চট্টগ্রাম বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রথম সাফল্যের অগ্নিশিখা। বিনা রক্তপাতে চট্টগ্রামকে সংবাদের দিক থেকে সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল।

আগেই কথা ছিল, এই প্রথম দল তাদের নির্দিষ্ট কাজে বেরিয়ে যাবার পর যাবে অন্যান্য দল। সরকারী সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা বিকল হয়ে গেলে ঐ পরিকল্পনাগুলি সফল করা সহজ হবে।

তার কয়েক মিনিট পরে বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে রজত সেন,* সুবোধ চৌধুরী ফণীন্দ্র নন্দী ও মাখন ঘোষালকে নিয়ে পাহাড়তলী সরকারী অস্ত্রাগার দখলের দলটি যাত্রা করল। ইউরোপীয়ান ক্লাব (বর্তমানে চট্টগ্রাম ক্লাব) আক্রমণের দল

* রজত সেন—শহরের উকিল শ্রীরঞ্জন সেনের ছেলে কালারপোল সংঘর্ষে শহীদ।
মাখন ঘোষাল—চন্দননগর সংঘর্ষে শহীদ।
ফণীন্দ্র নন্দী—পটিয়া দক্ষিণ ভূষর যুবক, আন্দামানে মৃত।
সুবোধ চৌধুরী অস্ত্রাগার লুন্ঠন মামলায় ২১ বছর সাজা হয়, ১৯৪৬শে মুক্তি পেয়ে নিজ জেলা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে চলে যায়।

তৈরী হল বিপ্লবী নরেশ রায়ের নেতৃত্বে। দামপাড়া পুলিশ লাইনের কাছে অন্যান্য সব দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা দখল করার জন্য দলে গেলেন সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, বিধু ভটাচার্য, শান্তি নাগ, নিতাই ঘোষ, প্রভাস বল, হরিপদ মহাজন, ক্ষীরোদ, সরোজ গুহ ও হিমাংশু সেন। শহরের বিভিন্ন গোপন কেন্দ্র থেকে একই সময়ে বিপ্লবীরা প্রচণ্ড আঘাতের সংকল্প নিয়ে সেদিনকার রাতে বেরিয়ে ছিল। সারা শহর তখন করেছে কর্মক্লান্ত দিবসের পর বিশ্রামের আয়োজন —আর মরণকে তুচ্ছ করে এই বিপ্লবীরা মুক্তি সংগ্রামের জন্য পরাধীন দেশের মানুষের ঘুম ভাঙ্গার জন্য, যারা দেশে সংগ্রামের প্রেরণা জাগাবার প্রয়াসে এগিয়ে চলে।

সুপুরুষ গৌরবর্ণ বলিষ্ঠদেহী লোকনাথ বলকে সামরিক পোষাকে ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীর মতই মনে হচ্ছিল। একখানা ট্যাক্সী ভাড়া করে আনা হল, তাতে সকলে এসে উঠবার পরে গাড়ী বেগে ছুটে চলে পাহাড়তলীর দিকে। কেমন করে পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখল করা হয়েছিল তার বিবরণ বিপ্লবী নেতা লোকনাথ বলের নিজের ভাষায়ই বলি :—

*চটগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল নির্মলদা (শ্রীযুক্ত নির্মল সেন) এবং আমার উপর। মাষ্টারদা (শ্রীযুক্ত সূর্য সেন) ছিলেন আমাদের সর্বোচ্চ নেতা, আমাদের কার্যের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম তাঁরই নির্দেশে। নির্মলদা এবং আমার মধ্যে সাব্যস্ত হল, রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিব আমি। ১৮ই এপ্রিল বেলা তিনটার সময় আমি স্থানীয় ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডে গিয়ে একজন ড্রাইভারকে বললাম, ঐদিন রাত আটটার সময় গাড়ী নিয়ে আমার বাসায় যেতে, আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু বেরুব বেড়াতে। সন্ধ্যার সময় নির্মলদা, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, জীবন ঘোষাল (মাখন), ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী ও আমি সামরিক পোশাকে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছি। আমার গায়ে ছিল উচ্চ ইংরেজ সামরিক কর্মচারীর পোষাক এবং অন্যেরা সৈন্যের পোষাক পরিহিত ছিল। আটটার সময় ট্যাক্সি এলে আমরা গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে পাহড়তলীর দিকে গাড়ী চালাবার নির্দেশ দিলাম। (পাহাড়তলী ষ্টেশন চট্টগ্রাম শহরের তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সম্মুখ পথ দিয়ে যাবার সময় আমরা দেখে গেলাম অস্ত্রাগারের অবস্থা অন্যান্য দিনের মতই

* "যুগান্তর" (২৯শে শ্রবণ, ১৩৫৪ বাং) স্বাধীনতা সংখ্যায় শ্রীলোকনাথ বল লিখিত "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

স্বাভাবিক। আমাদের গাড়ী যখন পাহাড়তলী ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে পেঁছিল তখন আমি ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বললাম। গাড়ী থামাতেই আমি এবং রজত গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারের দিকে রিভলভার লক্ষ্য করে তাকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলাম। ড্রাইভার আমাদের নির্দেশ পালন করল, আমরা ড্রাইভারকে রাস্তার পাশের ধানক্ষেতে নিয়ে যাই এবং তার হাতপা বেঁধে ক্লোরোফরমের সাহায্যে তাকে অজ্ঞান করে দিই। প্রায় দশটার সময় অমাদের গাড়ী রেলওয়ে অস্ত্রাগারের পাশের গেটে গিয়ে উপস্থিত হল। পাহাড়তলীর দিকে ফিরে আসবার সময় গাড়ী চালাবার ভার নিয়েছিল জীবন ঘোষাল। অস্ত্রাগারের সম্মুখে আমাদের ছয়জন সাথী পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী অপেক্ষা করছিল। তাদের একজন এসে ধাক্কা দিয়ে গেট খুলে দিলে আমাদের গাড়ী অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। অস্ত্রাগারের রক্ষী আমাদের পরিচয় জানার জন্য চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—"থাম, কে আসছ ?" (হল্ট, হু কামস্ দেয়ার ?)

তার জবাবে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম "বন্ধু" (ফেন্ড)। তারপর আমাদের গাড়ী অস্ত্রাগারের সিঁড়ির সামনে গিয়ে থামল। আমি একা গাড়ী থেকে নেমে এসে অস্ত্রাগারের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। আমার কাছ থেকে তখন রক্ষীর দূরত্ব ছিল অনুমান সাত আট হাত।

রক্ষীকে আমি ডাকলাম, "সেন্ট্রি, ইধার আও।"

রক্ষী আমার সামনে এসে সামরিক কায়দায় আমাকে অভিবাদ করল। তার ডানহাত রাইফেলের "বাট" স্পর্শ করা মাত্রই আমি বাঁহাত দিয়ে তার রাইফেল চেপে ধরি এবং ডান হাতে তার বুকের সামনে রিভলার লক্ষ্য করে বলি—অমরা স্বদেশী, আমরা অস্ত্রাগার দখল করতে এসেছি। তুমি পালিয়ে যাও। আমি তাকে রাইফেল ছেড়ে দিতে বলার পর সে হঠাৎ আমার হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিল। আমি তখন বাধ্য হয়ে তাকে গুলী করি। সে আহত হয়ে পড়ে গেল, অন্য তিনজনরক্ষী তাদের রাইফেল ধরার চেষ্টা করলে আমার সাথীরা ও আমি ক্রমাগত গুলী বর্ষণ করে তাদের প্রতিহত করলাম।

আমাদের প্রথম গুলির আওয়াজ শুনেই অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী সার্জেণ্ট মেজর ফ্যারেল তার ঘরের বারান্দায় এসে অস্ত্রাগারের রক্ষীকে ডাকল। আমি তাকে হুঁশিয়ার করে বল্লাম আমরা ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর সভ্য। আমাদের নেতার হুকুমে আমরা অস্ত্রাগার দখল করেছি। তুমি যদি আমাদের কোন অনিষ্ট করার চেষ্টা কর তাহলে জেনো তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

আমাদের কথা শোনার পর সে ঘরে গিয়ে ঢুকল, এবং অনতি-

বিলম্বে আমাদের আক্রমণ করার জন্য তার রিভলভার নিয়ে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্ষীর গুলিতে আহত হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার স্ত্রী তখন আমার কাছে এসে তাঁর এবং তাঁর শিশুর জীবন ভিক্ষা চাইলেন, আমি তাঁকে বললাম আপনি আমাদের মায়ের মত। আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী নই। আমরা তাঁকে হুঁশিয়ার করেছিলাম। আপনি নির্ভয়ে ঘরের ভিতরে যান কেউ আপনার অনিষ্ট করবে না।

গুলীর আওয়াজ শুনে পাহাড়তলীর দিক থেকে ক্যাপটেইন টেইট, আর কিছু ইংরেজ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রেল কর্মচারী রিভলভার নিয়ে ছুটে আসতে দেখে বিপ্লবীরা বিভিন্ন জায়গায় স্থান নিয়ে দাঁড়ায়। তখনও অস্ত্রাগার দখল করা হয়নি এবং পাহাড়তলীর ঐ রাজভক্তরা সংখ্যায় কত, দূর থেকে তা ঠিক বোঝাও যাচ্ছিল না। তাই বিপ্লবীদের দিক থেকে তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজীতে আদেশ দেওয়া হল "বোমা রিভলভার নিয়ে সব তৈরী থাক—আদেশ পাওয়া মাত্র সবাই এক সঙ্গে আমাদের দুষমনদের উপর তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের দিকে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি গুলীও ছুটে যায়। পলায়নই শ্রেয় মনে করে ঐ সব ইংরেজ আর তাদের সাথীরা আর দেরী না করেই চলে যায় এবং উর্ধশ্বাসে দৌড়ানোই নিরাপদ মনে করে।"

অস্ত্রাগারটিতে কেবল রেলওয়ের অস্ত্রাদিই থাকত না—রেলকর্তৃপক্ষ অবশ্য এটি তৈরী করেছিল তাদের অস্ত্রাদি নিরাপদে রাখার জন্য। তবু, চট্টগ্রামে এত সুরক্ষিত অস্ত্রাগার তখন আর ছিল না বলে, সরকারী রাইফেল, পিস্তল রিভলভার, মেশিনগান, লুইসগান এবং প্রচুর গোলাগুলী এখানে রাখা হত। এই ঘরটির নিরাপত্তার জন্য তাই নিযুক্ত ছিল দায়িত্বশীল ইংরেজ সামরিক কর্মচারী, যাকে বিপ্লবীদের গুলীতে প্রাণ হারাতে হয়েছে। তার অধীনে সশস্ত্র প্রহরীর প্রায় বিশ জনের একটি দল, এই অস্ত্রাগার পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত ছিল। এই পাকা ঘরের চারটি দেওয়ালের সঙ্গে ভিতর দিকে শক্ত লোহার পাত মেঝে থেকে প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত আটকানো ছিল। আর একটি মাত্র দরজায় খুব মোটা ডান্ডা দিয়ে তৈরী লোহার ভারী গেট ছিল।

অস্ত্রাগার দখল পরিকল্পনার সময়েই বিপ্লবীরা এই ঘর যে অতি সুরক্ষিত এবং দরজা যে অত্যন্ত কঠিন তার খবর নিয়েছিল। তাই তারা আক্রমণ করতে আসার সময় সঙ্গে শাবল, গাঁইতি ও জাহাজ বাঁধার দড়ি (ম্যানিলা রোপ) অনেকটা নিয়ে এসেছিল।

সংস্কৃত প্রবাদ 'য পলায়তি স জীবতি' (যে পলায়ন করে সেই বাঁচিতে

পারে) অনুসরণ করে যখন ইংরেজ কর্মচারীরা চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব যন্ত্রপাতি দিয়ে অস্ত্রাগারের লোহার গেট ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এত শক্ত গেট ভাঙ্গা সম্ভব হল না। তখন বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন বললেন, সঙ্গে যে 'ম্যানিলা রোপ' আছে, তা অস্ত্রগারের লোহার ডান্ডার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হোক্। তারপর তা মোটরের পিছনে চাকার ডান্ডার সঙ্গে বেঁধে খুব জোর মোটর চালাতে থাকলে দরজা ভেঙ্গে আসতে পারে।'

তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রস্তাব কাজে পরিণত হল। জাহাজের ঐ দড়িবাঁধা মোটর গাড়ী মিনিট কয়েক পূর্ণ শক্তিতে চালাবার পর অস্ত্রাগারের বিরাট লোহার গেট দেওয়াল থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে আর উল্লসিত বিপ্লবীদের গগনবিদারী, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ও "বন্দেমাতরম" ধ্বনিতে চট্টগ্রামের নৈশ-আকাশ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ফরাসী বিপ্লবের দিনে ব্যাসটিল দুর্গ ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবী প্রেরণা ইউরোপের শোষিত নিপীড়িতদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল আজ চট্টগ্রামের মুষ্টিমেয় মুক্তিপাগল বিপ্লবী তরুণ এশিয়ার বুকেও তারই পরশ পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষক ইংরেজের এই অস্ত্রাগারকে ভেঙ্গে ফেলল। তাদের এই আনন্দ আর উল্লাস সেদিনকার পাহাড়তলীর ঝোপে-ঝাড়ে ঢাকা সবুজ পাহাড়গুলির গায়ে যে প্রতিধ্বনি তুলেছিল, তা তখন ঘুমন্ত দেশবাসীকে শুধু দৈহিক দিক থেকে নয় চেতনার দিক থেকেও জাগিয়ে তুলতে যে সাহায্য করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জয়োদ্ধত বিপ্লবীরা তখন অস্ত্রাগারের ভিতরে। কত কষ্ট ও বিপদ মাথায় করে পূর্বে পিস্তল, রিভলভার ইত্যাদি যোগাড় করতে হয়েছে। কলিকাতার বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জির সাহায্যে "স্মাগলার"-(গোপন-বিক্রেতা) দের কাছ থেকে অথবা কলিকাতার বিখ্যাত "গুন্ডা" মীনা পেশোয়ারীর দল ও অন্যান্য গোপন সূত্র থেকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা পিস্তল, রিভলভার দেড় শ' দু'শ টাকা দামে কিনেছে। আর রাইফেল ত দেখা গেছে কেবল সরকারী পুলিশ বা সৈন্যের হাতে।

অস্ত্রাগারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণ বিপ্লবীরা দেখল খুব ভাল শ্রেণীর ওয়েবলী ও কোলট্ রিভলভার, রাইফেল ও গুলীর বড় বড় বাক্স সাজানো রয়েছে। আগে থেকে নিজ নিজ পরিবার থেকে চুরি করা বন্দুক যে দু'একটা এই দলের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল তার প্রতি আর আকর্ষণ কারও রইল না। অনেক বেশী শক্তিশালী রাইফেল তাদের করায়ত্ত। তারা রাইফেল এক একটি কাঁধে নিয়ে নিল। কেউ একটি কেউ দু'টি ভাল চক্‌চকে ওয়েবলী কোমরে চামড়ার বন্ধনীতে নিল। তাদের উৎসাহের সীমা নেই। অস্ত্রশালায় দু'টি মেশিনগান ও লুইসগান ছিল। এই দু'টির ব্যবহার তারা জানত না। যদি এই দু'টি শক্তিশালী অস্ত্রের

সাহায্য নেওয়ার সুযোগ বিপ্লবীরা সেদিন পেত, তা'হলে চারদিন পরে যে সম্মুখ যুদ্ধে তারা কেবল রাইফেলের জোরেই সরকারী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পেরেছিল, সেই যুদ্ধে তাদের আরও পর্যুদস্ত করা বিপ্লবী-দের পক্ষে সম্ভব হত।

বিপ্লবীদের সঙ্গে বড় বড় হাতুড়ী নেওয়া হয়েছিল। সেই বিরাট হাতুড়ী দিয়ে ঐ মেশিনগান আর লুইসগানকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাখা হল ভবিষ্যতে যেন শত্রুপক্ষ এগুলি ব্যবহার করতে না পারে। অন্য-দিকে অস্ত্র ও গোলাগুলি দ্রুত মোটরে বোঝাই করা হচ্ছে।

এমন সময় দেখা যায় 'টাইগার পাসের' মোড়ে একখানা মোটরের বড় আলো। বিপ্লবীরা সামরিক কায়দায় অস্ত্র নিয়ে মোকাবেলা করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। মোটর আরও এগিয়ে আসতে থাকলে বিপ্লবীদের আদেশ ঘোষিত হয়, "হল্ট" (থাম)।

জবাব আসে, "আমি জিলা ম্যাজিস্ট্রেট"।

ঐ মোটরে তখনকার ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিন্সন্ ও তার দেহরক্ষী ছিল। রাতের নির্জনতায় গোলাগুলীর শব্দ শুনতে পেয়ে সে বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এদিকে এসেছে। তখনও তার ধারণাই হয়নি যে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের পক্ষে অস্ত্রাগার দখল ও অধিকার করা সম্ভব। দূর থেকে খাকী পোশাকে বিপ্লবীদের দেখে নিজেদেরই লোক মনে করে বেশ সাহস ও ভরসা নিয়েই সে জবাব দিয়েছিল এবং গাড়ীকে বিপ্লবী সান্ত্রীদের আদেশ অনুসারে থামাবার কোন প্রয়োজন সেই ম্যাজিস্ট্রেট বোধ করেনি।

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের গুলী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ীর দিকে বর্ষিত হয়। মোটর টায়ারেও গুলী লাগে ও তার হাওয়া বেরিয়ে যায়, তাই গাড়ী থেমে যায়। বিপ্লবী সৈনিকরা তখন অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যায়। টর্চ ফেলে দেখে মোটরখানার ড্রাইভার নিহত হয়েছে আর ম্যাজিস্ট্রেট গাড়ীতে নেই। উইলকিন্সন্ সাহেব নাকি অত্যন্ত দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে রাস্তার পাশে গভীর নালার মধ্যে কতক্ষণ লম্বা হয়ে শুয়েছিল, যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। তারপর বিপ্লবীরা যখন অস্ত্র বোঝাই করার জন্য ব্যস্ত, এই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বেদনা-ভারাক্রান্ত মনে নিজের ঝাউতলার নিকটবর্তী উচ্চ পাহাড়ী বাংলোয় ফিরে আসে এবং কোথাও খবরাখবর করতে না পেরে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখলকারী দলের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত যে সময় নির্দিষ্ট ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী সময় যাওয়াতে সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন, অনন্ত সিংহ ও অন্য কিছু বিপ্লবীকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও

প্রয়োজন বোধে সাহায্যের জন্য পাহাড়তলী অস্ত্রাগারে মোটর যোগে পাঠিয়ে দেন। তারা এসে দেখে বিপ্লবীনেতা নির্মলসেন ও লোকনাথ বলের নির্দেশে কেবল অস্ত্র বোঝাই হচ্ছে মোটরে। কিন্তু নিজেদের কোনমতে বসবার যায়গা চাই, তাই বহু অস্ত্রবোঝাই সম্ভব হচ্ছে না। অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে যে বিপ্লবীরা আসে, তারা উন্মুক্তদ্বার অস্ত্রাগার দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে ছুটে গিয়ে তাদের মোটরেও অস্ত্রবোঝাই আরম্ভ করে। তারপর অস্ত্রাগারে পেট্রল দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মোটর দু'খানা এগিয়ে চলে সর্বাধিনায়কের হেড কোয়ার্টারে।

পূর্ব-নির্ধারিত কার্যসূচী অনুসারে সিদ্ধান্ত ছিল সর্বপ্রথম দল যখন সংবাদ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল করতে যাবে, তার কয়েক মিনিট পরে যাবে পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখলকারী দল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দল যাবে চট্টগ্রাম ইউরোপীয় ক্লাব (বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব) আক্রমণ করার জন্য। আর অবশিষ্ট বিপ্লবীরা সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন ও নেতা অনন্ত সিংহের পরিচালনায় শহর দখল পরিকল্পনার সর্বশেষ ঘাঁটি দামপাড়া রিজার্ভ পুলিশ ব্যারাকের পাহাড়ে সানুদেশে অন্য দলগুলির নিজ নিজ দায়িত্ব সাফল্যের সহিত পালন করে এসে মিলিত হবে। তারপর মোট ৬৩ জন বিপ্লবী নূতন সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, চট্টগ্রামে সেই তারিখে ইংরেজ সরকারের সর্বশেষ অবলম্বন ঐ রিজার্ভ পুলিশেদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম শহর দখল করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে দামপাড়ার ঐ পাহাড়ের গোড়াতেই সর্বাধিনায়ক সূর্যসেনের সদর দফতর স্থাপিত হয়েছিল।...

তারপর শুরু হ'ল চট্টগ্রাম রিজার্ভ ফোর্স আক্রমণ। বিপ্লবী নেতারা তাঁদের নিজ নিজ দল নিয়ে সমবেত। পাহাড়তলী অস্ত্রাগারের রাইফেল, রিভলভার ইত্যাদি নিয়ে গাড়ী বোঝাই করে এসেছেন নির্মল সেন, লোকনাথ বল আর অনন্ত সিংহ। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা অপেক্ষা করে রয়েছেন শহরের অন্যান্য দলের বিজয়ীদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। তারপর একযোগে চট্টগ্রাম শহরে সেই রাত্রির মত ইংরেজ সরকারের শেষ ভরসা, এই পুলিশ রিজার্ভ ফোর্সকে পরাজিত করার জন্য চলে অধীর প্রতীক্ষা।...

উপরে উঠবার পর প্রহরারত সান্ত্রী ও হাবিলদার প্রথমে সামরিক পোষাকে সজ্জিত গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহকে দেখতে পেয়ে নিজেদের কোন ঊর্ধতন কর্মচারী মনে করে সেলাম দেয়। রাইফেলধারী ঐ সান্ত্রী ঐ দুই বিপ্লবী নেতার গুলীতে যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তখন আর কোন লড়াইয়ের দরকার হয় না। রাইফেল, গুলী ও অস্ত্রাগার ফেলে

ইংরেজ সরকারের বেতনভুক্ত এই সব দরিদ্র দেশবাসী ব্যারাক ত্যাগ করে পালিয়ে যায়।

একরকম বিনা আয়াসেই জিলায় বিদেশী শক্তির শেষ প্রধান সশস্ত্র ঘাঁটি বিপ্লবীদের দখলে এসে গেল। আবার জোর গলায় ধ্বনি উঠল, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ," "বন্দেমাতরম," "স্বাধীন ভারত কী জয়"। পাহাড়-বন ঘেরা এই চট্টগ্রামের রাতের আঁধারের বুক চিরে এই বিপ্লবীদল দেশের মানুষের মনে সেই রাত্রে ছড়িয়ে দিল আলোর রেখা। সে আলো ছড়িয়ে পড়ে মুক্তিকামী ভারতবাসীর মনে প্রাণে, দূর হয়ে যায় নৈরাশ্য, হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারে কিছুকালের জন্য কিছু মানুষের মন থেকে।

দামপাড়ার ঐ পুলিশ রিজার্ভ ব্যারাকে তখন সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের প্রধান দফতর স্থাপন করা হল। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রভৃতি নেতারা সেখানেই বিপ্লবীদের রাইফেল শিক্ষা দিতে থাকেন। এর পূর্বে বিপ্লবীদের কোন রাইফেল ছিল না। তারা কেবল রিভলভার পিস্তল আর সাধারণ বন্দুকের ব্যবহার শিখতে পেরেছিল। পাহাড়তলী অস্ত্রাগার ও রিজার্ভ-ফোর্স থেকে সংগৃহীত রাইফেল আর গুলী প্রচুর পেয়ে আগের কার্টিজ-গান, পুরানো রিভালভার, পিস্তল সব ফেলে দিয়ে, ওয়াব্‌লি ও কোলট্‌ রিভলভার সবার হাতে আর কোমরে উঠেছে। সফেল্যের আনন্দে সবাই চঞ্চল। তাই নূতন ভাবে রাইফেল শিক্ষাও দ্রুত এগিয়ে চলেছে আর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে নেতারা তখন জরুরী আলোচনা করছেন।

ঠিক এমন সময় হঠাৎ মেশিনগানের গুলী বিপ্লবীদের উপর বর্ষিত হতে আরম্ভ করল। আকস্মিক ভাবে আক্রান্ত হলেও, নেতারা একটুও বিচলিত না হয়ে বিপ্লবী যোদ্ধাদের বুকের উপর শোয়া অবস্থায় রাইফেল চালাবার নির্দেশ দিলেন। সামান্য কয়েক মিনিট মাত্র এই ভাবে উভয়পক্ষে গুলী বিনিময়ের পর শত্রুপক্ষের মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থান পরিকল্পনার সময় প্রধান দুটি অস্ত্রাগার দখল করার কথাই চিন্তা করেছিলেন। কারণ পাহাড়তলী অস্ত্রাগারই চট্টগ্রাম অক্‌জিলিয়ারী ফোর্স আর রেলওয়ের অস্ত্রাদি নিয়ে ইংরেজ সরকারের প্রধান অস্ত্রের ঘাঁটি ছিল। দ্বিতীয় অস্ত্রাগার ছিল রিজার্ভ ফোর্সের ব্যারাকে। জেটিতে সরকারী বন্দর কর্তৃপক্ষের আট দশটা রাইফেল আর একটি মেশিনগান ছিল। শহরের ইংরেজ ও অন্যান্য ইউ-রোপীয় কর্মচারী ও ব্যবসায়ীরা সংবাদপত্র থেকে আইন অমান্য আন্দো-লনের তীব্রতা ও সেই আন্দোলনে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান যোগদানের খবর জানতে পেরে নৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই তারা যখন পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখলকালীন গোলা-গুলীর শব্দ শুনল,

তখন তারা টেলিফোন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে, তারপর পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখলকার বিপ্লবীদের গুলীর ঘায়ে বিতারিত ইংরেজ জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিনসন ফিরে গিয়ে ইংরেজদের খবর দেন যে, চট্টগ্রাম সম্ভবতঃ তাদের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে।

তখন সাহসী কয়েকটি ইংরেজ কর্মচারী ও ব্যবসায়ী জেটির ছোট অস্ত্রাগারটি থেকে সেখানকার একমাত্র মেসিনগানটি নিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে লড়বার জন্য স্থির করে। দামপাড়ায় রিজার্ভ পুলিশ ব্যারাকে যে বিপ্লবীরা আছে, তা আবার রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর এক দারোগা ও সিপাহীরা পালিয়ে এসে খবর দেয়। তখন ইংরেজরা কষ্ট করে মেসিন-গানটি দামপাড়ায় যে মিউনিসিপ্যালিটির জলসরবরাহের দমকল আছে তার উচ্চ জলাধারের উপর উঠিয়ে তা থেকে গুলী চালাতে শুরু করে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গুলীর লক্ষ্যসীমার যে দূরত্ব, তার চেয়ে অনেক নিকটে যখন বিপ্লবীরা তাদের নূতন শেখা রাইফেল নিয়ে বুকের উপর শুয়ে শুয়ে গুলী চালাচ্ছিল, মেশিনগান থেকে গুলী গিয়ে তাদের পিছন দিকে বেশ দূরে পড়ছিল। একটি গুলীও বিপ্লবীদের কাছাকাছি পড়েনি, অথচ তাদের রাইফেলের গুলী গিয়ে জলকলের কাছে গিয়ে পড়ছিল। তাই ইংরেজরা কিছুক্ষণ ঐ মেশিনগান দিয়ে বিপ্লবীদের ঘায়েল করার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে বিদায় নেয়।...

এই ঘটনার পর স্থানীয় ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, আর তাদের পক্ষে চট্টগ্রামে থাকা সম্ভব হবে না। তাদের নারী ও শিশুদের শহর ও পাহাড়তলীর তাদের বাসস্থান থেকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত তারা করে। এক বিদেশী জাহাজে শিশু ও নারীদের তাড়াতাড়ি মোটরে করে উঠান হয়। এবং ঐ জাহাজখানা কর্ণফুলী নদীর মোহনার বাইরে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে নোঙ্গর করে রাখা হয়।

তখনও রেডিওগ্রাম আমাদের এই উপমহাদেশে চালু হয় নি। দূরে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের প্রধান ব্যবস্থা ছিল টেলিগ্রাফ করা, কিন্তু বিপ্লবী-দের দূরদর্শী পরিকল্পনার প্রথম কাজও ছিল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস দখল ও ধ্বংস করে সারা দুনিয়ার সঙ্গে চট্টগ্রামের সংবাদ যোগা-যোগ ব্যবস্থা বিকল করে দেওয়া। তাই ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের এতবড় বিপদের খবর রাজধানী কলিকাতায় প্রাদেশিক লাট সাহেব ও অন্যান্যদের কাছে জনাবার জন্য পোর্ট কর্তৃপক্ষের শরণ নেয়। সেখানে ছিল বিনাতারের টেলিগ্রাফ। তার সাহায্যে তদানীন্তন লাট সাহেবকে চট্টগ্রামের ঘটনা জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে

বাংলা দেশের যে কোন দেশভক্তকে বিনা বিচারে আটকের জন্য অবিভক্ত বাংলার গভর্ণর এক জরুরী আইন জারী করে। ১

১৯শে এপ্রিল, ১৯৩০ ইং সারা বাংলায় শুরু হল পুলিশের তান্ডব-লীলা। আগে যে প্রধান দু'টি বিপ্লবীদলের কথা বলা হয়েছে, সেই যুগান্তর ও অনুশীলন এবং ব্যক্তিকে ঘিরে অন্য যে সব ছোট ছোট বিপ্লবীদল অবিভক্ত বাংলায় ছিল, ঐ দিন ভোর থেকে তাদের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হলা।

এদিকে রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ব্যারাকে এক ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। শহরের চন্দনপুরা এলাকার বিপ্লবী হিমাংশু সেন (আন্ডু) রিজার্ভ বাহিনীর অস্ত্রাগারটি পেট্রোল দিয়ে আগুন দিয়ে জ্বালেয়ে দিতে গিয়ে ভয়ানকভাবে দগ্ধ হয়ে যায়। তার করুণ আর্তনাদে গণেশ ঘোষ অনন্ত সিংহ ইত্যাদি নেতা ছুটে গিয়ে তাকে মাটিতে গড়িয়ে দিয়ে জামাকাপড়ের অগুন নিভাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার কাপড়-চোপড় আগে থেকেই পেট্রোলে কিছুটা ভিজা থাকায়, কোন মতেই তাকে আগুনের প্রকোপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তার মর্মন্তুদ অবস্থা দেখে বিমূঢ়ের মত অন্যান্য বিপ্লবীরা দাঁড়িয়ে থাকে তাকে ঘিরে। নেতারা আদেশ দেন ঐ আগুণের আলোর কাছে কেউ যেন না থাকে, তাহলে শত্রুরা তাদের দেখে ফেলতে পারে।

বিপ্লবায়োজনের শুরুতেই একটি সিদ্ধান্ত ছিল যে, গুরুতরভাবে আহতদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে যদি বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে কম ক্ষতি হিসাবে গুরুতরভাবে আহত সহযাত্রীকে গুলী করে হত্যা করতে হবে। আর কোন নারীকে কোন কারণে হত্যা করা হবে না।

হিমাংশু ছিল অত্যন্ত চমৎকার স্বাস্থ্যের। সাহসী এই কিশোরকে নেতারা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁদের চোখের সামনে যন্ত্রণায় তাঁদেরই দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্দীপিত সাথীটি ছটফট করেছে, পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে গুলি করলে সব যন্ত্রণার অবসান এই মুহূর্তেই হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, মাখন ঘোষাল ও হিমাংশুর অন্তরঙ্গ সহপাঠী আনন্দগুপ্ত একখানা মোটরে করে তাকে নিয়ে প্রথমে আনন্দ গুপ্ত-দের বাসায় নিয়ে আসেন। সেখানে থেকে আনন্দ গুপ্তের মহানুভব পিতা বহুকষ্টে গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হিমাংশুকে তাদের চন্দনপুরা বাসায় রেখে আসেন। সেই সময় হিমাংশুর পিতা আইনজীবি চন্দ্রনাথ সেন পরিবারের সকলকে নিয়ে তাদের গ্রামের বাড়ী সাতকানিয়ায় গিয়েছিলেন এবং বাসা সম্পূর্ণ খালি ছিল। কাছেই ছিল শহীদ অর্ধেন্দু

দস্তিদারের বাসা। হিমাংশুর অবস্থার কথা সেখানে এরা জানিয়ে দেয় এবং অর্দ্ধেন্দুর ছোট ভাই সুখেন্দু গোপনে হিমাংশুর চিকিৎসা ও সেবার ভার নেয়। সুখেন্দু তার মায়ের কাছ থেকে দুধ গরম করে বোতলে ভরে গায়ের চাদরের তলায় করে নিয়ে তাকে খাওয়াতে থাকে। কিন্তু খালি বাসায় এই যাতায়াত গোপন থাকে না। দু'তিন দিন পর মুমূর্ষু বিপ্লবী হিমাংশুকে তার বাসা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং তার কয়েকদিন পর পর্যন্ত পোড়া ঘা'র অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে হিমাংশু মৃত্যুবরণ করে।

হিমাংশুকে রেখে ভোর রাত্রে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও মাখন ঘোষাল কলেজ রোডে প্যারেড ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার ব্রাহ্ম-মন্দিরের পিছনে আনন্দ গুপ্তের বাসায় যায়। কারণ সবই তখন বিশেষ-ভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। অভ্যুত্থানে যাওয়ার আগে বিপ্লবীরা স্থানীয় চায়ের দোকনদার আঁব্বি মিঞাকে তাদের জন্য ৬৩ প্লেট মুরগীর মাংস ও পরোটার অর্ডার দিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল অভ্যুত্থানের বিজয়কে আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে ঐ দোকানে খাওয়ার মাধ্যমে অভিনন্দিত করা হবে। কিন্তু হিমাংশুর দুর্ঘটনা এবং তার পূর্বে জল-কলের উপর থেকে মেশিনগানের গুলী চলার ফলে, ঐ রাত্রে সম্পূর্ণভাবে জয়ী হয়েও বিপ্লবীরা শহর দখল করতেও আসেনি এবং উপরোক্ত দোকানে ভোজের ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়।

ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গোপনে আনন্দ গুপ্তদের বাসায় এই চারজন বিপ্লবী যেতেই আনন্দের মা তাড়াতাড়ি তাদের জন্য খিচুরী রান্না করেন। চারজনকেই কোনমতে খেয়ে আবার গিয়ে বিপ্লবীদের সদর দফতরে সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন ও অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। এদিকে বিপ্লবীরা শহরে প্রবেশ না করায় কোতোয়ালীর দারোগা তার হাতে যে কয়েকজন পুলিশ ছিল তাদের নিয়ে পরিচিত বিপ্লবীদের শহরের বাসায় হানা দিতে শুরু করে। এক বড় থালায় যখন গোল হয়ে এই চারজন বিপ্লবী খিচুরী খেতে বসেছে, দারোগা পুলিশ তখন আনন্দদের পাহাড়ী টিলার উপর উঠে পড়েছে। তার বোন ছিল পাহারায়। সে ছুটে এসে খবর দিতেই খিচুড়ী ফেলে রেখে পিছনের দরজা দিয়ে বিপ্লবীরা দেবপাহাড়ের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পালাতে সমর্থ হয়। এই চারজন বিপ্লবীর পরবর্তী অবস্থা পরে বলছি। এখন মূল দলের কাহিনীতে আবার আমরা ফিরে যাই।

প্রধান বিপ্লবী নেতা দুইজন অগ্নিদগ্ধ হিমাংশুকে রেখেই ভোর হবার পূর্বে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন, এই আশা নিয়ে সবাই

অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ঊষার আভাস দেখা গেলেও তাঁরা যখন ফিরে এলেন না, তখন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করার জন্য রাত শেষ হবার আগেই অন্য পাহাড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। সূর্য সেন, নির্মল সেন ও লোকনাথ বল সহ দলের অবশিষ্ট ৫৮ জন সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় পুলিশ ব্যারাকের পাহাড় ত্যাগ করল। তার উত্তরে সবুজ যে পাহাড়ের সারি, তার দিকে চলে যেতে হবে, শহরের অবস্থার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে ও যে চারজন বিপ্লবী শহরে গেছে, তাদের সঙ্গেও মিলিত হতে হবে। পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ পথে চারজন ছাড়া অন্য সকলে যাত্রা করল। তখন ঊষা আসন্ন, পূর্ব আকাশে লালিমার আভা। তার রং এসে লাগে মুক্তিপাগল এই সব কিশোর আর তরুণদের মনে। তাঁরা রাইফেল, গুলীর বস্তা ও অন্যান্য জিনিস কাঁধে নিয়ে হাসতে হাসতে দেশের বন্ধন মুক্তির শপথ স্মরণ রেখে বিপ্লবীরা এগিয়ে চলে।

প্রতিদিনের মত আকাশে সূর্য জেগে ওঠে। লতাগুল্মশোভিত সবুজ পাহাড়ের ঘন বনের ছায়ায় সোনালী আলোর টুকরো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯শে এপ্রিল সকালে বায়েজিদ বোস্তামীর আস্তানার পাশে নাগরখানা পাহাড়ে বসে সূর্য সেন, নির্মল সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী এক জরুরী বৈঠক করেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অবিলম্বে স্থির করা উচিত কিন্তু শহরের অবস্থা জানার পূর্বে তার জন্য কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তাই বিপ্লবীদের মধ্যে একজনকে শহরে পাঠান হল। তার খাকী পোষাক পরিবর্তন করে তাকে ধুতি শার্ট পরে যেতে বলা হল। এই যুবকটি ছিল সেই বছরের বি, এ, পরীক্ষার্থী। সে শহরে এসে দেখল, কোনো পুলিশ মিলিটারীর বিশেষ বাড়াবাড়ি তখনও নেই—প্রায় শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন চলছে শহরে। কিন্তু গতকাল রাত্রের ঘটনার আলোচনা করছে মানুষ চায়ের দোকানে ও অন্যান্য জায়গায়। অনেকে খুব খুশী হয়েছে যে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সরকারকে এমন জব্দ করেছে। সংবাদ সংগ্রহের গুরু দায়িত্ব নিয়ে এই তরুণ বিপ্লবী শহরে আসবার পর, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখের মায়া তার মনে দুর্বলতা সৃষ্টি করল। সে ভাবল গতকাল রাত্রে ত ছিলাম। সব কিছুতেই যখন জয় লাভ ঘটেছে, তার মধ্যে সেও কিছুটা সাহায্য করেছে। কিন্তু সেদিন যদি সে চট্টগ্রাম কলেজে গিয়ে বি-এ পরীক্ষা না দেয়, তাহলে আর কোনদিন ভবিষ্যতে তার হয়ত গ্র্যাজুয়েট হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই আদর্শের প্রতি ও নিজ দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এই যুবকটি আর খবর নিয়ে পাহাড়ে সাথীদের কাছে ফিরে গেল না। যখন গভীর উৎকণ্ঠায় নাগরখানা পাহাড়ে বিপ্লবীরা সময় কাটাচ্ছে তখন নিশ্চিন্তে ছেলেটি চট্টগ্রাম কলেজে বি-এ পরীক্ষা দিতে বসল।

সূর্যসেন স্বভাবতই ধীর প্রকৃতির তবু বার বার তিনি পথের দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁদের প্রেরিত যুবকটি আসছে কিনা। এদিকে দলের কিশোর ও যুবকদের কিছু খাদ্যেরও প্রয়োজন। অথচ জঙ্গলের বাইরে গিয়ে দিনের বেলায় কোন খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই এই উৎসাহী বিপ্লবীরা জঙ্গলের ভিতরেই খাদ্য সংগ্রহে লেগে গেল। তখন ছিল গাছে গাছে কচি আম। তেঁতুল গাছ থেকে কচি তেঁতুল পাতাও অনেক সংগ্রহ করা হল। কচি আম আর তেঁতুল পাতা দিয়ে ১৯শে এপ্রিল দিনের বেলায় মহা উৎসাহে বিপ্লবীদের ভোজনপর্ব সমাধা হল।

রাতের আঁধার জঙ্গলে পাহাড়ে কিছুটা আগেই ঘনিয়ে আসে। নেতারা স্থির করলেন আবার একজনকে পাঠাতে হবে শহরে খবরের জন্য। কিন্তু একা নয়, দু'জনকে পাঠাতে হবে।

প্রথমবার একা পাঠাবার ফলেই হয়ত সে বিপদে পড়েছে এই কথা ভেবে বিপ্লবী নেতারা বেশ চিন্তিত হয়েছেন। শহরের অবস্থা জানবার জন্য এবার পাঠানো হল কিশোর বিপ্লবী অমরেন্দ্র নন্দী এবং অন্য একটি বিপ্লবীকে।

শহরে একটি ছাত্রের উপর ১৯শে এপ্রিল তারিখে ইস্তাহার বিলির ভার ছিল। অমরেন্দ্র গোপনে তার কাছে এসে জানতে পারে শহরে মিলিটারী আর পুলিশের অত্যাচার শুরু হয়েছে। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ইত্যাদি চারজন বিপ্লবীর কোন সংবাদ তার কাছে পাওয়া গেল না। তবে অনন্তসিংহের পিতা গোলাপসিংহ, রজতসেনের পিতা স্থানীয় জজ-কোর্টের উকিল রঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ ও আনন্দ গুপ্তের পিতা যোগেন্দ্র গুপ্ত (মনাগুপ্ত) ইত্যাদিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং পরিচিত যে সব বিপ্লবীদের শহরে বাসা আছে, সেখানে বার বার পুলিশের খানাতল্লাসী চলছে। সেই সময় ঘরে অনুপস্থিত সন্দেহভাজন বিলবীপুত্র বা আত্মীয়ের সংবাদ দিতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক পিতামাতা ভাই-বোন কতজন যে ইংরেজ সরকারের গোলাম ঐ সব পুলিশ মিলিটারী দ্বারা জঘন্যভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ক্ষুধায় কাতর হয়ে অমরেন্দ্র তাদের ফিরিঙ্গি বাজার বাসায় গোপনে ওঠে। তার অভিভাবকদের সে বলে, কিছু খেয়ে সে চলে যাবে ঐ রাত্রেই। তাঁরা তাকে আর যেতে দিতে চান না। অনেক যুক্তি তাঁরা অমরেন্দ্র দিলেন, কিন্তু সে তার সংকল্পে অটল, অবিচল তার আদর্শনিষ্ঠা। তাই তাঁরা স্থির করলেন কাছেই যখন কোতোয়ালী থানা, অমরেন্দ্র বাসায় যখন খেতে থাকবে, তার মধ্যে যদি খবর ওখানে দেওয়া হয়, তাহলে পুলিশ তাড়াতাড়ি এসে তাকে ধরে ফেলবে এবং পুলিশের হাতে পড়ে গেলে,

বিপ্লবীদলের অত্যন্ত বিপজ্জনক কার্যক্রমে তার যোগদানকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করলে প্রথম কিছুদিন যদি তাকে জেলেও আটক রাখে ক্ষতি কি, পরে চেষ্টা করে ছাড়িয়ে আনা যাবে। কিন্তু অমরেন্দ্র ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। সে খেতে বসার একটু পরই টের পায় যে রাস্তায় ভারী বুটের দৌড়াবার শব্দ। তৎক্ষণাৎ সে তার গুলীভরা রিভলভারটি নিয়ে বাসার ভিতরদিক থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। একটু পরে সে পুলিশের সামনেই পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তার এক পোলের তলায় আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের দিকে গুলি চালাতে থাকে। কয়েকটা মাত্র বাড়তি বুলেট তার কাছে ছিল—রিভলভারের শেষ বুলেট যতক্ষণ পর্যন্ত অমরেন্দ্রের কাছে ছিল, ততক্ষণ সে আত্মসমর্পণ করেনি। মহাভারতের সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মত চট্টগ্রামের বীরবিপ্লবী অমরেন্দ্র নন্দী লড়তে থাকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টিত পুলিশবাহিনীর সঙ্গে। প্রাণের বিনিময়ে অমরেন্দ্র তার দেশপ্রেমের আদর্শকে অমর করে রাখে। ১৮ই এপ্রিলের পর থেকে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলে অমরেন্দ্রই প্রথম শহীদ হল।

আরও একটি রাত্রি বিপ্লবী নেতাদের অত্যন্ত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় কাটল। শহর থেকে কোন খবর দ্বিতীয় দফায় প্রেরিত সাথীরাও নিয়ে কেন ফিরল না, তা তাঁদের কছে তখনও অজ্ঞাত। তাঁরা আরও কিছুটা উত্তরে ফতেয়াবাদের কাছে এক পাহাড়ে রাত্রের অন্ধকারে সকলকে নিয়ে চলে গেলেন। ২০শে এপ্রিল আর ২১শে এপ্রিল ঐ ভাবে কেবল সংবাদ পাওয়ার আশায় বিপ্লবীদের দিন কাটে পাহাড়ে পাহাড়ে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে।

এই তিনদিন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তারা নানা উপায় গ্রহণ করে। কাঁচা আম আর তেঁতুল পাতার কথা তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পাহাড়ের পাশে সমতলভূমিতে এক তরমুজ ক্ষেত ছিল। ছোট বড় মাঝারি বেশীর ভাগ কাঁচা ও সামান্য কিছু পাকা তরমুজ ছিল ঐ ক্ষেতে। ক্ষুধায় কাতর বিপ্লবীরা ১৯শে রাত্রে ঐ তরমুজ ক্ষেতের প্রায় সব তরমুজই খেয়ে ফেলে।

পরের রাত্রে ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে বিপ্লবীরা আগের রাত্রেই পরিত্যক্ত তরমুজের খোসাগুলি আবার খেতে বসে। এর ভিতরে এই দলের অন্যতম বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তী একদিন চাকরের ছদ্মবেশে বিবির হাটে গিয়ে এক ঝাঁকা বিস্কুট কিনে নিয়ে আসে। অন্যতম নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ফতেয়াবাদের এক পরিচিত বাড়ী থেকে বড় এক হাঁড়ি খিচুড়ী নিয়ে আসেন। পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে সরু জলের

ধারা বয়ে আসে। তার জল দিয়ে বিপ্লবীরা পিপাসা নিবৃত্তি করে। এভাবে এই বিপ্লবীরা এক আসন্ন সংঘর্ষের জন্য তৈরী হয়।

২২শে এপ্রিল ১৯৩০। এই দিনটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল মোচনের জন্য সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার দাবী করতে পারে। ২২শে এপ্রিলের এই সংগ্রামে সম্মুখ যুদ্ধে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৩ বৎসর পরে ইংরেজ শাসনে এই প্রথমবার চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী সূর্যসেন পরিচালিত বিপ্লবী যোদ্ধারা, ইংরেজ সরকারের সৈনিকরা সংখ্যায়, বয়সে, অস্ত্রে এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় অনেক বেশী হওয়া সত্বেও শোচনীয়ভাবে তাদের পরাজিত করে।...

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে নেতাদের মধ্যে ছিলেন সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন, অন্যতম দুই প্রধান নেতা নির্মল সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী এবং অন্যতম নেতা লোকনাথ বল। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ অন্য দুইজন বিপ্লবী সাথীকে নিয়ে তখনও ফিরে আসতে পারেন নি। অথচ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামের এই অমর মুহূর্তে বার বার এই দুইজন তরুণ নেতার অভাব এঁদের মনকে পীড়িত করছিল।...

২২শে এপ্রিল ১৯৩০ তারিখ ভোরে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে এসে পেঁছায়। তার আগের দিন পর্যন্ত কাছাকাছি গ্রামের কেউ তাদের ঐভাবে পাহাড়ে অবস্থানের বিষয় জানত না। তবে ঐ বিরাট ঘটনা সম্পর্কে সারা জেলায় হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের ভিতরে সব সময় আলোচনা চলছে, নিজেদের জেলার এইসব সাহসী যোদ্ধাদের জন্য সকলে গৌরববোধ করেছে এবং গোপনে গোপনে অভিনন্দিতও করেছে। আর পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারের খবরও এর মধ্যে কিছু কিছু লোকের জানা হয়ে গেছে।

জালালাবাদ পাহাড়টি একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় নয়। চট্টগ্রাম পাহাড়ী জেলা। শহরেও অনেক পাহাড় আছে। শহরের উত্তর দিকে ষোলশহর থেকে পাহাড়ের সারি উত্তরে ফতেয়াবাদ পর্যন্ত গিয়ে কুমিরার দিকে সীতাকুণ্ড পাহাড়শ্রেণীর সঙ্গে যোগ হয়ে গেছে। এসব পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে সমতল জমিতে ধান হয়। কোথাও বিরল বসতিও আছে। এই পাহাড়ের কাছাকাছি গ্রামের হিন্দু-মুসলিম গরীব অধিবাসীদের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার যায়গা হল এই সব পাহাড়।

২২শে এপ্রিল সকালে বিপ্লবীরা যখন জালালাবাদ পাহাড়ে বসে বিশ্রাম করছিল, তখন কয়েকজন কাঠুরিয়া ঐ পাহাড়ে জ্বালানী কাঠ

সংগ্রহ করার জন্য ওঠে। কাছাকাছি সব পাহাড়ের মধ্যে এইটি সবচেয়ে উ'চু। সরল এই সব গ্রামের লোক দেখল খাকী পোশাকের রাইফেল-ধারী সব বালক-যুবক কেউ বসে, কেউ বা শুয়ে গল্প করছে। তারা তাড়াতাড়ি নীচে ফিরে গিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশনের আনন্দে বলে যে, স্বদেশীরা ঐ পাহাড়ে আছে। কোন পুরস্কারের লোভে যে তারা ঐ খবর বলেনি, তা বলাই বাহুল্য। নিছক বিস্ময়, গৌরববোধ ও কিছুটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকেই তারা নিজ প্রতিবেশীর কাছে খবর দিয়েছিল। পরে ঐ খবর পুলিশের কাছে গেলেই, ঠিক জালালাবাদ পাহাড়ের কাছে এসে মিলিটারী সশস্ত্র রেলগাড়ী (আর্মর্ড ট্রেন) থামে। ঝরঝরিয়া বটতলী চট্টগ্রাম-হাটহাজারী মোটর রাস্তার উপর কয়েকটি দোকান ও একটি মসজিদ নিয়ে বেশ পরিচিত একটি বসতি। বড় রাস্তার উপর যে মসজিদ, তা অনেক দিনের প্রাচীন। বড় রাস্তা থেকে ঐ মসজিদের পাশ দিয়ে একটি পায়ে চলাপথ পাশের চট্টগ্রাম-নাজিরহাট রেলওয়ে লাইন পার হয়ে এগিয়ে গেছে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে। এখান থেকে পঁচিশ গজের মত ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে সব চেয়ে উ'চু পাহাড়টি দেখা যাবে, সেটাই শহীদ স্মৃতিপূত জালালাবাদ পাহাড়। বর্তমানে জালালাবাদ পাহাড়টি সামরিক ছাউনি এলাকায় (মিলিটারী ক্যান্টনম্যান্ট এরিয়া) পড়েছে।*

জালালাবাদ পাহাড়ে যখন এই বিপ্লবীরা কেউ রাইফেল পরিষ্কার করছে, তিন প্রধান ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত, তখন উ'চু গাছের ডালে দু'তিন ঘন্টা অন্তর অন্তর নিয়মিত পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে বিপ্লবীরা ভোলেনি। গাছের ডালে অপেক্ষমান ঐ বিপ্লবী-শান্ত্রী সবার আগে দেখতে পায় যে, সামরিক রেলগাড়ীখানা কোন স্টেশন না থাকা সত্ত্বেও অদূরে রেললাইনের উপর থেমে গেল। তখনই সে সাবধানসূচক ধ্বনি দেয়।

দেখা গেল সশস্ত্র সামরিক গাড়ী থেকে নেমে আসছে দলে দলে সৈন্য। জালালাবাদ পাহাড়ের নীচে পূর্বদিকে খালি ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসতেই পাহাড়ের নীচে ঝোপের আড়াল থেকে এক ঝাঁক গুলী দিয়ে বিপ্লবীরা তাদের অভিনন্দন জানায়।

* এই কারণেই লেখকের ২৩-৯-৫৬ ইং তারিখের পূর্ব পাক পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ১২ জন জালালাবাদ শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ ঐ জালালাবাদ পাহাড়ের উপরে করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা যায় নাই। সরকার বিকল্পস্থানে ঐ স্মৃতিস্তম্ভ করার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু তার পূর্বেই সরকার পরিবর্তন হওয়ায় তা এখনও কার্যকরী হয়নি।

বিপ্লবীরা পাহাড়ের উপরে থাকায় তাদের অনেক সুবিধা হয়, কারণ তার ফলে সৈন্যরা তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন আন্দাজই করতে পারে না। যারা চারদিন আগে সারা শহর থেকে বৃটিশ শাসনকে লুপ্ত করে দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা যে এত কম, তার সংবাদ অনেকদিন পরে ইংরেজ শাসকরা জানতে পারে। ঝোপের আড়াল থেকে ঐ ভাবে অকস্মাৎ গুলীর আঘাতে সৈন্যদল বিভ্রান্ত হয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে। আবার অধিনায়ক তাদের নিয়ে এগিয়ে আসে এবং পাহাড়ের দিকে গুলী ছুঁড়তে থাকে। এভাবে উভয়পক্ষের গুলী বিনিময় চলে কিছুক্ষণ। সৈন্যরা তারপর জালালাবাদ পাহাড়ের পূর্বদিকে যেই ছোট একটি পাহাড় আছে, তার উপরে লুইসগান বসিয়ে বিপ্লবীদের দিকে গুলীবর্ষণ করে। প্রতি মিনিটে ৩৫০টি গুলী নিক্ষিপ্ত হতে লাগল জালালাবাদ পাহাড় লক্ষ্য করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত সৈন্যরা এই পাহাড়ে আসেনি, ততক্ষণ বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ হতাহত হয়নি। তবে গাড়ী থেকে নেমে মাঠের উপর দিয়ে যখন সৈন্যরা এগিয়ে আসছিল, তখন বিপ্লবীদের প্রথম আকস্মিক আক্রমণে কয়েকজন সৈন্য আহত হয়। পাহাড়ের দুই চূড়ায় বসে এবার দুইদল পরস্পরকে পরাভূত করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম শুরু করে।

এই সংগ্রামে বিরোধী দুই দলের মধ্যে বিপ্লবীরা বয়সে তরুণ। তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের বয়স দৌদ্দ থেকে পনর। রাইফেল শিক্ষা তাদের ১৮ই এপ্রিলের পূর্বে পাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ বেসরকারী কোন ব্যক্তিকে তখন রাইফেলের লাইসেন্স দেওয়া হত না। বিপ্লবীদের অস্ত্রশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল পিস্তল, রিভলভার, কার্তুজ বা গাদাবন্দুক আর বোমানিক্ষেপ শিক্ষার মধ্যে। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে পাহাড়তলী ও পুলিশ ব্যারাক অস্ত্রাগার দু'টি দখল করার পরই এই ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে গঠিত বিপ্লবী বাহিনীর রাইফেলে হাতেখড়ি হয়। তারপর থেকে গত চারদিন পাহাড়ে পাহাড়ে লুকায়িত থাকার সময় তাদের আর রাইফেল দিয়ে গুলীচালনার কোন অভ্যাস করা সম্ভব হয় নি। তবু তীব্র দেশপ্রেম আর আত্মদানের গভীর আগ্রহের ফলে এই তরুণ বিপ্লবীরা বুকের উপর শুয়ে সৈন্যদের লুইস-গানের গুলীবর্ষণের জবাব দিচ্ছিল। তিন প্রধান নেতা, সূর্য সেন, নির্মল সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী, সঙ্গে থেকে ঘন ঘন তাদের উৎসাহিত করেছেন, গুলী এগিয়ে দিচ্ছেন। গুলীর বাক্স টেনে নিয়ে আসছেন। কারণ লুইসগানের অবিরাম গুলীবর্ষণের সঙ্গে তাল মিলাতে হবে।

এই সময় টেগরা (হরিগোপাল বল) সর্বপ্রথম গুরুতরভাবে আহত হয়। জালালাবাদ যুদ্ধের প্রথম বলি এই ছাত্রটির বয়স তখন মাত্র ষোল-সতর। কিন্তু মৃত্যুবরণ করার সময়ও সে আদর্শভ্রষ্ট হয়নি, একটুও বিচলিত

হয়নি। তার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিপ্লবীনেতা লোকনাথ বল অদূরে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। উপরে তাঁর নিজস্ব বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, মৃত্যু টেগরাকে যেমন দুর্বল করতে পারেনি তেমনি তার সহোদরকেও কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। বরং টেগরার গুলীবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা আরও বেশী তীব্রভাবে গুলী চালাতে থাকে, ক্রমে বিপ্লবীদের মধ্যে আরও আহত হতে থাকে।

এই সময় একটি বড় সমস্যা উপস্থিত হয়। লুইসগানের অবিরাম গুলীবর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না বিপ্লবীরা, কারণ রাইফেলের ম্যাগাজিনে গুলী ফুরিয়ে গেলে তা খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ের বিভিন্ন যায়গায় ছড়ানো বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার হয়। তখন অধিনায়ক লোকনাথ বল আহ্বান করেন, গুলীবর্ষণের ভিতরে গুঁড়ি মেরে নিজেকে সাবধান রেখে কে সকলকে গুলী সরবরাহ করতে পারবে। নিজের রাইফেলটি পাশে রেখে অর্ধেন্দু দস্তিদার বলে, সে সকলকে গুলী দিয়ে আসবে। এই কাজ করতে গিয়ে কিছুক্ষণ পর সেও আহত হয়। এ ঘটনাটি সম্পর্কে বিপ্লবীনেতা লোকনাথবল লেখককে বলেছেন।

যতই বিপ্লবীরা আহত বা নিহত হচ্ছে, ততই তাদের প্রতিশোধের ইচ্ছা তীব্রতর হয়ে উঠছে। মাষ্টারদা গুঁড়ি মেরে বিভিন্ন বিপ্লবী যোদ্ধাকে সাবধান করছেন কিছু আড়াল যেন তারা নেয়। অম্বিকা চক্রবর্তী এ সময় গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়লেন। তিন প্রধান নেতার মধ্যে জালালাবাদে ইনিই আহত হয়েছিলেন। এইভাবে মৃত ও আহত সাথীদের পাশে রেখে বিপ্লবীরা সন্ধ্যার পর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটায় ওদের লুইসগান হঠাৎ থেমে গেল এবং সরকারী সৈন্যদের দিকে পর পর কয়েকটি হুইশেল শোনা গেল। বিপ্লবীরা লক্ষ্য করল, ঐ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সুশিক্ষিত সেনাদল প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন শুরু করেছে। ভাড়াটিয়া এই সৈন্যরা আমাদের দেশেরই গরীব কৃষক মধ্যবিত্তের সন্তান; পেটের দায়ে ফৌজে যোগ দিয়েছে। ইংরেজ শাসন রক্ষার জন্য তাদের আদেশে বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে এরা লড়তে এসেছিল। এরা জানত না যে, তাদেরই দেশের মুক্তি যোদ্ধারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করছে, তার ফলে যে আজাদী আসবে তার সুফল তারাও পাবে—তাই নিজের দেশের মুক্তিকামী ভাইদের কাছে পরাজিত হয়ে তারা প্রাণভয়ে পলায়ন করতে থাকে। এই সময় বিপ্লবীরা তাদের উপর আরও গুলী চালায় এবং জয় নিশ্চিত জানবার পর "বন্দে মাতরম" 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ" "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস

হোক", ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। অদূরে প্রতীক্ষারত সামরিক রেলগাড়ীখানা যখন চলে গেল তখন বিপ্লবীরা নিজেদের নিষ্প্রাণ সাথীদের সব এক যায়গায় নিয়ে এল। সবাইকে পাশাপাশি রাখা হল। তখন যাদের মৃত মনে করা হয় তারা হচ্ছেন :

১. অম্বিকা চক্রবর্তী
২. নির্মল লালা
৩. হরি গোপাল বল (ডাকনাম, 'টেগরা')
৪. নরেশ রায়
৫. বিধু ভট্টাচার্য
৬. প্রভাস বল
৭. জিতেন দাসগুপ্ত
৮. অর্ধেন্দু দস্তিদার
৯. ত্রিপুরা সেন
১০. পুলিন ঘোষ
১১. শশাংক দত্ত
১২. মধু দত্ত
১৩. মতি কানুনগো

যাবার সময় গুলিতে আহত, বিনোদ চৌধুরী* ও বিনোদ দত্তকে তাদের কাঁধে নিয়ে পাহাড় থেকে নামানো হয়। উপরোক্ত ১৩ জন ছাড়া আর সব বিপ্লবীরা রাতের আধাঁরে আহত সহযাত্রীদের নিয়ে অন্য পাহাড়ের দিকে ধীরমন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। জালালাবাদের এই স্মরণীয় ও সফল-সংগ্রামে যেই সব বিপ্লবী যোদ্ধা ১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর থেকে সর্বপ্রথম বৃটিশ সরকারী সৈনাকে সম্মুখ যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছিল, তাদের পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল :—

১. সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, বয়স ৩৫—জন্মস্থান নয়াপড়া, থানা—রাউজান, চট্টগ্রামের অধুনালুপ্ত উমাতারা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক।
২. নির্মল সেন, বয়স ৩৩—কোয়েপাড়া, রাউজান থানা—প্রধান তিনজন নেতার অন্যতম।
৩. অম্বিকা চক্রবর্তী, বয়স ৩৪—দেওয়ানপুর, রাউজান থানা, প্রধান তিনজন নেতার অন্যতম।
৪. গণেশ ঘোষ, বয়স ২৫—যশোহরে পৈত্রিক বাড়ী, কিন্তু চট্টগ্রামেই

* শ্রীবিনোদ চৌধুরী—বৃটিশ শাসনামলে হিজলী ও দেউলী আটকখানায় বহু বৎসর আটক ছিলেন। ১৯৪৮—৫৪ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

বড় হয়েছিলেন। পিতা প্রথমে রেলে চাকুরী করতেন। ১৯২২-এর আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটে যোগ দেন, পরে আর সেই কাজে যোগ না দিয়ে সদরঘাটে "স্বদেশী বস্ত্রালয়" নামে কাপড়ের দোকান খোলেন-ঐ বাড়ীতেই পুলিশ পরে ,মবিলিজেশন লিষ্ট পায়।

৫. অনন্তলাল সিংহ, বয়স ২৪—কয়েক পুরুষ আগে উত্তর ভারত থেকে এঁদের পরিবার বাংলায় আসেন এবং স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করতে থাকেন। বাসা শহরে ছিল তামাকুমণ্ডী—বর্তমানে তাঁর পিতার নামে ঐ গলির নাম গোলাপ সিংহ লেন।

৬. লোকনাথ বল, বয়স ২৩—ধোরলা, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৭. উপেন ভট্টাচার্য, বয়স ৩৪—বেতাগী, রাঙ্গুনীয়া থানা, চট্টগ্রাম।

৮. মধু দত্ত, বয়স ২৬—বিদগ্রাম, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৯. নরেশ রায়, বয়স ২০—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের ছাত্র।

১০. বিধু ভট্টাচার্য, বয়স ২০—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের ছাত্র।

১১. লালমোহন সেন, বয়স ২১—সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

১২. অর্ধেন্দু দস্তিদার, বয়স ১৯—ধলঘাট, পটিয়া থানা চট্টগ্রাম।

১৩. হেমেন্দু দস্তিদার, বয়স ১৫—ধলঘাট, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

১৪. হিমাংশু সেন, বয়স ১৫—সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, শহরেই চন্দনপুরায় থাকত।

১৫. শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, বয়স ২০—বাড়ী কোয়েপাড়া হলেও কক্সবাজারে' আইনজীবি পিতার কাছেই বড় হয়ে উঠেছিল এবং কক্সবাজারেই বিপ্লবী দলে যোগ দেয়।

১৬. নির্মল লালা, বয়স ১৪—সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী, বাড়ী যদিও হাওলা গ্রামে বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম, তার আত্মীয়ের সঙ্গে সে কক্সবাজার থাকত এবং সেই সময় কক্সবাজার স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে পড়ত। সে খুব বেশী জোর করে যে সেও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে যাবে, তাই এত ছোট্ট হওয়া সত্বেও সূর্য সেন তাকে সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দেন।

১৭. দেবপ্রসাদ গুপ্ত বয়স ১৮—প্যারেডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম নেতা রাজেশ্বর গুপ্তের পৌত্র, বর্তমানেও যে ব্রাহ্ম-মন্দিরটি আছে তার পিছনে টিলার উপর তাঁদের সুন্দর বাড়ী, এঁরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আসেন এবং দেবপ্রসাদের পিতার জন্মও চট্টগ্রামে।

১৮. আনন্দ গুপ্ত, বয়স ১৬—দেবপ্রসাদের ছোট সহোদর ভাই।

১৯. মণীন্দ্র গুহ, বয়স ২০—ভাটিখাইন, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

২০. সহায়রাম দাস, বয়স ১৭—রাণাঘাট, রহমতগঞ্জে তার কাকা কো-

অপারেটিভ রেজিষ্ট্রারের বাসায় থাকত।

২১. প্রভাস বল, বয়স ১৮—ধোরলা বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

২২. ফণীন্দ্র নন্দী, বয়স ১৭—দক্ষিণ ভূর্ষি, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

২.৩ রজত সেন, বয়স ১৬—কোয়েপাড়া, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম।

২৪. ত্রিপুরা সেন, বয়স ১৬—ঢাকা, চট্টগ্রামে পিতা চাকুরী করতেন, বাসা ছিল সদরঘাট।

২৫. দ্বিজেন্দ্র দস্তিদার, (শংকু), বয়স ১৮—পরৈকোড়া, আনোয়ারা থানা, চট্টগ্রাম।

২৬. বিধু সেন, বয়স ১৯—পৈতৃক বাড়ী বোয়ালখালী থানার শাকপুরা তবে জন্ম ও কর্মস্থল কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।

২৭. মনোরঞ্জন সেন, বয়স ১৮।

২৮. কালিপদ চক্রবর্তী, বয়স ২০—সারোয়াতলী, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

২৯. শশাংক দত্ত, বয়স ১৮—সারোয়াতলী বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৩০. নারায়ণ সেন, বয়স ১৮—ঢাকা, চাকুরে পিতার সঙ্গে দেওয়ান বাজার যোগেশবাবুর পুকুর পাড়ে (বর্তমান ঈশ্বর নন্দী লেন) থাকত। অস্ত্রাগার লুন্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে পলাতক, পুরস্কার ঘোষণা সত্বেও ধরা পড়ে নাই এবং সেই সময়ের কিছু পর থেকে অন্য নাম গ্রহণ করে স্কুলে শিক্ষকতা করছিল বলে জানা যায়।

৩১. স্বদেশ রায়, বয়স ২০—ঢাকা, পল্টনের (সার্কিট হাউস যেখানে আছে) দক্ষিণে যে বড় রাস্তা তার পাশে তার চাকুরে আত্মীয়ের সঙ্গে শৈশব থেকে থাকত, ১৯২৫শে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়ছিল।

৩২. সৌরিন্দ্র দত্ত চৌধুরী, বয়স ২০—দুর্গাপুর মীরেশ্বরী থানা, চট্টগ্রাম।

৩৩. সুকুমার ভৌমিক, বয়স ২০—মীরেশ্বরী থানা, চট্টগ্রাম।

৩৪. সুরেশ দেব, বয়স ১৭—ঢাকা, বক্সীরহাটে মুদীর দোকানে পিতার সঙ্গে থাকত।

৩৫. সুবোধ চৌধুরী, বয়স ১৮—পৈতৃক বাড়ী বর্ধমান, চট্টগ্রাম রেলের চাকুরে পিতার সঙ্গে পাহাড়তলী রেলকোয়ার্টারে থাকত।

৩৬. অমরেন্দ্র নন্দী, বয়স ১৭—দক্ষিণ ভূর্ষী, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

৩৭. বিনোদ চৌধুরী, বয়স ১৯—উত্তর ভূর্ষী, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৩৮. মহেন্দ্র চৌধুরী, বয়স ১৯—মোহরা, পাঁচালাইশ থানা, চট্টগ্রাম।

৩৯. নিতাই ঘোষ, বয়স ১৭—যশোহর জেলায় পৈতৃক বাড়ী, রেলওয়ে চাকুরে পিতার সঙ্গে পাহাড়তলী রেলকোয়ার্টারে থেকে পড়ত।

৪০. সুধাংশু বোস, বয়স ১৭—পরৈকোড়া, চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ

মিষ্টান্ন বিক্রেতা "বোস ব্রাদার্সের" অন্যতম মালিকের পুত্র, অস্ত্রাগার দখলের ১৬ বৎসর পর, ব্রহ্মদেশে পলাতক থাকার পর স্বেচ্ছায় বাড়ীতে আসায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে, কিন্তু পরে বিনাসর্তে মুক্তি দেয়।

৪১. মতি কানুনগো, বয়স ১৯—শ্রীপুর, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৪২. জিতেন দাশগুপ্ত, বয়স ২০—গৈরলা, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

৪৩. পুলিন ঘোষ, বয়স ১৯—গোঁসাইডাঙ্গা, ডবলমুরিং থানা, চট্টগ্রাম।

৪৪. রণধীর দাশগুপ্ত, বয়স ১৬—পরৈকোড়া, তবে শহরেই পিতা প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত জয়ন্ত কবিরাজের বাসা আন্দারকিল্লায় থেকে পড়ত।

৪৫. দীপ্তি মেধা চৌধুরী, বয়স ১৮—শাকপুরা, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৪৬. বিনোদ দত্ত, বয়স ১৮—মঠপাড়া, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

৪৭. হরিপদ মহাজন, বয়স ১৭—জন্মস্থান বীণাজুরী, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম।

৪৮. সুবোধ রায়, বয়স ১৭—নয়াপাড়া, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম।

৪৯. বনবিহারী দত্ত, বয়স ১৮—খরন্দ্বীপ, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৫০. ফকীর সেন, বয়স ১৭—ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী থানা, চট্টগ্রাম।

৫১. শান্তি নাগ, বয়স ১৬—ত্রিপুরা জেলা, তবে বক্সীরহাটে নিজের পিতার মুদীর দোকানে থেকে পড়ত।

৫২. সরোজ গুহ, বয়স ১৯—শ্রীপুর, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৫৩. ভবতোষ ভট্টাচার্য, বয়স ১৮—আনোয়ারা, সদরঘাট কালীবাড়ীর সেবায়েতের পুত্র, ঐখানে থেকে পড়ত।

৫৪. হরি গোপাল বল (টেগরা) বয়স ১৬—ধোরলা, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৫৫. কালীকিংকর দে, বয়স ২০—গোঁসাইডাঙ্গা, ডবলমুরিং থানা, চট্টগ্রাম।

৫৬. ক্ষীরোদ বানার্জী, বয়স ১৭—ঢাকা, পাহাড়তলী রেলওয়ে কোয়ার্টারের ছাত্র।

৫৭. সীতারাম বিশ্বাস, বয়স ১৮—সারোয়াতলী, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম (তারিণী মুখার্জী হত্যা মামলায় যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ১৯৩১-এ আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসী হয়, তার ছোটভাই)।

৫৮. বীরেন দে, বয়স ১৭—গুয়াতলী, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

৫৯. অশ্বিনী চৌধুরী, বয়স ১৮—কানুনগোয়পাড়া, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম।

৬০. নিরঞ্জন রায়, বয়স ২০—পরৈকোড়া, আনোয়ারা থানা, চট্টগ্রাম।

৬১. শংকর, বয়স ১৬—দুর্গাপুর, মীরেশ্বরী থানা, চট্টগ্রাম।

৬২. ননী দেব, বয়স ১৮—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম বক্সীরহাটে দোকানে থাকত।

৬৩. কৃষ্ণ চৌধুরী বয়স ১৭—কেলীশহর, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম।

অজয় ভট্টাচার্য

নানকার বিদ্রোহ

প্রথম মহাযুদ্ধ কালের ঘটনা। প্রাচীনরা বলতেন, তখন হঠাৎ একদিন তারা শুনতে পেলেন চাঁদপুর গ্রামে মথুরা ধুপীর অতর্কিত আক্রমণে বাহাদুরপুরের জমিদার রইছ মিঞা ঘায়েল হয়েছেন। তার উদ্দেশ্য যে ছিল ছিনতাই, বা রাহাজানি, তাও তারা বলতেন। তাই মথুরা ধুপীকে তখন ডাকাত বলেই সবাই ধরে নিয়েছিল।

কিন্তু পরে জানা গেছে, ছিনতাই বা ডাকাতীর সাথে এঘটনার কোন সম্পর্ক ছিল না, তার গোড়ায় ছিল অন্য কথা। এ হল জমিদারের সাথে তার নামকার প্রজার সম্পর্কের কথা। এ কথা সেদিন কেউ শুনেও শুনত না, শুনলেও বলতে সাহস করত না। তাই সেদিন মথুরা ধুপীকে ডাকাত ছাড়া আর কোন রূপ পরিচিত হওয়ার সুযোগ ছিল না।

রইছ মিঞা ছিলেন বাহাদুরের (বাগ প্রচান্ড খাঁ গ্রামের) প্রবল প্রতাপান্বিত এক ক্ষুদে জমিদার। তার কাছারীতে প্রতিদিন প্রজাদের হরেক রকম অপরাধের বিচার ও বিচিত্র ধরনের সাজা শাস্তির ঘটনা দেখা যেত। তখন একদিন কাপড় ধোয়ার ত্রুটির জন্যে তিনি তার নানকার রজক মথুরা ধুপীকে গালাগাল দিলে মথুরা জমিদারের সম্মুখে তর্ক করার মত ঔদ্ধত্য দেখান। তাতে চটে গিয়ে জমিদার তাকে ধরে ভর কাছারীতে জুতা পেটা করেন। এমন ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে, আর তাই রইছ মিঞার সামনে দাঁড়িয়ে কোন প্রজাই এখানে সত্যি মিথ্যে কিছু বলতে সাহস করেন না। কারণ সবাই তাকে প্রবল প্রতাপান্বিত বলেও ধরে নেয়। কিন্তু মথুরা ধুপী সেদিন তার ব্যতিক্রম ঘটালে তাকে উপযুক্ত শাস্তিই পেতে হয়।

মথুরা এ ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেন না। এ ঘটনার জন্যে জমিদারের উপর বদলা নিতে তিনি মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হয়ে যান।

কিন্তু এমন কাজে কেউ তাকে সাহায্য করবে বলে তিনি আশা করতে পারেন না। তাই একক দায়িত্বে সব কিছু সমাধা করতে হবে

বুঝে সেভাবেই তিনি তার পরিকল্পনাটা দাঁড় করিয়ে ফেলেন।

তারপর পরিকল্পিত ভাবে দিন কয়েক জমিদারের কাছারীতে হাঁটা-হাঁটি করে জমিদারের দৈনন্দিন কর্মসূচী তিনি ভাল করে জেনে নেন। তিনি দেখেন, জমিদার প্রতিদিন বিকেল বেলা দীঘির পাড়ে কাছারীর বারান্দায় একাকী আরাম কেদারায় বসে পরম তৃপ্তিতে মুক্ত বায়ু সেবন করেন। এ সময় তার ধারে-কাছে চাকর-বাকর কেউ থাকে না। তার সংকল্প কার্যকরী করার পক্ষে এ সময়টাকেই তিনি উপযুক্ত বলে ধরে নেন। দিনটিও নির্দিষ্ট করে ফেলেন।

তারপর নির্দিষ্ট দিনের আগেই গ্রামের কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে ঘরের মালামাল তিনি সরিয়ে ফেলেন। নির্দিষ্ট দিনে আত্মীয় বাড়ী যাবার নাম করে তিনি সপরিবারে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েন। খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে অপর সবাইকে রেলস্টেশনের পথ ধরিয়ে দিয়ে তিনি জমিদার বাড়ীর পথ ধরে এগিয়ে চলেন। জমিদার-বাড়ীতে পেঁছে পরিবেশকে তিনি তার পক্ষেই দেখতে পান। তারপর আর কাল বিলম্ব না করে দেয়ালের আড়াল থেকে দ্রুত ছুটে গিয়ে অর্ধ-নিদ্রিত জমিদারের পায়ের কাছে রাখা দু'পাটি চটিজুতা তিনি দুই হাতে তুলে নেন। জমিদার চোখ মেলে তাকাবার আগেই চোখে-মুখে উপর্যু-পরি জুতার আঘাতে তিনি চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকেন। তারপর এ ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে যখন তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন তার আগেই আঘাতে আঘাতে তাকে ভূতলশায়ী করে রেখে আততায়ী সরে পড়েছে।

জমিদারের চীৎকারে লোকজন ছুটে এলে তারা আততায়ীর পরিচয় জেনে নিয়ে তাকে ধরে আনতে তার বাড়ীর পথে ছুটল। কিন্তু আত-তায়ী তখন অন্য পথে ছুটতে ছুটতে ঘটনাস্থল থেকে ছ'মাইল দূরবর্তী লাতু রেল স্টেশনে পেঁছে ওখানে আসামগামী একটা ট্রেনে চড়ে বসেছেন। মথুরাধূপী একাকী বিদ্রোহ করে সেই যে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন আর কোন দিন ফিরে এলেন না। জমিদার তার বাড়ীর ঘর ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথে তার উপর প্রতিশোধ নিতে পারলেন না। তাই মথুরাধূপীকে ডাকাত আখ্যা দেওয়া ছাড়া বিদ্রোহী নানকার প্রজার হাতে জুতা পেটা হওয়ার এ অকল্পনীয় অপমান ও লাঞ্ছনাকে তিনি কেমন করে ধামাচাপা দেবেন? আর তখনকার ক্ষুদে জমিদার প্রধান সিলেট জেলার সামন্ত সমাজই-বা কেমন করে এ ঘটনার যথার্থ বিবরণকে ধরে রাখবে?

নানকারদের বিদ্রোহের ঘটনাগুলোকে সেযুগে তাই কেবল বিকৃতই

করা হয়েছে। শ্রেণী বিভক্ত এ সমাজের ইতিহাস কোনদিন নানকার বিদ্রোহের কোন কাহিনীকে ধরে রাখতে চায় নি। তাই নানকার বিদ্রোহের অতীত কাহিনীগুলো আজ হয় মথুরা ধুপীর কাহিনীর মতই বিকৃত, নয় একেবারেই লুপ্ত। নানকার বিদ্রোহের সুদূর অতীতকে ফিরে দেখা আজ তাই প্রায় অসম্ভব ব্যাপর।

নানকার বিদ্রোহ এক ধারাবাহিক বিদ্রোহ-প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালের একটা ঘটনা দিয়ে নানকার বিদ্রোহের বর্ণনা এখানে শুরু করলেও নানকার বিদ্রোহ কেবল তখনকারই ব্যাপার নয়। নানকার ব্যবস্থায় জীবন ধারাটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, বিদ্রোহকে নিত্য সঙ্গী না করে এ ব্যবস্থায় কারো বাঁচারই উপায় ছিল না। তাই আজো যে তারা টিকে রয়েছেন তার গোড়ায় তাদের বিদ্রোহী সত্তাকেই নজর করতে হয়। আর তাই নানকার বিদ্রোহ প্রায় একটানাই চলছিল।—কখনো এখানে, কখনো ওখানে। কখনো একক, বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত ও নিরুত্তপ্ত ভাবে। আবার কখনো সমাজগত, গোষ্ঠীগত, অঞ্চলগত ও সংঘবদ্ধ রূপে। কখনো আবার প্রচন্ড উত্তাপ সৃষ্টি করে চারপাশে তা আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে। যার ফলে যুগযুগ ধরে শত শত নানকারের কেউ মথুরা ধুপীর মত জমিদারকে আঘাত করে, কেউবা জমিদারের আঘাতে আহত হয়ে দেশ ছেড়ে গিয়ে বেঁচেছেন, বা মরেছেন, কিন্তু সমাজের ঘাড় থেকে নানকার ব্যবস্থার অচলায়তনকে কেউ নাড়াতে পারেন নি। তাই বিদ্রোহে ইতি টানবার কথা নানকার সমাজ কোনদিন ভাবতে পারে নি। এ বিদ্রোহ শতাব্দীর সীমারেখাকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছে একটার পর একটা।

'নানকার' শব্দটা এই সেদিনও সিলেট জেলার ভূমি ব্যবস্থায় বেশ পরিচিত পরিভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হত। কিন্তু এ শব্দ সিলেটের কোন স্থানীয় শব্দ নয়। শব্দটা আসলে উর্দু ভাষারই শব্দ। উর্দু ভাষায় রুটিকে 'নান' বলে। এই 'নান' বা রুটি হল মানুষের খাদ্য বস্তু। তাই খাদ্যবস্তু বা খাই-খোরাকী অর্থে ও 'নান' শব্দের ব্যবহার অস্বাভাবিক নয়। খাই-খোরাকী অর্থে এই 'নান' শব্দ থেকেই যে 'নানকার' শব্দের উৎপত্তি তা মনে করার মাঝেও অস্বাভাবিক কিছু নেই। অর্থাৎ খাই-খোরাকীর বিনিময়ে জনমজুর খাটাবার ব্যবস্থাটাই হল আসলে 'নানকার ব্যবস্থা'।

সিলেট জেলা প্রধানতঃ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল। এখানে উর্দু ভাষাশ্রয়ী এ 'নানকার' শব্দের প্রচলন থেকে এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ দেশে উর্দু ভাষার প্রসার কালে এ অঞ্চলে এসেছে। উর্দু ভাষার সৃষ্টি ও প্রসার কাল হল মধ্যযুগ, বিশেষ করে মধ্য যুগের মোগল আমল। তখন মোগল সাম্রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থায় যে ব্যাপক বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসের

কাজ বলে তার সূত্রধরে এখানকার ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের পরিভাষায় উর্দু ভাষাশ্রয়ী শব্দাবলীর ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখা যায়। এদিক থেকে বিচার করে এই নানকার ব্যবস্থার উৎপত্তি কালকেও এ সময়, অর্থাৎ মধ্য যুগের মোগল আমলের সাথেই যুক্ত করে দিতে হয়।

কিন্তু নানকার ব্যবস্থা মোগল আমলের ভূমি ব্যবস্থার অংশ থাকলেও তাকে সে যুগের একেবারে নতুন কোন ব্যবস্থা মনে করা বোধ হয় ঠিক হবে না। কারণ খাই-খোরাকীর বিনিময়ে লোক রেখে তার শ্রম শক্তিকে শোষণ করার ব্যবস্থাটা হল শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সেই আদি যুগের দাসত্ব বা ক্রীতদাস প্রথার সাথেই সম্পর্কিত। নানকার ব্যবস্থা আসলে সেই সম্পর্ককেই টেনে নিয়ে চলেছিল। অর্থাৎ সামন্তবাদী যুগে সম্পদের ক্ষেত্রে সম্পত্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে গেলে খাই-খোরাকীর বিকল্প হিসেবে জমিজমার ব্যবহারও সমাজে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। আর আদি যুগের সেই খাই-খোরাকী দিয়ে দাস পুষবার পরিবর্তে জমিজমা বরাদ্দ করে দিয়ে কাজের লোক রাখবার ব্যবস্থা চালু হয়। আদি যুগের দাস বা ক্রীতদাস প্রথার এ সংস্কার করা রূপই হল নানকার ব্যবস্থা।

তাই নানকারের জীবন ও মর্যাদা আদি যুগের দাস বা ক্রীতদাসের জীবন ধারার সাথে একেবারে সম্পর্কহীন ছিল না, বরং তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে জীবন ধারার সাদৃশ্য ছিল বহু ব্যাপক। নানকারদের জন্যে আরব ভাষার 'গোলাম' (দাস) শব্দের ব্যবহার থেকেও এ কথা বোঝা যায় যে, আদি যুগের দাসও প্রথাকেই আসলে নানকার ব্যবস্থার সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। নানকারের খাটুনী ছিল বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক এ খাটুনীকে বল হত হদ-বেগারী। বেগারী শব্দের উৎপত্তি হল ফার্সি 'বেগার' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল বিনে-মাইনের চাকর। নানকারের জন্যে অন্য যে সব প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হত সেগুলো হল 'বেগার প্রজা' চাকরান প্রজা, 'হদুয়া প্রজা' 'খানে বাড়ীর প্রজা' ইত্যাদি।

সিলেট জেলায় এই নানকার বা বেগার প্রজার সংখ্যা ছিল অত্যধিক। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ কালে জেলার লোক সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ ধরা হলে নানকারের সংখ্যা ছিল তখন প্রায় চার লক্ষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ। নানকারের এ সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে ছিল জেলার ভূমি ব্যবহার তখনকার কিছু বৈশিষ্ট্য। ভূমি ব্যবহারে এ বৈশিষ্ট্য ও নানকারের সংখ্যা বৃদ্ধিই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ সাল থেকে ৫০ সালের নানকার বিদ্রোহকে এমন পরাক্রান্ত হয়ে উঠবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। তারপর নানকার ব্যবস্থাকে আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।

সিলেট জেলার ভূমি ব্যবস্থা ও নানকার বিদ্রোহ

নানকার ব্যবহার পত্তন কালে সিলেট জেলার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজদের আগমনে মোগল সাম্রাজের পতন ঘটলে এ জেলায়ও ইংরেজ প্রভুত্ব কায়েম হয়। এই ইংরেজ প্রভুত্বের কালে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন হলে তখনকার বাংলার অংশ হিসেবে এ জেলায়ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিতেই ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থায় বাংলার অন্যান্য স্থানে যেমন ব্যাপক ভাবে বড় বড় রাজা, নবাব, জমিদার ও তাদের বিপুলায়তন জমিদারী গুলোর সৃষ্টি হয় সিলেট জেলায় ঠিক তেমনটি হতে পারে নি। শুরুতে এখানে গুটি কয়েক অপেক্ষাকৃত বড় তালুকের সৃষ্টি করা হলেও জেলার অধিকাংশ জমিজমাকে চাষীদের আবাদের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকে পরিণত করে তার মালিকানা জমির আবাদকারী চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিক যুগে সিলেট জেলায় ভূমি-ব্যবস্থার গোড়ায় ছিল স্বল্প আয়তন ছোট ছোট তালুকের বিপুল সংখ্যাধিক্য আর তার আবাদকারীরা ছিলেন তালুকের মালিক চাষী সিলেটে তাদের বলা হত তালুকদার।

কিন্তু পরবর্তী কালে এ অবস্থা আর বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী শাসন শোষণ সর্বশান্ত চাষীদের তালুকগুলো কোথাও নিলাম হয়ে, কোথাও বিক্রি হয়ে এবং আরো বিভিন্ন পথে হাত-ছাড়া হয়ে অচাষী অর্থশালী শ্রেণীগুলোর হাতে গিয়ে পড়ে। এ ভাবে চাষীর মালিকানা থেকে একাধিক তালুক খসিয়ে নিয়ে এ জেলায় নূতন এক অচাষী মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা হন ক্ষুদে ভূম্যাধিকারী। ভূমির অর্থে জেলায় প্রচলিত আরবী প্রতি শব্দ 'মিরাশ' থেকে এ সব ক্ষুদে ভূম্যাধিকারীরা মিরাশদার বলে পরিচিত হন।

সম্পদে-সম্পত্তিতে হীন হলেও এসব ক্ষুদে মিরাশদারদের আকাংক্ষা ছিল প্রচুর। তার ব্যয়ও ছিল প্রচুর। কিন্তু তাদের ক্ষুদে মিরাশদারী থেকে যেখানে দৈনন্দিন খাই-খরচ মিটানই ছিল তাদের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার সেখানে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের তাদের সুযোগ কোথায় ? তবু সুখ সম্ভোগের কোন আকাংক্ষাকেই তারা বাদ দিতে পারতেন না। আর তার-ব্যয় সংকুলানের জন্যেও তাদের অতিরিক্ত আয়ের পথ খুঁজতেই হত। শ্রম-বিমুখ মধ্যস্বত্ব-ভোগী শ্রেণীর কাছে মাত্রাতিরিক্ত প্রজা শোষণ ছাড়া মাত্রাতিরিক্ত আয়ের আর পথ কোথায় ? আর অধিকারহীন প্রজাই হলেন মাত্রাতিরিক্ত শোষণের উর্বর ক্ষেত্র। তাই জমিতে কোন অধিকার না দিয়ে কেবল হদ-বেগারীর সর্তে তারা প্রজাপত্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। আসলে

এসব ক্ষুদে মিরাশদারীরাই সিলেট জেলা নানকার প্রজার সংখ্যাকে এমন বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

নানকার শোষণের ধারা

কায়িক শ্রমের বিনিময়ে নানকার প্রজাকে খাই-খোরাকীর অর্থে যে জমিজমা বরাদ্দ করা হত তার উপর নানকার প্রজার কোন জোত বা দখলী স্বত্ব বর্তাত না। আইনতঃ তা জমিদারের খাস জমিই থাকত। সে জমিতে উৎপন্ন মৌসুমী ফসলের উপরই কেবল নানকারের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। জমিতে উৎপন্ন মূল্যবান ফল-ফলারী ও গাছ বাঁশের উপর জমিদারের অধিকার ছিল নিরংকুশ। জমিদার চাইলে কোন ওজর আপত্তি ছাড়াই নানকার প্রজাকে তার বাড়ী জমি ছেড়ে দিতে হত।

জমি বাড়ীর উপর নানকার প্রজার এই সীমাবদ্ধ অধিকারের বিপরীতে নানকার প্রজার উপর কিন্তু জমিদারের অধিকার ছিল সীমাহীন। অর্থাৎ জমিদারের ডাকে হাঁকে ছুটে গিয়ে তার হুকুম মত তাকে খেটে দিতে হত। এ খাটুনীর কোন সময় অসময় বা সীমা পরিসীমা ছিল না। নানকারের ঘরের মেয়েরাও জমিদারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে ছিলেন না, তাদেরও প্রতিনিয়ত জমিদার বাড়ীতে গিয়ে খেটে দিতে হত। জমিদারের ভোগ লালসার সামগ্রী হতেও তাদের আপত্তি করা চলত না। নানকার ব্যবস্থায় খাই-খোরাকীর নামে কেবল একখণ্ড জমি বরাদ্দ করে দিয়েই জমিদার এভাবে ঠিক আদিকালের সেই ক্রীতদাস যুগের মত স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে নানকারের সমগ্র পরিবারের উপর নিরংকুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে পারত। জমিদারের শোষণের সামনে তারা ছিলেন অসহায়। তাদের এই অসহায় অবস্থা তাদের জমিদারের পীড়ন যন্ত্রেও পরিণত করে দিয়েছিল। সমগ্র গ্রাম্য সমাজে জমিদারী শোষণ ও নিয়ন্ত্রণকে টিকিয়ে রাখতে নানকাররাই ছিলেন জমিদারদের প্রধান অবলম্বন।

নানকারদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ

এ অবস্থার বিরুদ্ধে নানকারদের সামান্যতম প্রতিবাদই জমিদারদের কাছে বিদ্রোহ বলে গণ্য হত। বিদ্রোহ অজুহাতে তাদের জন্য বিভিন্ন ধারার সাজা শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তার ভেতর বেত মারা, জুতা পেটা করা, অভুক্ত অবস্থায় দিনের পর দিন কয়েদ করে রাখা থেকে আরম্ভ করে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলা পর্যন্ত কিছুই বাদ ছিল না। কিন্তু তৎসত্বেও এ পীড়ন ধর্মী অমানুষিক ব্যবস্থাকে চোখ-কান বুজে মেনে নেওয়া নানকারদের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হয়ে উঠে নি। তাই অহরহ এমন বিদ্রোহ ঘটত,

আর এমন সাজা-শাস্তির ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকত।

তারপর যুগটা ক্রমে পালটে যেতে থাকে, নানকার বিদ্রোহের ধারায় দেখা দেয় সুস্পষ্ট পরিবর্তন।

সুখাইড় বিদ্রোহ (১৯২২-২৩)

পরিবর্তন ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেও এ সময়টা হল পট পরিবর্তন কাল। সিলেট জেলার ধর্ম-পাশা থানায় সুখাইড় গ্রামে প্রথম তার সূচনা হয়। বিদ্রোহের কারণ হল এক স্থানীয় ঘটনা। বিদ্রোহের চরিত্র ছিল স্বতস্ফূর্ত।

গ্রামের নানকারদের উপর জমিদারের অধিকার তখন নিরংকুশ। একদিন এক নানকার রমনীর উপর জমিদারের চোখ পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে আনতে তিনি লোক পাঠান। কিন্তু রমণীটি তাকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দেন। এ অপমান জমিদারের নিজের অপমান। তার উপর রমণীটিকে আয়ত্ব করাও তার চাই। তাই অবিলম্বে কিছু বাধ্য লোক নিয়ে গিয়ে তিনি বাড়ী চড়াও হয়ে রমণীটিকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন। এমন ঘটনা এ গ্রামে নতুন কিছু নয়। তাই এ ঘটনায় হঠাৎ কাউকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেল না। কিন্তু খানিকক্ষণ পর এ গ্রামেই নানকার ঘরের ব্রজবাসী দাসের উদ্যোগে গ্রামের নানকাররা একযোগে জমিদার বাড়ীতে পাল্টা চড়াও হয়ে অপহৃতা মহিলাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। এ ঘট-নার বদলা নিতে জমিদার তার বিদ্রোহী নানকারদের ভিটে ছাড়া করতে চাইলেন। কিন্তু জমিদারের বলও এই নানকারই। এই নানকারের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রজাকে লেলিয়ে দেওয়া জমিদারের পক্ষে সম্ভব হল না। একযোগে বিদ্রোহ করে সবাই তারা ভিটে মাটি আগলে বসে রইলেন।

ব্রজবাসী ছিলেন বিচক্ষন বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহীকে তিনি অন্যত্র ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। জমিদারদের আত্মীয়তার সূত্র ধরেই তখন নানকারদের আত্মীয়তা গড়ে উঠত। এ সূত্রে সুখাইড় গ্রামের নানকারদের আত্মীয়তা ছিল সুনামগঞ্জ মহকুমার গৌরারঙ্গ ও সিলেটের সদর মহকুমার বোয়ালজুর গ্রাম দু'টির নানকারদের সাথে। আত্মীয়তার এই সূত্র ধরে ব্রজবাসী লোক পাঠিয়ে গৌরারঙ্গ ও বোয়ালজুরেও বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। একমাত্র নানকার ছাড়া জনতার আর কোন অংশ এ বিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে আসেন নি। বিদ্রোহ তবু সমগ্র ২২ ও ২৪ সাল জুড়ে প্রায় দুটা বছরই চলেছিল। তারপর সরকার ও জমিদারের মিলিত শক্তির কাছে তা পরাস্ত হয়ে যায়।

বিদ্রোহটা ব্যর্থ হয়ে গেলে পর বিদ্রোহের নেতা ব্রজবাসীকে আর

খুঁজে পাওয়া যায় নি। কারো কারো মতে, জমিদার নাকি তাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল না। আবার ভিন্ন মতে শোনা যায় কিছু সঙ্গী সাথী নিয়ে ব্রজবাসী খাসিয়া পাহাড়ের পথে আসামের জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন। যাবার কালে নাকি তিনি একথাও বলে গিয়েছিলেন যে, জমিদারের হাতে ধরা দেওয়া থেকে পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে বাঘ-ভালুকের সাথে লড়াই করে মরাও ভাল।

কুলাউড়া বিদ্রোহ (১৯৩১-৩২)

সুখাইড় বিদ্রোহের প্রায় এক দশক পর ঘটে কুলাউড়া বিদ্রোহ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাথে এ বিদ্রোহ ছিল ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব সামন্তবাদ বিরোধী চরিত্রের জন্যে এ বিদ্রোহের সাথে সম্পর্ক ছেদ করলে বিদ্রোহীরা একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তবু প্রায় দু'টা বছর জমিদারের হদ-বেগারী বন্ধ রেখে তারা বিদ্রোহকে টিকিয়ে রাখেন। কংগ্রেসের তখনকার প্রচার-প্রচারণার সূত্রটা তুলে ধরেই বিদ্রোহীরা বলতেন, স্বাধীনতার মানে যদি নিজের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠাকেই বোঝায় তবে আমরা আর জমিদারের বেগার খাটব কেন ? তখন এমন শ্রেণী-দাবীতে ভারতের আরো বহুস্থানে শ্রমিক ও কৃষকদের ভেতর প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকলে অতিশয় শ্রেণী-সচেতন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের আন্দোলন গুটিয়ে নেন। পরিবেশের সাথে সংগতি হারিয়ে ভারতের আরো বহু শ্রেণী আন্দোলনের মত কুলাউড়া গ্রামের এ বিদ্রোহটিও এ পর্যায়ে এসে আত্মসম্পর্ণ করতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহটি ব্যর্থ হয়ে গেলে বিদ্রোহের নেতৃত্বকে স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হয়। আর অন্যদের পক্ষে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

ভানুবিল বিদ্রোহ (১৯৩৩-৩৫)

ভানুবিল অঞ্চলের মনিপুরী কৃষকরা ঠিক ঠিক নানকার ছিলেন না। তবু তারা ছিলেন জমিদারের হাতে অস্বাভাবিক রকম শোষিত ও নিগৃহীত কৃষক প্রজা। প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে না নেমে তাদের পক্ষে তখন টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। কুলাউড়ার নানকার বিদ্রোহের প্রায় সম-সময়ে একই কংগ্রেসী আন্দোলনে প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তারা যে দুঃসাহ-সিক বিদ্রোহ গড়ে তুলেছিলেন তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এ জেলার বামপন্থী আন্দোলন, বিশেষ করে নানকার বিদ্রোহ সহ পরবর্তী পর্যায়ের কৃষক আন্দোলনগুলোকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই প্রসঙ্গটা

এখানে নানকার বিদ্রোহ হলেও নানকারদের মত শোষিত নিগৃহীত বহিরাগত এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী বলিষ্ঠ সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভানুবিল বিদ্রোহকে তাই এখানে টেনে আনা হল।

ভানুবিল, অন্য কথায় ভানুগাছ অঞ্চলের মনিপুরী কৃষকেরা হলেন বিগত শতাব্দীতে ইংরেজ সৈন্যের হাতে পরাজিত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় দেশীয় রাজ্য মনিপুরের দেশত্যাগী অধিবাসী ও তাদের বংশধররা। দেশ ছেড়ে তারা সিলেট জেলার মৌলবিবাজার মহকুমায় ভানুগাছ অঞ্চলে বসতী গড়ে তুলেন। এ অঞ্চলটা ছিল তখন বৃটিশ রাজের এদেশীয় অনুচর পৃথিমপাশার জমিদার আলী আমজাদ খাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। স্বভাব-শান্ত সরল প্রকৃতির এই মনিপুরী চাষীদের হাতে পেয়ে জমিদার ও তার কর্মচারীরা তাদের পশ্চাৎপদতার সুযোগে তাদের উপর বেপরোয়া জুলুম অত্যাচার ও লুটপাট চালাতে লাগল। প্রথম প্রথম সবকিছু সয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত জীবন রক্ষার তাগিদে তারা প্রতিবাদ না করে থাকতে পারলেন না। কিন্তু তাদের এ প্রতিবাদ না জমিদার, না সরকার, কারো কাছে মর্যাদা পেল না। অথথা মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় তাদের সরকারী ও জমিদারী কাছারীতে টেনে নিয়ে নাস্তানাবুদ করা হতে লাগল।

মনিপুরী কৃষকরা কেবল তাদের নিজ সমাজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ, তাদের প্রতিবাদ আন্দোলন ও এ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এখানে ব্যর্থ হয়ে তারা আন্দোলনের বিস্তার কামনা করলেন। কিন্তু সহসা সে পথ তারা দেখতে পেলেন না।

অবশেষে ১৯৩০ সালের পর কংগ্রেসের ডাকে সারা ভারতে অহিংস সত্যাগ্রহ বলে পরিচিত এক গণ আন্দোলন শুরু হলে আন্দোলনের প্রসার ঘটাবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা মনিপুরী কৃষকদের ভেতর কাজের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেন। সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কংগ্রেস তখন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধের ডাক দেয়। ভানুগাছ অঞ্চলের মনিপুরী কর্মসূচী বলে ধরে নেন। কংগ্রেসের এ কর্মসূচীতে তারা বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠেন। ইংরেজ সরকারের সামরিক বাহিনী সমর শক্তিতে মনিপুরের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার ফলে মনিপুরীরা তখন জাতি হিসেবেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হয়ে উঠলেন, আর এখানে জমিদারের হাতে নিত্য দিন লাঞ্ছিত হয়ে হয়ে এ অঞ্চলের মনিপুরী কৃষকরা সামন্ত অবদানের বিরুদ্ধেও তখন ক্ষিপ্ত। তাই কংগ্রেসের এ ডাকে তারা সোৎসাহে সাড়া দিলেন। ফলে এ অঞ্চলে খাজনা ট্যাক্স একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

এ অবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে কৃষকরা কংগ্রেসের পরামর্শ মত অহিংস সত্যাগ্রহ বলে পরিচিত নিস্ক্রীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেন। প্রথমে তাতে কিছুটা কাজ হল। জনজমায়েত দেখে জমিদারের লোকজন ও সরকারী পুলিশ সরে গেল। খোল করতালের প্রচণ্ড নিনাদে ভয় পেয়ে জনজমায়েতের উপর লেলিয়ে দেওয়া জমিদারের হাতীগুলো পেছনে ফিরে দৌড় দিল।

কিন্তু তা কেবল প্রথম প্রথমই। পরবর্তীকালে বর্ধিত বল ও হিংস্রতা নিয়ে সরকার ও জমিদার পক্ষ এসে মাঠে নামল। নিস্ক্রীয় প্রতিরোধ তাদের আক্রমণের মুখে অচিরেই ভেঙ্গে পড়ল। পুলিশও জমিদারের লোকজন ঘরে ঢুকে চাষীর সংসার লুট করে নিতে লাগল। হাতীর পায়ের তলায় তারা মাঠের ফসল মাড়াতে আরম্ভ করল। দিনের পর দিন এমন কাণ্ড চলতে থাকলে চাষীদের চোখে নিস্ক্রীয় প্রতিরোধের অসারতা আর অস্পষ্ট রইল না। প্রতিরোধ না হোক অন্ততঃ প্রতিশোধের নেশায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। আদিম যুগের হাতিয়ার হাতে তারা আক্রমণকারী বাহিনীর মুখামুখী হলেন। হাতীগুলো শুড় বাগিয়ে ধেয়ে এলে তীক্ষ্ণধার খড়গের আঘাতে এবার ওগুলের শুড় তারা ছিন্ন করে দিলেন। পুলিশ ও জমিদারের গুণ্ডাপাণ্ডাগুলো ঘায়েল হয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু এ ফেরা তাদের শেষ ফেরা নয়। কৃষক জনতার লাঠি-সোটার কাছে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকার চিরতরে হেরে যাবে একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই দিন কয়েকের ভেতর সরকারী বাহিনী আবার পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করল। এ আক্রমণের সামনে চাষীদের টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। তবু শেষ পর্যন্ত তারা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন। প্রতিরোধ করতে পিছু হটাতে লাগলেন। গ্রাম ছেড়ে অঞ্চল ছেড়ে অবশেষে তারা পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে ঢুকলেন। ভানুবিল-ভানুগাছ অঞ্চলের মনিপুরা অধ্যুষিত গ্রামগুলো একেবারে জনশূন্য হয়ে গেল।

বৃটিশ সরকারের এ অমানুষিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। বৃটিশ পার্লামেন্টেও এঘটনার উপর তুমুল বিতর্ক হল। বৃটিশ পার্লামেন্টের তখনকার বিরোধী দল লেবার পার্টির প্রতিনিধিরা এ বিতর্কের মালমশল্লা সংগ্রহ করতে ভানুবিল পর্যন্ত ছুটে এলেন। কিন্তু এ বিদ্রোহকে সার্থক করে তুলতে কারো কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল না। সহিংসতার অজুহাতে কংগ্রেস নেতৃত্ব এখানে কৃষকদের সঙ্গ ত্যাগ করল। কেবল স্বল্প সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী কৃষকদের সাথে

ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করার ফলে বিদ্রোহের সারি থেকে সরে যেতে পারলেন না। এ বিদ্রোহের অবশেষকে তারাই টেনে নিয়ে চললেন। আর অহিংস পথে ও সহিংস পথের উপর বিরোধী করে কংগ্রেস নেতাদের সাথে ভাগ হয়ে এ জেলায় তারা বামপন্থী কংগ্রেসকর্মী গোষ্ঠী গঠন করলেন। পরবর্তীকালে নানকার বিদ্রোহী সহ সব ক'টি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন এই কর্মী গোষ্ঠীরই কাজ। জেলার সোসালিষ্ট পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি গড়ার কাজেও এরাই ছিলেন তখন প্রধান উপাদান। তখন সারা ভারতের অবস্থাও ছিল এই। প্রায় সর্বত্র এমন বামপন্থী কর্মী-গোষ্ঠীগুলোর আত্মপ্রকাশ শ্রমজীবী জনতার বিভিন্ন শ্রেণী আন্দোলন ও শ্রেণী সংগঠনকে বিকশিত করতে সাহায্য করছিল। কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কিষাণ সভা গঠিত হলে তার শাখা হিসাবে সে বছরই বামপন্থী কংগ্রেস কর্মীদের উদ্যোগে সিলেট ও কাছাড় জেলাকে নিয়ে সুরমা উপত্যকা প্রাদেশিক কৃষক সভা গঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সিলেট জেলায় নানকার বিদ্রোহ সহ বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন এই কৃষক সভার উদ্যোগেই সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।

কৃষক সভার উদ্যোগে সংগঠিত আন্দোলন

প্রজাস্বত্ব সংশোধনের আন্দোলন ও নানকার বিদ্রোহ (১৯৩৭-৪০) সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমির উপর নানকারদের কোন অধিকার তখন স্বীকৃত ছিল না। এমন কি নানকারদের প্রজার সংজ্ঞা থেকেই বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। কেবল নানকারদের বেলাই নয়, অন্যান্য বর্গের প্রজাদের বেলাও। এ আইন ছিল সর্বতোভাবে প্রজার স্বার্থ বিরোধী। এ আইনে জমিদারের প্রজা শোষণের উপর কারো কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সর্বোপরি জমিদারের প্রজা উচ্ছেদের অধিকার ছিল বহু ব্যাপক।

এ অবস্থার প্রতিকারার্থে সুরমা উপত্যকা প্রাদেশিক কৃষক সভার উদ্যোগে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইনের এক ব্যাপক সংশোধনী তৈরী করা হয়। এই খসড়া সংশোধনীতে কৃষক প্রজার জোত জমির উপর স্থায়ী জোত স্বত্ব সহ বিভিন্ন অধিকারের সঙ্গে নানকার ব্যবস্থার পরিপূর্ণ উচ্ছেদ দাবী করা হয়। সুরমা উপত্যকা প্রাদেশিক কৃষক সভার তখনকার সভাপতি করুনসিন্দুর রায় তখন আসন্ন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। এই খসড়া প্রস্তাবটা তিনি আইন পরিষদে উত্থাপন করতে চাইলে স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত আসামের তদানিন্তন মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকারের পরামর্শে আসামের

প্রাদেশিক গভর্ণর তাকে তা উত্থাপনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। তখনকার আইনে এই অনুমতি ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। ফলে সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের এ প্রস্তাবটা আর আইন পরিষদে উত্থাপন করা সম্ভব হল না।

পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপনে ব্যর্থ হয়ে এ ব্যাপারে সরকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে কৃষক সভা জেলা জোড়া আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল। এই খসড়া প্রস্তাবটার প্রায় লক্ষাধিক কপি ছাপিয়ে তারা বিলি করল এবং কৃষক জনতার কাছে এ আহবান রাখল যে, এ প্রস্তাব গুলোর যে কয়টা যেখানে সম্ভব সেখানে যেন তারা নিজ উদ্যোগে তা কার্যকরী করে ফেলেন। এই খসড়া সংশোধনটি কৃষক জনতার কাছে করুনাসিন্দুর প্রজা-স্বত্ব আইন বলে ব্যাপক ভাবে পরিচিতি লাভ করল। কৃষক সভার আহবানে সাড়া দিয়ে কৃষকরা স্থানে স্থানে এই খসড়া প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারা কার্যকরী করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। নানকার প্রজারাও বেশ ক'টা স্থানে জমি-দারের হদ-বেগারী বন্ধ করে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন।

এ ধারার কৃষক আন্দোলনগুলোর ভেতর তখন প্রধান হয়ে উঠেছিল সুনামগঞ্জ মহকুমার (১) ভাটিপাড়া (২) রফিনগর (৩) রামজীবনপুর, (৪) শাফেলা (৫) বৈঠাখালি (৬) কংশীকুন্ডা সদর সিলেট মহকুমার (৭) রনিকেলী (৮) ভাদেশ্বর (৯) ঢাকা দক্ষিণ, (১০) গোলাপগঞ্জ। এবং তখনকার করিমগঞ্জ মহকুমার (১১) দাসের বাজার (১২) বিয়ামীবাজার (১৩) বাহাদুরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন ও নানকার বিদ্রোহী-গুলো। তার ভেতর রফিনগর রনিকেলী, ভাদেশ্বর ও বাহাদুরপুরের আন্দোলন ছিল নানকার বিদ্রোহ।

রফিনগর বিদ্রোহ (১৯৩৮-৩৯)—সুনামগঞ্জ মহকুমার দিরাই থানায় ভাটিপাড়া জমিদারীর নানকার প্রজা অধ্যুষিত গ্রাম রফিনগর। ১৯৩৮ সালে সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী প্রস্তাব আইন সভায় উত্থাপনের পথে সরকারী প্রতিবন্ধকতার প্রতিবাদে কৃষক সভা আন্দোলনের ডাক দিলে রফিনগর এসে আন্দোলনের সারিতে দাঁড়ায়। সমগ্র ভাটিপাড়া জমিদারী এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। নানকাররা হদ-বেগারী বন্ধ করেন, প্রজারা খাজনা বন্ধ করেন। জমিদারের উশুল তহশীল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। জমিদার প্রথমে গায়ের জোরে এ বিদ্রোহ দমন করবার চেষ্টা করলে তার পক্ষে জোর দেখাবার মত জন সমাবেশ করা আর সম্ভব হয় না। এদিকে ব্যর্থ হয়ে সরকারী আশ্রয় থেকে জমিদার ফৌজাদারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। নানকার সহ বিভিন্ন বর্গের প্রজাদের উপর অসংখ্য বানোয়াট ফৌজদারী মামলা দায়ের করে তাদের নতিস্বীকার করাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও

কোন ফল পাওয়া সম্ভব হয় না। অবশেষে ফসল কাটার সময় হলে ব্যাপক অঞ্চলে ১৪৪ ধারা বলে নিষেধাজ্ঞা জারী করে প্রজাদের ফসল তোলা বন্ধ করবার চেষ্টা করেন। গ্রামে গ্রামে মাঠে মাঠে পুলিশ প্রহরা বসিয়ে প্রজাদের মাঠে নামা অসম্ভব করে দেওয়া হয়। সরকার ও জমিদারের এই দমন মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষক সভা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ধান কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। শত শত কৃষক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারা বরণ করেন। তাদের মাঝে ছিলেন কৃষক সভার সভাপতি পরিষদ সদস্য করুণা সিন্দুর রায়, সম্পাদক লালা শরদিন্দু দে প্রমুখ। বিচারে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে অন্যান্য বহু কৃষকের সাথে তাদেরও কারাদণ্ড হয়। কিন্তু এ বিদ্রোহ তবু সহসা দমন করা সম্ভব হয় নি, প্রজাদেরও জমি থেকে উচ্ছেদ করা যায় নি।

অবশেষে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেলে জেলার কৃষক আন্দোলনগুলো যুদ্ধকালীন দমন নীতির মুখে পড়ে বেশ কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। এই সুযোগে কৃষক সভা রচিত সংশোধনীকে পায়ে ঠেলে রেখে কংগ্রেস রচিত ও তাদের দ্বারা পরিষদে উত্থাপিত অপর একটা বিকৃত সংশোধনী সহ সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইন পরিষদে গৃহীত ও কার্যকরী হয়ে যায়। এই সংশোধিত আইনে সম্পন্ন স্তরের কৃষক প্রজাদের মর্যাদা, অধিকার প্রভৃতি প্রশ্নে খানিকটা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও নানকারদের প্রজা সংজ্ঞার বাইরেই রেখে দেওয়া হয়। জমিদারের খাস জমির স্বত্বহীন বসতকার ছাড়া তাদের আর কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাতে সমগ্র আন্দোলনের ভেতর বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সমগ্র ভাটিপাড়া জমিদারীর কৃষক প্রজাদের এ আন্দোলনটা যেমন মাঝ পথে এসে থেমে যায়, তেমনই রফিনগরের নানকার বিদ্রোহকেও কোন দাবী আদায় না করেই প্রতিপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

রনিকেলি ও ভাদেশ্বর বিদ্রোহ (১৯৩৮-৩৯) সদর সিলেট মহকুমার গোপালগঞ্জ থানায় রনিকেলি ও ভাদেশ্বর দুই নানকার অধ্যুষিত অঞ্চল। দুটা অঞ্চলের ব্যবধান আট/দশ মাইল। সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন দাবী করে ১৯৩৮ সালে কৃষক সভা-যে আন্দোলনের ডাক দেয় তাতে জেলার বিভিন্ন অংশের কৃষক প্রজা ও নানকারদের সাথে রনিকেলি ও ভাদেশ্বর অঞ্চলের নানকাররাও এসে যোগ দেন। রনিকেলিতে বিদ্রোহ হয় পরিপূর্ণ কিন্তু ভাদেশ্বরে হয় আংশিক, কেবল পূর্ব ভাগে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে যে একমাত্র প্রতিনিধি সিলেট জেলা থেকে মুসলিম লীগ টিকেটে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি এই ভাদেশ্বর গ্রামেরই এক ক্ষুদে জমিদার আবদুল মতিন চৌধুরী, ওরফে কলা মিঞা। এই গোলাপগঞ্জ

থানা ছিল তারই নির্বাচনী এলাকা। তিনি আসাম মন্ত্রী সভার সদস্যও হয়েছিলেন। তার এলাকায় নানকারদের এ বিদ্রোহ ঘটে গেলে তিনি ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে বিদ্রোহীদের উপর অমানুষিক সরকারী দমন পীড়ন নামিয়ে আনেন। তবু খুব সহজে এ বিদ্রোহ দমন করা যায় নি। জমি-দারদের তরফ থেকে অসংখ্য বানোয়াট ফৌজদারী মামলা দায়ের করে বিদ্রোহীদের হাজতবন্দী করা হয়। পুলিশের সাহায্যে তাদের সংসার তছনছ ও নারী পুরুষ শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার উপর মারপিট করা হয়। বিদ্রোহ তবু বছর দুই চলে।

অবশেষে আসাম মন্ত্রীসভার বিশেষ উদ্যোগে সিলেটের তখনকার ডেপুটি কমিশনার খান্ সিভিলিয়ান মিঃ খুর্শেদের অক্লান্ত চেষ্টায় রনিকেলির বিদ্রোহকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিলে ভাদেশ্বরের বিদ্রোহও আর টিকে থাকতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মসম্পর্ন করতে হয়।

বাহাদুরপুর বিদ্রোহ (১৯৩৮-৩৯)—বাহাদুরপুর বিদ্রোহ নামে পরিচিত নানকারদের এ বিদ্রোহটাও একই সময়ে কৃষক সভার ডাকে একই ভাবে আরম্ভ হয়। এ বিদ্রোহটা তখনকার করিমগঞ্জ মহকুমার জলতুপ (বর্তমান বিয়ানীবাজার) থানায় বাগ প্রচন্ড খাঁ গ্রামের এক অত্যাচারী জমিদার পরিবারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা, গ্রেপ্তার, কয়েদ, পুলিশ জুলুম প্রভৃতি চিরাচরিত দমন পীড়নের পথ ছাড়া সরকার ও জমিদারকে বিদ্রোহ দমনে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের অনুকরণে মিথ্যা সালিশির অভিনয় করে করিমগঞ্জের তখনকার মহকুমা হাকিম আবদুল হাই এখানেও বিদ্রোহের স্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। আবদুল হাই ছিলেন এ বিদ্রোহে জড়িত নানকারদের প্রতিপক্ষ জমিদারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অবশেষে বহু জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করে এ বিদ্রোহকেও প্রতিপক্ষের কাছে আত্মসম্পর্ন করতে হয়।

দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করার পর নানকার বিদ্রোহ এ যুগে এসেই সর্বপ্রথম কৃষক সভার নেতৃত্বে সংগঠিত রূপ নিতে আরম্ভ করে। বিদ্রোহের সারিতে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাহসিকতা ও বীরত্বের ভুরিভুরি প্রমাণও বেরিয়ে আসতে থাকে। বিদ্রোহ তবু নিয়ম-তান্ত্রিকতার গন্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। এ বিদ্রোহের পক্ষে তাই সঠিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কি আশা করবার থাকে? বিদ্রোহী কার্যক্রমে নিজেদের ভূমিকার জন্য এ পর্যায়ে ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব নানকারদের ঘাড়ে চাপাবার কোন পথ নেই। এ বিদ্রোহের সংগঠক, পরিচালক ও নেতৃত্বকেই এ দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগ

১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর হানাহানি শুরু হয়ে গেলে সিলেটের কৃষক আন্দোলন ও নানকার বিদ্রোহ অমীমাংসিত অবস্থারই যুদ্ধের যুগে গিয়ে প্রবেশ করে। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের যুদ্ধকালীন দমন-পীড়নের কঠোর নীতি আন্দোলনের গতিকে এখানে সাময়িক ভাবে দুর্বল করে দেয়। এ অবস্হায় কায়েমী স্বার্থভোগী শ্রেণীগুলো নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে তৎপর হয়ে উঠে। এ অবস্থায়ই নানকার বিদ্রোহের দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন বিকৃত আকারে গৃহীত হয়। এ যুদ্ধ-কালীন অবস্হায় তার বিরুদ্ধে আর কোন সার্থক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

পুরো ছ'টা বছর বিশ্ব জনতার ঘাড়ে দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এসে যুদ্ধের অবসান হয়। যুদ্ধে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত মিত্র শক্তি জোটের বিজয় ও ফাসিস্ট শক্তি জোটের সার্বিক পরাজয় বিশ্বের বিপ্লবী পরিস্হিতিকে এক নতুন অবস্হানে ঠেলে নিয়ে যায়। বিপ্লবী পরিস্হিতির এই অভূতপূর্ব বিকাশ দেশে দেশে শ্রমজীবি জনতার স্তরে আবার নতুন করে আন্দোলন, সংগ্রাম সংঘর্ষ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। ভারতেও এ অবস্হার প্রতিফলন ঘটে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সিলেট জেলার অমীমাংসিত নানকার বিদ্রোহকে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায়। যুদ্ধ শেষ হতে না-হতে জমিদারী শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে তারা আবার স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ নেমে যেতে থাকেন। যুদ্ধোত্তর যুগের জন-চেতনা নানকারদের এক নূতন ভবিষ্যতের পথে ঠেলে নিয়ে যায়।

বটরশি বিদ্রোহ (১৯৪৬)—যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ দেখা দেয় বটরশি গ্রামে। তখনকার অবিভক্ত সিলেট জেলার মহকুমা শহর করিমগঞ্জ থেকে বটরশি গ্রামের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। বটরশি জমিদারদের গ্রাম। তাই নানকাররাও ওখানে ঠাসাঠাসি করে বাস করেন, আর জমিদারদের হুকুমে কাজে-অকাজে বেগারী খাটেন। সংসার তাদের অনটনে ভরা। যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বর্ধিত মুজুরীর সুযোগ দিনমজুরের দৈন্যদশার কিছুটা লাঘব হলে তাদের অবস্থাও সহনীয় হয়ে উঠে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে এলে আবার তারা অনটনের ভেতর গিয়ে পড়েন। ঘরে ঘরে অন্নকষ্ট, উপবাস প্রায় নিত্য দিনের ঘটনায় পর্যবসিত হয়।

এ অবস্থায় একদিন জমিদার তার নানকার প্রজা রকা, ওরফে রকীবকে

বেগারীর জন্যে ডাকতে লোক পাঠালে তিনি তাকে বকাবকি করে ফিরিয়ে দেন। মনের ক্ষোভে সেই সাথে তিনি জমিদারদেরও গালমন্দ করেন। খবর শুনে জমিদার লোক পাঠিয়ে রকার ঘরদোর তছনছ করে দেন। রকা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। রকার ঘর যারা তছনছ করেন তারা রকারই স্বগোত্রীয় নানকার। ঘটনার পর রাত্রিকালে তারা এক জটলায় বসে এ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন। এ খবর জমিদারের কানে পেঁৗছে গেলে তিনি তাদের ডেকে এনে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেন, খড়ম হাতে মারতেও তাড়া করেন। এ অঞ্চলে জমিদাররা চিরদিন এমন করেন। কেউ কোন দিন তার প্রতিবাদ করে নি।

কিন্তু নানকাররা যে যুদ্ধোত্তর যুগের মানসিকতায় এর ভেতরেই তেতে উঠেছেন তা আর তিনি বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারলেন তখন, যখন নানকাররা তাকে কড়া করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে এক সাথে তার কাছারী ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

নানকারদের শায়েস্তা করতে গ্রামের কয়ঘর ফন্দে জমিদার তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করে গ্রামের উপর পুলিশ জুলুম নামিয়ে আনলেন। করিমগঞ্জের মহকুমা হাকিম তখন এ জেলারই এক সামন্ত বংশের সন্তান এহিয়া খান। পুলিশী অত্যাচারে নানকারদের তিনি নাস্তানাবুদ করে ফেলেন। এভাবে মাস ছয় মামলা লড়ে উকিল-মোক্তার, আমলা ও মামলার দালালদের শোষণে সর্বশান্ত হয়ে অবশেষে পরাজয় বরণ করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর রইল না। সিলেট জেলায় যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম নানকার বিদ্রোহ এ ভাবে স্বতঃস্ফূর্ততার ভেতর শুরু হয়ে ব্যর্থতার মাঝেই শেষ হয়ে যায়। তবু তার প্রভাব পড়ে আশ-পাশের বেশ ব্যাপক অঞ্চলে নানকার বিদ্রোহের পক্ষে অবস্থা অনুকূল হয়ে উঠে।

মহাকাল বিদ্রোহ (১৯৪৬)

একই করিমগঞ্জ মহকুমায় বটরশি থেকে মহাকালের দূরত্ব প্রায় পনেরো ষোল মাইল। বটরশি গ্রামের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বটরশির পরপরই মহাকল গ্রামের মালাকার সম্প্রদায়ের নানকারদের ভেতর বিদ্রোহ দেখা দেয়। মালাকার নানকাররা তাদের হদ-বেগারীর অংগ হিসাবে জমিদারের পালকী বহন করতেন। গ্রামে ছিলেন আশি ঘর মালাকার। যুদ্ধোত্তর যুগের মানসিকতায় কাঁধে করে মানুষ বয়ে বেড়ানকে জেলার মালাকার সমাজ অবমাননার বিবেচনা করেন। তাই তারা পালকী বহনের কাজ ছেড়ে দিতে সাব্যস্ত করেন। কিন্তু এ নিয়ে জমিদারের

সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য বুঝে তারা ইতস্ততঃ করতে থাকেন। অবশেষে বটরশির বিদ্রোহে উৎসাহিত হয়ে একদিন মহাকল গ্রামের মালিকরা সত্যি সত্যি জমিদারকে তাদের সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ হদ-বেগারী বন্ধ করে বিদ্রোহ করবার ইচ্ছা ছিল না।

জমিদার তবু তাদের রেহাই দিলনা। সে রাতেই জমিদারের হুকুমে আশি পরিবার নানকারের আশিটা ঘরে এক সাথে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তারা প্রাণ বাঁচালেন, কিন্তু যথা সর্বস্ব তাদের পুড়ে-ছাই-হয়ে গেল।

এ ঘটনার প্রতিষ্ঠানের নামে করিমগঞ্জের কংগ্রেস নেতারা জমিদারের সাথে পরামর্শ করে আবার পালকী বহনের বিনিময়ে তাদের সব ক্ষতি পূরন করে দেবার অঙ্গীকার করলে নানকাররা তাতে সম্মত হলেন না। তারা সবাই—এক সাথে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে জমিদারের হদ-বেগারী মুক্ত হলেন। তবু জেলার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাছে দেন-দরবার করে মহাকল গ্রামের জন্যে এক বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ ঘাটি চেয়ে নিয়ে আসেন। বিদ্রোহীরা আর কোন দিন এ গ্রামে ফিরে আসেন নি। তবু এ ঘাটি মাস ছয় এখানে রেখে দেওয়া হয়।

কোনা সালেশ্বর বিদ্রোহ (১৯৪৬)

কোনা সালেশ্বর গ্রামটাও এই একই করিমগঞ্জ মহকুমার বিয়ানীবাজার থানায় অবস্থিত। বটরশি ও মহাকলের বিদ্রোহ কোনা-সালেশ্বরের ত্রিশঘর নানকারকে সাহসী করে তোলে। জমিদারকে প্রতিদিন তাদের খাবার মাছ ধরে দিতে হত। তাতে তাদের দিনমজুরীর কাজে ব্যাঘাত হত বলে তারা মাছ ধরা বন্ধ করে দেন। জমিদাররা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে নানকারদের সব কটা ঘর একরাতে জ্বালিয়ে দেয়।

তারপর আবার জমিদারদের নেতা বদরুল মোক্তার নামকারীর শর্তে তাদের ঘর বানিয়ে দেবার প্রস্তাব দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে তাদেরই এক আত্মীয় আসিদ আলীর কেনা জমিতে গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে গাদাগাদি করে বসে পড়ে তারা বেগারী মুক্ত এক নূতন পল্লীর পত্তন করেন। যুদ্ধোত্তর যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জমিদাররা আর এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে সাহস করেন নি।

পরপর এ তিনটি স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও সমগ্র পূর্ব সিলেটে তা এক বিদ্রোহের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। নানকার বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে তারপর আর কারো চাপা দেবার পথ থাকে না।

সংগঠিত আন্দোলন ও বিদ্রোহ সৃষ্টির উদ্যোগ

এ সময় জেলার বাইরের একটা ঘটনাও এখানে বিদ্রোহী পরিবেশকে পরিপক্ক করে তুলতে খুব সাহায্য করে। এ ঘটনা হল বাংলার তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত প্রায় সর্বহারা ভূমিহীন ভাগচাষীদের এক পরাক্রান্ত বিদ্রোহী জেলার স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও বাংলার তেভাগা বিদ্রোহ জেলার জনতার স্তর, বিশেষ ভাবে নানকারদের ভেতর বাঁধ ভাঙ্গার মানসিকতাকে বেশ বাড়িয়ে তুলেছিল। এ অবস্থায় জেলার কমিউনিস্ট কর্মীরা যুদ্ধোত্তর যুগের রাজনীতি নিয়ে আবার জনতার স্তরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। তাদের কাজের একটা ক্ষেত্র ছিল লাউতা বাহাদুরপুরে। তখনকার করিমগঞ্জ মহকুমার বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানা দু'টির গুটি কয়েক গ্রাম নিয়ে এই লাউতা-বাহাদুরপুর অঞ্চল। এ অঞ্চলে ক'ঘর ক্ষুদে জমিদার ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার ছাড়া আর সবাই নানকার। এই লাউতা বাহাদুরপুরেই প্রায় এক দশক আগে এক অত্যাচারী ক্ষুদে জমিদারের বিরুদ্ধে তার নানকার প্রজারা বিদ্রোহ করে হেরে গিয়েছিলেন। লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলে কমিউনিষ্টদের কাজের ক্ষেত্র ছিল তাই নানকারদের ভেতর। আর বিগত ব্যর্থ বিদ্রোহের কারণে তা ছিল খুবই দুরূহ। অতি গোপনীয়তার ভেতর দিয়েই কেবল নানকারদের সাথে তখন যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল। এমন গোপন যোগাযোগের পথে যে দু'জন নানকার যুবক সার্বাগ্রে কর্মীদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তারা হলেন, আবদুছ ছোবাহান (পটল) ও জোয়াদ উল্লা। স্থানীয় মধ্যবিত্ত ঘরের কমিউনিষ্ট কৃষক সভার কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রেখে তারা নানকারদের ঘরে ঘরে গোপন প্রচারের ধারাটা টেনে নিয়ে চললেন।

প্রায় দু'টো মাস এমন প্রচার ও জন জন বিচার করে যে পাঁচ জন নানকারকে তারা বাছাই করলেন তাদের নিয়ে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এক গভীর রাতে আলাপের ব্যবস্থা করলেন। আলাপের বিষয়বস্তু হল সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেমন করে আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। পাঁচ জন নানকার ও বৈঠকের দুই উদ্যোক্তারা ছাড়া এ আলোচনায় আর যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন কমিউনিষ্ট ও কৃষক সভাকর্মী বীরেন্দ ও অজয় ভট্টাচার্য। দীর্ঘ আলোচনার পর এ বৈঠকে স্থির হল যে নানকারদের বাড়ি-জমিতে স্বত্ব ও হদ বেগারীর পরিবর্তে নগদ অর্থে খাজনা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতেই আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর থেকেই গ্রামে গ্রামে পাড়ায় এ ভিত্তিতে গোপন প্রচার ও সংগঠন গড়ার কাজ হয়ে যায়।

এ সময় একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে, যার ফলে পরবর্তীকালে বিদ্রোহের সারিতে নানকারদের সমাবেশ দ্রুততর ও ব্যাপকতর হয়ে উঠে। ঘটনা হল, চীন, রাশিয়া সহ প্রাচ্য পাশ্চত্যের বহুদেশের বন্দরে বন্দরে দীর্ঘ বিশ বছর ঘুরে বেড়িয়ে বিপুল অভিজ্ঞতা ও নানকার ব্যবসার বিরুদ্ধে এক দুর্দমনীয় গণ আন্দোলন গড়ে তুলবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নানকার কর্মী নঈম উল্লার দেশে ফিরে আসা। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কেবল কেবল তার নিজ গ্রামেই নয়, বিভিন্ন অঞ্চলেও নানকারদের দ্রুত সংগঠিত করতে ও বিদ্রোহে টেনে আনতে তাকে অবিশ্বাস্য রকম সাহায্য করে।

বছর যেতে না যেতে নানকারদের ভেতর প্রথমে গোপন, তার আধ-গোপন সংঠন গড়ে উঠলে বিদ্রোহের পরিবেশ সৃষ্টি হতে আর বাকী থাকে না। বিদ্রোহ এবার বহির্মুখী হবার পথ খুঁজতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সাল কেটে যায়।

লাউতা বাহাদুরে বিদ্রোহ (১৯৪৭)

এই গোপন ও আধা-গোপন সংগঠনের উপর দাঁড়িয়েই লাউতা-বাহাদুর সর্ব প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের সংগঠিত নানকার বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।

সূত্রপাতে চাষীর পাকা ধানে বিচরণ কালে রাতের আঁধারে কৃষক সমিতির কর্মীরা জমিদারের ঘোড়াকে বর্শা ছুড়ে মেরে ফেলেছিলেন। জমিদার এ ঘটনার বদলা নিতে মনস্থ করেন। কিন্তু কে ঘোড়ার হত্যাকারী তা জানতে না পেরে তিনি আন্দাজে অনুমানে নারাইনপুর গ্রামের তার নানকার প্রজাদের এ ঘটনার জন্যে দায়ী করে তলব পাঠিয়ে তাদের কাছারীতে ডেকে আনেন। কিন্তু এ ঘটনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বলে তাদের ডেকে পাঠাবার কারণ কিছু তারা বুঝতে পারেন না। জমিদারের বেগার খাটবার কোন কাজ হয়ত পড়ে থাকবে, মনে করে গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্করা এসে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখেই জমিদার ক্ষেপে গেলেন এবং ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে তাদের পিঠে চাবুক মারতে আরম্ভ করলেন। সারির সামনে ছিলেন ষাট বছরের বুড়ো পাখী সহিষ্যদাস। বেশ খানিক ক্ষণ পাখীর পিঠে চাবুক চালিয়ে তিনি লাথি মারতে মারতে তাকে চৌকির নীচে ঢুকিয়ে দিলেন। এবার তার সামনে পড়লেন কৃষক সমিতির যুবক কর্মী দরবারী সহিষ্যদাস। জমিদারের চাবুক এবার তার পিঠে এসে পড়ল দু'একটা ঘা। পিঠে পড়তেই অবস্থাটা তার বোধগম্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে চাবুকটা ধরে ফেলে এক ছেঁচকা টানে তিনি জমিদারের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিলেন। তারপর আর কাল বিলম্ব না করে সবাইকে ঠেলে নিয়ে জমিদারের কাছারী ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন।

সেদিন ১৯৪৭ সালের ষোলই জানুয়ারী। জমিদারের কাছারী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছুটতে ছুটতে তারা কৃষক সমিতির অফিসে এসে উঠলেন।

খবর পেয়ে চারদিক থেকে লোক ছুটে এল। অলপক্ষণের ভেতর কৃষক সমিতির অফিসে লোকের ভিড় জমে গেল। সেদিন বেলা প্রায় দু'টোর সময় কৃষক সমিতির অফিস থেকে দু'তিন শ' লোকের এক মিছিল 'হদ-বেগারী বন্ধ কর', 'নানকার ব্যবস্থা রদ কর', "জমিদারী প্রথা ধ্বংস হোক" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে পথে এসে নামল। প্রচণ্ড কলরবে চার দিক কাঁপিয়ে তুলে সর্বাত্মক বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়ে ধ্বনি দিতে দিতে মিছিলটা সারা অঞ্চল ঘুরে বেড়াল। তারপর বর্ধিত কলেবরে সন্ধ্যার পর আবার কৃষক সমিতির অফিসে ফিরে এল। সেদিন হাজার লোকের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা করা হল যে, লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলে হদ-বেগারী সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

এ বিদ্রোহের গভীরতা

এ অঞ্চলের ব্যতিক্রম এমন এক অস্বাভাবিক ঘটনার পরে জমিদারের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। নারাইনপুরকে শায়েস্তা করতে তার অপরাপর নানকার প্রজাকে তাই তিনি ডেকে পাঠালেন। কিন্তু গুটি কয়েক একান্ত বাধ্য লোক ছাড়া আর কেউ তার এ ডাকে সাড়া দিলেন না। ফলে অবস্থাটা কিছু তার বোধগম্য হল। তবু একেবারে চুপ করে থাকা যায় না। অন্যান্য জমিদারদের সাথে সলাপরামর্শ করে নারাইনপুরের নানকারদের তিনি জমি থেকে উচ্ছেদের পরিকলপনা করলেন।

কিন্তু জমি থেকে উচ্ছেদ করতেও লোকবলের প্রয়োজন। সে লোকবলে পরিচিত গোলাব নামের তার এক পেটুয়া নানকারকে দিয়েই তিনি কাজটা সেরে নিতে চাইলেন। একদিন তার গুটি কয়েক চাকর সহ হাল সঙ্গে দিয়ে গোলাবকে তিনি নারাইনপুরের চাষের জমি বেদখল করতে মাঠে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ঘটনাটা বুঝতে পেরে চার দিক থেকে লেকে ছুটে এসে নারাইনপুরের জমি ঘিরে দাঁড়ালেন। গোলাবকে তারা ভয় দেখিয়ে জমি থেকে তুলে দিলেন। জমিদারের পক্ষে তখন আর মিথ্যা মামলা দায়ের করা ছাড়া গত্যন্তর রইলনা।

এদিকে করিমগঞ্জের মহকুমা হাকিম তখনো সেই এহিয়া খান। বটরশির বিদ্রোহে ইতিমধ্যেই তিনি তার ভূমিকা প্রকাশ করে দিয়েছেন। এবার লাউতা বাহাদুরপুরের বেলাও তিনি সেই ভূমিকাই নামলেন।

জমিদাররা নানকারদের বিরুদ্ধে মিথ্যে ফৌজদারী মামলা দায়ের করার সাথে সাথে কথিত আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হতে

আরম্ভ হল। তার পরই এ পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ এসে গ্রামে ঢুকল। আসামী খোঁজার নাম করে ঘরে ঘরে ঢুকে তারা নানকারদের ঘর সংসার তছনছ করতে লাগল। প্রথম প্রথম কেউ কিছু বুঝবার আগেই কয়েকজন নানকার কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে গেলে কর্মীরা পুলিশকে এড়িয়ে চললেন। পুলিশ আর কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারল না। বটরশির স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহটাকে যে ভাবে ধমক দিয়ে কাবু করে ফেলা হয়েছিল মহকুমা হাকিম বোধহয় লাউতা-বাহাদুরপুরের লোকও তাই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আর তিনি করতে পারলেন না। লাউতা-বাহাদুরপুরে বিদ্রোহের পেছনে যে একটা সংগঠন আছে এবার বোধ হয় তা তার নজরে পড়ল। এ সংগঠনকে ভেঙ্গে ফেলতে তিনি খুব তৎপর হয়ে উঠলেন।

জমিদারদের সাথে সলাপরামর্শ করে তিনি সালিশীর নামে একদিন লাউতা-বাহাদুরপুরে এসে উপস্থিত হলেন। কৃষক সমিতি তার অসাধু উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলেও তার সাথে আলোচনা করতে সরাসরি অস্বীকার করল না। লাউতা গ্রামের কালীবাড়ী বাজারের খোলা জায়গায় প্রায় দুই তিন শ' নানকার নিয়ে সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত হলে হাকিম সাহেব এ ব্যাপারে কৃষক সমিতির কথা বলার অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। সরাসরি নানকারদের মুখে তিনি এখানকার অবস্থাটা শুনতে চাইলেন। কৃষক সমিতি বলতে হাকিম সাহেব বুঝে ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের কর্মীদের। কিন্তু নানকারদের ভেতরও যে সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মী ও নেতারা রয়ে গেছেন তা তিনি বোধ হয় অনুমান করতে পারেন নি। তাই কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেও বৈঠক ছেড়ে তারা বেরিয়ে এলেন না। নানকার ঘরের কর্মীদেরই কৃষক সমিতির পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরবার ব্যবস্থা করা হল। সে মত নানকার নেতা নঈম উল্লা, আসিক আলী ও ভ্রমর দাস এমন সুষ্ঠু ও প্রাঞ্জল ভাষায় নানকারদের অবস্থা, জমিদারী নিপীড়ন ও নানকার বিদ্রোহের যুক্তিযুক্ততা তুলে ধরলেন যে, উপস্থিত জমিদারদের তাতে প্রায় ক্ষেপে যাওয়ার উপক্রম হল। নানকার ব্যবস্থাটা প্রচলিত আইন বহির্ভূত কিছু নয়, এ যুক্তিতে জমিদার পক্ষের প্রতিনিধি মস্তই মিঞা কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনের জন্যে মহকুমা হাকিমের কাছে আবেদন জানালেন। মহকুমা হাকিম তার এ যুক্তি মেনে নিয়ে নানকারদের কৃষক সমিতির উস্কানীতে বিভ্রান্ত না হয়ে আবার তাদের সাবেক অবস্থানে ফিরে যেতে নানকারদের উপদেশ দিলেন। সালিশের নাম করে এসে তার এ কথায় উপস্থিত নানকার জনতার ভেতর বেশ অস্বস্তির প্রকাশ ঘটতে দেখা গেল। সর্বশেষ তিনি যখন সরকারী তরফ থেকে কঠোর দমন-পীড়নের ভয় দেখিয়ে নানকারদের আবার হদ-বেগারীতে

ফিরে যাবার ডাক দিলেন তখন নানকারদের পক্ষে ধৈর্য ধরে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হল না। সবাই তারা একসাথে উঠে দাঁড়িয়ে মহকুমা হাকিমকে তার কথা প্রত্যাহার করতে আহ্বান করলেন। হঠাৎ জনতার এ মেজাজ পরিবর্তনে মহকুমা হাকিম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সভা ছেড়ে দৌঁড় দিলেন। দৌড়ে তিনি সভার কাছে রাখা জমিদারদের একটা হাতীর পিঠে চড়ে বসলেন। হাতীটা সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলে জনতার পক্ষে আর তার নাগাল ধরা সম্ভব হল না। জনতা তখন নানকার ব্যবস্হা রহিত করার দাবীতে আওয়াজ তুলে মিছিল করে সারা অঞ্চল বেড়াল।

তারপর থেকে মিথ্যা মামলার আর কোন সীমা সংখ্যা রইল না। আসামীর সংখ্যা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিন দিনই কেবল বেড়ে চলল। লাউতা বাহাদুরপুরে পুলিশের যাতায়াত দিনে রাতে কখনো আর বন্ধ রইল না। জমিদাররা দল বেধে শিলং শহরে গিয়ে এ নানকার বিদ্রোহকে ভয়ানক অরাজকতা বলে সরকারকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পরিষদ সদস্যরাও ডেপুটেশন দিয়ে এ কথাই বললেন। সরকারী আমলা কর্মচারীরাও তাদের রিপোর্টে একথাটাই সরকারকে লিখে জানালেন।

কৃষক সমিতির পক্ষ থেকেও নানকারদের মিছিল নিয়ে মহকুমা ও জেলা শহরে গিয়ে এসব কথার প্রতিবাদ করা হল। সভা করে পুলিশের জুলুম অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল। শিলং শহরেও নানকারদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে মন্ত্রীদের কাছে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরা হল। তার ফলে শহরে বন্দরে জনমত নানকারদের পক্ষে সংহত হল আর মন্ত্রীরা পুলিশ জুলুমের অবসান সহ নানকার ব্যবস্থা রহিত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু পরে দেখা গেল, বিদ্রোহীদের প্রতি জন সমর্থন ঠিকই রয়ে গেল, বরং দিন দিন তা আরো বেড়ে চলল। কিন্তু মন্ত্রীদের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি বাসি হওয়ার আগেই মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে গেল। দিন কয়েকের ভেতরেই লাউতা বাহাদুপুরে সশস্ত্র পুলিশ এসে ঘাঁটি গেড়ে বসল।

বিদ্রোহের বিস্তার

১৯৪৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলের কুখ্যাত ক্ষুদে জমিদার ছয়াব মিঞার কাছারী থেকে বেরিয়ে এসে নারাইনপুরের নানকার প্রজারা যে বিদ্রোহের সূচনা করলেন চরম দমন-পীড়নের মুখেও তা দমন হওয়া দূরে থাক, বরং দিন দিন কেবল ছড়িয়ে পড়তেই লাগল।

নানকার সমাজের মেজাজ তখন বিদ্রোহের অনুকূলে। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সভাও তখন নানকার বিদ্রোহের প্রসার ঘটাতে একান্ত ভাবে প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। ফলে এপ্রিল ও মে মাসে এ বিদ্রোহ বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানা দু'টির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে গেল। গোলাপগঞ্জ থানার ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলেও কানিশালি, রায়গড়, দওরাইল, নগর, শিলঘাট প্রভৃতি প্রধান প্রধান নানকার অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটল। বিদ্রোহের প্রসার তারপরও থেমে থাকল না। কোথাও কর্মীদের চেষ্টায় সংগঠন গড়ে তুলে তার ভেতর দিয়ে বিদ্রোহকে ছড়িয়ে দেওয়া হল, কোথাও আবার নানকার জনতা কেবল নিজেদেরই উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় বিদ্রোহ করে জমিদারের হদ বেগারীর বন্ধ করে বসে রইলেন। এমন করে দিনের ভেতর গোলাপগঞ্জ থানার রনিকেলি, ভাদেশ্বর ফুলবাড়ি, আমুড়া-আয়নিয়া, সদর থানার দউদপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ থানার মউয়াপুর, বালাগঞ্জ থানার বোয়ালজুরে, বড়লেখা থানার দক্ষিণ-ভাগ, ছোটলেখা, সাহবাজপুর প্রভৃতি বড় বড় নানকার অধ্যুষিত অঞ্চল গুলো বিদ্রোহের সারিতে এসে দাঁড়াল। ঢাকা দক্ষিণ, দক্ষিণ ভাগ, ভাদেশ্বর আমুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে সশস্ত্র পুলিশের ঘাটি বসল। পুলিশ জুলুম সর্বত্র বেড়ে চলল। বিদ্রোহকে তবু বাগে আনা গেল না।

সরকার ও জমিদারদের এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক সমিত নতুন কার্যক্রমে প্রজাদের সাথে বিশেষে লিপ্ত জমিদারদের একঘরে করার ডাক দিলে কেবল নানকার নয়, প্রায় সর্ব শ্রেণীর জনতা এসে এ বিদ্রোহে জড়িয়ে গেলেন। জমিদারদের কাছে সবাই জিনিসপত্র বিক্রি বন্ধ করে দিলেন।

ফলে জমিদারদের হাট-বাজার বন্ধ হল, জন মজুর আর তাদের মিলল না। জমিদার বাড়ীগুলোর চাকর-বাকর, দাসী-বাঁদি বেরিয়ে এল। তাদের জমিদারীর অন্যান্য প্রজা তারাও খাজনা বন্ধ করে দিয়ে সরাসরি বিদ্রোহের সারিতে এসে দাড়ালেন।

জমিদাররা এবার উস্কানী দিয়ে সংঘর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগলেন। হাটের পথে পুলিশ ও দালালের সাহাষ্যে নিরীহ চাষীদের জিনিষপত্র লুটপাট করা তাদের প্রতিদিনের কাজ হয়ে উঠল। তবু পুলিশের সাহায্যে জিনিসপত্র ছিনিয়ে না নিলে কেউ জমিদার ও পুলিশের কাছে বিক্রি করতে যেত না। সংঘর্ষপূর্ণ অঞ্চলগুলোর এ অবস্থা দেখে বহু অঞ্চলে জমিদাররা আর সংঘর্ষে যেতে উৎসাহ বোধে করেন নি। তাদের নানকার প্রজাদের বিদ্রোহকে উপেক্ষা করে তারা চুপচাপ বসে রইলেন।

দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন

সিলেট জেলার এই নানকার বিদ্রোহই কেবল নয় যুদ্ধোত্তর যুগে বিশ্ব পরিসরে বিপ্লবী পরিস্থিতির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে যেমন দেশে, তেমন সারা ভারতেও তখন এমন অসংখ্য আন্দোলন, সংগ্রাম, সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ সংগঠিত হচ্ছিল। সারা ভারতের অবস্থা তখন অগ্নি-গর্ভ। এ অবস্থাকে ঠেকাতে ভারতের তখনকার ঔপনিবেশিক সরকার আপোষে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে এখানকার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার নূতন বিন্যাস ঘটাবার এক পরিকল্পনা উপস্থিত করে। এ পরিকল্পনার মূল কথা ছিল, এদেশের জনতাকে বিভক্ত করা। তাদের ভেতর অবিশ্বাস, সন্দেহ, হানাহানি সৃষ্টি করে এদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সামন্তবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের ভিত্তিমূল উপড়ে ফেলা। এই লক্ষ্যে তারা এখানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগের ব্যবস্থা করল। বলা-বাহুল্য, এ দেশের জনবিরোধী বিত্তবান শ্রেণীগুলো শ্রেণী-স্বার্থে ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সমসূত্রে গাঁথা বলে এ পরিকল্পনা তাদেরও স্বার্থ রক্ষা করছিল। তাই এ দেশের বিত্তবান শ্রেণীগুলোর সবগুলো প্রতিষ্ঠানই এ পরিকল্পনাকে মেনে নেয়। জনতার মানসিকতা এ অবস্থার প্রতিফল ঘটতে আরম্ভ করে।

তথা-কথিত গণভোট

প্রবল আন্দোলনই কেবল দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়ার এ চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে পারত। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো এমন কোন আন্দোলনকে ঠেকাতে নতুন নতুন ষড়যন্ত্র আঁটিতে লাগল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেট জেলায় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ঠিক আগ মুহূর্তে হিন্দুস্তান অথবা পাকিস্তানে যোগ দেবার প্রশ্নে তথা কথিত গণভোটের আয়োজন আসলে এই ষড়যন্ত্রের অংশ। কারণ ১৯৪৬ সালে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সারা ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর এই একই ভিত্তিতে আবার জনমত যাচাইয়ের সুযোগ ছিল না। এই নির্বাচনের জয় পরাজয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রভাব বলয় ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে যাওয়ার কথা বৃটেনের ঔপনিবেশিক সরকার মেনে নিয়েছিল এবং সে হিসেবে দেশ বিভাগের কথাও ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবল এ দুটো অঞ্চলের জন্যই সারা ভারতের ব্যতিক্রম এক নতুন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে আসলে তারা এ ষড়যন্ত্রের কথাটাই প্রকাশ করেছিল।

ভারতের উত্তর—পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের অবস্থা ছিল তখন

সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিতে ব্যতিক্রমধর্মী। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সংলগ্ন ছিল সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর ওখানে দেশের ভেতর ছিল অবিচল বৃটিশ বিরোধী দুর্ধর্ষ পাঠানদের বাস। তখনো পর্যন্ত তাদের ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জনতার মত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক প্রভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি ভারতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক বিন্যাসকে তারা হয়ত মেনে নাও নিতে পারেন। আর এমন কোন অবস্থা দেখা দিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠানদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাই পাঠানদের ভেতর এমন কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি হতে না পারে তার জন্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিষে তাদের ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা হল, তথা কথিত গণভোটের নামে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণার আবার সুযোগ করে দেওয়া। ইংরেজ ত আপোষেই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার সাথে পাঠানদের আর কোন বিরোধ নেই। বিরোধ এখন কেবল হিন্দু আর মুসলমানে। এ বিরোধের আর কোন দিন শেষ নাই। তাই এবার পাঠানদের স্থির করতে হবে তারা কোন পক্ষে যাবে। তারা পাকিস্তানে যাবে না হিন্দুস্থানে যাবে, গণভোটে তাই এবার স্থির হবে।

সিলেট জেলার প্রশনটা ঠিক এমন না হলেও দেশ বিদেশী প্রতিক্রিয়া এখানেও এমনই এক সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী প্রবল গণ-আন্দোলনের ভয় করছিল। কারণ এখানে ভূমিহীন প্রায় সর্বহারা নানকার চাষীদের যে পরাক্রান্ত বিদ্রোহটা চলছিল তার উপর নির্ভর করে ভারতের এই সীমান্তেও নতুন ঔপনিবেশিক বিন্যাসের উপর আঘাত পড়ার আশংকাকে খাটো করে দেখা দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নানকার বিদ্রোহের অবস্থা ছিল তখন (১) বিদ্রোহ দ্রুত প্রসার লাভ করছিল, (২) প্রচণ্ড সরকারী দমন-পীড়ন বিদ্রোহের সারিতে মনোবল ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। (৩) সরকারী দমন-পীড়নের মুখে বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রধানতঃ গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করছে (৪) নেতৃত্বের ভেতর তখন উন্নততর প্রতিরোধের কার্যক্রম আলোচিত হচ্ছে। (৫) দমন নীতির মোকাবেলায় বিদ্রোহের সারিতেও তখন প্রতিরোধের আশংকা ব্যাপকতা লাভ করেছে (৬) নিয়মতান্ত্রিক পথের অসারতা বিদ্রোহের সারিতে তখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে (৭) জনতার ভেতর সংঘর্ষের প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে (৮) ৪৬ এর নির্বাচনের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তখনকার সাম্প্রদায়িক হানাহানি বিদ্রোহের সারিতে তখনো কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে নি (৯) বিদ্রোহী অঞ্চল গুলোর নানকার ছাড়া বিভিন্ন বর্গের কৃষক প্রজারাও দ্রুত বিদ্রোহের সারিতে এসে ভিড়ছেন (১০) সামন্ত স্বার্থের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্কিত

নয় এমন মধ্য ও নিম্নবিত্ত সমাজগুলো বিদ্রোহের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হয়ে গিয়েছে (১১) সামন্ত জমিদার শ্রেণী গ্রামঞ্চলে সমর্থন হারিয়ে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে নানকার বিদ্রোহের তখনকার প্রকৃতিও গতিশীলতা নজর করা মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিল না।

অন্যদিকে সিলেট জেলার অবস্থান ছিল ভারতের পূর্ব সীমান্তে, তখনকার বিদ্রোহ-আন্দোলিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একেবারে নিকটবর্তী। তাই এখানেও আবার সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণা প্রতিক্রিয়ার পক্ষে জরুরী হয়ে উঠল। অন্যথায় এই নানকার বিদ্রোহকে ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গণবিদ্রোহ ভারতের মাটিতে পা বাড়িয়ে দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থকে এখান থেকে হয়ত চিরতরে উচ্ছেদ করে দিতেও পারে। তাই সিলেট জেলায় এই তথা কথিত গণভোটের লক্ষ্য ছিল আসলে নানকার বিদ্রোহ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষে ডুবিয়ে না দিয়ে প্রতিক্রিয়া এখানে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত এই তথাকথিত গণভোটের উদ্যোক্তাদেরই জয় হল। সীমান্তের বেলা যা ঘটল সিলেটের বেলাও প্রকৃত পক্ষে তাই ঘটল। এ ভোটকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণা চলল তাতে জনতার ভেতর বিভক্তি অবিশ্বাস্য রকম গভীরতা লাভ করল। ফলে সিলেট জেলার এমন সকস নানকার বিদ্রোহটাও যেন হোচট খেয়ে একবার দাড়িয়ে পড়ল। দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রের ফসল তথা কথিত আপোষে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটা দক্ষিণ পন্থী বামপন্থী উগ্রপন্থী নম্রপন্থী সবার মিলিত জয়ধ্বনির ভেতর দিয়ে নির্বিবাদে কার্যকরী হয়ে গেল। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত দেশ ও জনতাকে একবার আন্দোলনের প্রশ্নে হাত ধুয়ে ঘরে গিয়ে উঠতে হল।

দেশ বিভাগরে পর

সিলেট জেলায় এই তথা কথিত গণভোটে মুসলিম লীগের বিজয় ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বৃটেনের ভারত সাম্রাজ্যের বিভাগ মুসলিম লীগকে অস্বাভাবিক দাম্ভিক করে তোলে। একমাত্র মুসলিম লীগ ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব তাদের কাছে যেন অপ্রয়োজনীয় ও অনভিপ্রত হয়ে উঠে। নানকারদের দীর্ঘকালের দাবী দাওয়ায়, আন্দোলন বিদ্রোহ প্রভৃতির গোড়ায় কোন যৌক্তিকতা আছে কি না তা নজর করবার চেষ্টা না করেই তারা কেবল মুসলিম লীগের আওতাভুক্ত নয় বলে নানকারদের সব দাবী

দাওয়া এক কথায় নাকচ করে দিল। মুসলিম লীগ নানকার ব্যবস্থাকে আবার তার পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একটা মাস যেতে না-যেতে সে চেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেল। সেপ্টেম্বরের ১০/১২ তারিখের দিকে তখনকার পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য সিলেটের গহরপুরের ক্ষুদে জমিদার আবদুর রব লাউতা বাহাদুরপুর এসে তার আত্মীয় জমিদারদের সাহায্যে কিছু সংখ্যক নানকারকে ডেকে এনে তাদের কাছে বিদ্রোহ অবসানের প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে তিনি কঠোর দমন-পীড়নের ভয় দেখান। কিন্তু দেশ বিভাগ ও তথা কথিত গণভোটের প্রচার-প্রচারণায় বিদ্রোহের সারিতে যথেষ্ট দুর্বলতার প্রকাশ ঘটলেও নানকারদের কোন অংশই আবার নানকরীর পূর্ব অবস্থায় অর্থাৎ হদ বেগারীতে ফিরে যেতে তৈরী ছিল না। তাই তারা এ প্রস্তাব মেনে নিলেন না। ফলে তিনি যারপর নাই ক্ষুব্ধ হয়ে দারোগার সাথে ষড়যন্ত্র করে তার উপস্থিতিতেই ১৭ই সেপ্টেম্বর রাতের বেলায় কৃষক সমিতির অফিসে পুলিশের এক অভিযান পাঠালেন। অতর্কিত এ আক্রমণে কৃষক সমিতির বিশিষ্ট কর্মী বীরেন্দ্র চন্দ্র ও সম্পাদক অজয় ভট্টাচার্যকে কোন অভিযোগ ছাড়াই গ্রেপ্তার করা হল। তারপর আবার আবদুর রবের পক্ষ থেকে হদ-বেগারীতে ফিরে যাবার জন্যে নানকারদের উপর চাপ দেওয়া হল। কিন্তু এ চাপের কাছে নতিস্বীকার করা দূরে থাক, এবার দু'একজন অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন নানকার ছাড়া আর কেউ এসে আবদুর রবের সাথে দেখাই করলেন না। তারা বরং গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে এ অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। এই আক্রমণ ও গ্রেপ্তারের পরপরই সরকারী দমনীতির প্রতিবাদে বিয়ানী বাজার, বড়লেখা ও গোলাপগঞ্জ থানার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে সর্বশ্রেনীর জনতা হাল-গৃহস্থী, হাট-বাজার বন্ধ রেখে একদিনের এক সফল হরতাল পালন করেন। সরকারী উদ্যোগে বিদ্রোহ আবার সংঘর্ষের পথে চলে যেতে বাধ্য হয়।

তথাকথিত গণভোটের সময় আসাম সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামে এ বিদ্রোহের সাথে সম্পর্কিত যে মামলা মোকদ্দমাগুলো স্থগিত রেখে অভিযুক্ত বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন, এবার নতুন করে সংঘর্ষ শুরু করেই সরকার বিনা নোটিশে সেই মামলা গুলো পুনরুজ্জীবিত করে তোলে এবং অভিযুক্তদের অতর্কিত গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করে। গ্রামে গ্রামে আবার সশস্ত্র পুলিশের ঘাঁটি বসতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাফল্যে সিলেট জেলার মুসলিম লীগ পন্থী জমিদাররা এবার আবার

নতুন উৎসাহে নানকার বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে উঠেন। সাম্প্রদায়িক ভাবধারা পুষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের সারিতে আবার প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। জমিদারদের আবার একঘরে করা হয়। স্থানে স্থানে পুলিশের সাথেও জনতার সংঘর্ষের উপক্রম হয়। পুলিশ ঘাঁটিতে আটক বন্দীদের উপর মারপিট ঠেকাতে হাজার জনতা লাউতা-বাহাদুরপুরে পুলিশ ঘাঁটি ঘেরাও করে রাখে এ ঘটনায় কৃষক সমিতির নেতারা অবস্থা আয়ত্বে আনেন। তবু তাদের পক্ষে পুলিশ ও পুলিশের দালালদের বিরুদ্ধে জনতার ক্রোধকে একেবারে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না। এসব ঘটনার ভেতর লাউতা-বাহাদুরপুরে জগৎ মুচির হাতে দালাল বলে কথিত লালু মিঞার জুতা পেটা হওয়া, কালই বিবির হাতে দারোগা করম আলীর নাজেহাল হওয়া এবং তহমিনা বিবির ঝাটা বটির প্রতিরোধের মুখে পড়ে পুলিশ বাহিনীর পলায়ন প্রভৃতি প্রধান। এ সব ঘটনা বিদ্রোহকে আবার উদ্দীপ্ত করে তোলে।

অপর পক্ষে সরকারও তখন নানকারদের উপর আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তারা ১৪৪ ধারা বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে নানকারদের তাদের বাড়ী-জমির ফসল সংগ্রহ করতে নিষেধ করে দেয়। সার্বিক নানকার উচ্ছেদের পথে নানকারদের জমি বাড়ী জমিদারের খাসজমি হিসেবে তাদের হাতে তুলে দিতে সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে এ ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু নানকাররা এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সর্বত্র জমি বাড়ীতে তাদের দখল বজায় রাখেন। অবশ্য এজন্যে জমিদারের খাস জমির ফসল চুরির অভিযোগে তাদের অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়।

তৎসত্বেও এ বিদ্রোহকে এখানেই দমন করা সম্ভব হয় নি। বরং তাতে ফল হয় ঠিক উল্টো। অর্থাৎ ইতিপূর্বে দেশের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদ বিদ্রোহের স্তরে যে বিভ্রান্তি দুর্বলতা জাগিয়ে তুলেছিল সংঘর্ষের প্রয়োজনে তাকে পাশে ঠেলে রেখে বিদ্রোহের সারিতে আবার পূর্ণ সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হয়। তদুপরি মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিরোধ তার এক অংশ নেতা ও কর্মীকে নানকার বিদ্রোহের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে মুক্ত হওয়া তখনো তাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও বিভিন্ন কারণে তারা বিদ্রোহের পক্ষে এসে দাঁড়ান। তারপর থেকে নানা প্রকার বিদ্রোহের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব কমিউনিষ্টরা মুসলিম লীগের এই একাংশ নেতা ও কর্মীদের সহযোগিতার বিদ্রোহ পরিচালনার ব্যবস্থা করলে এ বিদ্রোহের বিপ্লবী রাজনৈতিক চরিত্রকে আর টিকিয়ে রাখার পথ থাকে না। মুসলিম লীগের সামন্তবাদী চিন্তা-ভাবনার ও সাংগঠনিক রীতি পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত

হয়ে এ সময় বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে সংস্কারবাদী নিয়মতান্ত্রিককতার পরিমন্ডলে গিয়ে ঢুকে পড়ে। তবু বিদ্রোহী নানকারদের আবার হদ-বেগারীকে মেনে নেবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। নানকারীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে।

এ অবস্থায়ও পুলিশ জুলুম অব্যাহত থাকলে বিদ্রোহের সারিতে অধৈর্যের লক্ষণ-সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। নানকাররা তখন স্থানে স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের পথ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। এমন ঘটনাগুলোর ভেতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের কানিশালি গ্রামে জমিদার পেটার ঘটনা। ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের নানকার কর্মী মকলেছ ও তার দুই সহযোগীর হাতে কানিশালী গ্রামের চরম ভাবে নানকার বিরোধী ক্ষুদে জমিদার কটু মিঞা, ফজই মিঞা ও সালাম মিঞা গ্রামের পথে একই দিনে প্রকাশ্য দিবালোকে জুতা পেটা হন। এ ঘটনা কেবল সংশ্লিষ্টদেরই নয়, বরং এ অঞ্চলে সমগ্র জমিদার শ্রেণীকেই তীব্র ভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হয়।

এ ঘটনার পরপরই প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এক তদন্ত কমিটি গঠন করে নানকার বিদ্রোহের ব্যাপারে সুপারিশ করতে তাকে নির্দেশ দেয়। কমিটি ঘটনাস্থলে তদন্ত করে গিয়ে যে সুপারিশ করে তাকে সামনে রেখে একই মুসমিক লীগের নেতাদের সরকার জমিদার ও নানকার এই তিন পক্ষ সাজিয়ে এক তথা কথিত ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ডাকা হয়। সরকার পক্ষে তদানিন্তন রাজস্বমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লা বাহার, শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ প্রমুখ উপস্থিত থেকে তথাকথিত ত্রিপক্ষীয় আপোষ চুক্তিনামে যে চুক্তি সই করেন তাতে সংঘর্ষ পূর্ণ বিদ্রোহী অঞ্চলগুলোতেই কেবল সংঘর্ষে লিপ্ত নানকারদের একাংশকে খাজনা প্রদানের ভিত্তিতে নানকারী থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের আংশিক জমিতে জোতস্বত্ব দেবার কথা স্বীকৃত হয়। সমগ্রভাবে জেলার ব্যাপারে ও নানকার ব্যবস্থার উপর এখানে কোন কথাই বলা হয় না। অর্থাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠায় জনা কয়েক নানকারকে নানকারী থেকে মুক্তি দিলেও নানকার ব্যবস্থাকে কোন সংস্কার ছাড়াই এ জেলায় অব্যাহত রেখে দেওয়া হয়।

আরেক কথা সংঘর্ষ (১৯৪৮)

আরেক কথা সংঘর্ষ (১৯৪৮)-নানকার বিদ্রোহের নেতৃত্ব কমিউনিষ্ট-দের সাময়িক উদ্যোগহীনতা বিদ্রোহকে মুসলিম লীগের কোলে ঠেলে দেয়। কিন্তু তা তখন একেবারে অনিবার্য ছিল না। উদ্যোগ নিলে তাকে

আবার আপন পায়ের উপর দাঁড় করান সম্ভব ছিল। কিন্তু তার জন্যে সময়ের প্রয়োজন ছিল। বিলম্ব হলেও নেতৃত্ব অবশেষে তা বুঝতে পারেন। কিন্তু সরকার পক্ষ নেতৃত্বের এ মনোভাব আঁচ করতে পেরে তাদের আর সময় দিতে তৈরী ছিল না। চূড়ান্ত আঘাত হানার সুবিধার্থে পুলিশের পক্ষ থেকে ক্রমাগত উস্কানী দিয়ে ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলে গাংপার মকাইর টোল নামক গ্রামে নানকার জনতাকে তারা স্বতঃস্ফূর্ত সংঘর্ষে টেনে নিয়ে গেল। এ সংঘর্ষে দারোগা পুলিশ আহত হল। এ সংঘর্ষকে উপলক্ষ করে লাউতা-বাহাদুরপুর অঞ্চলে সরকারী তরফ থেকে চূড়ান্ত দমন-পীড়নের ব্যবস্থা করা হল।

এ সময় পুলিশী অভিযোগে গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত হল। জনতার যথাসর্বস্ব লুন্ঠিত হল। মেয়েরা ধর্ষিত হলেন। জনতা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাল। এ গৃহত্যাগ ছিল অনিয়ন্ত্রিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাই বিদ্রোহের নেতৃত্ব আর নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। নেতৃত্বের ভেতর বেশ ক'জন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলে বিদ্রোহের সারিতে দুর্বলতা প্রকাশ পেতে লাগল। অবশেষে জনতা যেমন অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ঘর ছেড়ে গিয়েছিল তেমনই আবার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হয়েই গ্রামে ফিরে এল। কিন্তু হদ-বেগারী তাদের উপর আর চাপিয়ে দেওয়া গেল না। তথাকথিত ত্রিপক্ষীয় আপোষ চুক্তির সূত্র ধরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও অধিকাংশ জমিজমা জমিদারের খাসে ছেড়ে দিয়ে অবশেষে তারা নানকারীর বোঝা ঘাড়ে থেকে সরিয়ে ফেলতে সমর্থ হলেন।

সিলেট জেলায় নানকার সমস্যা তবু অমীমাংসিতই থেকে গেল। আর বিদ্রোহটাও এখানে শেষ হাতে পারল না।

বিদ্রোহের পুনঃ প্রকাশ (১৯৪৯)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিমলীগ নেতারা যখন মধ্য যুগীয় সামন্তবাদী চিন্তা-চেতনাকে আশ্রয় করে দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলেন তখন যুগের দাবী কিন্তু জনচেতনাকে বিপরীতমুখী করে তুলছিল। তাই প্রবল দমন নীতির মুখে পড়ে ১৯৪৭ সালের নানকার বিদ্রোহ একবার বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে গেলে ও দাসত্ব ধর্মী চরম নিপীড়ন মূলক এ নানকার ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখে চিরদিনের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রাখা তখন সম্ভব ছিল না। কেবল নানকার বিদ্রোহের কথাই নয় সমগ্র পূর্ব বাংলার দীর্ঘ দিনের সামান্তবাদ বিরোধী চিন্তা-চেতনা এবং আন্দোলনকেও কেবল মুসলিম লীগের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ধ্বনি দিয়ে চাপা দিয়ে ফেলা ছিল তখন অসম্ভব ব্যাপার। তাই ১৯৪৮ সালে বাংলা

ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে আন্দোলনের সূত্রপাতের পর থেকেই মুসলিম লীগের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জিগিরকে পাশ কাটিয়ে পূর্ব বাংলার জনতার স্তরে সামন্তবাদ বিরোধী চিন্তা চেতনা আবার বহির্মুখী হতে আরম্ভ করেছিল এবং গড়ে উঠছিল এখানে আন্দোলনের নতুন নতুন ক্ষেত্রে। পূর্ব বাংলার বহু স্থানে তেভাগার দাবী, টংক প্রথা অবসানের দাবী-প্রভৃতির মত দাবীগুলোর ভিত্তিতে দীর্ঘদিনের পরিচালিত অমীমাংসিত কৃষক অন্দোলনগুলো আবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। মাত্র বছর খানেক আগের বীভৎস সরকারী দমন পীড়নের স্মৃতিকে পাশে ঠেলে দিয়ে নানকার সহ সিলেট জেলার কৃষক জনতা আবার মধ্যযুগীয় নানকার ব্যবস্থার অবসান সহ বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, অর্থাৎ সার্বিক কৃষি সংস্কারের দাবীতে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছিল। এ আন্দোলন অচিরেই বিয়ানীবাজার বড়-লেখা ও গোলাপগঞ্জ থানায় পুরনো বিদ্রোহী এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়লে বিদ্রোহের সারিতে জন জমায়েত নিতান্ত অল্প হল না। বিদ্রোহ পুনরুজ্জীবনের পক্ষে অবস্থা বেশ অনুকূল হয়েই উঠল।

কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাও তখন বেশ খানিকটা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এ প্রতিকূল অবস্থাটা হল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বিদ্রোহ যেখানে সম্প্রসারমান ছিল সেখানে পরবর্তীকালে তা কেবল পুরনো এলাকা-গুলোতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। নবলব্ধ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য দাবী আদায়ের পন্হা হিসেবে আন্দোলন ও বিদ্রোহকে মেনে নেওয়া বিশেষ ভাবে মুসলিম জনতার এক বিরাট অংশের কাছে তখন আর গ্রহণ যোগ্য ছিল না। এ অবস্থা কাটাবার জন্যে সময়ের প্রয়োজন ছিল। সময় নিয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাই করে দেখার নীতি গ্রহণ করলে এ অবস্থা যে কোন দিনই কাটত না তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। কিন্তু সরকার সে সময় দিতে রাজী ছিল না। অমীমাংসিত নান-কার বিদ্রোহ ও কৃষক প্রজাদের সার্বিক ভূমি সংস্কারের দাবীতে আবার নতুন করে সংগঠিত হওয়ার আগেই সরকার তাকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দেবার ব্যবস্থা করে। বিদ্রোহের স্তরে কিন্তু তখন এ অবস্থার যথা-যথ উপলব্ধি ছিল না। এ সুযোগে সরকার ও জমিদাররা লাউতা-বাহাদুরপুরে যে পথ ধরেছিল, এখানেও ঠিক পথ ধরে উস্কানী দিয়ে জনতাকে স্বতঃস্ফূর্ত সংঘর্ষে টেনে নেবার জোর প্রচেষ্টা চালাল। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো হল এই ১৯৪৮ সালের কার্তিক সংক্রান্তির দিন ভুরছিয়া গ্রামের কৃষক নেতা রাই চারণ দাশের তিনটা গরু চুরি করিয়ে নিয়ে বাহাদুরপুরের ক্ষুদে জমিদার কারই মিঞা

দালাল পাঠিয়ে তাকে জমিদারের বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব দেয়। অন্যথায় এ গরু গুলো কেটে ফেলা হবে বলে তার ধর্মীয় অনুভূতির সুযোগ নিয়ে কার্যোদ্ধার করতেচায়। কিন্তু রাইচরণ তাতে নতি স্বীকার না করায় অবশেষে জমিদার এ গরুগুলো তার কাছারীর আঙ্গিনায় প্রকাশ্যে কেটে ফেলে দেয়। ফলে সানেশ্বর অঞ্চলে প্রজারা বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়।

পরবর্তী কালে উক্ত কারই মিঞা একদিন নৌকা যোগে এ অঞ্চল দিয়ে যাবার কালে প্রজারা তাকে ধরে ফেলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কোন রকমে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। এ ঘটনার জের হিসেবে লউতা বাহাদুরপুর পুলিশ ঘাটির কিছু সংখ্যক পুলিশ জমিদারদের গুন্ডা পান্ডা সঙ্গে নিয়ে সানেশ্বরের খেয়া ঘাটে গিয়ে ওৎপেতে থাকে। কৃষক সমিতির কর্মীরা খেয়াপার হয়ে আসার কালে নৌকার উপর তারা কর্মীদের আক্রমণ করে। এ আক্রমণে সঙ্গীদের আঘাতে মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে সানেশ্বর গ্রামের কৃষক কর্মী রজনীদাস নদীতে পড়ে ডুবে মারা যান।

সরকার ও জমিদারদের তরফ থেকে এ অঞ্চলের কৃষকদের আন্দোলনের কারণে পাকিস্তান বিরোধী বলে প্রচার করা হলেও গ্রামের নেতারা এই হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে এজাহার দিতে জনা কয়েক কর্মীকে লাশ সঙ্গে দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দেন। থানার দারোগা সাক্ষ্য গ্রহণের নামে পরদিন সানেশ্বর গ্রামে এসে কৃষক সমিতির পাঁচজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। রজনী দাশের হত্যাকান্ডের আর কোন তদন্ত বা বিচার কোনদিনই হয় নি। সেদিনের ধৃত কর্মীদের প্রায় দেড় বছর কাল আটক করে রেখে অবশেষে কল্পিত এক সভার অজুহাতে পরবর্তীকালে তাদের একদিনের কারাদন্ড ও পঞ্চাশ টাকা করে অর্থদন্ড করে পুলিশের মুখরক্ষা করা হয়।

এভাবে উস্কানী দিয়ে দিয়ে জনতাকে তখন কেবল সংঘর্ষের পথে টেনে নেওয়া হচ্ছিল। ফলে পুলিশ ও জমিদারদের প্রতি জনতার আর কোন বিশ্বাস অবশিষ্ট ছিল না। পুলিশ আসছে শুনলে গ্রামের লোকজন হয়ত তখন পালিয়ে যেত, নয় পুলিশকে প্রতিরোধ করতে লাঠিসোঠা নিয়ে গ্রামের ভেতর তৈরী হয়ে থাকত। এ অবস্থায় ১৯৭৯ সালের ১৬ই আগষ্ট একদল পুলিশ এসে সানেশ্বর উলুউরী, মিয়ারী শিলুকরা প্রভৃতি গ্রামগুলোর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত বরুদল নদীর তীর ধরে রুটমার্চ করার কায়দায় মার্চ করে চলে গেল। গ্রামের লোক গ্রামগুলো থেকে তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু পুলিশের এ গমনাগমন যে তাদের আক্রমণ প্রস্তুতি তা আর কেউ বুঝতে পারলেন না। আসলে এছিল তাদের গ্রামের লোক কে প্ররোচনা দিয়ে উত্তেজিত করারই চেষ্টা।

তারপর মাঝে মাত্র একটা দিনের ফাঁক দিয়ে ১৮ই আগষ্ট বিশাল একদল পুলিশ (শতাধিক হবে) জমিদারদের গুন্ডাপান্ডা সহ অতি প্রত্যুষে লাউতা বাহাদুরপুরের দিক থেকে মাঠ অতিক্রম করে এসে ওদিকের প্রথম গ্রাম সানেশ্বরের উপর চড়াও হয়ে বসে। গ্রামে ঢুকে সারি বাঁধা বাড়ীগুলো তারা আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দিতে আরম্ভ করে। তারা বাড়ির লোকজনকে মারপিট করতে থাকে। শিশু বৃদ্ধ পুরুষ নারী কাউকে তারা বাদ দেয় না। নারীদের ঘর থেকে টেনে বের করে তারা প্রকাশ্য স্থানে ফেলে এক এক জনকে বহুজনে ধর্ষণ করে। জিনিসপত্র তারা যা পারে লুটপাট করে নেয়। যা বাকী থাকে তা ভাঙ্গচুর করে নষ্ট করে দেয়।

নারী পুরুষ শিশুদের চীৎকারে সেদিন সে অঞ্চলের ভোরের আকাশ চমকে উঠে। চীৎকার চারপাশে ছড়িয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে থাকে। এ অবস্থা দেখে পুলিশ দল গ্রামের ভেতর ঘেরাও হয়ে পড়ার ভয়ে অর্ধেক গ্রাম লুট করেই গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসে। এবার তারা সানেশ্বর ও উলুউরী গ্রামের মাঝামাঝি মাঠের উপর এসে অবস্থান গ্রহণ করে। গ্রামের দিক থেকে ছুটে আসা লোক জনকে তারা মাঠের উপরই ঠেকায়। পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে জনতা তবু সানেশ্বরমুখী আগাতে চাইলে পুলিশ তাদের আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেয়। জনতা তখন মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে পুলিশকে সংযত ব্যবহারের আহবান জানায়। মাঠে দাঁড়িয়ে জনতা পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে। তারা আশা করে যে, এর ফলে পুলিশ ও জমিদাররা তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধী বলে যে প্রচার চালাচ্ছিল তা মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়ে গেলে পুলিশের আচরণ অবশ্যই সংযত হবে। এ সময় পুলিশ দলের সাথে তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য নিয়ে কিছু বাদানুবাদ হয়। জমিদারের শোষণ অত্যাচার নিয়েও তারা পুলিশের সাথে কথা বলেন। এমন কথা বলতে বলকে জনতা পুলিশের একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। তারা ভাবছিলেন যে, পুলিশ দল বুঝি তাদের কথা সত্যি শুনছে। তাদের প্রথম দিকের উত্তেজনাও বেশ খানিকটা কমে আসছিল।

পরে বোঝা গেল, পুলিশদল তাদের কোন কথাই গ্রাহ্য করেনি। কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তারা জনতার প্রতি গুলী ছুড়তে আরম্ভ করেছিল। জনতার একেবারে সামনে ছিলেন ব্রজনাথ দাস (ওরেফে কটুমনি), কথা বলতে বলতে তিনি পুলিশের প্রায় নাগালের ভেতরেই চলে গিয়াছিলেন, পুলিশ তার মাথা লক্ষ্য করেই প্রথম গুলিটা ছুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তারপর কেবল গুলী

আর গুলী। গুলীর শব্দে দিশাহারা হয়ে সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লেন। মাটিতে শুয়ে পড়লে গুলী থেকে বাঁচা যায়, একথা তারা কৃষক কর্মীদের কাছে থেকে শুনেছিলেন। শুয়ে শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলা, তাও কেউ কেউ অভ্যেস করে ছিলেন। এবার এ অভ্যেসটাই তাদের কাজে লেগে গেল। ধানের ক্ষেত্রে শুয়ে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসা গুলীর ভেতর থেকে তারা বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তবু গুলীতে সে দিন পাঁচজন নিহত ও তিনজন আহত হলেন। নিহতরা হলেন উলুউরী গ্রামের ব্রজনাথদাস (৫০), (২) প্রসন্নকুমার দাস (৫০) ও তার ভাই (৩) পবিত্রকুমার দাস (৪৫), (৪) অমূল্য কুমার দাস (১৬) এবং মিথারী গ্রামের (৫) কটুমনি দাস (৪৭)।

পুলিশের মুখামুখি মাঠে সেদিন লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু পুলিশ বেশ খানিক্ষণ এক নাগাড়ে গুলী ছোড়ার পর সারা মাঠে ছোটাছুটি করে নিহতদের ছাড়া কেবল দশ জনকেই ধরতে পেরেছিল। তার ভেতর আবার ৬ জনই মহিলা এবং একজন আহত সহ মাত্র ৪ জন ছিলেন পুরুষ। তারা ছিলেন নিহত ব্রজনাথের ৮০ বছরের বৃদ্ধ পিতা ও ভাইরা এবং মহিলাদের ভেতর ছিলেন ব্রাজনাথের স্ত্রী ও বোনেরা। পুলিশের গুলীতে ব্রজনাথ মারা গেছেন খবর পেয়ে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে তখন সবাই হামাগুড়ি দিয়ে গ্রামে গিয়ে উঠে পড়েছিলেন।

কিন্তু পুলিশ সেদিন গুলী ছুড়ে হত্যা করেও গ্রেপ্তার করেই কেবল ক্ষান্ত হল না, তারা ধরা পড়া এ লোকজনের উপর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এমন অকথ্য অত্যাচার চালাল যে, এখানে তার বর্ণনা দেওয়া খুবই কঠিন। মহিলা কৃষক কর্মী অপর্ণাপাল ধরা পড়ার সময় ছিলেন অন্তঃস্বত্তা। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে ঘটনাস্থলে মাঠের উপরই তার গর্ভপাত হয়। তারপর মৃতপ্রায় অবস্থায় তাকে ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে পায়ে ধরে টেনে উলঙ্গ অবস্থায় নৌকায় নিয়ে তোলা হয়।

পুলিশের অত্যাচার এখানেই শেষ হয় না। তারপর থেকে দিনের পর দিন তারা বিয়ানীবাজার, বড়লেখা ও গোলাপগঞ্জ থানা তিনটির বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে একটার পর একটা গ্রাম ঘেরাও করে কৃষকদের যথা সর্বস্ব লুটপাট, লোকজনকে মারপিট গ্রেপ্তার ও নারী নির্যাতন চালাতে থাকে। এমন অত্যাচারে তিষ্টাতে না পেরে বহু গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। গ্রাম ছেড়ে গিয়ে তারা পার্শ্ববর্তী আসামে ত্রিপুরায় গিয়ে আশ্রয় নেন। পুলিশ তবু এখানে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র পুলিশের অনেকগুলো ঘাটি প্রায় বৎসরাধিক কাল দমন-পীড়ন অব্যাহত রাখে।

পুলিশ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ বাধাবার অভিযোগে পুরুষ মহিলা মিলিয়ে প্রায় ৭০ জনের উপর পুলিশ অভিযোগ গঠন করে। প্রায় বৎসর কাল এদের কারাগারে আটকে রেখে অবশেষে জেলে গেটে (কারাগারের ফটকে) এক অপ্রকাশ্য তথাকথিত বিচারে তাদের ভেতর থেকে ৬০ জনের প্রত্যেককে ১ দিনের কারাদন্ড ও ২০ টাকা থেকে ১০০ টাকা করে অর্থদন্ড করে পুলিশের মুখ রক্ষা করা হয়। অপর তিনজন মহিলা কৃষক কর্মী অপর্ণাপাল (২৮) সুষমা দে (২৮) ও অসিতা পাল (২০) এর বিরুদ্ধে পুলিশ এঘটনায় নেতৃত্ব দেবার অভিযোগ আনলে এমনই অপ্রকাশ্য বিচার তাদের প্রত্যেকের ছয়মাস করে সশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ড করা হয়। অপর ১১ জনকে অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দিয়ে বোধ হয় একথাই বুঝাবার চেষ্টা করা হয় যে, অপ্রকাশ্য হলেও এ বিচার ছিল নিরপেক্ষ।

নানকার ব্যবস্থার অবসান (১৯৫০)

এতসব করেও সরকার ও জমিদারদের পক্ষে নানকারদের আবার হদ-বেগারীতে টেনে নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। সরকারী অমানুষিক দমন পীড়নের এ ঘটনা গুলো দেখে একমাত্র জমিদার শ্রেণীছাড়া জনতার অপর প্রায় সবগুলো অংশ এমন কি মুসলিম লীগের স্থানীয় সমর্থকরাও ততদিন নানকার ব্যবস্থার বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। তবু পুলিশের ঘাঁটিগুলো তখনো টিকিয়ে রাখা হচ্ছিল।

এসময় সমগ্র পূর্ববাংলা জুড়ে সমস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু খন্ড খন্ড সংগ্রাম ও সংঘর্ষ দেখা দিতে আরম্ভ করে। তার ভেতর উত্তর ময়মনসিংহ-এর হাজং বিদ্রোহ, রাজশাহীর নাচোল অঞ্চলের সাঁওতাল চাষীদের বিদ্রোহ, প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলে সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের এক কৃষক আন্দোলনকে যে কেবল গায়ের জোরে চেপে দেওয়া সম্ভব নয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ অবস্থায় ১৯৫০ সালে সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারী করে 'টংক' ও 'নানকার' ব্যবস্হা দু'টিকে আইনী ঘোষণা করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক কৃষক অসন্তোষ ও আন্দোলনের মোকাবেলায় সরকার এ প্রদেশে ব্যক্তিগত হাত থেকে জমিদারীগুলো খরিদ করে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাবারও প্রস্তাব করে। পরবর্তী কালে এ প্রস্তাবই পূর্ব-বঙ্গে ভূমি প্রশাসনের ভিত্তি হয়ে থাকে। মুসলিম লীগ সরকারের এ ব্যবস্হায় কৃষক অসন্তোষ দমনে রাষ্ট্র যন্ত্রকে ব্যবহারের সুযোগ বাড়িয়ে দিলেও কৃষক অসন্তোষের মূল কারণ সমাজে সামন্তবাদী শোষণ ও সামন্ত-বাদী মানসিকতার গোড়াটা অক্ষুণ্নই রেখে দেওয়া হয়। তাই কৃষক অসন্তোষের সম্ভাবনাও লোপ পায়নি। তবু কয়েকটা শতাব্দী একটানা চলে আসবার পর নানকার বিদ্রোহের এখানে অবসান ঘটে।

মণি সিংহ

টংক আন্দোলন

ময়মনসিংহের উত্তরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ বারো বৎসর টংক প্রথার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী ও জঙ্গী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। টংক প্রথা হচ্ছে কৃষকদের উপর এক প্রকার জঘন্য ও বর্বরতম সামন্তবাদী শোষণ। টংক কৃষকদের জমিতে কোন স্বত্ব ছিল না। জমিতে ধান হোক বা না হোক টংক কৃষকদের জমির মালিক জমিদার ও অন্যান্যদের ধানে খাজনা দিতেই হ'ত। টাকায় খাজনা না দিয়ে এই প্রথার খাজনায় কৃষকরা মারাত্মক রকম শোষণের শিকার হ'ত। এই প্রথার বিরুদ্ধে এবং টাকায় খাজনা দেওয়ার দাবীতে টংক কৃষকের মরণ পণ সংগ্রাম বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের কৃষক আন্দোলনে এক গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

শোষণে জর্জরিত হয়ে টংক কৃষকরা যখন মরনোম্মুখ কিন্তু প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা ও পথ যখন তারা পাচ্ছিল না, তখন টংক কৃষকদের অনুরোধে আমি এই আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি। কিভাবে এই আন্দোলনে আমি জড়িত হ'লাম, কিভাবে তা ব্যাপক কৃষকদের সংগ্রামে রূপান্তরিত হ'ল, কিভাবে এই সংগ্রাম বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র রূপ ধারণ করল, কিভাবে এই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটলো তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা আমি করছি। আমি ইতিহাসবেত্তা নই, এটা কোনক্রমেই গবেষণামূলক প্রবন্ধও নয়-নিজের জীবন সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার একটি অধ্যায়ের বিবরণ মাত্র। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা এখানে রক্ষিত হয় নি।

টংক আন্দোলনে যোগদান

১৯২৮-এর প্রথম দিকে আমি কলকাতার মেটিয়াবুরুজে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল যখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার

লুন্ঠিত হয়, তখন বৃটিশ সরকার পাগলা কুকুরের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। টেরোরিস্ট-কমিউনিষ্ট কোন বাছ-বিচার না করেই শত শত রাজনৈতিক কর্মীকে তখন বিনা বিচারে আটক করা হয়। রাজনৈতিক এই পটভূমিতে ১৯৩০ সালের ৯ই মে আমি গ্রেপ্তার হয়ে যাই। বিভিন্ন জেল, ক্যাম্প ঘুরিয়ে এনে ১৯৩৫ সালে সুসং-এর নিজ বাড়ীতে আমাকে নজরবন্দী করা হয়। আমাকে প্রতি দিন বিকেলে থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হ'ত। আমার থানায় যাওয়ার চৌহদ্দি ছিল অনেক বড়। এতে কিছুটা সুবিধাও ছিল। আমার বাড়ী থেকে মাত্র আধা মাইল দূরে ছিল কৃষকদের গ্রাম। সেখানে মুসলমান কৃষকরাই বসবাস করতেন। তাদের সাথে আমার আলাপ-আলোচনা থেকে জানতে পারি যে, টংকের অত্যাচারে কৃষকেরা জর্জরিত। তারা অবিলম্বে ঐ প্রথার অবসান চান। আমি তাদের আশ্বাস দিয়ে বলি, "আপনারা যদি সবাই একজোট হয়ে আন্দোলন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই টংক প্রথা উচ্ছেদ হয়ে যাবে।"

এরই মধ্যে এক জমিদারের জনৈক রাজমিস্ত্রীকে ভিটা-মাটি থেকে উচ্ছেদ করা নিয়ে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। এই দ্বন্দ্বের ফলে আমি এখানে রজনীতি করছি, এই মর্মে জমিদার আমার নামে আই, বি-তে দরখাস্ত দেয়। একদিন আমাদের গ্রামের বন্যার সময় হঠাৎ আমার সাথে ঐ জমিদারের দেখা হয়। তিনি বললেন, "দেখতো—আমি ব্যাপারটা কিরকম ম্যানেজ করলাম।" অর্থাৎ সাত দিনের মধ্যে তিনি রাজমিস্ত্রীকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন তা তিনি করেন নাই। তিনি জোর খাটান নাই। কারণ থানায় একটি শান্তি রক্ষার দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন "উত্তেজনার মাথায় তোমার নামে একটি দরখাস্ত দিয়েছিলাম। এখন বুঝছি এটা ঠিক হয় নাই। কিন্তু তীর তো ছেড়ে দিয়েছি—ফল ফলবেই। আই, বি নিশ্চয়ই আসবে।" কিছুদিন পর আই, বি এল। আমি রাজনীতি করছি বলে জানাল এবং কিছু কাগজপত্র নিয়ে গেল।

আমি ধারণা করলাম, আমাকে আবার জেলে যেতে হবে। তাই চিন্তা করলাম যে জনতার মধ্যে প্রচার করে জেলে যাওয়াই ভাল। এই সময় নেত্রকোণার এস, ডি, ও পাট উৎপাদন কম করার জন্য একটি জনসভা ডেকে ছিলেন। আমি এস, ডি, ও সাহেবের জনসভায় বক্তৃতা করলাম এবং অভিযোগ তুললাম যে পাটের নিম্নতম দাম বাধা হয় না কেন ইত্যাদি। পাট উৎপাদন কম করার বিষয়ে কিছু বললাম না। কেবল বললাম, "সরকার ৩৫ ভাগ পাট কম উৎপাদন করতে বলছেন, আর আপনি বলছেন ৫০ ভাগ। আমরা কোনটা মানব।" বক্তৃতা দেওয়া সরকারী নির্দেশে নিষিদ্ধ ছিল। আমার বিরুদ্ধে মামলা হ'ল। আমাকে তিন বছরের সাজা

হ'ল। আপিলে দেড় বছর হ'ল। ঢাকা জেলে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর—নদীয়া জেলার করিমপুর থানার এক গণ্ডগ্রামে আমাকে অন্তমরণী করা হ'ল।

১৯৩৬-৩৭ সালে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার দাবীতে এক জোর আন্দোলন হয়। ফলে আন্দামান বন্দীদের নিজ নিজ প্রদেশের বন্দী শালায় আনা হয়। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা শাসিত প্রদেশগুলিতে আন্দামান বন্দীরা মুক্তি পেলেন। কিন্তু এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা শাসিত বাংলাদেশে আন্দামান বন্দীরা মুক্তি পেলেন না। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার এই সিদ্ধান্ত নেন যে. যারা বিনা বিচারে আটক আছেন তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দফায় যে এগার শত বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির তালিকা তৈরী হয় তার মধ্যে আমিও ছিলাম। আমি ১৯৩৭-এর মাঝামাঝি নদীয়া জেলার করিমপুর থানা থেকে মুক্তি পাই।

আমি মুক্তি পেয়ে কলকাতায় গেলাম। সেখানে কোন কমিউনিষ্ট বন্ধুর দেখা পেলাম না।

ঐ সময়ে কলকাতা ছাড়া আর কোথাও কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল না। সেখানেও কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল আত্মগোপন। আমি ঐ দিনই মায়ের সাথে দেখা করার জন্য গ্রামের বাড়ী রওনা হলাম। গ্রামে আসার ২/৩ দিনের মধ্যে আমার সাথে কৃষকেরা দেখা করতে আসেন। ৮/১০ জন বয়স্ক মুসলিম কৃষক আমার কাছে এসে বললেন, "খোদার রহমতে আপনে খালশ পাইছেন—আমরা খুব খুশী হইছি। এহন আপনি টংকটা লইয়া লাগুইন। আমরা আর টংকের জ্বালায় বাচতাছি না।" আমি তাদের বললাম, "আমি কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলন করি, মাকে দেখার উদ্দেশ্যে দিন সাতেকের জন্য বাড়ী এসেছি। আমি কলকাতায় ফিরে যাব।" তারা বললেন, "এডা হয় না। দ্যাশের ছাওয়াল দ্যাশে থাইকা টংক লইয়া লাগুইন। আমরা যাতে বাচি তার চেষ্টা করুইন। খোদা আপনের ভালা করবো।" আমি তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেও প্রতিদিন তারা এসে টংক আন্দোলন করার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন।

একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলাম যে, আমি কি ট্রেড ইউনিয়ন কাজের জন্য কলকাতায় যেতে আগ্রহী? তখন মেটিয়াবুরুজের প্রতিটি শ্রমিক সংগ্রহে জয়লাভ করায় সেখানে একটি ট্রেড ইনিয়নের বেশ সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামে টংক আন্দোলন করা কঠিন ব্যাপার। যাদের বিরুদ্ধে টংক আন্দোলন করা কঠিন ব্যাপার। যাদের বিরুদ্ধে টংক আন্দোলন করব,

তারা সবাই আমাব আত্মীয়। আমার নিজের পরিবারেরও টংক জমি আছে। কাজেই সকলের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করতে হবে। তাই এইসব কারণে হয়তো আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। এই কথা আমার মনে আসায় আমার মধ্যে এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'ল। আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম- আমি যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হই, যদি মার্কসবাদ–লেনিন-বাদ গ্রহণ করে থাকি, তাহলে যেখানে আমার ও আমার পরিবারের স্বার্থ নিহিত রয়েছে—প্রয়োজন ও আদর্শের জন্য তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা আমার কর্তব্য। যা অন্যায়, যা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিৎ। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চেতনা উদ্দীপিত করা ও তাদের সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। এইভাবেই দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর করে নেওয়া সম্ভব। এটা আমার আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ নিহিত আছে বলে আমি ঐ আন্দোলন হতে কখনো নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আমার স্বার্থ আছে বলেই আমাকে কৃষকদের নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কৃষকদের এই সংগ্রামে সাথী হয়ে যদি এই সংগ্রামকে গড়ে তুলতে পারি তবেই আমার সঠিক পথে যাত্রা শুরু হবে। এটা আমার জীবনের পরীক্ষার মূল। এই পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। আমার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। পরামর্শ করতে পারি এমন কোন বন্ধুও আমার পাশে ছিল না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ এবং আমার মন এদু'টিই ছিল আমার বড় বন্ধু। আমার দুই দাদা ছিলেন ভিন্ন চিন্তা চেতনার মানুষ। তাদের সাথে পরামর্শ করার প্রশ্নই ছিল না। সারা ময়মনসিংহ জেলায় এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না যার সাথে এ বিষয়ে কোন পরামর্শ করা যেতে পারত।

ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নলিতা-বাড়ী, শ্রীবর্দ্ধি থানায় এই টংক প্রথা চালু ছিল। টংক নাম কিভাবে হ'ল তা জানা যায় না। এটা ছিল স্থানীয় নাম। এই প্রথা বিভিন্ন নামে ঐ সময়ের পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। সুসং জমিদারী এলাকায় যে টংক ব্যবস্থা ছিল, তা খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হতো সাত থেকে পনের মণ। অথচ ঐ সময়ে জোত জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ঐ সময়ে প্রতি মণ ধানের দর ছিল সোয়া দু'টাকা। এরফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হ'ত ১১ টাকা থেকে প্রায় সতের টাকার মত। এই প্রথা শুধু জমিদারদেরই ছিল না—এই প্রথায় মধ্যবিত্ত ও মহাজনেরাও লাভবান হতেন। একমাত্র সুসং জমিদাররাই টংক প্রথায় প্রায় দুই লক্ষ মণ ধান আদায়

করতেন। এই টংক প্রথা ছিল তখনকার সময়ে এক জঘন্যতম সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণ।

জোত স্বত্বের জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে কৃষকদের প্রতি সোয়া একরে একশত থেকে দুইশত টাকা নজরানা দিতে হ'ত। গরীব কৃষকদের পক্ষে ঐ নজরানার টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ত না। টংক প্রথায় কোন নজরানা লাগত না বলে গরীব কৃষকদের পক্ষে টংক নেওয়াই সুবিধা-জনক ছিল। টংকের হার প্রথমে বেশী ছিলনা। কৃষকরা যখন টংকের জমি বেশী করে নিতে এগিয়ে আসল, তখন প্রতি বছর ঐ সব জমির হার নিলামে ডাক হতে লাগল। এর ফলে টংকের হার ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। নিলামে পূর্বতন বেশী ডাবকারী কৃষকের কাছে থকে জমি ছাড়িয়ে নিয়ে অধিকতর বেশী ডাককারী কৃষকের কাছে টংকের জমি হস্তান্তর করা হত। এর ফলে ১৯৩৭ সাল থেকে টংকের হার নিলামে বেড়ে গিয়ে সোয়া একরে পনের মণ পর্যন্ত উঠে যায়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদে আমার যেটুকু জ্ঞান ছিল, আর শ্রমিক আন্দোলনের যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাকেই ভিত্তি করে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, টংক আন্দোলনে আমি সর্বতোভাবে শরিক হ'ব। কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর অভাব হবে না। কিন্তু এখানে কোন প্রগতিশীল কর্মী নেই। এখানে আন্দোলন করবে কে ? কৃষকদের এই আন্দোলনে এত উৎসাহ—পরিশেষে সংগঠনের অভাবে সব নিভে যাবে। সকল দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম।

আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ঃ টংক প্রথার সংশোধন

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করে দেখলাম—টংকের কঠোর নির্যাতন হতে এরা মুক্তি চায়। কাজেই ঠিক মত প্রচার আন্দোলন চালাতে পারলে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব নয়। জমিদারদের চাপ এলে কৃষকরা দলবদ্ধভাবে তার সম্মুখীন হবে—এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু পুলিশ এলে এরা কিরূপ ব্যবহার করবে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে কিনা সে সম্পর্কে আমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না।

ঠিক করে নিলাম। আন্দোলনের ধারা হবে অহিংস-আইনসম্মত। ধান দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এটাই হবে মূল কাজের ধারা। কিন্তু আন্দোলনকে আইনসঙ্গত রাখার জন্য বলতে হবে—আমরা খাজনা দিতে চাই, তা জোত স্বত্বের নিরিখ মত দেব। ধান দিয়ে আমরা পারি না, এতে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছি। তা না হলে খাজনা বন্ধের আন্দোলন বলে সরকার এই আন্দোলনকে 'বেআইনী' ঘোষণা করতে পারে।

আন্দোলনের মূল আওয়াজগুলো হবে এইরূপ :

১। টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই।

২। টংক জমির স্বত্ব চাই।

৩। জোত স্বত্ব নিরিখ মত টংক জমির খাজনা ধার্য করতে হবে।

৪। বকেয়া টংক মওকুব চাই।

৫। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ চাই।

৬। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

আমি এইসব পরিকল্পনা স্থির করে ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে একদিন দশাল গ্রামে উপস্থিত হলাম। বয়স্ক কৃষকদের বললাম, "আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। বৈঠক ডাকেন। টংক আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে। জমিদারদের ধান দেওয়ার আগেই এই আন্দোলন শুরু করে দিতে হবে।"—শুনে কৃষকরা খুব খুশী।

বৈঠকে লোক এসে জুটলো। আমি বললাম, "আপনারা এই আন্দোলনের সামনে থাকবেন, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।"

কৃষকেরা বললেন, "এডা হয় না। আপনে থাকবেন সামনে, আমরা থাকুম আপনের পাছে। কি করতে হইব কইয়া দেইন।" আমি বললাম, "আপনারা টংকের অত্যাচারে জেরবার হচ্ছেন, আমি জেরবার হই না। আপনারা জানেন আমারও টংক জমি আছে। আমি মনে করি টংক উচ্ছেদ আপনাদের ন্যায্য দাবী। কাজেই আমি আপনাদের সাথী হয়েছি। আপনারা সামনে, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব—যতদিন না টংক প্রথা উচ্ছেদ হচ্ছে।" তারা একই কথা বললেন, "আপনি সামনে আমরা পিছে।" আমি ভাবলাম এই পর্যায়ে এটা বুঝানো সম্ভব নয়। পরে এরা চেতনা সম্পন্ন হলে বুঝতে পারবেন। দশাল গ্রামে কোন হিন্দুর বাস ছিল না। চতুর্দিকের গ্রামেই মুসলমান কৃষকদের বাস। কৃষকরা বললেন, "কি করতে হইব, আমাদের বলেন, আমরা তাই করুম।" আমি বললাম, "সকল কৃষককে এক করা। একজোট বাধা।" এ কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন। বললেন, 'ব্যাঙরে কি পাল্লায় মাপন যায়। যায় না। কৃষকেরাও একজুট হইব না।" আমি বললাম, "মানুষ ব্যাঙ না, টংকের ডোলের মধ্যে ভরে তাদের মাপতে হবে।" এর উত্তর তাদের কাছে ছিল না। কাজেই তারা নিরুত্তর থাকলেন। আমি আবার বললাম, "কৃষকদের এক করতে হবে। ধান কেউ এক ছটাকও জমিদারকে দেবে না। ধান দিয়ে দিলে চিৎকার করলেও কিছুই করা যাবে না। জমিদারদের পেয়াদা বরকন্দাজ ২৫/৩০ জন একত্র হলেও সব গ্রামের সব লোক একত্র হয়ে বলবেন—আমরা ধান দিতে পারি না, আমরা জোত স্বত্বের নিরিখ মত খাজনা

দেব।" আমি আমার পরিকল্পনার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনারা গ্রামে গ্রামে যান, আমি বৈঠক করব—এটা তাদের জানিয়ে দিন। আর আপনারা মুখে মুখে প্রচার করে আসেন।" এরপর কৃষকরা চারিদিকে বের হয়ে গেলেন।

আমি গ্রামে গ্রামে অনেক বৈঠক-সভা করলাম। কৃষকরা টংক আন্দোলনের কথা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই টংক আন্দোলনের কথা গ্রামে গ্রামে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। কৃষকদের আকাঙ্খা ছিল টংক প্রথা উচ্ছেদ। কাজেই আগ্রহ ও উদ্যোগ নিয়ে তারা প্রচার কাজে নেমে পড়লেন। এত দ্রুত এবং এত ব্যাপকভাবে এটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তা আগে আমিও ভাবতে পারিনি।

আমরা মুসলিম এলাকা ছাড়াও ঐ সময় উপজাতীয় এলাকায় প্রচার চালাবার ব্যবস্থা করলাম। ললিত সরকার ছিলেন ধনী কৃষক। কিন্তু তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। তিনি হাজং উপজাতির একজন প্রধান নেতাও ছিলেন। তিনি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়ান।

টংক আন্দোলন মুসলিম ও উপজাতি দুই এলাকায় সমভাবে চলছিল। এই সময় একদিন একদল পুলিশ এল। তারা গ্রামে এসে প্রচার করতে লাগল যে কৃষকরা যখন সব টংক দিতে পারবে না তখন কিছু কিছু করে দিক। এতে অনেক কৃষক এই ব্যবস্থা উত্তম মনে করে কিছু কিছু ধান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমি চিন্তা করলাম যে, পুলিশের এই প্রচার সফল হলে আন্দোলন মাটি হয়ে যাবে। আমি কৃষকদের দৃঢ়ভাবে বললাম যে পুলিশের এরূপ অপপ্রচারের ফাঁদে পড়লে কোনদিন টংক প্রথা উচ্ছেদ হবে না। এ কথা শুনে যারা কিছু কিছু ধান দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারা অনেকেই ধান দেওয়া থেকে বিরত হলেন। মাঘ মাসে ধান আদায়ের সময় দেখা গেল যে জমিদারেরা এক চতুর্থাংশের চেয়ে বেশী ধান আদায় করতে পারেনি।

গ্রামে গুল মামুদ নামে আমাদের নিজস্ব একজন টংকদার ছিল। সে ছিল সৎ প্রকৃতির লোক। তার বছরে ষাট মণ টংক ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে তার টংক মওকুব করে দিলাম। গুল মামুদ বলল, "উপরে খোদা আছেন। তিনি সব দেখেন ও জানেন। আমি রেজিষ্টারী করে টংক এনেছি। আমি যদি টংক পরিশোধ না করি তাহলে আমার গুনাহ হবে।" আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, "আমি জমির মালিক। আমি তোমার টংক মওকুব করে দিচ্ছি। তাতে তোমার গুনাহ হবে কেন ?" অর্থাৎ আন্দোলনে এধরনের সৎ, সরল ও ধর্মপ্রাণ লোকও ছিল।

টংক আন্দোলনের ফলে, জমিদার, মধ্যবিত্ত সমাজ এমন কি আমার নিজ আত্মীয় স্বজনও তাদের শ্রেণী স্বার্থে আঘাত লাগায় আমার উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তারা নানাভাবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচার চালাতে থাকলেন। বিবাহ সহ সকল রকম সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাকে মধ্যবিত্ত সমাজ দাওয়াত দেওয়াও বন্ধ করে দিল। তাদের কটূক্তি ছিল—"নাইড়াকে নিয়ে নাচানাচি আরম্ভ হইছে। ঠ্যাং ভাইঙ্গা যাইব।" আমার দুই দাদার স্বার্থে আঘাত লাগায় তারাও আমার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। জমিদারেরা আমার বিরুদ্ধে একটার পর একটা মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েও যখন কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে পারল না, তখন তারা বলে বেড়াতে লাগল যে, "মণি সিং একজন স্বদেশী বিপ্লবী। শহর থেকে পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবে, তখন সাধারণ কৃষকেরা ফাসাদে পড়ে যাবে।" এই প্রচারে কৃষকরা কিছুটা বিভ্রান্ত হলেন। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা হ'ল আমাকে বার বার পুলিশ গ্রেফতার করে। আমি জেলখাটা লোক। কৃষকেরা একদিন আমাকে বললেন—"আপনারে কোনদিন পুলিশ ধইরা লইয়া যাইব, তহন আমরা ফাইক্কায় পইড়া যাইবাম। আপনার নাহান আর কিছু লোক আনুইন।" তাদের উৎকন্ঠা দেখে অন্য কাউকে আনা যায় কিনা চিন্তা করলাম।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কমরেড মুজাফফর আহমেদ, ফৈজউদ্দিন সাহেব নামক আমাদের একজন সমর্থকের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি ময়মনসিংহের একজন চামড়া ব্যবসায়ী ছিলেন। আমি একটি ইশতেহার ছাপানোর জন্য একদিন ময়মনসিংহ শহরে গিয়ে ফৈজউদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা করে তাকে আমার সাথে সুসং-দুর্গাপুর যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। ঐ ইশতেহারের কপিতে 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'—কথাটি লেখা ছিল দেখে ঘোর আপত্তি জানালেন। কিন্তু আমি তা বাদ দিলাম না। আমার সঙ্গে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি জানালেন এবং সুসেন সেন নামে একজনকে আমার সঙ্গে দিলেন। সুসেন সেন ১৯২৯ সালে কালকাতায় জেনারেল জুট স্ট্রাইকের সময় আমাদের সাথে ছিলেন। সুসেন সেনকে ডেকে আনা হ'ল। তিনি বললেন—"আমি যেতে রাজী আছি। কিন্তু সুসং শীতের জায়গা। আমার শীত বস্ত্র নেই। কিভাবে যাব?" আমার গায়ে পুলওভার ছিল। সেটি খুলে তাকে দিলাম এবং পরের দিন স্টেশনে যাওয়ার সময় জানিয়ে দিলাম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তাঁকে স্টেশনে পাওয়া গেল না। হায় একেই কি বলে লোক চরিত্র, আদর্শনিষ্ঠা।

পরবর্তী সময়ে কিশোরগঞ্জের জ্যোতিষ রায় সুসং গিয়ে আন্দোলনে সাহায্য করেছেন। নগেন সরকারও মাঝে মাঝে সুসং-এ গিয়ে আন্দোলনে

সাহায্য করতেন। অন্য কিছু প্রগতিশীল লোকও যেতেন।

আন্দোলন চলতে থাকল এবং ক্রমে তা বিস্তৃতি লাভ করতে লাগল।

এই এলাকার উপজাতীয়দের বৃটিশ সরকার, বৃটিশ ভক্ত বলে মনে করতেন। এসব এলাকায় কখনও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল না। কেবল সুসং-এ একটি কংগ্রেস অফিস ছিল। ১৯৩০ সালে তাও ভেঙ্গে দেওয়া হয়। অথচ এসব এলাকায় কমিউনিস্টরা প্রভাব বিস্তার করছে দেখে বৃটিশ সরকার প্রমাদ গুণলেন। কাজেই তারা সজাগ হলেন এবং এই এলাকাকে কমিউনিস্ট প্রভাবমুক্ত করার জন্য টংক সম্পর্কে আশু কিছু করা দরকার বলে অনুভব করলেন।

এই উপলব্ধি থেকেই সরকার কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী ও শ্রীবর্দি গারো পাহাড়ের পাদদেশের এই পাঁচটি থানার জরিপের ব্যবস্থা করলেন। একর প্রতি কত উৎপাদন হয় তার হিসেব নেওয়াই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল। জরীপের কাজ শেষ হ'ল। একর প্রতি উৎপাদনেরও হিসেব হ'ল। এর ফলে বেশীর ভাগ জায়গায় টংক ধানের হার অর্ধেক হয়ে গেল। কোন কোন স্থানে অর্ধেকেরও কম হয়ে গেল। এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যার বছরে যে টংক খাজনা আছে—তার সমপরিমাণ—বেশীর পক্ষে আট কিস্তিতে পরিশোধ করে দিলে জমির স্বত্ব তার হয়ে যাবে। এ পদ্ধতিটি আসলে একটি নজরানা দেওয়ার মত। যেমন—একজনের যদি বছরে সত্তর মণ টংক ধান দিতে হয়—তবে ঐ অতিরিক্ত সত্তর মণ মোট আট কিস্তিতে পরিশোধ করে দিলে জমিতে তার স্বত্ব হয়ে যাবে। এর আগে টংক জমির কোন স্বত্ব ছিল না। এইভাবে ১৯৪০ সালে টংক প্রথার কিছু সংশোধন করে—সংশোধিত পদ্ধতির প্রবর্তন করা হ'ল বটে, কিন্তু টংক প্রথা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা হ'ল না।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৪৬ সাল থেকে টংক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমরা যুদ্ধের মধ্যে কোন আন্দোলন করি নি। ১৯৪১ সালে নাজি জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেজন্যই যুদ্ধের সময় পার্টি কোন রূপ আন্দোলন করে নি। যুদ্ধ পরবর্তীকালে এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাগরণ সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস নেতারা তখন গণআন্দোলনের পথ ছেড়ে আপোষের দিকে ঝুঁকেছে। জনগণের জাগরণ লক্ষ্য করে কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব নিল, জনগণ বিশেষতঃ শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন

অগ্রসর করে নিতে হবে। সে হিসেবেই পার্টি তেভাগা ও পুণরায় টংক আন্দোলন করা স্থির করল।

এভাবেই পরবর্তীতে দ্বিতীয় দফার টংক আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। আন্দোলনের স্বার্থে আমরা যারা নেতৃস্থানীয় ছিলাম, তারা সকলেই আত্মগোপনে চলে গেলাম।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের চার-পাঁচ তারিখ নেত্রকোনায় ঐতিহাসিক সারা ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। টংক আন্দোলনের পটভূমিতে এই সম্মেলন অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এই সম্মেলনেও অন্যান্য প্রস্তাবের সাথে টংক উচ্ছেদের আন্দোলন সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহীত হয়।

টংক আন্দোলন পুণরায় শুরু করার জন্য সুসং দুর্গাপুর স্কুলের মাঠে আমরা সভা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। স্কুলের মাঠের সাথেই আমাদের বাড়ী। সেখানেই পার্টি অফিস ছিল। স্থির হ'ল পাহাড় অঞ্চল থেকে বড় মিছিল করে সবাই সভাক্ষেত্রে আসবে। আমি তখনও আত্মগোপনে আছি। লেঙ্গুরাবাজারের এক ঘটনায় মামলায় আমাদের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা বের হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হতে হবে। দুর্গাপুর থানার পাশ দিয়ে একটি রাস্তা গেছে। রাস্তার ধারে সোমেশ্বরী নদী। ঐ রাস্তার পাশে থানা, টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট অফিস। রাস্তাটিকে থানার বলে তারা দাবী করে। মিছিল যাতে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তায় পোক্ত কাটা তারের বেড়া দিয়ে দেয়। মিছিলের খবর পেয়ে সশস্ত্র পুলিশকেও সেখানে মোতায়েন করা হয়।

পার্টির কাজের জন্য হরিহর ছত্রের মেলা থেকে এক বেপারীকে দিয়ে একটি সুন্দর সাদা ঘোড়া এনেছিলাম। প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সুসজ্জিত এক বিরাট মিছিল পাহাড় অঞ্চল থেকে আসছিল। আমাদের ভলান্টিয়ারেরা ডিসপোজালের প্যান্ট-সার্ট পরে মিছিলে আসে। (সামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত প্যান্ট-সার্ট যুদ্ধের পরে সরকারীভাবে নিলাম করা হয়, সেগুলোকেই ডিসপোজালের প্যান্ট-সার্ট বলা হ'ত)। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল বল্লম। ঘোড়ার উপরে বসেছিলেন আমাদের নেতা বল্লভী বক্সী। ভলান্টিয়ারদের পেছনে শ'খানেক হাজং মহিলা ছিলেন। ভলান্টিয়ারেরা যখন রাস্তার উপর কাটাতারের বেড়া দেখল, তখন কালক্ষেপন না করে মহুর্মুহু শ্লোগান দিতে দিতে কাটাতারের বেড়া ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। শুধু কাটাতারের বেড়াই নয় টেলিগ্রাফের তারও ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। বিরাট মিছিল ও বল্লম দেখে সশস্ত্র পুলিশ আতংকিত হয়ে ঐ স্থান ছেড়ে থানার ঘরের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিল। মিছিল যথারীতি স্কুল মাঠে গিয়ে পেঁছাল। সে এক বিরাট সভা। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল

পুণরায় টংক উচ্ছেদের আন্দোলন শুরু করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনাম দিবসে ময়মনসিংহ শহরে পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্রনেতা অমলেন্দুর মৃত্যুর প্রতিবাদ করা। সভার পর বল্লভী এই ঘটনাকে খুব গুরুতর বলে মন্তব্য করল। আমি তাকে বললাম, "সশস্ত্র পুলিশ ময়মনসিংহ থেকে এসে পড়বে তোমরা সবাই সতর্ক হয়ে যাও।" দিন কয়েকের মধ্যে সশস্ত্র পুলিশ এসে বিভিন্ন জায়গায় ঘাটি গেড়ে বসল। সুসং-দুর্গাপুরের অপর পারে বিবিশিরিতে একটি সশস্ত্র পুলিশের ঘাটি বসল। গুলির অর্ডার দানের জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটও সেখানে থাকলেন।

সুসং-দুর্গাপুরের অপর পারে বিরিশিরি থেকে মাইল চারেক দূরে হাজং ও গারোদের গ্রাম বহেরাতলী। এখানে বহুদিন থেকেই একটি অস্ট্রেলিয়ান মিশন আছে। অস্ট্রেলিয়ার লোকজনই ছিল এখানকার কর্তাব্যক্তি। এখানে একটি হাই স্কুলও আছে। ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। ক্যাম্প থেকে জনা পাঁচেক সশস্ত্র পুলিশ মাইল চারেক দূরে হাজংদের বাড়ীতে তল্লাসী চালাতে যায়। তখন হাজং মেয়েরা তাদের দা নিয়ে তাড়া করে। পুলিশেরা তাদের এই রণরঙ্গীনী মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে যায়। তারা জানত যে, কোন সংকেত পেলে শত শত হাজং পঙ্গপালের মত তাদের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে তারা জনা পঁচিশেক পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে আবার বহেরাতলী গ্রামে যায়। ঐ গ্রাম থেকে বিশ একুশ বছর বয়সের কুমুদিনী নামে এক বিবাহিত মেয়েকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ সময় আমাদের ত্রিশজন পুরুষ ও দশজন মহিলার একটি ভলান্টিয়ারের দল ঐ মাঠ দিয়ে আসছিল। কুমুদিনীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে রাশিমণি নামক একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা ছুটে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করে। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর সুরেন্দ্র নামে একজন গেলে তাকেও পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। অন্যরা তখন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের দিকে বল্লম ছুঁড়তে থাকে। তখন সশস্ত্র পুলিশেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নদীর দিকে সরে যায়। নদীর পাড় উঁচু। শীতকালে নদীর জল দূরে সরে যায়। পুলিশের উদ্দেশ্য ওখান থেকে গুলি চালাবে। এজন্য সব পুলিশ নদীর দিকে ছুটে যায়। এদিকে দু'জন পুলিশ নদীর দিকে যাওয়ার জন্য আলাদাভাবে এগিয়ে যায়। এখানে কিছু ঝোপ-ঝোড় ছিল। ঐ দু'জন পুলিশ লতা-পাতায় ঘেরা বরাক বাঁশের একটি বেড়ায় আটকা পড়ে যায়। ঐ উচু বেড়া পার হওয়ার সময় আমাদের ভলান্টিয়ারেরা তাদের আক্রমণ করে, ফলে ঐ দু'জন সশস্ত্র পুলিশ বল্লমের আঘাতে ঘটনাস্থলে মারা যায়। অন্য পুলিশেরা

নদীর পড়ে নামে, কিন্তু তাদের উপরও বল্লম এসে পড়তে থাকে। তারা মনে করেছিল যে, তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। কাজেই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাস যোগে সবাই পালিয়ে যায়। দুজন পুলিশ মরে পড়ে আছে সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

আমরা ঘটনাস্থল থেকে নদীর অপর পাড়ে সাত মাইল দূরে ছিলাম। একজন ভলান্টিয়ার সাইকেলযোগে খবর দিল যে, আমাদের ও পুলিশের উভয় পক্ষেরই দুজন করে মারা গেছে। কিন্তু সে একটি ভুল খবর দিল। যে, এপাড় ওপাড় দু'পারেই পুলিশ এসে গেছে। তাই সোজা রাস্তায় আমাদের না যাওয়াই ঠিক হবে। আমরা সে মতে দু'ভাগে রওয়ানা হ'লাম। এক-দল পাহাড়ের গা ঘেসে উত্তর দিক দিয়ে গেল, আর আমি সমতল ভূমি দিয়ে দক্ষিণ দিক ঘুরে পাহাড়ের দিকে গেলাম। যা'হোক পরে জানা গেল পুলিশ দীর্ঘ রাত পর্যন্ত ঘটনাস্থলে আসে নি। পরে গভীর রাতে পুলিশ মিশনারীদের নিয়ে ঐ দুটি লাশ সরিয়ে নিয়ে গেছে।

এখানে একটি হাস্যকর মজার কাহিনী মনে পড়ছে। ঐ দিন একদল যুবক ভলান্টিয়ার আমাকে এসে বলল, "পারলাম না কমরেড।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি পারলেন না?" তারা একটি ঘটনার কথা বলল। ঐ সংঘর্ষের সময় আমাদের ভলান্টিয়ারগণ মৃত পুলিশের একটি রাইফেল তখনই নিয়ে আসে। কিন্তু আর একটি রাইফেল আনতে পারেনি। সন্ধ্যার পর কয়েকজন যুবক ভলান্টিয়ার ঐ রাইফেলটি আনতে যায়। তারা মৃত পুলিশের গায়ের সাথে রাইফেলটি আটকানো দেখতে পায়। তারা রাইফেলটি নেবার জন্য একবার হাত বাড়িয়ে দেয়, আবার ফিরিয়ে আনে, এইভাবে কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা তাদের এই ব্যর্থতার কথা আমার কাছে বিমর্ষভাবে ব্যক্ত করছিল। তারা বলল, "জীবন্ত মানুষ যত শক্তিশালী হোক না কেন, আর যে অস্ত্রই থাককুক না কেন আমরা ভয় পাই না। কিন্তু যে মরে গিয়েছে, সে শংক (ভূত হয়ে গেছে)। তার সাথে আমরা পারবো কেন?" পরে জানতে পারলাম যে, মৃতদেহের সাথে রাইফেল আটকিয়ে থাকায় তারা ভূতের ভয়ে রাইফেল ছিনিয়ে আনতে পারি নি। তাদের আমি বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, মৃত ব্যক্তি কিছুই করতে পারে না। ভূত বলে কিছু নেই, ওটা কুসংস্কার। আমার এই সব কথায় তাদের এতদিনের কুসংস্কার তখনই চলে যাবে এটা আশা করা যায় না। এরূপ একটা ঘটনা ঘটছে পারে এটা কখনও ভাবাও যায় না। এধরনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ও নানা আচার আচরণে এবং পশ্চাৎপদ জনসাধারণের মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হয়েছে এবং পার্টি সংগঠিত হয়েছে।

আমাদের টংক এলাকায় প্রথম শহীদ হলেন রাশিমণি ও সুরেন্দ্র।

এই সংঘর্ষের জন্য এক বিরাট মামলা হ'ল। আমাদের অনেক নেতৃস্থানীয় কমরেডদের নামে সরকার হুলিয়া বের করল। এই মামলার মূল সাক্ষী ছিল আটজন নিরক্ষর গারো। গারোদের উপর আমাদের প্রভাব ছিল খুব কম, মিশনারীদেরই প্রভাব বেশী ছিল। তারা বেশীর ভাগ ছিল খৃষ্টান। আমরা এই সকল গারোদের মাতব্বরদের ভাল করে বুঝালাম যাতে তারা সত্য কথা বলে। কারণ ঐ সময় তারা কেউ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। দারোগা এদের শিখিয়ে পড়িয়ে টিপসই নিয়েছিলেন। মামলা কোর্টে উঠলে আমরা জানতে পারলাম যে, পঁচিশজন পুলিশ ও একজন ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। ঐ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে উকিলদের বলেছিলেন, "খুব বেঁচে গিয়েছি, এক বীরাঙ্গনা আমাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছোড়ে, আমি কাত হয়েছিলাম বলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি।" এখানে উল্লেখ্য যে, হাজংদের পুরুষেরাই বল্লম চালায়, মেয়েরা বল্লম চালায় না।

সাক্ষীদের কোর্টে যখন সাক্ষী দেবার জন্য দাঁড় করানো হ'ল এবং তারা কি জানে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রথম সাক্ষী বলল— "আমরা শুনছে, দেখে নাই।" উকিল জেরা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা দারোগা সাহেবের কাছে বলেছ যে, এই সব আসামী ঘটনাস্থলে ছিল, এখন অস্বীকার করছ কেন?" প্রথম সাক্ষী বলল—"আমরা কি লেখাপড়া জানে? দারোগা সাব কি বলছে আমরা জানে না! হামাদের টিপসই দিতে বলেছে— হামরা টিপ দিছে।" এইভাবে আটজনই একই কথা বলল। অন্যান্য সাক্ষীরা ছিলেন সবাই দূরের। তারা কেউ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখেন নি। অধিকাংশ সাক্ষীর সাথে আমাদের পূর্বে আলোচনা হয়েছিল। আমরা তাদের আদালতে সত্য কথা বলার জন্য আবেদন করেছিলাম। ফলে কেউই মিথ্যা সাক্ষী দিলেন না। প্রকৃতপক্ষে সংঘর্ষের সময় কোন লোকই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। গোলা-গুলীর জন্য কেউই কাছে এগিয়ে আসে নি। ফলে মামলা প্রথম কোর্টেই খারিজ হয়ে গেল। কোন আসামীই কোর্টে উপস্থিত ছিলেন না। আমি প্রথম দিন কোর্টে উপস্থিত ছিলাম। সরকারী উকিল আমাকে দেখিয়ে বললেন, "নেতা এখানে উপস্থিত আছেন, কাজেই ভয়ে তারা সত্য কথা বলতে পারছে না।" আমাদের বললেন, "নেতা আছেন বলেই তারা সত্য কথা বলছে, মিথ্যা বা শেখানো কথা বলে নি।" পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৪৮ সালে এই কেসটি হয়।

এই সংঘর্ষের পরে সরকারের পক্ষ থেকে চরম দমননীতি নেমে আসে। বহেরাতলী গ্রাম সহ অন্যান্য গ্রাম তছনছ করা হয়। হেলিকপ্টার এসে আকাশে টহল দিতে থাকে। এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হয়। এ সময় যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জনাব সোহরাওয়ারদী সাহেব।

এসব দমননীতির কথা কলকাতায় পেঁছিলে কলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা হতে একটি অনুসন্ধান কমিটি পাঠানো হ'ল। ঐ অনুসন্ধান কমিটিতে ছিলেন বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, ব্যারিষ্টার স্নেহাংশু আচার্য্য ও সাংবাদিক প্রভাত দাশগুপ্ত।

এই অনুসন্ধান কমিটির সদস্যরা ময়মনসিংহ থেকে জীপ যোগে নলিতাবাড়ী পেঁছালে সেখানকার প্যারামিলিটারীর অবাঙালী কমান্ডার তাদের আটক করেন ও তাদের কাছ থেকে ক্যামেরা কেড়ে নেন। তাদের বলা হয়, "তোমরা এখানে এসেছ কেন? তোমাদের আগামী কাল ময়মনসিংহ জেলে পাঠানো হবে।" জ্যোতি বসু তখন একজন এম. এল এ.-আইন পরিষদ সদস্য এবং ব্যারিস্টার, স্নেহাংশু আচার্য্যও একজন ব্যারিস্টার। তারা দুজনে প্রায় দু'ঘণ্টা তর্ক—বিতর্ক করলেন, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। তখন স্নেহাংশু আচার্য্য কোন উপায় না দেখে তার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তিনি বললেন, 'জান আমি কে? আমি ময়মনসিংহের মহারাজকুমার।" এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টে গেল। কমান্ডার বললেন—"তোমাদের জন্য কি করতে পারি?" চা এসে গেল। ক্যামেরা ফেরৎ পাওয়া গেল। কমান্ডার বললেন', 'জীপ লাগলে আর একটি নিয়ে যাও।" সেখান থেকে ফিরে এসে স্নেহাংশু আচার্য্য আমাকে বলেছিলেন, "দেখুন আপনারা সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের জন্য লড়াই করেছেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে সামন্তের প্রতি কি মোহ! এরা আমাদের প্রদেশের লোক নয়, তবু সামন্ততন্ত্রের উপর কি শ্রদ্ধা।" তিনি আরও বললেন, "আমরা দু'ঘণ্টা তর্ক করলাম, আইনের কথা বললাম। জ্যোতি বসু এম. এল. এ. তাও বললাম, কিছুতেই কাজ হ'ল না। কিন্তু মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহারে কার্য সিদ্ধি: এই তো দেশের অবস্থা।" যা হোক, তখনকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেস্টিন সাহেব বসু ও স্নেহাংশু আচার্য্যকে বহেরাতলী যাওয়ার অনুমতি দিলেন না।

আমি তখন আত্মগোপনে। বেষ্টিন সাহেব আমাকে গ্রেফতারের জন্য পাহাড়ে এসে ক্যাম্প করেছেন। চারিদিকে গোয়েন্দা পাঠানো হয়েছে। বেস্টিন সাহেব কার কাছ থেকে শুনেছেন যে, কমিউনিষ্টদের একটি সাদা ঘোড়া আছে, সেই ঘোড়ায় চড়ে আমি ঘুড়ি। তখন ঐ এলাকায় যত সাদা ঘোড়া আছে, সব ধরে আনার হুকুম হ'ল। এই খবর পেয়ে আমরা নেত্রকোনায় আমাদের এক পার্টি দরদীর কাছে আমাদের ঘোড়াটি পাঠিয়ে দিলাম। ঘোড়া খুঁজতে এসে পুলিশ ঘোড়া পেল না। কিন্তু ঘোড়ার জিনগদি ছিল ললিত সরকারের ধানের গোলায়। পুলিশ তার সন্ধান পেয়ে আশপাশ জিনগদি সহ ললিত সরকারের বিরাট গোলাসহ ধান

পাড়িয়ে দিয়ে গেল। ঘোড়া বিক্রির অপরাধে যে ব্যাপারী আমাদের কাছে ঘোড়া বিক্রি করেছিল তাকে আটকানো হলো। সে বলেছিল যে, সে ঘোড়ার ব্যাপারী, তার কাছে আমরা ঘোড়া কিনতে চেয়েছিলাম, তাই সে পাঁচ শত টাকায় ঘোড়া বিক্রি করেছে। এতে তার অপরাধ কি। কিন্তু এই সত্য যুক্তি কে শোনে। পরে দারোগাকে তিন শত টাকা দিয়ে সেই বেপারী কোন রকমে মুক্তি পায়।

নেত্রকোনার এক প্রেস থেকে একটি ইশতেহার ছাপানো হয়েছিল। তাতে তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু ঐ ইশতেহার ছাপানোর অপরাধে প্রেসের মালিক, কম্পোজিটরসহ ট্রেডেল মেশিনটিও নেত্রকোনা সাব জেলে আটক রাখা হয়। এরূপ খামখেয়ালী অত্যাচার খুব বিরল, কিন্তু বৃটিশ রাজত্বে তাও করা হয়েছিল।

এই পর্যায়ে টংক আন্দোলন আর অগ্রসর হ'ল না। টংক উচ্ছেদ হ'ল না। যতটুকু সংস্কার করা হয়েছিল তাই রয়ে গেল।

পুনরায় টংক আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

টংক আন্দোলনের পুনরায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে। এই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পর। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস যে রিপোর্ট ও থিসিস গ্রহণ করে তা যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করে। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দু' এক কথা বলা প্রয়োজন।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাস পরই। কলকাতায় মোহম্মদ আলী পার্কে বিরাট চাঁদোয়ার নীচে সাত দিন আলোচনার মধ্য দিয়ে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বৃটিশরা ভারত ত্যাগের পর ভারত ভাগ করে দুইটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলো বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সারা ভারতীয় দলের কাঠামোতেই ছিল। এ জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পাকিস্তানের কমরেডরাও উপস্থিত হয়। ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত ৯১৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৬৩২ জন উপস্থিত ছিলেন। বৃটিশ আমলের পার্টি কাঠামোর ভিত্তিতে সে সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১২৫ জন ডেলিগেট উপস্থিত হন। তখন সারা ভারতে পার্টির সভ্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ হাজার। পূর্ব পাকিস্তানের সভ্য ছিল

১২ হাজার। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাত্র জনা পাঁচেক ঐ কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলো থেকে যুগোশ্লাভিয়ার যুগোভিচ দেদিয়ার, অস্ট্রেলিয়ার পার্টি থেকে লরেন্স সারকি, বার্মার পার্টি থেকে পার্টি সম্পাদক থানটুন কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল খুব উত্তেজনাপূর্ণ। তিনি বলেন, "সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই মুক্তি আসবে। আমরা সেই পথেই চলেছি।" ঐ কংগ্রেসে মূল দলিল উপস্থাপিত করেন কমরেড বি. টি. রণদীভে। কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় ছিল অতীতের কার্যকলাপের মূল্যায়ণ এবং রণনীতি ও রণ-কৌশল গ্রহণ। রণদীভের সমালোনায় বলা হয়, "এতদিন আমরা সংস্কারপন্হী পথে অগ্রসর হয়েছি। বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজুরবৃত্তি করেছি। স্বাধীনভাবে উদ্যোগ নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারিনি। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমঝোতার ভিত্তিতে তথাকথিত স্বাধীনতা এনেছে। এ স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়—ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার মত এখনো বিপ্লবী অবস্থা বিরাজ করে, কাজেই সংগ্রাম করে বুর্জোয়া নেতৃত্বের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে ইত্যাদি।" মোট কথা 'ভূয়া স্বাধীনতা'র বিরুদ্ধে ধর্মঘট, জঙ্গী মিছিল, সভা ও সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়। পরে নীতিগত ভাবে বলা হয় যে, "ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিলম্বিত, অথচ পৃথিবীতে প্রলেতারিয়ান বিপ্লব সমাধা হয়েছে। কাজেই দুই বিপ্লব অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সামাজতান্ত্রিক বিপ্লব একসূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। ভারতের বিপ্লবের স্তর হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক। সর্বহারা-অর্ধ-সর্বহারাদের নিয়ে বিপ্লবে এগিয়ে যেতে হবে। এতদিন পি, সি, যোশীর নেতৃত্বে আমরা সংস্কার পন্হা অবলম্বন করে চলেছি। কাজেই পার্টি তার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংগ্রাম করে বুর্জোয়া নেতৃত্ব উচ্ছেদ করতে হবে।"

এই কংগ্রেসে পাকিস্তান থেকে আমরা যারা গিয়েছিলাম, আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। কাজেই আমাদের পার্টিকেও পৃথকভাবে পাকিস্তান ভিত্তিতে নুতনভাবে গঠন করতে হবে। ১৯৪৭ সালের আগস্টের ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ন্যায় কমিউনিস্ট পার্টিও নিখিল ভারত ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এরপর মুসলিম লীগ, ও কংগ্রেস প্রভৃতি সংগঠনও দুই রাষ্ট্রের জন্য আলাদাভাবে সংগঠন গঠিত হয়। আমরাও চিন্তা করি যে যখন আমাদের পৃথক দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তখন দু'টি পার্টিও গঠিত হওয়াই সঙ্গত। কারণ কমিউনিস্টরা নিজ নিজ রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই কাজ করে থাকে। পাকিস্তান একটি আলাদা রাষ্ট্র, এর সমস্যাও আলাদা। তাই এখানে আলাদা

পার্টি গঠন করতে হবে। কাজেই পাকিস্তান থেকে যে সকল প্রতিনিধি কলকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ৬ই মার্চ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে পাকিস্তানের পার্টি সংগঠিত করেন। এইভাবে আমাদের বর্তমান পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ভিন্ন স্থানে সমবেত হয়ে পাকিস্তানের পার্টির জন্য পৃথক সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নয় জনকে নিয়ে পাকিস্তানের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এঁরা হলেন—সাজ্জাদ জহীর, আতা মোহম্মদ, জামালউদ্দিন বুখারী, ইব্রাহীম (শ্রমিক নেতা), খোকা রায়, নেপাল নাগ, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, মনসুর হাবিব ও মণি সিংহ। পলিটব্যুরো গঠন করা হয়—সাজ্জাদ জহীর, খোকা রায়, কৃষ্ণ বিনোদ রায়কে নিয়ে।

ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারই কমিউনিস্টদের কলকাতা কংগ্রেসের পর ব্যাপকভাবে ধরপাকড় ও তাঁদের উপর অকথ্য দমননীতি চালাতে থাকেন। ফলে পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের আত্মগোপনে কাজ চালাতে হয়।

বৃটিশ কর্তৃক ১৯৪৭-এ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বিপ্লবের স্তর প্রভৃতি সম্পর্কে রণদীভের রিপোর্ট ও থিসিসে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয় পাকিস্তানের পার্টিও সেদিন তা যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করেছিল।

রণদীভের থিসিসে বলা হয়েছিল যে ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিবর্তীত বিশ্ব পরিস্থিতিতে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে এবং ভারতীয় বিপ্লবের স্তর হ'ল সমাজতান্ত্রিক। এই বক্তব্য ছিল নীতিগতভাবে ভুল। গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দু'টি স্বতন্ত্র স্তর। একটি সম্পাদনের পরে অপরটি সম্পাদন করা সম্ভব—এটাই লেনিনের শিক্ষা। অথচ, রণদীভের বক্তব্যে দু'টিকে একটি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে তখন ভারতীয় বিপ্লবের স্তর ছিল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বড় ধনিক বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। এটা উপেক্ষা করে ভারতীয় বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক—এভাবে বিপ্লবের স্তর চিহ্নিত করাও ছিল ভুল। এ ভুল পার্টি আন্দোলনকে অনিবার্যভাবে বামপন্থী হঠকারিতার দিকে নিয়ে যায়। পাকিস্তানেও আমরা হঠকারি লাইন অনুসরণ করি।

রণদীভের থিসিসে—১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকে ভুয়া স্বাধীনতা এবং জগগণ তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তৈরী সে কথা বলে বুর্জোয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। অথচ সে সময় ভারত কি পাকিস্তান কোথাও জনগণ অনুরূপ

আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সারা ভারতে আন্দোলনের যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, ১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তার পরিবর্তন ঘটে অথচ রণদীভের থিসিসে তা কোনরূপ হিসেবের মধ্যেই নেওয়া হয়নি। তাছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভুয়া এই বক্তব্যও সত্য ছিল না। এর ফলে বৃটিশের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়েছিল। এই ঘটনা তাৎপর্যহীন ছিল না। বস্তুতঃ সে সময়ে রণদীভের নেতৃত্বে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল—তা ছিল ভুল ও হঠকারি।

এই বামপন্থী হঠকারী নীতি ও কার্যক্রমের ভিত্তিতেই ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হালুয়াঘাটের নাগের পাড়ায় পার্টির ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সভা পুনরায় টংক আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

টংক আন্দোলনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়

পার্টির জেলা কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আমরা টংক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে উঠে পড়ে লেগে যাই। আমরা এতদিন সংস্কার পন্থায় ডুবে ছিলাম—এই বেদনা বিপ্লবী হিসেবে আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কাজেই আমরা জঙ্গী আন্দোলন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি। জেলা কমিটির প্রস্তাবের পর বিভিন্ন এলাকার কমরেডদের মধ্যে স্থানীয় কমিটি থেকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। রাজনৈতিক ভাবে আমরা সংস্কারপন্থী বিচ্যুতি করেছি, এটাও বলা হয়। পুনরায় টংক আন্দোলন করার জন্য চারিদিকে প্রচার চালানো হয়—খুব তড়িৎ গতিতে এই আন্দোলন ছিল খুব জঙ্গী। এই এলাকাতে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠে। এই সুদীর্ঘ এলাকায় পাহাড়ের পাদদেশে দু' তিন মাইল অন্তর সরকার সশস্ত্র পুলিশের ক্যাম্প বসায়। এক একটি ক্যাম্পে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন করে সশস্ত্র সিপাই থাকত। পুলিশের সাথে তখন আমাদের বহু সশস্ত্র সংগ্রাম হয়েছে। এখানে সব সংগ্রামগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কয়েকটি জঙ্গী সংগ্রামের কথাই উল্লেখ করব। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৪০ সালে বৃটিশ সরকার টংক প্রথার সংস্কার করে, কিন্তু টংক প্রথা উচ্ছেদ করে নাই। কাজেই আওয়াজ উঠল, 'টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই: জান দিব তবু ধান না; জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই; লাঙ্গল যার জমি তার;" প্রভৃতি। এই প্রচার দাবানলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পাহাড় এলাকা ছাড়িয়ে মুসলমান এলাকাতেও এই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। যদিও হাজং, ডালু, বানাই প্রভৃতির মত ততখানি জঙ্গী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি, তবুও টংক বন্ধ করে দিয়ে মুসলমান কৃষকেরা এই

আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন। মুসলিম এলাকায় টংকের হার ছিল বেশী, তাছাড়া লেভী ধানের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলছিল।

প্রথমে জবরদস্তি করে নীল চাঁদ হাজং-এর টংকের বিশ মন ধান চৈতন্য নগর থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীরা ঐ ধান কেড়ে নিয়ে চাঁদকে ফেরত দিল। জমিদারের লোকেরা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ঘটনা জনগণে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমান, গারোসহ সমগ্র জনগণ এই আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করল। ১৯৪৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী কমলাকান্দা থানার বটতলায় টংক ধান আটক হ'ল। সংবাদ পেয়ে পরের দিন দারোগা ছয়জন সশস্ত্র পুলিশ, আনসার ও চৌকিদার নিয়ে এসে বিশ মণ ধান গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে রওনা হতেই কৃষকেরা পথ রোধ করে দাঁড়াল। আনসারেরা লাঠি চালিয়ে কয়েকজন কৃষককে আহত করল। আনসারদের বিরুদ্ধে কৃষকেরাও ক্ষেপে উঠে তারাও লাঠি নিয়ে আনসারদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ গুলি চালিয়ে দু'জন কৃষকে আহত করল। গুলি চলছে দেখে কৃষকেরা মাটিতে শুয়ে পড়ল। এরপরও তারা গাড়ী চলছে দেখে গাড়ীর গতি রোধ করল। এ অবস্থা দেখে দারোগা ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মনে করলেন হয়তো আরো লোক এসে জুটে যাবে। তিনি বললেন, "সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চল আমরা পালিয়ে যাই।" কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হাওয়া হয়ে গেল। গাড়োয়ান গাড়ী থেকে তার বলদ দু'টি খুলে গাড়ীটি মাঠে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। কৃষকেরা আওয়াজ তুলল, "জান দেব তবু, ধান দেব না।" আহত চাষীদের পিঠে বয়ে গ্রামে ফিরে গেলেন।

তারপর ২৬শে ফেব্রুয়ারী চৈতনা নগরের জমিদারী কাছারী দখল করে আগুন ধরিয়ে কাগজ-পত্র পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তহশীলদার ও পাঁচজন পেয়াদাকেও তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এখানে কেউ টংক ধান দেবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হ'ল। এর দু'দিন পরে কালিকাপুরে তারা দু'গাড়ী ধান আটক করল। হাজং রমণী মানিক, কলাবতীসহ প্রায় জনা কুড়ি মহিলা ধানের গাড়ী আটক করা হ'ল। বিহারী গাড়োয়ান ইতস্ততঃ না করে মহিলাদের নির্দেশিত স্থানে ধান তুলে দিয়ে চলে গেল। সরকারী কর্মচারীরা চাড়ুয়াপাড়া থেকে বিশ্বেশ্বরের একশত মণ লেভী ধান জোর পূর্বক নিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় পরেশ সরকারের নেতৃত্বে ভলান্টিয়ারেরা ধান আটক করল। বিশ্বেশ্বর বললেন, "আমার লেভী ধান দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। আমি টাকা চাই না।' জঙ্গী ভলান্টিয়ারেরা ঐ ধান দুঃস্থ হিন্দু, মুসলমান, উপজাতিদের মধ্যে বিতরণ করে দিল। বিশ্বেশ্বরের এই মহানুভবতা সকলেই উত্তম কাজ হিসেবে প্রশংসা করল।

গ্রামে গ্রামে টংক ধান, লেভী, মহাজনের ধান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ২৮শে জানুয়ারী লেঙ্গুরা পুলিশ ক্যাম্পের কাছে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় টংক বন্ধ, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ প্রভৃতি আওয়াজ তোলা হয়। ৩০শে জানুয়ারী রাশিমণি ও সুরেন্দ্রের স্মরণে শহীদ দিবস ফিরে এল। চাড়ুয়া পাড়ায় জনসভা করে কর্মী ও ভলান্টিয়ারেরা লাল পতাকা হাতে চারিদিকে প্রচারে বেরিয়ে পড়ল। একদল সিপাই ও আনসার ঘোষগাঁ হাটের দক্ষিণে ভালুকা পাড়ার গির্জার সামনে তাদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করল। গ্রেফতারকৃতদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য দাবী জানালো। সিপাই ও আনসারেরা তাদের ছেড়ে না দিয়ে ভয় দেখাতে লাগল। সুচতুর নেতা নয়ান সরকার হাজং ভাষায় সকলকে বল্লম থেকে পতাকা খুলে নিতে বললেন। তিনি তড়িৎ গতিতে একজন সিপাইয়ের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে তার বুকে বল্লম বিদ্ধ করে দিলেন। ইতিমধ্যে আর একটি বল্লমের আঘাতে আর একজন ধরাশায়ী হ'ল। এই সময়ে তারা আর একটি বন্দুক ছিনিয়ে নিল। এই অবস্থায় সিপাই ও আনসারেরা অনন্যপায় হয়ে পলায়ন করল।

আগেই প্রচারিত হয়েছিল যে, হাজং কৃষকেরা খুবই দুর্ধর্ষ। কখন যে কি করে তার ঠিক নেই। সশস্ত্র পুলিশেরা তাই সব সময়ই ভয়ে ভয়ে থাকত।

গারো প্রাহাড়ের সন্নিকটস্থ লেঙ্গুরা বাজারের মঙ্গল সরকার নামে আমাদের একজন জঙ্গী ও দুর্ধর্ষ কর্মী ছিল। তার চরিত্রবল যেমন ছিল তেমনি ছিল অসীম দুঃসাহস। সে কমিউনিস্ট পার্টি'র একজন সভ্য ও কর্মী ছিল। মঙ্গল সরকার মদ খেয়ে যাকে তাকে মারধোর করে বলে গ্রামের লোকেরা আমার কাছে নালিশ করল। এমন কি কর্মীরাও তার হাত থেকে রেহাই পায় না। এর একটি বিহিত করার জন্য তারা আমাকে অনুরোধ করল। আমি মঙ্গল সরকারকে ডেকে সে মদ খায় কি না—জিজ্ঞাসা করলাম। সে স্বীকার করল যে সে মদ খায়। মদ খেলে তার যোশ পয়দা হয়। আমি বললাম—"মদ খেয়ে মাতলামি করে অন্যদের মারধোর করা অন্যায়। তা ছাড়া আমাদের দেশে মদ খাওয়াকে জন সাধারণ খারাপ চোখে দেখে। এখন সংগ্রামের সময় সকল কর্মীকে জনপ্রিয় হতে হবে। এ অবস্থায় তোমার কাছে আমার প্রস্তাব হ'ল, তোমাকে মদ ছাড়তে হবে, না হয় পার্টি ছাড়তে হবে। তোমাকে চব্বিশ ঘন্টার সময় দেওয়া হ'ল। তুমি চিন্তা করে আমাকে জবাব দেবে"। পরের দিন মঙ্গল সরকার এসে বলল, "আমি পার্টি কখনোই ছাড়তে পারব না, আর কোন দিন মদ স্পর্শ করব না বলে আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম।" পরে মঙ্গল সরকার তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত

এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে গিয়েছে।

১৯৪৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মঙ্গল সরকারের নেতৃত্বে একদল ভলান্টিয়ার লেঙ্গুরা হাটের দিন প্রচারের কাজে সেখানে হাজির হ'ল। সেখানে অবাঙালী সশস্ত্র পুলিশের ক্যাম্প ছিল। তারা সংখ্যায় প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জনের মত ছিল। মঙ্গল সরকারের দল যখন শ্লোগান দিল, "টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর", তখন ঐ ক্যাম্পের পুলিশ কোন সতর্কতা ঘোষণা না করেই ভলান্টিয়ার দলের উপর নৃশংসভাবে গুলি চালায়। ফলে মঙ্গল সরকার, অগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন। এই সংবাদ যখন গ্রামে পৌঁছুলো তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা—যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অগ্রসর হ'ল। তারা এতখানি উত্তেজিত হয়েছিল যে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার কোন অবস্থা ছিল না। ত্রিশটি রাইফেল থেকে অনবরত গুলি বর্ষণ হতে থাকল। তখন তারা শুয়ে পড়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তাদের অভিযান টিকল না। আরো যোল জন মেয়ে-পুরুষ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো। শঙ্খ-মণি, রেবতী, যোগেন, স্বরাজ প্রমুখ মোট ১৯ জন কর্মী শহীদ হলেন। ঐ সময়ে হাজং নেতারা কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আমি নেত্রকোণায় ছিলাম। খবর পেয়ে আমি লেঙ্গুরায় উপস্থিত হ'লাম। আমি বললাম, "সরাসরি পুলিশকে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। রাইফেলের মুখে আমরা এইভাবে আক্রমণ করতে গেলে আমাদের ক্ষতি হবে বেশী, পুলিশের তেমন কিছুই হবে না। কাজেই অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমাদের উপর হামলা আসবে। পাহাড়ে আশ্রয়স্থল ঠিক করতে হবে। জঙ্গী ভলান্টিয়ারেরা ঐ সব স্থানে থাকবে।"

টংকের লড়াই ঃ গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ

লড়াই সংগঠিত করার লক্ষ্যে পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় স্থান ঠিক করার জন্য কমরেডদের নির্দেশ দেওয়া হ'ল। বলা হ'ল—সামনা সামনি নয়, গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করতে হবে। এর জন্য সত্তর মাইল ব্যাপী পাহাড় এলাকায় নয়টি ক্যাম্প গঠিত হ'ল। এক একটি ক্যাম্পে দেড়শত থেকে দু'শত ভলান্টিয়ার অবস্থান করত। যাদের উপর অত্যাচারের আশংকা ছিল, তাদের ঐসব ক্যাম্পে আনা হ'ল। বলা হ'ল আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া লড়াই করা সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে কমরেড বিপিনের প্রচেষ্টায় দেশী বোমা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হ'ল। আমাদের হাজং কারিগর কমরেডরা প্রথমে দু'টি গাদা বন্দুক তৈরী করলেন। তাঁরা আমাকে এসে বললেন যে তাঁরা বন্দুক তৈরী করেছেন, তবে কার্টিজের

বন্দুক তৈরী করতে পারেন নি। বন্দুকগুলো এত সুন্দর ও মসৃণ ছিল যে তা যন্ত্রে তৈরী আসল বন্দুকের সাথে তুলনা করা যেত। এ ভাবে আমাদের কারিগরেরা গোটা-পঞ্চাশেক গাদা বন্দুক তৈরী করেছিলেন। এছাড়া তারা বড় বড় কতকগুলো বন্দুকও তৈরী করেছিলেন। এগুলোতে পলিতা দিয়ে এক সঙ্গে ত্রিশ চল্লিশটি গুলি ছোড়া যেত। তারা এগুলোকে কামান বলতো।

সংগ্রামের মধ্যেই কর্মীদের ভিতরে এইরূপ সৃজনী শক্তি হয়েছিল। আমাদের হাতে ছিনিয়ে আনা কয়েকটি রাইফেল, স্টেনগান ও গোটা দুই পিস্তল ছিল। অভাব ছিল আমাদের টোটার। রাইফেলের টোটা আমদানী করতে গিয়ে দু'বার সে প্রচেষ্টা ধরা পড়ে যায়। বোমা ও বন্দুক তৈরী করার মূল কৃতিত্ব ছিল হাজং কমরেডদের। মধ্যবিত্ত কমরেডদের এতে তেমন কোন কৃতিত্ব ছিল না। নলিতাবাড়ীর শচী রায়, আমাদের একজন বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত কমরেড, বোমা তৈরী করতে গিয়ে বিস্ফোরণে মারা যান। পরে আমরা মাত্র এক জায়গা থেকে বোমা তৈরীর নির্দেশ দেই। এ সময় হাজং মেয়েদের রাইফেল চালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যান্য ভলান্টিয়ারদের রাইফেল চালনা ও গেরিলা কায়দায় শিক্ষিত করা হয়।
ভলান্টিয়ারদের রাইফেল চালনা ও গেরিলা কায়দায় শিক্ষিত করা হয়। যখন আমরা গাদা বন্দুক তৈরী করতে সক্ষম হলাম ও সাথে সাথে বোমা তৈরীও হয়ে গেল, তখন সংগ্রামের জোশ অনেকগুণ বেড়ে গেল। বহু খন্ড সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে। সশস্ত্র পুলিশ পালিয়ে জীবন উদ্ধার করেছে। অনেক পুলিশ আহত হয়েছে। কিছু সংখ্যক পুলিশ মারাও গিয়েছে। এ সব খন্ড খন্ড সংগ্রামের সবকথা এখানে লেখা সম্ভব নয়।

আমাদের কর্মীরা পুলিশ ক্যাম্পও আক্রমণ করেছে এবং পুলিশ ভয়ে ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এইভাবে প্রতিদিন পুলিশের সাথে কোন না কোন জায়গায় সংঘর্ষ হ'ত। সমগ্র এলাকা একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। টংক, লেভী, মহাজনী ঋণ সবই বন্ধ হয়ে গেল। কৃষক সমিতির স্লিপ ছাড়া কেউই একসঙ্গে বেশী পরিমাণ ধান বিক্রয় করতে পারত না। সশস্ত্র পুলিশও ভীত হয়ে পড়ল। কখন কোথা থেকে চোরাগুপ্তা গুলি আসে বা বোমা ফাটে কিছুই ঠিক নেই। সরকারও মরিয়া হয়ে সংগ্রামীদের দমাবার জন্য প্রচন্ড দমননীতি চালিয়ে যেতে লাগল। কলমাকান্দা থানায় জায়গীর পাড়া গ্রামে একদিন গভীর রাতে প্রায় দেড় দুই শত পুলিশ গুলি করতে করতে চারিদিক থেকে আক্রমণ করল। অনেককে তারা হত্যা করল। এরূপ বর্বর হত্যাকান্ড চালিয়ে কিছু লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে চলে গেল। পরে গ্রামটি পুড়িয়ে দিল।

আসামের গারো পাহাড়ের পাদদেশে রাণীপুরে আমাদের কমরেডরা

একটি নতুন গ্রাম তৈরী করেছিল। সারি সারি ঘর, ভলান্টিয়ারদের থাকার বিরাট লম্বা ঘর, হাসপাতাল ইত্যাদি। গ্রামটি বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছিল। উ'চু বাঁশের মাথায় লাল পতাকা উড়ত। এই গ্রামে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকত। পুলিশ ক্যাম্প থেকে এই গ্রাম বেশী দূরে নয়। তবু তারা সহজে এই গ্রামে আক্রমণ চালানোর সাহস পায়নি। একদিন কয়েক-জন সশস্ত্র পুলিশ গ্রামের দিকে আসছিল। তা দেখে জনা বিশেক ভলান্টিয়ার তাদের প্রতিরোধ করার জন্য খোলা মাঠে এগিয়ে যায়। অপর একটি দল অন্য দিক দিয়ে তাদের আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হ'ল। খোলা মাঠ পেয়ে সশস্ত্র পুলিশ অনবরত গুলি বর্ষণ করতে লাগল। অপর দিকে ভলান্টিয়ারদের সাথে মাত্র একটি বন্দুক। কিন্তু সেটার কার্টিজও ফুটলো না। অপর দলও গুলি চালাতে পারল না। ফলে আমাদের সাত জন কমরেড—দুবরাজ, অনন্ত, ক্ষিরোদ প্রমুখ এখানেই শহীদ হলেন। আরও দু'জন গুরুতর আহত হলেন। আমরা আগে থেকেই দু'জন এম. বি. ডাক্তারকে ক্যাম্পে এনে রেখেছিলাম। ওষুধ-পত্র সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। এরা আমাদের কমরেডদের ইনজেকশান দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। মোটামুটিভাবে আমাদের মেডিকেল স্কোয়াডও ছিল। আহত-দের মধ্যে একজনকে রাণীপুর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অপরজনকে পাহাড়ের অভ্যন্তরে নিভৃত ক্যাম্প নিয়ে যাওয়া হ'ল।

আমি তখন রাণীপুর হ'তে মাইল দুয়েক দূরে নিরাপদ ক্যাম্পে ছিলাম। আমাকে এসে ঘটনার খবর দেওয়া হ'ল। তখনই যাব বলে খবর পাঠালাম। এইরূপ মর্মান্তিক খবর পেয়ে আমি খুবই চঞ্চল ও মর্মাহত হ'লাম। আমাকে কয়েকজন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আমি মনে মনে ভাবলাম, যারা আজ স্বামীহারা হয়েছে তাদের কি সান্ত্বনা দেব; যারা আজ পুত্রহারা তাদের অশ্রু মোছানোরেই বা কি করব। আমি ভেবে কিছুই স্থির করতে পারলাম না। ভাবলাম, এতক্ষণে কান্নাকাটি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কিন্তু যখন গ্রামের কাছে উপস্থিত হ'লাম তখন কোন শব্দ শুনতে পেলাম না; মনে করলাম, এরা সকলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে নিরাপদ স্থান চিরাখালীতে চলে গিয়েছে। যে ভলান্টিয়ারটি পাহারা দিচ্ছিল সে আমাকে হাসপাতালের দিকে যেতে বলল। সেখানে একজন গুরুতর আহতকে রাখা হয়েছে। আমি সেখানে গেলাম। ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন। তারা বললেন, "আজ রাত হয়ে যাচ্ছে, এই কমরেডকে এখন এখান থেকে সরানো যাবে না।" কিন্তু এই গ্রামটি আজ রাতে পুলিশ আক্রমণে করতে পারে—এটা আমরা আশংকা করলাম। আমি ভলান্টিয়ারদের বললাম, "যাদের স্বামী মারা গিয়াছে তাদের কাছে আমাকে নিয়ে চল।" ঐ সব স্বামীহারাদের

সাথে দেখা করার জন্য তখনই রওয়ানা হ'লাম। কিছুদূর যেতেই একজনের সাথে দেখা হ'ল। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে সে কাঁদছে না। মুখ গম্ভীর। আমি তাকে কয়েকটি কথা বললাম, সে কোন কথা বলল না। সামনে কতকগুলো বল্লম ছিল, সেদিকে তাকিয়ে রইল। তাদের ভাব এই —রক্তের অবশ্যই বদলা নেব। শত্রুদের কঠিন আঘাত হানতে হবে। একটু পরে দেখলাম তার চক্ষু হতে জল ঝরে পড়ছে। যাদের কাছে গিয়েছি কেউই উচ্চস্বরে কাঁদে নি। একজন মাকে দেখলাম—গুণ গুণ করে কাঁদছে। এদের ধৈর্য্য দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আজও মারা যায় নি। যদি মরত তবে আমি সে পরিস্থিতিতে কি করতাম তা জানি না। এ সব নিরক্ষর মেয়েরা আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিল। আমরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত আছি—এই স্পর্ধা এই নিরক্ষর মেয়েদের সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের কাছে খান খান হয়ে গেল। কতভাবে এরা প্রস্তুত রয়েছে—এটাই ছিল অনুধাবনের বিষয়। সংগ্রামের পূর্বে আমরা যেসব সংকল্প প্রচার করেছিলাম যে, আমাদের অনেকের মৃত্যু হতে পারে, আমাদের ঘর-বাড়ী ভাঙ্গা হতে পারে কিন্তু আমরা সংগ্রামে অটল থাকব। যতদিন পর্যন্ত টংক ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ না হয়, সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। পিছু হটব না।

এই ঘটনার পর সব ভলান্টিয়ারদের ডেকে সভা করলাম। আমার বক্তব্য ছিল, আমাদের কৌশলের ভুল হচ্ছে। আমরা গেরিলা কায়দায় না গিয়ে ফাঁকা মাঠে লড়তে গিয়েছি। কাজেই আমাদের প্রচন্ড ক্ষতি হয়েছে। আমরা শহীদের নামে শপথ করছি—"তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না। আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। পিছু হটব না।" পরে নেতাদের ডেকে মিটিং করলাম—এখন কি করা? সকলের ধারণা—এই রাণীপুর গ্রামে আজ রাত্রেই পুলিশ আক্রমণ করতে পারে। তাদের আমরা ঠেকাতে পারব না। গ্রাম শুদ্ধ লোক চিরাখালীতে নিরাপদ জায়গায় এখনই সরিয়ে নিতে হবে। প্রশ্ন উঠল, আহতকে সরানো যাবে না। কাজেই কি করা? পরিস্থিতি নাজুক এবং সংকটপূর্ণ। অবশেষে ঠিক করা হ'ল গাছের উপর পাহারাদার থাকবে। কিন্তু রোগীর কাছে কে থাকবে? এই সময় এক বৃদ্ধা হাজং মহিলা বললেন, "আমি থাকব। আমার তিন কাল গিয়েছে, আমাকে মেরে ফেলে ফেলুক, আমার মরণে ভয়-ডর নেই।" বৃদ্ধার এই সাহস দেখে আমরা চমৎকৃত হ'লাম। সেভাবেই ব্যবস্থা হ'ল। ভলান্টিয়ারেরা পালাক্রমে পাহারা দিবে। পুলিশ আসতে দেখলে সকলকে সতর্ক করে তারাও সরে পড়বে। শুধু বৃদ্ধা ও আহত থাকবে। সুখের বিষয় পুলিশ সে রাতে আর গ্রাম আক্রমণ করে নি। পরে পুলিশের আরও

শক্তিশালী দল এসে ঐ গ্রাম আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়। ইতিমধ্যে ডাক্তারেরা ঐ আহতের পশ্চাৎ দিক থেকে গুলি বের করে ফেলেন। সে বেঁচে যায়। পরে সে সামান্য খুঁড়িয়ে হাটতে পারত। অপর আহত কমরেডরাও সুস্থ হয়ে উঠেন।

ঐ সময়ে সিলেট জেলাও টংক আন্দোলনে যোগ দেয়। তারাও পাহাড় অঞ্চলে একটি নিরাপদ ঘাঁটি স্থাপন করে। সিলেট জেলার এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন রবি দাম। তিনি ছিলেন খুব সাহসী ও দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। তিনি ও অন্যান্যরা মোহনপুরে মজুত ধান বিলি করার জন্য যান। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পঁচিশ ত্রিশ জন পুলিশ ও আনসার এঁদের ঘেরাও করে ফেলে। রবি দাম পুলিশকে প্রতিরোধ করতে গেলে পুলিশের কয়েকটি গুলি তাঁকে বিদ্ধ করে। তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। রবি দামের মত নেতার মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি দৃঢ়চেতা খাঁটি কমিউনিস্ট ছিলেন। অণিমা এই দলে ছিল। তাঁর ছিল অদম্য সাহস। তাঁরা খুব কষ্ট করে জীবন-যাপন করতেন। দু'বেলা মাত্র টক দিয়ে ভাত খেতেন।

এখানে দু'জন কুরিয়ারের কথা বলা দরকার। একজনের নাম ছিল গণেশ। সে ছিল নিরক্ষর গরীব চাষী, অপর জন ছিলেন রমণী কর। তিনি লেখাপড়া জানতেন। গণেশ কুরিয়ারের কাজ করছিল ১৯৪০ সাল থেকে। সে ছিল একজন কৌশলী ও সাহসী ব্যক্তি। পাহাড় অঞ্চলের রাস্তা ঘাট ছিল তার নখ-দর্পণে। সে নৌকাও ভাল বাইতে পারত। গণেশ নিয়মিত চিঠি–পত্র নিয়ে নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ যেত। ১৯৪৯ সালে পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করা ছিল খুবই কঠিন ও বিপজ্জনক। পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াত, কেউ যেন পাহাড় অঞ্চলে যেতে না পারে বা পাহাড় অঞ্চল থেকে কেউ বাইরে আসতে না পারে। দীর্ঘ এলাকা বলে আমাদের আর একজন কুরিয়ারের প্রয়োজন হ'ল। ১৯৪৯ সালে নেত্রকোনার রমণী করকে আমারা কুরিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলাম। একবার তাকে কাগজ-পত্র ও দুই শত টাকা দিয়ে ময়মনসিংহ পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। অত্যন্ত দুঃখের কথা কে বা কারা তাঁকে পথে মেরে ফেলে। তাকে কে বা কারা মেরেছে তা আজও আমরা সঠিক জানতে পারিনি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গণেশ ছিল কৌশলী, সাহসী ও পরিশ্রমী। পার্টির প্রতি তার ছিল অকুন্ঠ আনুগত্য। সে জাতিতে ধোপা ছিল। ধোপার কাজ জানা থাকলেও সে ধোপার কাজ করত না। প্রকৃত-পক্ষে সে ছিল একজন গরীব কৃষক। সে বিভিন্ন কঠিন রাস্তা ভেদ করে নিয়মিতভাবে নেত্রকোনা এবং প্রয়োজনে ময়মনসিংহের সাথে যোগাযোগ

রক্ষা করত। আমি পাহাড় অঞ্চল হতে পায়ে হেটে নেত্রকোনা বা ময়মনসিংহ গেলে—সে আমার পথ প্রদর্শক হিসেবে আমার সাথে যেত। পার্টির কাজের জন্য একটি ভাল ছৈ-ওয়ালা নৌকা ছিল। ঐ নৌকার মাঝি হিসবে ভাটি অঞ্চলে আমাদের পার্টির সভ্য ফজর আলীর ভাতিজাকে মাসিক বেতনে রাখা হয়েছিল। তার নাম ছিল হাসন; সে ছিল একজন জোয়ান ছেলে।

একদিন দুই ডাক্তারের মধ্যে একজন বললেন, "অপর ডাক্তারের প্রতিদিন অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে, তার কিছুটা কাশিও আছে। আমি আশংকা করছি যে তার টি. বি. হয়েছে। তাকে কলকাতায় পাঠানো দরকার।" পাহাড় অঞ্চল থেকে লোক পাঠানো কঠিন। অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমরা নিম্নরূপে পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। ভারতের ভূখন্ডে গারো পাহাড়ে একটি বড় হাট আছে—নাম ভং বাজার। ঐ হাটে বাঁশ-কাঠ প্রভৃতি কেনার জন্য সোমবার ও মঙ্গলবার বহু নৌকা পাকিস্তান থেকে যাতায়াত করত। তখনও পাসপোর্টের প্রচলন ছিল না। অবাধে লোকজন সীমান্তের এপার-ওপার যাতায়াত করতে পারত। ভংবাজারের হাটের দিন হাসনকে আসার জন্য গণেশের মাধ্যমে খবর পাঠালাম। হাসন আসার পর, সে নৌকার মাঝি হিসেবে গণেশ ও ডাক্তারকে নৌকায় করে নিয়ে যাবে বলে ঠিক হ'ল। ডাক্তারের এ এলাকায় রাস্তা ঘাট চেনা ছিল না বলে গণেশকে তার সঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। গণেশ পুলিশের কাছেও ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি গণেশকে সব বুঝিয়ে দিলাম ঃ সে খুব কর্তব্যপরায়ণ ছিল। তাকে বলা হ'ল যেন ডাক্তারকে পৌঁছিয়ে আমাদের খবর দেয়।

সময় চলে যেতে থাকল। কিন্তু গণেশ আর ফিরে আসে না। আমরা খুব উদ্বিগ্ন হ'লাম। কোন অঘটন ঘটল কি না কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভাবছি খবর নেব—এমন সময় একদিন আমাদের দুঃশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে গণেশ এসে উপস্থিত হ'ল। আমাকে সে খুব মানত। কিন্তু আমাকেই সে আক্রমণ করে বলল, "আপনি কি রকম নেতা? একটি লোক যদি মরে যায়—তবে কি করতে হবে তার কোন নির্দেশ আছে?" আমি বললাম, "বাজে কথা বক না, কি হয়েছে বল।" সে বলল, "হাসনের বোধহয় আগেই কলেরা হয়েছিল, সে অর্ধেক রাস্তায় যাওয়ার পরই মারা গিয়েছে। আমি একা নৌকা বেয়ে গিয়ে ডাক্তারকে টিকেট কিনে দিয়েছি, তিনি চলে গিয়েছেন। আমি নৌকায় ফিরে এসে খুব ভাবলাম—কি করা যায়। মুর্দা কিভাবে পৌঁছানো যায়। পরে মনে করলাম যে, মুর্দা তার নিজ বাড়ীতেই পৌঁছে দিতে হবে, নইলে পার্টির বদনাম হবে।"

ফজর আলীর বাড়ী নেত্রকোনা থেকে অনেক দূরে ভাটি অঞ্চলে ঝিমটি গ্রামে। গণেশ একা নৌকা বেয়ে ফজর আলীর বাড়ীতে মুর্দা নিয়ে গেল। সে ফজর আলীকে সব কথা বলল। ফজর আলী আফসোস করেও আশ্চর্য হয়ে বলল, "আমার ভাতিজার হায়াত নেই, তাই সে মারা গিয়েছে। কিন্তু তুমি তো আশ্চর্য কর্মী। তুমি কলেরার মুর্দা নিয়ে এতদূর পথ এসেছ? ধন্য তুমি! ধন্য কমিউনিষ্ট পার্টি।" গ্রামের লোকেরা শুনে অবাক হয়ে গেল। গণেশকে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। আমি এই কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে শুনতে লাগলাম। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "তুমি একজন সাচ্চা কমিউনিষ্ট, যে মানবতা এবং কর্তব্যের কাছে নিজের জীবনকেও তুচ্ছ মনে করে।" সকলেই এই কাহিনী শুনে গণেশকে ধন্যবাদ জানাল। সে সময় আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এইরূপ সাচ্চা ও নিষ্ঠাবান কর্মী বের হয়ে এসেছিল। বহু নতুন নতুন কর্মী সৃষ্টি হয়েছিল। যে সব কৃষক কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা হয়েছিলেন —তারা রাজনৈতিক সচেতন হয়েছিলেন, সাংগঠনিক দিক দিয়ে তারা ছিলেন অপূর্ব দক্ষ সংগঠক। হাজার দুই কর্মীর সব খরচ-খরচা এই এলাকার কৃষকেরাই বহন করতেন। চাল, টাকা, পয়সা সংগ্রহ করে দিতেন।

এই সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘ দেড় বছর। শত শত কৃষককে জেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শত জেল-জুলুমের অত্যাচার সত্ত্বেও যারা গোপন আশ্রয়ে থেকে সংগ্রাম করেছেন, তাদের একজনকেও পুলিশ তখন ধরতে পারে নি। আমাদের তিনজন মহিলা কর্মী—অর্শমণি, রাহেলা ও ভদ্র সোমেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় গ্রেফতার হয়ে যান। পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে এদের উপর নির্মম ও জঘন্য নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু পুলিশ তাদের নিকট থেকে সংগ্রাম সম্বন্ধে কোন কথা বের করতে পারে নি। পরে তাদের ময়মনসিংহ জেলে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। তারা দীর্ঘদিন পরে মুক্তি পান। জেলে তারা লিখতে-পড়তে শিখেন।

বিরাট এলাকা জুড়ে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছিল। আমাদের লোক মারা পড়ছিল, পুলিশের লোক আহত হচ্ছিল। কোথাও কোথাও পুলিশও মারা পড়ছিল। ঐ সংগ্রাম দেখে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার হ'ল। সরকার ও মুলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল পান্ডারা বুঝলো,—টংক দিতে হয় না, লেভীও দিতে হয় না,—এটাতো খুবই ভাল, কিন্তু এই আন্দোলনে পাকিস্তানও ভেঙ্গে যেতে পারে। তারা এই চিন্তায় বিমর্ষ ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের কাছে এই খবর এসে পৌঁছুল। আমরা চিন্তিত হ'লাম। মুসলমান কৃষকেরা টংক ধান দিচ্ছিলেন না ঠিকই,

কিন্তু তারা হাজংদের মত জঙ্গী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করছিলেন না।

১৯৫০ সালের প্রথম দিকে কমিউনিষ্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর (কমিনফরম) মুখপত্র "ফর এ লাস্টিং পীস এন্ড ফর এ পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি" নামক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি রণনীতি ও রণকৌশলে ভুল করেছে বলে জোরের সাথে লেখা হয়। এটা প্রকাশ হওয়ার পর ভারতের পার্টির মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দেশব্যাপী পার্টির সভ্যরা তখনকার ভারতের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ সম্পাদক রণদীভের উপর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের দ্বারা গঠিত প্রাদেশিক কমিটির উপরেও এই বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। 'লাস্টিং পীস' পড়ে আমরা আমরা আলোচনা করে বুঝতে পারি আমরাও নিদারুণ ভুল করেছি।

সরকারী বর্বর ও পৈশাচিত নির্যাতন : টংক আন্দোলনের সমাপ্তি

১৯৫০-এর দিকে মুসলিম লীগ সরকার এই জঙ্গী সংগ্রামে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সশস্ত্র পুলিশ ভীত-সন্ত্রস্ত। তারাও আন্দোলন দমনে আসতে গড়িমসি করত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেব সুসং এলাকায় এসে এক জনসভা করলেন। জনসভায় তাঁর বক্তব্য ছিল—"টংক উঠিয়ে দিচ্ছি; সবাই জমির স্বত্ব পাবে, জমিদারী প্রথাও আইন করে তুলে দিচ্ছি। রাস্তা দিয়েছি, স্কুল দিয়েছি, কাজেই তোমরা এখন আন্দোলন থামিয়ে দাও।" 'লাস্টিং পীস' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় বিবেচনায় নিয়ে নুরুল আমিন সাহেবের উক্ত বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জেলা কমিটির সভা ডেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু নুরুল আমিন সাহেবের মনে মনে যে অন্য মতলব ও সংকল্প ছিল তা তখন আমরা বুঝতে পারিনি।

সংগ্রাম থামিয়ে দেবার পর গ্রামে গ্রামে এমন লুণ্ঠন আর বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি হ'ল যা কল্পনা করা যায় না। মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হ'ল, তাদের ধর্ষণ করা হ'ল, গ্রামের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা হ'ল। ক্ষেত খামারে ফসল নষ্ট করা হ'ল। যেখানে যাকে পেল ধরে জেলে পাঠানো হ'ল। মোটের উপর সরকার ও টাউটরা এক পৈশাচিক অমানবিক নির্যাতনের তান্ডবে মেতে উঠল। মুসলিম লীগ সরকার ঠিক করল—এই বর্ডার এলাকায় এইরূপ বিদ্রোহী লোকদের উচ্ছেদ করতে হবে। এদের পরিবর্তে জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলমান কৃষকদের এখানে এনে বসাতে হবে। হ'লও তাই। উচ্ছেদের কাজ পাইকারী হারে শুরু হ'ল। হাজং

কমরেডরা এই নির্মম অত্যাচারের ফলে এখানে টিকতে পারল না, ভারতের আসামে চলে যেতে বাধ্য হ'ল। হাজংদের সংখ্যা ছিল প্রায় লাখ খানেক। তাদের অধিকাংশ সীমান্তের অপর পারে চলে গেল। তাছাড়া ডালু, বালাই, কোচ, রাজবংশী যারা ছিল তারাও চলে গেল। তবে গারো উপজাতি এখনও কিছু সংখ্যক আছে। হাজং উপজাতির সংখ্যা এখন অতি নগন্য।

বামপন্থী হঠকারীতার ফলে বার বছরের একটি নিবিড় নিচ্ছিদ্র জমাট বাঁধা জঙ্গী সুশৃংখল সংগঠন ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। আন্দোলন করা আমাদের ঠিকই ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি না বুঝে সশস্ত্র সংগ্রাম করা ছিল বামপন্থী বিচ্যুতি।

আমাদের সংগ্রাম ছিল সামন্তবাদী টংক ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রাম। ওটা নুরুল আমিন সরকারকে উচ্ছেদের সংগ্রাম ছিল না। এই মনে রেখে এবং শুধু একটি এলাকায় নয়, সমগ্র দেশবাসীর মনোভাব বিচার করে আমাদের কৌশল নির্ধারণ করা উচিৎ ছিল। তা না করায় কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে, তারা পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলতে চায় এ কথা বলে সরকার দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছিল। ফলে পার্টি ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমরা যখন এটা উপলব্ধি করতে পারলাম তখন আন্দোলন থামিয়ে দিলাম। এর ফলে যে মারাত্মক দমননীতি নেমে আসে তাতে ক্ষতি হয় ঠিকই, কিন্তু আন্দোলন চালিয়ে গেলে সে অবস্থায় আরও ক্ষতি হত। সরকার তখন জমিদারী প্রথা ও টংক প্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন। সে অবস্থায় আন্দোলন চালিয়ে যাবার আর যুক্তিও ছিল না।

সারা বাংলাদেশে আইন সঙ্গতভাবে ধান কড়ারি খাজনা উঠে গিয়েছে সত্য। কিন্তু যে হাজং উপজাতি বীরত্ব, সাহস, ত্যাগ, নিষ্ঠার সাথে ঐ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের আমরা হারিয়েছি, তাঁরা পিতৃ পুরুষের ভিটা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই একদিকে হয়েছে জয়, অপর দিকে হয়েছে পরাজয়।

এই পর্যায়ে আন্দোলনের কৌশলে মারাত্মক ভুল হলেও কমরেডদের বীরত্ব, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাংগঠনিক দক্ষতা, সৃজনী প্রতিভা ও রাজনৈতিক চেতনা চিরদিন অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।

কামাল সিদ্দিকী

তেভাগা আন্দোলনে কৃষক প্রতিরোধ চরিত্র

বাংলার কৃষক আন্দোলনের মধ্যে তেভাগাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী তথ্য সমৃদ্ধ এবং সম্প্রতি চমৎকার কিছু ব্যক্তিগত বিবরণ এবং বিশ্লেষণ-ধর্মী প্রবন্ধের প্রকাশ সেটি আরো জোরদার করেছে। তবে, তেভাগার সময় সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রকৃতি বা তার পেছনের নির্ধারক শক্তিগুলো এবং তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে এসব লেখায় নির্দিষ্ট কোন আলোকপাত করা যায় নি। তেভাগার এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ মনোযোগ দাবী করে। কারণ অধস্তন শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চরম উপায় হচ্ছে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং সংগ্রাম, বামপন্থী মহলের এই অহরহ বুলিবাগিশী সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তব পরিস্থিতিতে কৃষক সশস্ত্র সংগ্রাম কি নির্দিষ্ট রূপ নিতে পারে তা নিয়েও এদেশে কোনো অর্থপূর্ণ বিতর্ক হয় নি। তাই, নকশালবাড়ী অভ্যুত্থানে সংগ্রামী গণ আন্দোলন বা 'ঘাঁটি এলাকার' সশস্ত্র সংগ্রাম, সচেতনভাবে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের প্রধান রূপ হবে কিনা তা আলোচিত হয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নয় বরং দীর্ঘ এবং বিমূর্ত উদ্ধৃতির সহায়তায়। সুতরাং না বললেও চলে যে, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার অর্থবহ নির্দেশক হিসেবে কৃষক প্রতিরোধের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে যদি মেনে নেই, তা' হলে সে সংগ্রামকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। নীচে সে চেষ্টাই করা হয়েছে।

বাংলায় তেভাগা আন্দোলন ছিল (১৯৪৬—৪৭) বর্গাদারদের, জোতদারের সঙ্গে উৎপাদিত শস্য অর্ধেক ভাগাভাগির বদলে, নিজের জন্য দু-তৃতীয়াংশ রাখার সংগ্রাম। আন্দোলনটি সংগঠিত করেছিল এবং নেতৃত্ব দিয়েছিল নিখিল ভারত কিষাণ সভার বাংলা প্রাদেশিক শাখা এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রদেশ শাখা। পূর্ববর্তী সব কৃষক আন্দোলন থেকে এটি ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যতিক্রমী। গ্রামীণ জনগণের বামপন্থী যোজনা ছিল এর উৎস এবং বাংলার ইতিহাসে এটি ছিল রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কৃষককুলের বিদ্রোহের প্রথম সচেতন প্রচেষ্টা।

ঐতিহাসিকভাবে বর্গাদাররা কোন নমিত শ্রেণী নয়। বিশ দশকে, ঢাকা ময়মনসিংহ ও যশোর জেলায় তাদের প্রতিরোধের বেশ কয়েকটি উদাহরণ আছে, তবে এগুলি সফল হয়নি প্রতিরোধের নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির জন্য। উদাহরণ স্বরূপ—নড়াইলে, সৈয়দ নওশের আলীর নেতৃত্বে বর্গাদারদের কৌশল ছিল, ফসলের দু-তৃতীয়াংশ না দিলে, চাষ না করা। জবাবে জমিদার ও জোতদাররা পতিত রাখলো তাদের জমি। এর ফলে শুধু কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণেই হ্রাস পেল তা নয়, বর্গাদারদের প্রতিরোধ ক্ষমতাও হ্রাস পেল। কারণ, বর্গাদাররা আবার যখন পুরনো শর্তে জোতদারের জমি চাষ করতে চাইলো তখন জোতদাররা সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো। ১৯৩৯ সালে, কিষাণ সভার নেতৃত্বে বর্গাদাররা উত্তর বঙ্গে গড়ে তোলে শক্তিশালী এক আন্দোলন। তারা তাদের প্রাপ্য অর্ধেক থেকে দু-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধির দাবীই শুধু করেনি, দাবী করেছিল, সকল প্রকার অবৈধ কর, যেমন চৌকিদারের ফি, যাতায়াত ভাড়া, ধুলা খাওয়া, মাঙন, দাদন প্রভৃতির অবলুপ্তিও। ঘটনা যখন গুরুতর মোড় নিল, তখন মধ্যস্থতা করতে হলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এবং শেষ পর্যন্ত আধিয়ার ও জোতদারের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছিল।

সমঝোতার শর্তগুলি ছিল (ক) আবওয়াব বিলুপ্তি (খ) দ্রব্য ঋণের ওপর সুদ হ্রাস (গ) আধিয়ারদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা সমূহ প্রত্যাহার এবং (ঘ) আন্দোলনে যোগদানের কারণে আধিয়ারদের আর হয়রানী না করা। আঞ্চলিক প্রশাসকের সভাপতিত্বে সমসংখ্যক আধিয়ার ও জোতদার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি বোর্ড যারা দু'পক্ষের কোন বিষয়ে বিরোধ বাঁধলে তার নিষ্পত্তি করবে। এবং কার্যকর করবে সমঝোতার শর্তগুলি। যদিও এ আন্দোলনের সাফল্য ছিল আংশিক কিন্তু তা কৃষকদের শিখিয়েছিল, তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামী কার্যক্রম। ১৯৩৯ সালের এই সংগ্রাম পরবর্তীকালে আরো এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়, কিষাণ সভার কর্মীরা ত্রাণ কাজ চালিয়ে যাবার সময় বর্গাদারদের পরামর্শ দিয়েছিল জোতদারদের ফসলের ভাগ না দেওয়ার জন্য। সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে, তেভাগার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, এই ছিল বর্গাদারদের সংগ্রামের চিত্র। তেভাগার প্রধান দাবীগুলি ছিল—

ক. ফসলের দু-তৃতীয়াংশ ভাগ
খ. জমিতে দখলীস্বত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার
গ. সুদের হার ১২.৫% এ হ্রাস
ঘ. আবওয়াব বিলুপ্তি

ঙ. ফসলের ভাগ পাওয়ার পর জোতদরেদের সঠিক রশীদ প্রদান
চ. বর্গাদারদের প্রাঙ্গনে ধান মাড়ানো

দিনাজপুর জেলায় আটওয়ারী থানার রামপুর গ্রামে জ্বলে উঠেছিল আন্দোলনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ। যেহেতু তখন ছিল ফসল কাটার মরসুম এবং ফসল ছিনিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ মুহূর্ত তাই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলের মত। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম, মেদেনীপুর, চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বাকুরা, বীরভূম, মালদা, এবং জলপাইগুড়ি—বাংলার উনিশটি জেলায় তীব্র হয়ে উঠেছিল আন্দোলন।

সংগ্রামের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এরকম—ক, ফসল একতরফাভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বর্গাদারদের বাড়ীর আঙ্গিনায় বা খোলানে। যে সব এলাকায় আগে কৃষকদের বাড়ীর আঙ্গিনায় ফসল নেওয়া হয়নি, পরবর্তী সময়ে অন্য এলাকার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে যে সব এলাকার কৃষকরা জোতদারদের ধানের গোলা আক্রমণ করে লুট করতে লাগলো নিজেদের দু-তৃতীয়াংশ ভাগ আদায়ের জন্য। এটা করার সময় কৃষকরা থাকতেন সশস্ত্র—লাঠি ও লাল পতাকা নিয়ে এবং কাজটি করতেন ঐক্যবদ্ধভাবে। জোতদারকে দেওয়া হয়েছিল এক তৃতীয়াংশ ফসল। জোতদার তা প্রত্যাখ্যান করলে তা জমা হতো গণ ভান্ডারে।

খ. কিছু জায়গায় গঠন করা হয়েছিল গণ কমিটি যেখানে ছিলেন ভূমীহীন, গরীব, মাঝারী এবং বোধোদয় হয়েছে এরকম ধনীকৃষক। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল আন্দোলনের নির্দেশ দেওয়া এবং উপদ্রুত এলাকায় দৈনন্দিন প্রশাসন চালিয়ে যাওয়ার। তবে, বেশীর ভাগ অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনার আসল কাজ করেছেন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও কিষাণ সভার ক্যাডাররা।

গ. কিছু এলাকায় গ্রামীণ বদমাশদের বিচার ও গরীবদের বিবাদ মীমাংসার জন্য গঠন করা হয়েছিল গণ আদালত। গরীবদের বলা হয়েছিল সরকারী আদালত গুলি বয়কট করতে।

ঘ. পুলিশ এবং জোতদারদের গতিবিধির ওপর সবসময় নজর রাখার জন্য গঠন করা হয়েছিল গোয়েন্দা ইউনিট। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, নড়াইলের কথা যেখানে পুলিশ বা জোতদারের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে, গোয়েন্দা বিভাগ হুঁশিয়ারী সংকেত প্রদান করতো জয়ঢাক ব্যবহার করে।

ঙ. গঠন করা করা হয়েছিল গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। এদের অস্ত্র ছিল

তীর, ধনুক, বর্শা, রামদা। পুরুষদের সহায়তা করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী।

চ. গরীব, পঙ্গু এবং আটক তেভাগা কর্মীদের সহায়তা করার জন্য গঠন করা হয়েছিল একটি গণ তহবিল।

ছ. গ্রেফতারের জন্য তখন ওয়ারেন্ট জারী ও প্রতিশোধ হিসেবে আদালতে মামলা দায়ের করা হতে লাগলো তখন এর মোকাবেলার জন্য সাধারণভাবে যে উপায় গ্রহণ করা হতো তা ছিল আত্মগোপন করা, গণ প্রতিরোধের মাধ্যমে পুলিশকে বাধা দেওয়া, আদালতে লড়বার জন্য উকিলের ব্যবস্থা করা, পুলিশ ঘেরাও করে তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া। তবে, প্রায় ক্ষেত্রে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র আবার ফেরত দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। ঘেরাওর সময় সচেতনভাবে পুলিশকে নাজেহাল করার কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে নেতারা হস্তক্ষেপ করতেন এবং কিছুক্ষণ আটক রাখার পর পুলিশদের নিরাপদে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো। অবশ্য, পুলিশ এবং কৃষকদের মধ্যে বেশ কিছু সশস্ত্র সংঘর্ষও হয়েছে। এ সংঘর্ষে আহত ও নিহত হয়েছে দু-পক্ষেই। তবে, এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে বলা যায় এগুলি ছিল সংগঠিত সংঘর্ষ।

জ. কৃষকেরা যেখানে আক্রমণ করেছে প্রায় সব ক্ষেত্রে সেখান থেকে জোতদাররা পালিয়ে ছিল। কিন্তু দ্রুত তারা বর্গাদার এবং তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছে আদালতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধান লুটের অভিযোগে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং যৌথ দরখাস্তের মাধ্যমে তারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস, ডি, ও, এম, এল, এ, এবং মন্ত্রীদের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাগুলিকে নিয়ে এসেছে নিজেদের পক্ষে, উদাহরণ স্বরূপ রংপুরে, তখন একটি সভার পর বেরুলো জঙ্গী মিছিল। ঘেরাও করা হলো জোতদারদের কিন্তু তাদের শরীর বা সম্পত্তির ওপর কোন হামলা হয়নি। প্রকাশ্যে তাদের নাজহালের কোন চেষ্টাও করা হয়নি। বরং আহ্বান জানানো হয়েছে নির্দিষ্ট কোন জোতদারকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বয়কট করার জন্য। এর পেছনে 'যুক্তি' ছিল, জোতদারের হাটুরে বিচার ও শাস্তি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করতে পারে।

ঝ. এমনকি পুলিশ যখন গুলি করতো (ঘটনা হতো এরকম-যখনই কৃষকদের কোন শক্তিশালি ঘাঁটিতে পুলিশ আসতো কোন কৃষক কর্মীকে গ্রেফতার করতে তখন হাতের কাছে যে দেশী অস্ত্র পাওয়া যেতো তা দিয়েই প্রতিরোধ করা হতো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং পুলিশ তখন গুলী চালাতো হত্যার জন্য) এবং তার ফলে কেউ নিহত হতো তখনও এর প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ

থাকতো মিছিল এবং প্রতিবাদের মধ্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে, এ ধরনের প্রতিবাদ সভা ও মিছিলকে অবৈধ ঘোষণা করা হতো এবং পুলিশ আবার গুলী চালিয়ে হত্যা করতো কৃষকদের।

ঞ. ঐ সময়, কখনও নির্দিষ্টভাবে কোন সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী তৈরী, ঘাঁটি স্থাপন বা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। যদিও ধরে নেওয়া হয়েছিল এটি হচ্ছে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন, কিন্তু কখনও, কোন সুনির্দিষ্ট আকারে কৃষক প্রতিরোধ চালাতে হবে তা সংগ্রামের কোন পর্যায়েই ঠিক করে দেওয়া হয়নি। এক পর্যায়ে, কোন কোন এলাকার কৃষকরা পার্টি থেকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দাবী করেছিল, তড়িঘড়ি কিছু ব্যবস্থার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। কিন্তু কখনও তা বাস্তবে রূপ পায়নি একারণে নয় যে পুলিশ তা জেনে ফেলেছিল বরং নেতাদের মূল পরিকল্পনায় এ বিষয়টি ছিল না।

সংক্ষেপে, তেভাগা আন্দোলন ছিল, না ঘরকা না ঘাটকা। এটা ঠিক যে তা সত্যাগ্রহের মত নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ ছিল না। অন্যদিকে তা ঘাঁটি এলাকা থেকে পরিকল্পিত কৃষক সংগঠনের সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ধ্রুপদী গেরিলা যুদ্ধও ছিল না। এমনকি জঙ্গী গণআন্দোলন যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হরতাল, হিংসাত্মক মিছিল, অসহযোগ, 'ঘেরাও' 'জ্বালাও', ক্ষমতার বিরাজমান কাঠামোর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির পঙ্গুকরণ এটি তাও ছিলনা। এক পর্যায়ে কিছু আক্রমণাত্মক উদ্যোগ (যেমন, 'খোলান ভাঙ্গা'), নেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারপরই গ্রহণ করা হয়েছে হয় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও পিছু হটা নয়ত অফলপ্রসূ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আক্রমনাত্মক প্রচেষ্টা (যেমন, সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে মুখোমুখী লড়াই)।

তেভাগার তুলনা রহিত প্রতিরোধের পেছনের কারণ আছে কয়েকটি। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধিকাংশ এবং স্থানীয় নেতৃত্বের একটি অংশের ভিত্তি ছিল শহরের মধ্যবিত্ত ও উঁচু শ্রেণীর কৃষক। এটি অবশ্য অযোগ্যতা নয়। কিন্তু যা সন্তোষজনক নয় তা' হলো উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের অধিকাংশের পক্ষে সর্বান্তকরণে গরীব মানুষের সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সাধারণ কৃষকের সঙ্গে, তাঁদের একাত্মতা চিহ্নিত করা যেতে পারে কৃষকদের জন্য উদার বুর্জোয়া সাহানভূতি হিসেবে। তাঁরা বস্তুগত ভাবে বিপ্লবী শ্রেণী গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের কাছে বিপ্লবের তত্ত্ব পেঁৗছে দেননি যার ফলে তাঁদের মধ্যে থেকে নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলো। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (সি পি আই) গঠিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে, এবং একুশ বছর পরে ১৯৪৬ সালে দেখা গেল সি পি আই এবং কিষাণ সভার কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভূমিহীন বা গরীব কৃষক থেকে একজন সদস্যও নেই। সংগঠনের এই

দুর্বলতা থেকে উত্থিত হয়েছিল আপোষ দোলাচল এবং অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার। এজন্য, বর্গাদার বিলের গেজেট বিজ্ঞপ্তির ফলেই কিষাণ সভার নেতারা সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়াবার যথেষ্ট অজুহাত খুঁজে পেয়েছিলেন। যদিও এই বিলের ঠিক পরেই তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলন হয়ে উঠেছিল তীব্র। একইভাবে, ১৯৪৮-এ তেভাগার মাত্র একবছরের মধ্যে, বাংলায় কিষাণ সভার কাউন্সিল অধিবেশনে সি পি আই নেতা পি, সি, যোশী, জমিদারী প্রথা বিলোপের ভিত্তি হিসেবে "ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য বাগ বৈদগ্ধ প্রয়োগ করেছিলেন। তেভাগার সময়, তেভাগা বিরোধী কিছু দলীয় নেতা বলেছিলেন, কৃষকরা বিপ্লবী শ্রেণী নয়, সুতরাং পার্টির উচিত কৃষকদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করা। বিপ্লবী শ্রেণীকে চেনায় তাঁদের অক্ষমতার ফলে, তাঁরা বিপ্লবী রাজনীতির গঠন প্রকৃতিটি বুঝতে চাননি। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এরকম যার কোনো আধাআধি পরিণতি ছিল না; হয় তেভাগা আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে হবে, নয়ত তাকে নিয়ে যেতে হবে তার যৌক্তিক পরিণতিতে যথা রাষ্ট্র যন্ত্রের সঙ্গে তার সংঘর্ষ তীব্রকরণ। মহাযুদ্ধের পর, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল তার সবচেয়ে দুর্বলতম অবস্থায়; এবং মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতিতে কঠোর আঘাত হানার জন্য তখনই ছিল যোগ্যতম সময়। বাস্তবে সে রকম কিছুই ঘটেনি। এ ধরনের নেতৃত্ব থেকে আসলে শুধু আশা করা যায় সুবিধাবাদ, দোলাচল, আপোষ ও তাৎক্ষণিকবাদী কাজ, প্রতিরোধের পরিকল্পিত রণকৌশল নয়।

দ্বিতীয়তঃ দৃষ্টিভংগীও ছিল খণ্ডিত, মূলতঃ এটি ছিল একটি অর্থনৈতিক সংগ্রাম; সংগঠকদের কর্মসূচীতে রাজনৈতিক ক্ষমতার কোন কথাই ছিল না। নগর এলাকার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে এর কোন সমন্বয় ছিল না, বিশেষ করে শ্রমজীবি ও ছাত্রদের সংগ্রামের সঙ্গে। এমনকি, গ্রামাঞ্চলেও সরাসরি আহ্বান সীমিত ছিল বর্গাদারদের মধ্যে। আন্দোলনে, মজুরী শ্রমিক, মধ্য ও নিম্নমধ্য কৃষকদের কোনো দাবী অন্তর্ভুক্ত হয় নি। জমিদারী নয়; জোতদারী ছিল তেভাগা সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তু। 'লাংগল যার জমি তার' এবং ন্যায্য মজুরীর দাবী ছিল না। তেভাগার আওতা থেকে বর্গাদারদের ঠিক ওপরের ও নীচের পর্যায়কে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাই একটি ব্যাপকভিত্তিক আঁতাতের অভাবে, কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ তীব্রতর হয়ে আরো কার্যকর পর্যায়ে উঠতে পারে নি। চণ্ড শক্তিতে আন্দোলন দমানোর সময় একজন বিশিষ্ট কিষাণ সভা নেতা দেরীতে হলেও বুঝেছিলেন, জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক

ভিত্তিক আন্দোলন। তৃতীয়তঃ তেভাগা শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের সমন্বয় করেনি। ঐ সময় উপমহাদেশ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছিল স্বাধীনতা অর্জনের দিকে। এর অর্থ ছিল, অন্তিমে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অযৌক্তিক সীমান্ত, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ অথবা, 'একজাতি তত্ত্ব' বা 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'। এই পরিস্থিতিতে শুধু শ্রেণীসংগ্রাম, তা ও যার আবেদন সীমাবদ্ধ, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিরোধের ভিত্তি হতে পারে না। অন্যদিকে সি পি আই যদি তখন ব্যাপক ভিত্তিক কৃষক সংগ্রামের সঙ্গে স্বাধীন বাংলার দাবী তুলতো (পাকিস্তান ও ভারতের বাইরে) তা হলে তা ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে একই সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদ, সামান্তবাদ ও মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতো।

বিপ্লবী তত্ত্ব সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান থাকলেও বর্গাদাররা ১৯৪৬ সালে যে কোন পর্যায় পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিল। তাদের কাছে জীবনের সব স্বপ্ন আর আশার প্রতীক ছিল তেভাগা কারণ তাদের বাস্তব জীবন ছিল দারিদ্র, লাঞ্ছনা এবং নিষ্ঠুর শোষণে ভরা। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট নরক তারা দেখেছিলেন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানতেন ব্যর্থ হলে জোতদারী প্রতিরোধ কি ভয়ংকর হবে। তা'ছাড়া রাজনৈতিক সচেতনতা আত্ম-অনুশীলনের বস্তু নয় যা কিছু আকর্ষণীয় সূত্র স্ত্রোতের মত মুখস্ত করলেই জন্মায় বরং তার জন্ম হয় বাস্তব বিপ্লবী কর্মপ্রয়াস থেকে। এবং এ অর্থে তেভাগা তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল বহুগুণ। ব্যাপারটি দুর্ভাগ্যজনক যে, এ রকম সম্ভাবনা ও বিকাশমান শ্রেণী সচেতনতা পিষে মেরেছিল নপুংসক এবং সুবিধাবাদী নেতৃত্ব। একদিকে, তেভাগার ব্যর্থতায় প্রতিফলিত হয়েছে কৃষক এবং জাতীয় প্রশ্নে তাদের আত্মসমর্পণ।

বাংলাদেশের পরবর্তীকালের কৃষক বিদ্রোহগুলির সঙ্গেও তেভাগার পার্থক্য সুস্পষ্ট। ষাটের দশকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে, বাংলাদেশে একটি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষক আন্দোলনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। এটা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল ১৯৬৯ সালের গণজাগরণে। এর বৈশিষ্ট্য ছিল, ঘেরাও, জ্বালাও, জঙ্গীসভা ও মিছিল। গণ আদালতের মাধ্যমে হাটুরে বিচার ও প্রশাসন স্থবিরকরণে। ১৯৬৯ সালে, শহরে এবং গ্রামীণ জাতীয় এবং শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে একটি সমন্বিত মিলন হয়েছিল। এই গণজাগরণ পতন ঘটিয়েছিল আইয়ুব খানের এবং শোষক শ্রেণীগুলোর মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। যাহোক, ১৯৬৯ সালের সে অন্বিষ্ট পরবর্তীকালের কৃষক আন্দোলন বাস্তবায়িত হয় নি। ১৯৬৯ এর পর্যায়ের পর, নকশালবাড়ী লাইনের প্রতি দেখা দিয়েছিল এক ধরনের মোহ, যা শ্রেণীর প্রশ্নকে আলাদা

করে দেখলো জাতীয় প্রশ্ন থেকে, এবং জঙ্গী গণআন্দোলনের বদলে গড়ে তুলেছিল 'ঘাঁটি এলাকা' এবং 'খতম'-এর মতো সশস্ত্র কার্যকলাপ। যার ফল হলো সে বিষয়ে সবাই এখন একমত যে, ব্যাপারটি ছিল এক কথায় বিপর্যয়। সুতরাং বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে ১৯৬৯ সালের মতো জঙ্গী গণ আন্দোলন, তেভাগার মতো আন্তরিকতাহীন সংগ্রাম বা খতমের নকশালবাড়ী পন্থা নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কৃষক সংগ্রামের সবচেয়ে অকার্যকর পন্থা বলে বাংলাদেশে প্রমাণিত হয়েছে।

শেষ বিশ্লেষণ সংগঠিত কৃষক প্রতিরোধকে শুধুমাত্র অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও আদর্শগত বাস্তবতা (যথা, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রেণী ভিত্তিক সহযোগিতা, রাষ্ট্র, বর্ণ, ধর্ম, প্রকৃতির শক্তি ও ইত্যাদি) বিবেচনা করলেই চলবেনা, তার সাথে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলিও গণ্য করতে হবে। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ—

(১) বাংলাদেশে পলিমৃত্তিকায় গঠিত অত্যন্ত ঘন বসতিপূর্ণ সমতলভূমি যেখানে কোন 'গভীরতা' নেই। আধুনিক যানবাহনগুলি যেরকম সহজে সর্বত্র যাতায়াত করতে পারে তা বিবেচনা করলে বাংলাদেশে 'ঘাঁটি গঠনের' ধ্রুপদী রণকৌশল যে অনুপযোগী তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

(২) বাংলাদেশের জনবহুল প্রতিবেশ শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক। তাই বর্ষাকালে শুধু যে একটি গ্রাম আরেকটি গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা নয়, বরং একটি বাড়ীও আরেকটি বাড়ী থেকে যোগাযোগহীন হয়ে থাকে। জলের সহজ-প্রাপ্যতার দরুণ দুষ্প্রাপ্য জলের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণকে ভিত্তি করে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তৃণমূল পর্যায়ে যেরকম শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশে সে রকম হয় নি।

(৩) দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী 'সীমান্তরূপী' অঞ্চলের দরুণ বাংলাদেশে বিদেশগত মানুষ ও চিন্তাধারার নিরবিছিন্ন প্রবাহ ঘটেছে। এর ফলে কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশে কার্যকর হতে পারেনি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ জনগণের মধ্যে প্রবল হয়ে রয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও নদীর ভাঙ্গনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিয়মিত শিকার। এ ধরনের প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা বাঙ্গালীর মনে যেমন আদৃষ্টবাদের জন্ম দিয়েছে তেমনি সমাজে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করেছে।

(৫) শুকনো আবহাওয়া ও যোগাযোগ এর সুবিধার জন্য বাংলাদেশে শীতকাল সবচেয়ে চমৎকার সময়। প্রধান ফসল আমন ধান এ সময় কাটা হয় বলে শীতকালে বছরের অন্য সময়ের তুলনায় খাদ্য শস্য সহজে মেলে। সুতরাং এসব কারণেই কৃষক অভ্যুত্থানসহ অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন শীতকালে ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে তেভাগা অথবা পরবর্তী সময়ের আরও সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলী সংগ্রামের রূপ ও রণকৌশল প্রণয়নকালে বিবেচনা করা হয়নি।

গ্রন্থ নির্দেশ

1. Bipin Chandra, *The Rise & Growth of Economic Nationalism in India*, New Delhi, 1966.
2. Rasul, A, *History of the Krishak Sabha* (in Bengali), Calcutta, 1971.
3. Choudhury, B. B., in *Socialism in India*, ed by Nanda, B. R., Delhi, 1972.
4. Roy, Suprakash, *Peasant Revolt and Democratic Struggle in India* (in Bengali), Calcutta, 1972.
5. Umar B., *Permanent Settlement and the Peasants of Bengal* (in Bengali), Dhaka, 1974.
6. Sen. S. K. *Agrarian Struggle in Bengal (1946-7)*, New Delhi, 1972.
7. Sen. S. K., *Peasant Movement in India*, New Delhi, 1982.
8. Dhanagare, D. N., 'Peasant Protest and Politics, The Tebhaga Movement in Bengal, (1946-7)', in the *Journal of Peasant Studies*, London, Vol. 3, No. 3, April 1976.
9. Sen, S., *In Village Bengal* (in Bengali), Dhaka, 1970.
10. K. Siddiqui, etal, 'Tebhaga Movement in Bengal (1946-7), An Assessment,' in *Studies in Rural History*, Dhaka, 1979.
11. Personal Communications with cadres and leaders of and researchers on Tebhaga.

অনুবাদ ঃ মুনতাসীর মামুন

মেসবাহ কামাল

নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ

১. প্রসঙ্গের উত্থাপন

নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উঠলেই তার সাথে অবশ্যম্ভাবিরূপে অন্য যে বিষয়টি এসে যায় সেটি হলো তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের নির্যাতন মূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়। বস্তুতঃ নাচোলের কৃষক অভ্যুত্থান সেই সময় সারা দেশের মানুষকে যতটা না আলোড়িত করতে পেরেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী আলোড়ন তুলেছিল ঐ এলাকার পুলিশ বাহিনীর পৈশাচিক নির্যাতনের বিবরণ। এই নির্যাতনের বিবরণ তৎকালে ক্ষমতায় আসীন মুসলিম লীগ সরকারের ফ্যাসিস্ট চরিত্রকে উন্মোচন করতে সাহায্য করেছিল এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর ঘটনা সহযোগে, তা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির পিছনে একটি পরোক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।

নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৯৪৯ সালের শেষভাগ এবং ১৯৫০ সালের গোড়ার সময়কালটা জুড়ে। এই বিদ্রোহের মূলশক্তি ছিলেন সাঁওতাল কৃষকেরা। রাজশাহী জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল এই কৃষক উত্থানের সংগঠক এবং সারাদেশে কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গের মত এই জেলার নেতৃবৃন্দও তখন, ১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস গৃহীত রণদীভে লাইন অনুযায়ী, 'উপ-মহাদেশে বিপ্লব অত্যাসন্ন' মনে করতেন এবং সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বর্তমান নিবন্ধে নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন পর্যায় সহ পুলিশ হত্যার প্রসঙ্গ, আন্দোলনের নেতৃত্ব, সরকারী নির্যাতন এবং আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ণ সহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধটির বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হচ্ছে মৌলিক তথ্যাবলীর বহুল ব্যবহার। টেপকৃত সাক্ষাৎকারের আকারে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও নাচোল পুলিশ হত্যা মামলা

সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র এই প্রথমবারের মত ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ক. প্রেক্ষাপট—১

নাচোল থানাটি প্রশাসনিকভাবে বরাবরই, চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের সাথে যুক্ত এবং ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্বে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ ছিল মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতাল পরগণা জেলায় যে সাঁওতালরা ১৮৫৫ সালে এক মহাবিদ্রোহে উচ্চকিত হয়েছিলেন[১] তারা বা তাদের উত্তর পুরুষরা বিভিন্ন শোষণ নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে জীবিকা সংগ্রহ ও শান্তিতে বসবাসের আশায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে। এদেরই একাংশ এসে বসতি গড়েছিলেন মালদহ জেলায়—বিশেষতঃ চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের নাচোল ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে। এদের সহযাত্রীদের অনেকেই বসতি স্থাপন করেছিলেন পাশের জেলা দিনাজপুর বা তার পাশের জেলা জলপাইগুড়ির বিভিন্ন জায়গায়।[২] কিন্তু যে শান্তির অন্বেষা ও জীবিকা সংগ্রহের তাগিদ থেকে তারা আদি বাসভূমি ছেড়ে এতদঞ্চলে এসে বসতি গড়েছিলেন, দেখা গেল যে, সে আশা মোটেই পূরণ হলো না। কেননা তারা এসে পড়লেন উত্তর বঙ্গের জোতদারদের হাতে। বর্গাদার চাষী হিসেবে তাদেরকে নিজেরা সমস্ত খরচ যুগিয়ে, ফসল ফলিয়ে, তার অর্ধেক নিজ খরচে দিয়ে আসতে হতো জোতদারদের গোলায়। এছাড়া ছিল বিভিন্ন ধরনের আবওয়াব ও বেগার। সর্বোপরি ছিল যে কোন সময় জমি থেকে উচ্ছেদ হবার ভয়।[৩] ফলে দুঃখ তাদের কাছ ছাড়া হলো না।

কিন্তু তাদের সংকটকে আরো ঘণিভূত করলো ১৯২৯ সালের বিশ্বজোড়া মহামন্দা, ভারতেও তার ধাক্কা এসে লাগলো—ফসলের দাম গেল অনেক কমে। জোতদাররা চাইলো এই সংকটের বোঝা বর্গাদারদের মাথার উপর চাপিয়ে দিতে। তারা বর্গাচাষীদের কাছে দাবি করলো ফসলের তিনভাগের দু'ভাগ, যে বর্গাদার এটা মানতে চাইলোনা তাকেই উচ্ছেদ করা হতে লাগলো। ফলে চারিদিকে শুরু হলো জোতদারদের বিরুদ্ধে বর্গাচাষীদের সংগ্রাম। মালদহ ও দিনাজপুরের সাঁওতাল কৃষকরাও আন্দোলনে সক্রিয় হলেন। আবার বেজে উঠলো সাঁওতালদের বিদ্রোহের মাদল। জিতু বোটকা ও সামুর নেতৃত্বে ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে সংগঠিত হলেন মালদহ ও দিনাজপুর জেলার প্রায় দুহাজার সাঁওতাল। শুরু হলো জোতদারদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম। তাদের আক্রমণের মুখে বহু জোত-দারের বাড়ি ও ধানের গোলা ধ্বংস হয়ে গেল। পরবর্তীতে এরা

দুর্গ হিসেবে বেছে নেন পান্ডুয়া অঞ্চলের আদিনা মসজিদকে। কিন্তু বিশেষ অঞ্চল ও বিশেষ জন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এই আন্দোলনকে দমন করা সরকারের পক্ষে তেমন কঠিন হয়নি। ১৯৩২ সালের ১৪ই নভেম্বর পুলিশবাহিনী আদিনা মসজিদকে ঘিরে ফেলে। দীর্ঘ সংঘর্ষের পর ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় বিদ্রোহের নায়ক জিতু ও সামুকে বন্দী করা হয়—এবং কোন রকম বিচারের অপেক্ষা না করেই তাদেরকে গুলী করে হত্যা করা হয়।[৪] জিতু ও সামুর নেতৃত্বে ১৯৩২ সালের এই বিদ্রোহ জোতদার-দের অযৌক্তিক খাজনা বৃদ্ধি ও অত্যাচারকে প্রতিহত করতে পারে নি সত্য কিন্তু উত্তর বঙ্গের সাঁওতালদের মনে রেখে যায় বিদ্রোহের এক উজ্জ্বল স্মৃতি।

খ. প্রেক্ষাপট—২

চাঁপাই নওয়াবগঞ্জে কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎপরতা প্রথম কখন শুরু হয় সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কোন কিছু জানা যায় না। তবে শেখ আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে ১৯৩০ সালে কম্যু-নিষ্টরা নওয়াবগঞ্জের কোন কোন এলাকায় তৎপর ছিলেন। কৃষ্ণ গোবিন্দপুর হাইস্কুলের শিক্ষক কামার পাড়ার ফণিভূষণ মাষ্টার, শিবগঞ্জের অজয় ঘোষ, কৃষ্ণ গোবিন্দপুর মাইনর স্কুলের শিক্ষক, রামচন্দ্রপুরের রমেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ছিলেন এ ব্যাপারে অগ্রণী।[৫] তবে এদের সাথে ১৯৩২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহীদের কোনরকম যোগাযোগ ছিল কিনা তা জানা যায়নি।

১৯৩৭-৩৮ সাল নাগাদ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবিকে সামনে নিয়ে কম্যুনিষ্টরা নাচোল পার্শ্ববর্তী রামচন্দ্রপুর, শিবগঞ্জ এলাকায় ভাল একটি অবস্থান গড়ে তোলেন। নওয়াবগঞ্জের পার্টি-সেক্রেটারী ছিলেন শিবগঞ্জের মানিক ঝাঁও। পার্টির অপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন অজয় ঘোষ, মানিক ঝাঁও এলাকায় অনুপস্থিত থাকলে তার দায়িত্ব তখন অজয় ঘোষই পালন করতেন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হিসেবে তখন বেরিয়ে এসেছেন শেখ আজাহার হোসেন, পাতানু, নকুল কর্মকার, ওয়াজেদ মোড়ল প্রমুখ। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবিকে সামনে রেখে তারা তখন বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সভা করেছেন, মিছিল করেছেন। এমনকি এক পর্যায়ে তারা প্রায় তিন হাজার পুরুষ ও তিন চারশ নারীকে একত্রে মিছিলে সামিল করতে সমর্থ হয়েছেন। অবশ্য এরপরে নারীদের মিছিলে অংশ গ্রহণের প্রসঙ্গ নিয়ে সমাজপতিরা বিরূপ মন্তব্য করতে থাকলে তাদেরকে আর মিছিলে নামানো হয়নি, তবে জমিদার বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে শুরু হয় পুলিশী তৎপরতা—পাতানু, নকুল কর্মকার, ওয়াজেদ মোড়ল প্রমুখ গ্রেফতার হন। শেখ আজাহারসহ অনেকেই আধা গোপনে

আলি। তিনি ছিলেন মুসলমান। অন্যদিকে এলাকার বেশীর ভাগ জোতদার-জমিদাররা ছিলেন হিন্দু। ফলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হিসেবে চিহ্নিত করে আন্দোলনটিকে সহজেই দমিয়ে ফেলা হয়।[১৫]

১৯২৯ সালের সর্বগ্রাসী মহামন্দার আঘাত যে বাংলার কৃষক কুলের উপরও এসে পড়েছিল এবং উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হ্রাসের ফলে যে কৃষক অসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কৃষকদের পক্ষে তখন আর খাজনা দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আর খাজনার অনাদায়ে জমিদারী ব্যবস্থা উপক্রম হয়েছিল ভেঙ্গে পড়ার। ফলে ক্রমবর্ধমান কৃষক অসন্তোষের মুখে বৃটিশ রাজ ভূমি সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়। ফলে ১৯৩৮ সালের ৫ই নভেম্বর ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করে সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশ করার জন্য ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করে—এই কমিশন পরবর্তীতে ফ্লাউড কমিশন হিসেবে পরিচিত হয়।[১৬] কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত প্রাদেশিক কৃষক সভা ১৯৩৯ সালের ২৬/২৭ শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সভায় খাজনা অর্ধেক কমানোর পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে—ভাগ চাষীদের জন্য জমিতে দখল স্বত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ফসলের কমপক্ষে দশ আনা ভাগ লাভের অধিকার স্বীকার করার জন্য তারা দাবি জানায়।[১৭] ঐ দশ আনা অর্থাৎ ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ লাভের দাবি থেকেই উদ্ভূত হয় তেভাগা আন্দোলন। এ ছাড়া প্রাদেশিক কৃষক সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ দাবি করে কমিশনের কাছে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেছিল।[১৮]

কমিশন দুই খণ্ডে তার রিপোর্ট দাখিল করে ১৯৪০ সালের ২১শে মার্চে। এতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে কৃষক সভার দাবীকে মেনে নিয়ে তা উচ্ছেদের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয় এবং সমস্ত জমিদারী ও মধ্য স্বত্বভোগীদের স্বত্বকে কিনে নিয়ে রাইয়তওয়ারী প্রথা প্রবর্তনের জন্য সরকারকে সুপারিশ করা হয়। কমিশন বর্গাদারদের সরাসরি সরকারের প্রজা হিসেবে গণ্য করার পক্ষে মত প্রকাশ করে এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ লাভের অধিকারকে ন্যায্য বলে স্বীকার করে।[১৯]

ভূমি রাজস্ব কমিশন সরকারের নিকট তার রিপোর্ট পেশের আড়াই মাসের মধ্যেই, ৮–৯ জুন ১৯৪০ তারিখে, যশোরের কেশবপুর থানার পাঁজিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত কৃষক সভার চতুর্থ প্রাদেশিক সম্মেলনে ঐ কমিশনের রিপোর্ট আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পাবার জন্য

সংঘবদ্ধ হয়ে অনতিবিলম্বে প্রবল সংগ্রাম শুরু করার ডাক দেয়া হয়।[২০]

কৃষক সভার প্রাদেশিক সম্মেলনের ঐ ডাক অনুযায়ী তখন সংগঠনের দিক দিয়ে অগ্রসর কোন কোন জেলায়, যেমন—দিনাজপুরে, তেভাগার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তবে এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কাজ শুরু করা সম্ভবপর হয় জলপাইগুড়িতে।[২১] মালদহ জেলায় ঐ ধরনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। যাহোক, তেভাগার পক্ষে 'আন্দোলন' গড়ে তোলার বিষয়টি তখন খুব একটা এগোতে পারেনি।

তেভাগার জন্য আন্দোলন গড়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মহাদুর্ভিক্ষের উত্তরকালে—১৯৪৬-৪৭ সালে। আর এ ব্যাপারে দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ির এবং ময়মনসিংহ ও যশোর-খুলনার সংগঠকরা ছিলেন বিশেষভাবে অগ্রণী। এ ছাড়া আরো যে সমস্ত জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহ।[২২] তবে মালদহ জেলার আন্দোলন ১৯৪৬-৪৭ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়নি। ঐ জেলার সীমানাভুক্ত এলাকায় আন্দোলন মূলতঃ গড়ে ওঠে ১৯৪৯-৫০ সালে নাচোল এলাকায় এবং দেশবিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হবার সুবাদে নাচোল তখন রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ নাচোলের তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল এমন একটি সময়ে যখন তেভাগা দাবির স্বপক্ষে প্রায় সারাটা বাংলায় দানা বেধে ওঠা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুটো কথা এখানে আরো নির্দিষ্ট ভাবে বলা দরকার—

(১) নাচোলের আন্দোলন ছিল ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রায় সারাটা প্রদেশব্যাপী গড়ে ওঠা ভাগ চাষীদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট একটি আন্দোলন।

(২) নাচোলের উদ্যোগটি ছিল মূলতঃ একটি বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ। ১৯৪৬-৪৭ সালের ব্যাপক ভিত্তিক তেভাগা আন্দোলন তখন ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাছাড়া ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপক উত্থানের মধ্য দিয়ে দেশবিভাগ সাধিত হওয়ায় কম্যুনিষ্টরা তখন সাধারণভাবে এদেশে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তদুপরি মূলতঃ সংখ্যালঘু জাতিস্বত্বাগুলোর মধ্যে কম্যুনিষ্টদের যে ভিত্তি ছিল তার উপর নির্ভর করে নাচোল ও ময়মনসিংহে আন্দোলনে নামার পক্ষে পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে ঐ উদ্যোগকে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ না বলে উপায় নেই।

৩. সংগঠন ও আন্দোলনের বিকাশ

নাচোলে সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যারা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন রমেন্দ্রনাথ মিত্র ওরফে হাবু বাবু, শেখ আজাহার হোসেন ওরফে পল্টু, অনিমেষ লাহিড়ী, বৃন্দাবন সাহা, ইলা মিত্র প্রমুখ।[২৩] সাঁওতালদের মধ্যে থেকে যে নামটি সবার আগে এবং বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করতে হয় সে নামটি হলো মাতলা মাঝি। তিনি ছিলেন খানিকটা মোড়ল ধরনের—সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে তার প্রভাব ছিল ব্যাপক। নিজের জমি ছিল ২৫/৩০ বিঘা, এ ছাড়াও কিছু জমি আধিতে চাষ করতেন। এলাকায় মিটিং আয়োজন করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। সাঁওতালী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সাধারণ সাঁওতাল কৃষকদের কাছে মার্কসবাদ ও কম্যুনিস্ট পার্টির বিভিন্ন উদ্যোগকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে তিনি পালন করতেন একটি বিশেষ ভূমিকা। চণ্ডিপুর গ্রামে তার বাড়িটিই ছিল কম্যুনিস্ট-দের যোগাযোগের প্রধানতম কেন্দ্র এবং এক পর্যায়ে তিনি তার বাড়িটিকে পার্টির কাজে সর্বতোভাবে 'ক্যাম্প' হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি পার্টির স্থানীয় কমিটির সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন।[২৪] এছাড়া অন্যান্য সাঁওতাল কর্মীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন মংলা মাঝি, টুটু হেমরম, চিতোর মাঝি, সাগারাম মাঝি, শুক্র মাডাং, চুতার মাঝি, সুখ বিলাস বর্মণ, ভগিরথ কর্মকার প্রমুখ।[২৫] দেশবিভাগের পূর্ববর্তীকালেই নাচোল থানার অধিকাংশ এলাকাতে কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তবে মূল এলাকাগুলো ছিল চণ্ডীপুর, কৃষ্টপুর কেন্দুয়া, ঘাসুড়া, শিবনগর, মান্দা, গোলা পাড়া, মল্লিকপুর, কালুপুর, ও মহীপুর।[২৬]

মূল আন্দোলনে যাবার আগে প্রচার আন্দোলনের কাজ চলেছিল দীর্ঘদিন। সুপরিকল্পিত উদ্যোগের মাধ্যমে, প্রথম ভাগে জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ইজারাদারদের বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করা হয়েছিল এবং পরবর্তী ভাগে তোলা হয়েছিল তেভাগার দাবি। এ ব্যাপারে ত্রিশ দশকের গোড়ার দিক থেকে কাজ শুরু করেছেন এমন সংগঠকদের ভূমিকা তো ছিলই, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল ইলা মিত্রের ভূমিকা। ইলা মিত্র কলকাতা শহরের শিক্ষিতা রমণী, তার উপরে জোতদারদের স্ত্রী; আবার জোতদারী প্রথা উচ্ছেদ করার সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, দিনে শিক্ষকতা করছেন, বিকেলে এবং রাত্রে কৃষকদের সাথে আলোচনা করছেন, সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়া পড়ে সর্বত্র; সাধারণ মানুষ আবেগ ও আশায় উদ্বেল হলেন, ত্রাসে আতঙ্কিত হলো স্থিতাবস্থার

পক্ষেকার শক্তি।[২৭] ঐ সময়—জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ইজারাদারদের বিরুদ্ধে বড় আকারের একটি গণজমায়েতের আয়োজন করা হয় কৃষ্ণ গোবিন্দপুর হাটে। জমায়েতে শ্লোগান ওঠে—'জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর,' 'লাঙ্গল যার জমি তার', 'ইজারাদারী বন্ধ কর'—ইত্যাদি। নারী পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণে বের করা হয় একটি বিরাট মিছিল; প্রায় শ' তিনেক নারী ঐ মিছিলে অংশ গ্রহন করেন।[২৮]

কম্যুনিষ্টদের ক্রমবর্ধমান শক্তির সংবাদ পেয়ে প্রশাসনযন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রামে পুলিশ আসতে শুরু করে, গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করে গ্রামগুলোর উপর। ফলে আন্দোলনের সংগঠকদের সাবধান হবার প্রয়োজন হয়। তবে জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে ওঠায় নেতৃবৃন্দকে আত্মগোপন করে চলাফেরা করতে বা তৎপরতা অব্যাহত রাখতে তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

আজাহার হোসেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে সংঠগনের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে পরখ করে নেয়ার পর পার্টি বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ক্ষেত মজুরদেরকেও সংগঠিত করতে হবে। ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করবার উদ্যোগটি সে সময়ের জন্য নিঃসন্দেহে একটি অগ্রণী উদ্যোগ ছিল, কেননা ক্ষেত মজুরদের আনুপাতিক সংখ্যা তখন ছিল অনেক কম। যাহোক, এ ব্যাপারে আজাহার হোসেনের বক্তব্য যে সঠিক তার প্রমাণ আমরা পাই নাচোল পুলিশ হত্যা মামলায় পুলিশ কর্তৃক সংগৃহীত আলামতের তালিকা থেকে। পুলিশ সেখানে অন্যান্য আলামতের সাথে 'রাজশাহী জেলা ক্ষেতমজুর সমিতি'র চাঁদা আদায়ের একটি রশিদ বইও খুঁজে পায়।[২৯]

কৃষক সভা তথা কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে তখন কৃষকদেরকে সংগঠিত করে তোলর অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শেখানো হতো পুলিশের মুখোমুখি হলে তাদের মনে কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক না করেই সরে পড়ার সম্ভাব্য উপায়গুলো কি কি, অথবা কোন বাড়িতে অবস্থানরত কোন কমরেডকে সম্ভাব্য পুলিশী আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পথগুলি কি কি হতে পারে ইত্যাদি। পরবর্তী পর্যায়ে শেখানো হতো দক্ষতার সাথে তীর চালানোর পদ্ধতি। এ ছাড়া উদ্যমী কৃষকদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং সরকারী বাহিনী সমূহের অনুকরণে তাদের মার্চ করার প্রশিক্ষণও দেয়া হতো। আর এ ব্যাপারটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন আজাহার হোসেন।[৩০] স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চন্ডীপুরের হরমা মাঝি, তারাচাঁদ,

ভগিরথ ও মাতলা মাঝি, পলাশ বন্দরের হড়েক ও ঝড়ু, নাপিত পাড়ার উদয় ও চুরকা, কেন্দুয়ার সোনা ও চুনু, রায়তারার মারাঙ্গ, বিষ-পুকুরের জয়চাদ ও মেথু, জগদলের ডুলু, ধরমশ্যামপুরের বেনীরাম ও বিষ্ণু রায়, তেলাঙ্গা পাড়ার সংকর প্রমুখ।[৩১] কম্যুনিষ্ট ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত মাতলা মাঝির বাড়িটি পাহারা দেয়ার জন্য প্রত্যেক রাত্রে এলাকার প্রতিটি গ্রাম থেকে দুজন করে স্বেচ্ছাসেবক আসতেন এবং সমস্ত রাত পাহারা দিতেন। সাধারণভাবে বন্দুক চালানোর ট্রেনিং তখন দেয়া হয়নি, তবে সংগঠনের এখতিয়ারে গোটাকতক বন্দুক ছিল। রমেন মিত্র ও ন'ওগার রামকান ঝিগড়ার অনিমেশ লাহিড়ী ছিলেন সামন্ত পরিবারের সন্তান এবং তাদের পারিবারিক বন্দুকগুলোকেও কখনও কখনও পার্টির কাজে ব্যবহারের জন্য আনা হতো।[৩২]

শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রায়োজনে বা অন্য কোন কারণে পার্টির বন্ধুদেরকে একত্রিত করার কাজে নাচোল এলাকায় একটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োগ ঐ সময় ঘটানো হয়েছিল। গাঁয়ের সীমানায় সবচেয়ে উঁচু যে তালগাছ, সেই তাল গাছের মাথায় বাঁধা হতো একটি বিরাট লম্বা বাঁশ। আর একত্রিত হবার নির্দেশের স্মারক হিসেবে ঐ বাঁশের আগায় উড়িয়ে দেয়া হতো কম্যুনিস্ট পার্টির লাল পতাকা। ঐ পতাকা যখনই উড়তো তখন আশে পাশের পাঁচ/ছ' মাইল এলাকার মানুষ বুঝে নিতেন যে পার্টি তাদের ডাক দিয়েছে। আর লাল পতাকা উড়ার সাথে সাথে সাঁওতাল পল্লীতে বেজে উঠতো মাদলের দ্রাম-দ্রাম, দ্রিম-দ্রিম শব্দ। ঐ শব্দের তরঙ্গ সংকেত ধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়তো এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়।[৩৩]

তেভাগা দাবী উত্থাপনের একেবারে গোড়াতে, প্রচার আন্দোলনের পর্যায়ে, নাচোল, শিবগঞ্জ ও গোদাবাড়ীর বিভিন্ন এলাকায় ঘরোয়া সভা, জনসভা, গণজমায়েত বা পথসভার আয়োজন করা হয়। ছোট খাট অসংখ্য মিছিলের পাশাপাশি সংগঠিত করা হয় বড় বড় বেশ কতক মিছিল। বিশেষতঃ নাচোল এলাকায় ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে যখন সুদীর্ঘ মিছিলগুলো সম্মুখভাগে এগোত—তখন অনেক সময় ট্রেন দাড়িয়ে পড়তো, আর যাত্রীরা অবাক হয়ে বা উৎসাহভরে তা প্রত্যক্ষ করতেন।[৩৪]

৪. সাত আড়ি জিন ও তেভাগার দাবি

ঘরোয়া বৈঠক, জনসভা, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নির্যাতনকে প্রতিরোধ করার একটি মানসিক প্রস্তুতি যখন গড়ে উঠে সেরকম একটি সময়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা করেন। দাবি উত্থাপন করা

হয় 'সাত আড়ি জিন' ও ফসলের তেভাগার,[৩৫] 'সাত আড়ি' কথাটি আঞ্চলিক ভাবে ব্যবহৃত বিধায় তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিষয়টি ধান কাটা ও মাড়ানোর সাথে সম্পর্কিত। বরেন্দ্র এলাকায় প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী বিশ আড়ি (কাঠা/ধামা) ধান কাটা ও মাড়ানোর জন্য জমিতে চাষাবাদ করেছেন যে কৃষক অথবা ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কেনে দিনমজুর পেতেন তিন আড়ি ধান। কৃষক সভা তথা কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে ঐ হারকে তিন থেকে বাড়িয়ে সাত আড়ি করতে হবে। তাদের এই দাবি অযৌক্তিক ছিলনা। কেননা একেতো বরেন্দ্র এলাকায় কৃষককে তখন উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুভাগই ভূস্বামীকে দিতে হতো—উপরন্তু ভূস্বামী ফসল উৎপাদনের কোন খরচও বহন করতেন না। সর্বোপরি উত্তর বঙ্গের কৃষিব্যবস্থায় সামন্ত প্রভাব অত্যন্ত জেঁকে বসে থাকায় সেখানে প্রচুর জমি কতিপয়ের হাতে সন্নিবেশিত হয়েছিল। অর্থাৎ ঐ এলাকার জোতদাররা ছিলেন বড় বড় জোতের অধিকারী,—একেকজন জোতদার বা জমিদার, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনভাবে অংশ গ্রহণ না করেই (এমনকি কোন কোন স্থানের জোতদাররা যে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন তা পর্যন্ত না করেই) হাজার হাজার মণ বা নিদেন পক্ষে শত শত মণ ধান লাভ করতেন বছরে। কাজেই নীতিগত প্রশ্নের বিভিন্ন বিষয়কে বাদ দিলেও কেবল এসব বিবেচনা থেকেই ক্ষুদ্র বর্গাচাষীরা বা ধান কাটা ও মাড়ানোর কাজে নিযুক্তি-প্রাপ্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ঐ দাবিকে কোন ভাবেই অসংগত বলা যায় না। কৃষক সভা তথা কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক উথাপিত ঐ দাবি যে এলাকায় কৃষকরা খুব আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে-ছিলেন তার প্রমাণ এই যে বিষয়টি স্থানীয় লোকগীতির মধ্যে স্থান করে নেয়। এতদসংক্রান্ত একটি লোক গীতির খানিকটা অংশ ছিল নিম্নরূপ।[৩৬]

"লীলা মৈত্র নারী
আইন করলো জারী
আধি জমি তেকুটি ভাগ
জিন হলো সাত আড়িরে ভাই
জিন হলো সাত আড়ি।"

১৯৪৯ সালের শেষ ভাগ ও ৫০ সালের প্রথম ভাগে যে উপরোক্ত দুটি দাবিকে কেন্দ্র করে কম্যুনিষ্টদের আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ম্যাজিষ্ট্রেট আহমেদ মিয়া বর্ণিত পুলিস মার্ডার কেস এর prosecution story থেকে। তিনি লেখেন—[৩৭]

"In the month of December 1949 and in the beginning

of 1950 there were intense communist activities in the villages of Ghasura, Chandipur, Kendua, Rautara, Jagdal, Dharol, Shyampura, Napitpara and other neighbouring areas within Nachol P. S. ... the communists preached their doctrines among the village people often by holding conferences and meetings here and there...They in their preaching encouraged the looting of the properties of big land holders and action of the tebhaga. They also told people that Sat-ari-jin should be demanded... Cultivators were asked to stop payment of rents to the landlords and not to obey the authorities and administrating law & order. In other words, the communists preached open revolt against the existing social order of things."

ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ মিয়া তার Prosecution Story-র অন্য এক জায়গায় লিখেছেন যে, ঐ সময় ধান লুটের অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। পুলিশ হত্যা মামলার পূর্বে উল্লিখিত চার্জশীটেও উল্লেখ করা হয় যে, কম্যুনিস্ট পার্টি সাঁওতালদেরকে এই মর্মে উৎসাহিত করেছে যে, তারা যেন মহাজনদের গোলা থেকে ধান লুট করে নিয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী ধান লুটের বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। কিন্তু এসব ঘটনা পুলিশকে অবহিত করলে তার শাস্তি হিসেবে আবার কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীদের কাছে জরিমানা দিতে হতো। ঐ চার্জশীটেই আরো উল্লেখ করা হয় যে ধান লুট ও জরিমানা বিষয়ক বেশ কয়েকটি কেস ৩/১২/৪৯, ১/১/৫০, ২/১/৫০, ৫/১/৫০, ৬/১/৫০, ৭/১/৫০ ও ৮/১/৫০, তারিখে নাচোল থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়। ইলা মিত্রের পূর্ব উল্লিখিত স্বীকারোক্তিমূলক বলে কথিত স্টেটমেন্ট থেকে জানা যায় যে, পুলিশে খবর দেয়ার অপরাধে যেসুরা গ্রামের ঝড়ু, বিপন ও বাসুকে এবং নিলামপুরের বাদিন মণ্ডলকে বিভিন্ন অংকের টাকা জরিমানা করা হয়—এবং তেভাগা ও সাত আড়ি জিন মেনে না নেয়ার জন্য রাঙ্গা মিঞা, চরণ মাঝি ও এছান মিঞার খোলানের ধান লুট করা হয়। এ ছাড়া সংগঠিত কৃষকদের শক্তিতে ভীত ধবন্দ শ্যামপুরের জোতদারদের কাছ থেকে তেভাগা মেনে নেয়ার মর্মে লিখিত Statement নিয়ে নেয়া হয়। আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে মহীপুরের জমিদাররা প্রথমে ফসলের তেভাগা ব্যবস্থা মানতে রাজি হয়নি এবং কৃষকদের বন্দুক দেখিয়ে বশ করতে চেষ্টা করছে। অবশ্য শেষাবধি আজাহার হোসেন, সুখবিলাস, ভগীরথ, সন্তোষ কর্মকার প্রমুখের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বর্গাদাররা তাদের কাছ থেকে ফসলের

দুই তৃতীয়াংশ ঠিকই আদায় করেছেন। অবশ্য চার্জশীটে বর্ণিত 'গোলা থেকে ধান লুট' অথবা ইলা মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত বলে কথিত স্বীকারোক্তি মূলক Statement এর ভাষ্য অনুযায়ী রাঙ্গা মিয়া, চরণ মাঝি ও এছান মিঞার 'খোলানের ধান' লুট করার যে বিবরণ আমরা পাই তার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কেননা এই নিবন্ধ লেখার প্রয়োজনে যে সমস্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কেউ 'গোলা' বা 'খোলানের' ধান লুট হবার কথা জানাননি। আজাহার হোসেন সাক্ষৎকারের এক পর্যায়ে বলেছেন যে সে সময় কামাতে (খোলানে) ধান তোলার সময় ভূস্বামীকে ঠিকই খবর দেয়া হতো। তারপর ভূস্বামী উপস্থিত হলে তার সামনেই অথবা উপস্থিত না হলে তার অনুপস্থিতিতেই ধান তিনভাগ করে দুভাগ কৃষকরা রেখে দিতেন, বাকি এক ভাগ গরুর গাড়ীতে করে পাঠিয়ে দেয়া হতো ভূস্বামীর বাড়ীতে। এমনও হতে পারে যে ঐ রকম কোন ঘটনাকে ধান লুটের ঘটনা হিসেবে ভূস্বামী নামাঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন। ইলা মিত্রের প্রদত্ত বলে কথিত পূর্বে উল্লিখিত Statement টি থেকে জানা যায় যে, ৫/১/৫০ তারিখে সকাল বেলা তিনি এই মর্মে এক সংবাদ পান যে জগদল গ্রামের জনক হিন্দুস্থানবাসীর (ভারতে চলে গেছেন এমন) ২০ মণ ধান পুলিশ আটক করতে আসছে। এই সংবাদ পেয়ে অনিমেষ লাহিড়ী সেখানে যান এবং গাড়ি করে ঐ ধান মাতলা মাঝির বাড়ীতে নিয়ে আসেন, অর্থাৎ ঐ ধান পার্টির ক্যাম্পে আনা হয়, দিনাজপুরের ক্ষেত্রে পার্টির নেতৃত্বে ধর্ম গোলা স্থাপনের উদাহরণ আমরা দেখেছি। এমনও হবার সম্ভাবনা আছে যে সরকারী ভাষ্যের 'লুট' কথাটির মধ্যে এই ধরনের ঘটনাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যাহোক, নাচোলের আন্দোলন একটি সংগঠিত রূপ ধারন করায় এবং এতদিন ধরে প্রচলিত বন্টন ব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলার উপক্রম করায় জমিদার জোতদাররা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং আন্দোলনকে দমন করার স্বার্থে পুলিশের শরণাপন্ন হলেন। ফলে তৎপর হয়ে উঠলো পুলিশ। ইলা মিত্রের প্রদত্ত পূর্বে উল্লিখিত Statement টি থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৯ সালের মে মাসের গোড়ার দিক থেকেই পুলিশ তৎপর ছিল। আন্দোলন সংগঠনে যারা নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিস বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে হামলা শুরু করে। সন্ধান না পেলেই চলতো সাধারণ কৃষকদের উপর নির্যাতন। তবে 'সালামী' পেলেই পুলিশ সে দিনের মত গ্রাম ছেড়ে চলে যেত অর্থাৎ শুরু হয়েছিল পুলিশের মাধ্যমে আর এক নতুন ধরনের শোষণ।[৩৮] ক্রমাগত ঐ অত্যাচারে মানুষ আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, ফলে শ্লোগান উঠলো 'দালালকে হালাল

কর', প্রস্তুতি শুরু হলো পুলিশকে প্রতিরোধের।[৩৯] তাছাড়া পার্টির পক্ষ থেকে নাচোলকে মুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়ে গেছে।[৪০] এরকম একটি প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয় পুলিশ হত্যার ঘটনা যা এলাকায় ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন ডেকে আনে, এবং পরিণতিতে প্রায় বারো বছরের শ্রম দিয়ে গড়া একটি এলাকার সংগঠন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

৫. পুলিশ হত্যা ও পরবর্তী নির্যাতন প্রসংগ

৫/১/৫০ তারিখে সকাল প্রায় নয়টার দিকে নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা একটি গরুর গাড়ীতে করে তিনজন কনষ্টেবল সহ ঘাসুরা গ্রামে উপস্থিত হন এবং জনৈক অক্ষয় পণ্ডিতের খোলানের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পান যে দুজন কৃষক, বাদান ও ফেলু, ধান সরাচ্ছে।[৪১] পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঐ দুজনকে গ্রেফতার করে এবং তাদেরকে সহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে ঘাসুরা প্রাইমারী স্কুলে উপস্থিত হয় এবং উৎপাদিত ফসলের অবৈধ ভাগাভাগির বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে।[৪২] গ্রামে পুলিশের ঐ আগমন এবং কতিপয় কৃষককে স্কুলে আটক করার সংবাদ আশে পাশে ছড়িয়ে যায়, ফলে বিপদ সংকেতের স্মারক হিসেবে গ্রামের সীমানাবর্তী তাল গাছের মাথায় টানানো পার্টির লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয় এবং সাঁওতালী নাকাড়া বেজে ওঠে। ফলে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় চার পাঁচ হাজার নারী-পুরুষ তীর-ধনুক, লাঠি-সোটা নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত হন। ক্রুদ্ধ কৃষকদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পুলিশ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং গুলী চালায়। ফলে একজন সাঁওতাল কৃষক অকুস্থলেই নিহত হন।[৪৩] এরপর জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং দারোগা সহ পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেন। শুরু হয় গণপিটুনী এবং এক পর্যায়ে দারোগা সহ সব ক'জন পুলিশই নিহত হন। নিহত দারোগার নাম ছিল তফিজউদ্দিন মোল্লা এবং কনষ্টেবলরা ছিলেন শাহাদত আলম, নওয়াজেস আলী ও তপেশ চন্দ্র আচার্য।[৪৪] এদের মৃত দেহকে পরবর্তীতে মরা পুকুর ও শ্যামপুর নামক দুটি স্থানে মাটির নিচে পুতে ফেলা হয়।[৪৫] এ ছাড়া 'পুলিশ ডেকে এনেছে' সন্দেহে কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ খাদ্য বিভাগের 'প্রকিউরমেন্ট' সাব-ইন্সপেক্টর আফজাল হোসেন ও পরিমাপক সফল খানকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদেরকে জনৈক সাঁওতালের ঘরে আটক রাখে। মাটির ঘরের অশক্ত জানালা কোন ভাবে ভেঙ্গে এরা রাতের বেলা পালিয়ে যান এবং কোন ক্রমে প্রাণ রক্ষা করেন।[৪৬]

দারোগা ও পুলিশদের যখন আঘাত ও হত্যা করা হয় তখন দারোগাকে

বহনকারী গো-শকটের চালক লালনাথ কর্মকার প্রাণ ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। তিনিই পরবর্তীতে থানায় যেয়ে খবর দেন। থানা থেকে সাথে সাথে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ ও রাজশাহীতে খবর পাঠানো হয়। অনতিবিলম্বে নাচোলে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ ও আনসার পাঠানো হয়। এরা অপরাধী নির্ধারণ বা কোনরকম বিচারের আদৌ অপেক্ষা না করেই বেপরোয়াভাবে গুলী বর্ষণ করতে থাকে, গোটা এলাকায় প্রতিটি কৃষকবাড়ীর মধ্যে ঢুকে নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলকে বেধড়ক মারপিট করা হয়। এরা অধিকাংশ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং বহু নারীকে ধর্ষণ করে। পুলিশ হত্যার 'উপযুক্ত' প্রতিশোধ গ্রহণের উম্মত্ততায় মত্ত পুলিশ ও আনসার বাহিনীর হাতে প্রচুর সংখ্যক সাঁওতাল নিহত হন। বাকিরা পরিবার পরিজন নিয়ে বা তাদের ফেলে রেখেই, ঘরবাড়ী, গরু-ছাগল, ধান-চাল ও অন্যান্য সম্পদ ফেলে রেখেই প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারেন পালিয়ে যান। সারা এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এক নিদারুণ ত্রাসের রাজত্ব।[৪৭]

পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে থেকে রমেন্দ্রনাথ মিত্র ওরফে হাবু-বাবু ও মাতলা মাঝি নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যেতে সমর্থ হন।[৪৮] ইলা মিত্র সাঁওতাল রমণীর ছদ্মবেশে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় রহনপুর রেল ষ্টেশনে ধরা পড়েন। তাঁর সাথে ধরা পড়েন বৃন্দাবন সাহা।[৪৯] আজাহার হোসেন ও অনিমেষ লাহিড়ী কয়েকদিন পর আজাহার হোসেনের বাড়ী রামচন্দ্রপুরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।[৫০] ট্রেনযোগে পলায়ণপর বেশকিছু সাঁওতালকে রাজশাহীর কাছাকাছি এক জায়গা থেকে ৮ই জানুয়ারী পুলিশ গ্রেফতার করে।[৫১] বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন ভাবে গ্রেফতার করা হয় আরো অসংখ্য সাঁওতাল কৃষককে। চাঁপাই নওয়াব গঞ্জের সাব জেল পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় কয়েক দফায় কয়েদীদেরকে সেখান থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।[৫২]

সে সময় যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছিল তার কিঞ্চিত বর্ণনা পাওয়া যায় কেস চলা কালীন সময়ে Examination of Accused নামক ফর্ম বৃন্দাবন সাহা কর্তৃক লিখিত বক্তব্য থেকে। তিনি লেখেন—[৫৩]

"নাচোল থানায় আমাকে খুব মারপিট করা হয়। ইহা ৮ তারিখে। ডান হাতের আঙ্গুলের মধ্যে একটা লোহার পিন পুঁতে দেওয়া হয়। এই সময় আমি অজ্ঞান হই। যখন জ্ঞান হয় তখন সামান্য বেলা ছিল ও আমি একজন পুলিশকে লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি। তখন

আমাকে একটা ছোট ঘরে রাখা হয়। রাত্রে আমাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি বা কোন জামা কাপড় দেওয়া হয়নি। পরদিন সকাল বেলা দুইটা লাঠি দিয়া গায়ে চাপা দেওয়া হয়। পায়ে ও পিঠে লাঠি দিয়া খুব আঘাত করা হয়। বৈকালে আবার মারা হয়। নবাবগঞ্জ থানায় দারোগা আমার বুকে লাথি মারায় আমার গলা দিয়া রক্ত বেরোয়। সেখানে যে কয়দিন ছিলাম ততদিনের মধ্যে শুধু মুড়ি খাইতে দেওয়া হইত। জল খাইতে চাইলে সেপাইরা মুখে প্রশ্রাব করিত। মারের চোটে বাম হাতের cup ভাঙ্গিয়া যায় ও ডান হাতে কব্জির কাছে ভাঙ্গিয়া যায়। মারের জন্য Central Jail Hospital-এ ২৬ দিন থাকি। এখনও আমার বুকে ব্যথা আছে। ডান পা ও বাম হাত এখন ব্যথা আছে।"*

গ্রেফতারকৃত সাঁওতালদের উপর অত্যাচারের মাত্রা সম্পর্কে শেখ আজহার হোসেনের সাক্ষাৎকার থেকে কিছুটা জানা যায়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে, তখন থানার হাজতে রাখার জায়গা থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু এমনকি তার দরকার পর্যন্ত ছিলনা। কেননা সাঁও-তালদেরকে মেরে এমন অবস্থা করা হয়েছিল যে তাদের বাইরে বাধনমুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হতো—অথচ কারো পালিয়ে যাবার মত সাধ্য শারীরিক ভাবে ছিলনা।

তবে, সে সময়ে পুলিশী নির্যাতনের ভয়াবহতা বিধৃত করার প্রধান মাধ্যম ইলা মিত্রের উপর নির্যাতনের বিবরণ। ইলা মিত্র রাজশাহী কোর্টে তাঁর নিজের জবানবন্দীতেই 'ইসলামী রাষ্ট্র' পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সরকারের আসল চেহারার একটি চিত্র তুলে ধরেছিলেন যথার্থভাবে। তাঁর জবানবন্দীটি বদরুদ্দিন উমর লিখিত "পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে[৫৪] বিধায় তা আর এখানে পুনঃ মুদ্রণ করা হলোনা।

পুলিশ কর্তৃক ইলা মিত্রের ওপর অমানবিক ও বর্বরোচিত নির্যাতনের পর তাকে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলে, সরকারী ডাক্তার কর্মস্থলে উপস্থিত না থাকায় স্থানীয় একজন ডাক্তার, আইয়ুব আলী, তাঁর চিকিৎসা করেন।[৫৫] তিনি এক সাক্ষাতকারে ঐ নির্যাতনের কথাকে সত্য বলে বর্ণনা করেছেন।[৫৬]

নাচোলে পুলিশ নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে প্রাদেশিক বিধান পরিষদে আলোচনা উত্থাপনের জন্য প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী ও মনোহর ঢালী কতকগুলি মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারকে দেন। কিন্তু তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন, শিক্ষা মন্ত্রী আবদুল হামিদ

*Statement টি লিখিত হয়েছে ৭/১/৫১ তারিখে।

এবং মুসলীম লীগ সদস্যরা পরিষদে প্রস্তাবটি উত্থাপনের ব্যাপারে এই মর্মে বিরোধীতা করতে থাকেন যে, পুলিশ হত্যা, সম্পর্কিত বিষয়টি কোর্টের বিচারাধীন, কাজেই সে সম্পর্কে কোন আলোচনা পরিষদে হতে পারে না। জবাবে প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী ও বিরোধী দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস বলেন যে তারা পুলিশ হত্যার বিষয়টি আলোচনা করতে চান না বরং আলোচনা করতে চান, ঘটনা ঘটে যাবার পরবর্তী সময়ে ঐ এলাকায় পুলিশ ও মিলিটারীর নির্যাতনের বিষয়টি। কিন্তু নানা কুতর্ক টেনে নুরুল আমিনরা এর বিরোধীতা করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত মুখ্য মন্ত্রীর অনুগত স্পীকার রায় দেন যে এই ব্যাপারে পরিষদে কোন মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবেনা বা কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে পারবেনা। এভাবে নুরুল আমিন সরকার নাচোলে সরকারী বাহিনীর নির্মম নির্যাতন ও হত্যা-কান্ডের ঘটনাবলীকে জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৫৭]

নাচোলের ঘটনাটি যে সময়ে ঘটে তার বেশ আগেই চাঁপাই নওয়াবগঞ্জে ফৌজদারী ও দেওয়ানী কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পুলিশ হত্যা সম্পর্কিত ঐ মামলাটির বিচার চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ কোর্টে না করে নিয়ে যাওয়া হয় রাজশাহীতে এবং সেখানকার একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আহমেদ মিয়ার কোর্টে মামলাটি ন্যস্ত করা হয়। এ পর্যায়ে আসামী করা হয় মোট একত্রিশ জনকে এবং এরা হলেন—[৫৮]

(১) ইলা মিত্র, (২) অনিমেষ লাহিড়ী ওরফে সাগর বাবু, (৩) আজাহার সেখ, (৪) বৃন্দাবন সাহা, (৫) সুকরা কামার ওরফে সুকচামন্দ কামার (৬) রবি কামার, (৭) রেঙ্গা মাঝি ওরফে রেঙ্গা সারেন (৮) দেওয়ানী রায়, (৯) সুখ বিলাস সিংহ, (১০) চতুর মাঝি, (১১) যাদু মাঝি, (১২) ছনু মাঝি, (১৩) ভাদু মন্ডল ওরফে ভাদু বর্মণ (১৪) দুখু মাঝি ওরফে দুখু সারেন, (১৫) উপেন কোচ, (১৬) মঙ্গলা মন্ডল, (১৭) ইন্দ্রীয় মরসু ওরফে ইন্দ্র মরসু, (১৮) সুরেন বর্মণ ওরফে খোকা (১৯) ভোতন মাঝি ওরফে ভোতন কিসকু, (২০) কালো রায়, (২১) স্চিফেন মাদী ওরফে গোপাল মাদী (২২) গোপাল চন্দ্র সিংহ, (২৩) মোহান্ত মল্লিক, (২৪) সুফল মাঝি, (২৫) দেবেন রায়, (২৬) সোমায় সারেন, (২৭) কিষাণ তদু, (২৮) চিগু রায়, (২৯) খোকা রায়, (৩০) নগেন সরদার (৩১) দুর্গা বকশী।

পরবর্তীতে মামলাটি ঐ কোর্ট থেকে স্থানান্তর করা হয় জেলা সেশনস্

জজ জনাব এস আহমেদের কোর্টে এবং আসামীর সংখ্যা ৩১ থেকে কমিয়ে করা হয় ২৩ জন। এই ২৩ জন হলেন উপরে বর্ণিত তালিকার প্রথম ২২ জন এবং সোমায় সারেন।[৫৯]

আসামীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান পেনাল কোডের ১৪৮, ৩০২/১৪৯ এবং ৩৩৩/৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়, ১১/১/৫১ তারিখে প্রদত্ত রায়ে জেলা সেশনস্ জজ জনাব এস আহমেদ আসামীদের সবাইকে Transportation for life দণ্ড দণ্ডিত করেন।[৬০] দণ্ড দেয়া হয় পাকিস্তান পিনাল কোডের ৩০২/১৪৯ ধারা অনুযায়ী। ১৪৭ ও ৩৩৩/৩৩৪ ধারায় অভিযোগ জন্য আলাদাভাবে আর কোন দণ্ড দেয়া হয়নি। বিচারক তার রায়ে উল্লেখ করেন যে, "যদিও আসামীদের সকলেই Unlawful Assembly তে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের কেউ কেউ হত্যা কান্ডে অংশ গ্রহণ করেছিল তথাপি যেহেতু নির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি যে, ঠিক কার অথবা কাদের আঘাতে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে সেহেতু কোর্ট সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা থেকে বিরত থাকছে।"[৬১]

সেশনস্ জজের উপরোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয় এবং হাইকোর্টের রায়ে আসামীদের শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দশ বছর করা হয়।[৬২] এদের মধ্যে থেকে এ, কে, ফজলুল হকের গভর্ণরশীপের সময় ইলা মিত্রকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয় চিকিৎসার প্রয়োজন ভারতে যাবার জন্য।[৬৩] ইলা মিত্র আর ফিরে আসেন নি এবং ধারণা করা হয়ে থাকে যে সেরকম একটা বন্দোবস্তের প্রেক্ষিতেই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়েছিল।

পুলিশ ও আনসারের ব্যাপক নির্যাতনের মুখে নাচোল এলাকা থেকে সাঁওতাল রাজবংশীসহ কয়েক হাজার অধিবাসী নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে গমন করেন, এদের অধিকাংশই আর ফিরে আসেননি। স্বল্প সংখ্যক যারা ফিরে এসেছেন তারাও আর তাদের পূর্বের ভিটে মাটিতে ফিরে যেতে পারেননি—কেননা স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা সেগুলো দখল হয়ে গেছে। এরা নাচোলের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায়, যেমন আমনুরা বা মুণ্ডমামলার হাট অথবা তানোরের কৃষ্ণপুরের মত জায়গায়, নতুন করে বসতি গড়েছেন।[৬৪]

উপসংহার

নাচোল এবং তার পাশ্ববর্তী এলাকাসমূহে সে সময় কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার পিছনে ছিল পার্টি সংগঠকদের অনেকগুলো বছরের দীর্ঘ ও ধারাবাহিক শ্রম। শ্রমজীবি মানুষের অধিকাংশ

প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় এবং অর্জিত সাংগঠনিক, ও রাজনৈতিক শক্তির ভার অনুযায়ী কর্মসূচী হাতে নেয়ার দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অগ্রযাত্রী ছিল মোটামুটি সাবলীল। বিশেষতঃ সাঁওতাল, রাজবংশীসহ আদিবাসী সম্প্রদায়-গুলোর মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাদের একক সংগঠন। কিন্তু পুলিশ হত্যার মত একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত তাদের এত বছরের শ্রমে গড়া সংগঠনকে একেবারে বিনষ্ট করে দেয়।[৬৫] বস্তুতঃ হঠকারীতা যে সংগঠন ও আন্দোলনের জন্য কি ভয়াবহ পরিণাম আনতে পারে তার সাক্ষী হচ্ছে নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস।

প্রেক্ষাপট আলোচনার সময়েই এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ছিল একটি বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ। ভাগচাষী কর্তৃক ফসলে প্রদেয় খাজনা এবং খাজনার পরিমাণের আধিক্যের বিষয়টি মোটেই স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত কোন সমস্যা ছিলনা, বরং ঐ ব্যবস্থার ব্যাপ্তি ছিল, দেশ-ভিত্তিক। কাজেই দেশভিত্তিক একটি সমস্যার সমাধান কেবল নাচোলের ঐ স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের দ্বারা সম্ভবপর হতো বলে মনে হয়না। বিশেষতঃ বাংলার বিশটি জেলায় একযোগে পরিচালিত ছেচল্লিশ, সাত-চল্লিশের আন্দোলন যেখানে সাফল্যমন্ডিত হয়নি, যেখানে নাচোলের আন্দোলনের সাফল্য আশা করাটাও খানিকটা অযৌক্তিক। কিন্তু এটা ঠিক যে সাব-ইনস্পেক্টর সহ চারজন পুলিশ হত্যার ঘটনাটি না ঘটলে হয়তো আন্দোলনে আংশিক সাফল্য আসতো এবং তাতে করে নাচোলে গড়ে ওঠা কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্ত ভিত্তি আরো পোক্ত হতো এবং ক্রমান্বয়ে কাজের এলাকা সম্প্রসারিত হতে পারতো। কিন্তু হঠকারী ঐ সিদ্ধান্তের ফলে নাচোল চাঁপাই-নওয়াবগঞ্জের সংগঠন সমগ্র কাঠামো সহ একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে যে পুলিশ হত্যার ঐ ঘটনা কি স্থানীয় নেতৃত্বের অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তের ফল? নাকি তার জন্য দায়ী ছিল সে সময়ে সামগ্রীকভাবে পার্টিতে অনুসৃত নয়া লাইন। আমরা জানি যে ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রণদীভে নির্দেশিত পথ অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশে অনতিবিলম্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ একই সাথে সমাধা করার লাইন গৃহীত হয় এবং ঐ সময় আলাদা স্বত্বা হিসেবে আবির্ভূত "নিখিল পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি"ও একই লাইন গ্রহণ করে।[৬৬] আন্দোলন ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতার, আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে, সশস্ত্র সংগ্রাম সংঘটিত করার কথা না ভেবে কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই গৃহীত ঐ পদক্ষেপ যে, অতিবাম ঝোঁকের স্মারক ছিল তা আজকে

সুপ্রমাণিত। আর ঐ অতি-বাম ঝোঁকের স্মারক হিসেবে সেদিন কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক সামনে আনা হয়েছিল "দালালকে হালাল করা"র লাইন। নাচোলের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, আন্দোলনে তৎপর কৃষকদের অনুসন্ধানে পুলিশ গ্রাম এসে যখন টাকা পয়সা আদায়ের মাধ্যমে এক নতুন ধরনের শোষণ শুরু করলো, তখন পুলিশকে প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়—পুলিশদেরকেও 'দালাল' হিসেবে নামাঙ্কিত করে শ্লোগান ওঠে "দালালকে হালাল কর"।[৩৭] আর তার পরপরই আমরা দেখেছি পাঁচই জানুয়ারীর পুলিশ হত্যার ঘটনা সংঘটিত হতে। এই যদি হয় সমগ্র ঘটনাটির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ণ তাহলে বলতে হবে যে, ঐ পুলিশ হত্যার সিদ্ধান্তের পিছনে যে হঠকারীতা, তার জন্য স্থানীয় নেতৃত্ব যতখানী দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী হচ্ছে তদানিন্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং তাদের প্রদত্ত হঠকারী লাইন। আঞ্চলিক নেতৃত্ব কেবল এতখানি দায়ী যে, তারা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত পার্টি লাইনকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করেছেন। তাদের অন্ধত্বের আর একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে খাদ্য বিভাগের সংগ্রহ শাখার সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর আফজাল হোসেন এবং তার পরিমাপক সফল খানকে 'পুলিশ ডেকে এনেছে' সন্দেহে হত্যার উদ্যোগ। বস্তুতঃ কেন্দ্র কর্তৃক 'বিপ্লব অত্যাসন্ন' থিসিস এবং কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সেসময় যেভাবে সারাদেশে পার্টির জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছিল তারই একটি অংশ হিসেবে সাধিত হয়েছিল নাচোল-চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের সংগঠনের বিলুপ্তি। বস্তুতঃ নাচোলের কৃষক আন্দোলনের পক্ষেকার লোকজনও তাদের সাথে সাক্ষাৎকারে 'সংগঠন ও আন্দোলন বিকাশের স্বার্থে ঐ পুলিশ হত্যার ঘটনা যৌক্তিক ছিল'—এমন কোন কথা প্রমাণ করতে পারেননি বরং দীর্ঘ সময়ের Realization এর প্রেক্ষিতে তারা অনেকেই তাদের সিদ্ধান্ত ও লাইনের ভ্রান্তি স্বীকার করেছেন। তাছাড়া স্মরণ রাখা দরকার যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত সরকারী বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র চার। সুসংগঠিত একটি পার্টি এলাকায় চারজনের একটি বাহিনীকে অন্যভাবেও প্রতিরোধ করা যেতে পারতো বলে মনে হয়।

পুলিশ হত্যার উত্তর পূর্বে নাচোল এলাকায় সরকারী বাহিনীর যে প্রচন্ড ও বিভৎস নির্যাতন নেমে আসে তা থেকে মনে হয় যে তদানিন্তন সরকার সংগ্রামমুখর আদিবাসী সম্প্রদায়কে দেশ থেকে বিতাড়নের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছিল। টংক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহেও অনুসরণ করা হয়েছিল একই নীতি। সম্ভবতঃ এই নীতিরই একটি বর্ধিত (Extended) রূপ হচ্ছে ১৯৭১ সালের মার্চের কালো দিনগুলোর হত্যাকান্ডের পরবর্তীতে পাকিস্তানী বহিনী কর্তৃক হিন্দু এলাকাগুলোর

উপর অক্রমণকে অনেকটা কেন্দ্রীভূত করা। অর্থাৎ সংগ্রামমুখর অদিবাসী এলাকায় প্রচন্ড নির্যাতন পরিচালনার মাধ্যমে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করার বিষয়টি ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর নগ্ন সাম্প্রদায়িক চরিত্রেরই আর একটি প্রকাশ মাত্র।

নাচোলের কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন কম্যুনিষ্টরা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি'ই ছিল এই আন্দোলনের নেতৃত্বকারী শক্তি। তবে আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠনভুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তি নেতৃত্বের সারিতে সমাসীন হয়েছিলেন তাদের নামসমূহ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর নাচোল এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায় গরিষ্ঠ ছিলেন সাঁওতালরা এবং তারা একনিষ্ঠ-ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন বলে এই বিদ্রোহকে কখনও কখনও 'নাচোলের সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামেও অভিহিত করা হয়, যদিও বাস্তবতাটা হচ্ছে এই যে এই বিদ্রোহে সাঁওতালরা ছাড়াও রাজবংশী, মুড়িয়াল সর্দার, মাহাতো, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ভুক্ত বর্গাচাষীরাই প্রত্যক্ষ ভাবে ও আন্তরিকভাবে যোগদান করেছিলেন। সেদিন আর এদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিলনা, সবাই এক হয়ে গিয়েছিলেন।[৬৮]

নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের সাফল্য কতটুকু এই প্রশ্নের জবাব দেয়া দুরূহ। আন্দোলনের মূল দাবি তেভাগা ও সাত আড়ি জিন অর্জিত হয়নি। বরং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যাপক অংশকে বিশেষতঃ আদি-বাসীদেরকে—হতে হয়েছে দেশত্যাগী। তবে তাদের ফেলে যাওয়া জমিজমা-গুলো যারা বর্গাশর্তে চাষাবাদের জন্য গ্রহণ করেছেন তাদেরকে আর ফসলের দুই তৃতীয়াংশ খাজনা আকারে প্রদান করতে হয়নি, দিতে হয়েছে অর্ধাংশ এছাড়া নির্ভরশীলতা সম্পর্কের দ্বিতীয় কাঠামো (Secondary structure of dependency relationship) হিসেবে পূর্বে প্রদেয় ব্যাগার অথবা আবওয়াব দেয়ার হাত থেকে তারা বহুলাংশে মুক্তি পেয়েছেন; যদিও নির্ভরশীলতা সম্পর্কের অপর অবিচ্ছেদ্য অংশ ঋণগ্রস্থতার হাত থেকে তারা বহুলাংশে মুক্তি পাননি।

পরিশেষে, নাচোল বিদ্রোহের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাতকারী এযাবৎ কালের একমাত্র গ্রন্থ* বদরুদ্দীন উমরের 'পূর্ব' বাংলার ভাষা আন্দোলন

*এ ব্যাপারে ইলা মিত্রের লেখা স্মৃতিচারণমূলক একটি গ্রন্থ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা গেছে, কিন্তু তার কোন কপি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। এছাড়া আরো কয়েকটি গ্রন্থে নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এসেছে, তবে সেগুলো মূলত: বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থের উপর নির্ভর করে লিখিত হয়েছে বিধায় সে গুলোর উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করিনি —লেখক।

ও তৎকালীন রাজনীতি'র সংশ্লিষ্ট অংশটুকু প্রসঙ্গে কয়েকটি মন্তব্য করা দরকার। তাঁর লেখায় এক ধরনের সরলীকরণের ঝোঁক স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন নিবন্ধের গোড়াতেই একজায়গায় তিনি লিখেছেন—[৯৬]

"১৯৫০ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে আমন ধান কাটার সময় এই সাঁওতাল কৃষকরা স্থির করেন যে, প্রচলিত প্রথামত তারা জোতদারদের ইচ্ছামত তাদের ঘরে ফসল তুলতে দেবেন না, ফসলের ন্যায্য অংশ তারা নিজেরাই জোর করে নিজেদের ঘরে তুলবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সমগ্র এলাকার কৃষকদেরকে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাঁওতাল, ইলামিত্র ও অন্যান্যরা সংঘবদ্ধ হয়ে ফসল তোলার জন্য একত্রিত হওয়ার আহবান জানান। এই আহবান অনুসারে স্থানীয় কৃষকরা ৫ই জানুয়ারী দলে দলে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধভাবে ফসল তুলতে উদ্যোগী হন।"

উপরের অংশটুকু পড়লে মনে হয় যে প্রথমতঃ সাঁওতাল কৃষকরা যেন হঠাৎ করেই চলতি প্রথাকে ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ইলা মিত্র ও তার দলবলের ডাকে সাড়া দিলেন। অথচ বাস্তবে ঘটনাটি এভাবে ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ মনে হয় যে ৫ই জানুয়ারী (অর্থাৎ যেদিন পুলিশ চারজন নিহত হলেন) তারিখে কৃষকরা সংঘবদ্ধ ভাবে ফসল তোলার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে ঐদিন আদৌ সে রকম কোন কর্মসূচী ছিল বলে কোন তথ্য, কোন উৎস থেকেই পাওয়া যায়নি।

এছাড়া বদরুদ্দীন উমর তাঁর তথ্যের উৎস হিসেবে যেসব ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আজ্‌হার হোসেন বাদে এই প্রসঙ্গে বাকি দুজনের (আবদুল হক ও নরেশ দাসগুপ্ত) নির্বাচন কতখানি যুক্তি সংগত সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এটা ঠিক যে তখন বংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আত্মগোপনকারী কম্যুনিষ্টদের কেউ কেউ বিভিন্ন সময়ে নাচোলে যেয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এদের মধ্যে হাজী দানেশ, মণি সিংহ, আবদুল হক, বৃন্দাবন সাহা প্রমুখের নাম আজ্‌হার হোসেন তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে পুলিশ হত্যা মামলার পূর্বে বহুবার উল্লিখিত ফাইলে রক্ষিত suspect list-এও আমরা কয়েকজনের নাম পাই। রনেশ দাসগুপ্ত কখনও নাচোলে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি, তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, তিনিও হয়তো কখনো নাচোলে আশ্রয় নিয়েছিলেন যা এই লেখার জন্য সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তথাপি বলতে হয় যে কেবলমাত্র বৃন্দাবন সাহা বাদে উপরে উল্লিখিত কয়েকজনের মধ্যে আর কেউ যে ৫ই জানুয়ারী বা তার অব্যবহিত পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত

ছিলেন এমন কোন প্রমাণ কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায়নি। তাহলে নাচোলের পুলিশ হত্যা ও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রদানের উৎস হিসেবে আবদুল হক ও রনেশ দাসগুপ্তকে নির্বাচনের যৌক্তিকতা কি ?

আবার ৫ই জানুয়ারীর হত্যাকাণ্ডে সংঘটিত হবার পরবর্তীকালে পুলিশের নির্যাতন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে যেয়ে বদরুদ্দিন উমর, আজহার হোসেন, আবদুল হক ও রনেশ দাসগুপ্তকে সূত্র হিসেবে ধরে উল্লেখ করেছেন যে "ক্ষুধা, তৃষ্ণায় এবং অমানুষিক প্রহারের ফলে প্রায় ২৪ জন সাঁওতাল নাচোল থানা হাজতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।" স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, ঐ ২৪ সংখ্যাটি তার তথ্যদাতারা পেলেন কোথায় ? কেননা তাদের কেউই, এমনকি আজাহার হোসেনও তখন নাচোল থানা বা তার আশে পাশে উপস্থিত ছিলেন না, আজাহার গ্রেফতার হন রামচন্দ্রপুরে তার নিজ বাড়ীতে এবং তাকে সরাসরি নিয়ে যেয়ে রাখা হয় চাঁপাই নওয়াব-গঞ্জে। তাহলে তিনি বা অপর দুজন সংখ্যাটি পেলেন কোথায় ? উত্তর হতে পারে নাচোলে আটক অন্য কোন কর্মী বা নেতার কাছ থেকে ; অথবা লোকমুখের প্রচার থেকে। আসল উৎস নাচোল থানা বা তার আশে পাশে উপস্থিত কোন কর্মী বা নেতা হলে তার উল্লেখ সাপেক্ষেই তথ্যটি বিধৃত হওয়া দরকার। আর লোকমুখের প্রচার থেকে বিধৃত হলেও তার উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে বলে চলে যে বদরুদ্দিন উমরের লেখাটির মধ্যে এক ধরনের sweeping generalization কাজ করেছে।

বস্তুতঃ পক্ষে সে সময় পুলিশ, আনসার ও স্থানীয় সামন্তীয় প্রতি-নিধিদের দ্বারা লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা যে কতগুলো ঘটেছিল তার সার্বিক সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে থেকে কেবল হারেক চন্দ্র সিং, বিজু মাঝি ও ঝড়ু কোচের "অসুখে প্রাণ ত্যাগ করা"র সংবাদ আমরা পুলিশী উৎস সমূহ থেকে খুঁজে পাই। গ্রেফতার ও বিচারের তোয়াক্কা না করে নির্বিচার হত্যা ও নির্যাতনের কথা সরকারী সূত্রাবলীতে সহজবোধ্য কারণেই আসেনি। আজাহার হোসেনের অনুমানমতে সে সময় অন্ততঃপক্ষে ৫০ থেকে ১০০ কৃষককর্মী নির্যাতনের মুখে প্রাণ ত্যাগ করেন। তবে সার্বিক সংখ্যা জানা না গেলেও হাজার হাজার অধিবাসীর দেশত্যাগের সংবাদ থেকে আমরা সে সময় সরকারী নির্যাতনের ব্যাপকতাকে অনুধাবণ করতে পারি।

নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের মূল দাবিসমূহ পূর্ণ হয়নি এটা ঠিক, কিন্তু এটাও ঠিক যে, বাংলার নিম্নবর্গের কৃষক নিজ অবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে সংগ্রাম ও আন্দোলনে উচ্চকিত হয়েছেন

তারই ধারাবাহিকতায় নাচোল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। নাচোলসহ সারাদেশের সমাজ পরিবর্তনে আকাংখী মানুষের কাছে নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ আজও একটি প্রেরণাদায়ক উদাহরণ—কেননা নাচোলে বিদ্রোহের মাধ্যমে সংগঠিত কৃষক জনতার শক্তির খুব খন্ড চিত্র হলেও, একটি চিত্র পাওয়া গেছে।

সূত্র নির্দেশ

১. ১৮'৫৫—৫৭ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন K. K. Datta, *The Santal Insurrection of 1855-57*, এবং ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮২।
এছাড়া C.E. Buckland লিখিত *Bengal under the Lieutenant Governors*, vol. 1 ; Calcutta, Second Edition, এবং সুপ্রকাশ রায় লিখিত, ভারতের কৃষক বিদ্রোহও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, গ্রন্থে এই বিদ্রোহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. সুপ্রকাশ রায়, মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ১০৩।

৩. ঐ, এছাড়া আজাহার হোসেন টেপকৃত সাক্ষাৎকারে একই কথা জানিয়েছেন। আজাহার হোসেন ছিলেন নাচোল কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান সংগঠক। ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকেই তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৯-৫০-এর কৃষক অভ্যুত্থানের সময় তিনি ছিলেন বরেন্দ্র অঞ্চলের সম্পাদক। পুলিশ হত্যা মামলায় অন্যান্যের সাথে তারও বিশ বছর শাস্তি হয়, পরে হাইকোর্টের রায়ে তা কমিয়ে করা হয় দশ বছর। মধ্য কৃষক পরিবারের সন্তান আজাহার হোসেন একাডেমিক পড়াশুনার দিক থেকে স্বল্প শিক্ষিত। বর্তমানে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত নন।

৪. সুপ্রকাশ রায়, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১১৪ ও ১১৬।

৫. আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার।

৬. ঐ।

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. ইলা মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত বলে কথিত জবানবন্দী। ইলামিত্র পরবর্তীতে এরকম কোন জবানবন্দী প্রদানের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। যাহোক, রাজশাহী জেলা জজের রেকর্ড রুমে রক্ষিত নাচোল পুলিশ হত্যা মামলা সম্পর্কিত নথিপত্রের ফাইলে (Sessions case No. 1/51, Date of Disposal

11.1. 1951, District Judges Record Room, Rajshahi) ঐ জবানবন্দীটির মূল কপিটি পাওয়া গেছে যার নিচে ইলামিত্র ও একজন ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর রয়েছে। এমনও হতে পারে যে ইলামিত্রের মুখে আরোপিত ঐ জবানবন্দীটি প্রস্তুত করেছে পুলিশ এবং তারপর জোর করে ইলামিত্রের স্বাক্ষর নিয়ে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে ইলামিত্র ঐ জবানবন্দীটি প্রচন্ড পুলিশী নির্যাতনের মুখে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে প্রথমে প্রদান করেছিলেন, কিন্তু পরে প্রাপ্ত প্রথম সুযোগেই তা অস্বীকার করেন। বাস্তবে যাই ঘটে থাকুক না কেন, এটা ঠিক যে জবানবন্দীতে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্যাবলী তখন পুলিশের অবগত ছিল। অবশ্য সে ক্ষেত্রে এর মধ্যে কোথাও কোথাও বিশেষতঃ পুলিশ হত্যা সম্পর্কিত বর্ণনায় অতিকথন থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কাজেই অপরাপর উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সাথে সমার্থক হলেই কেবল এই statement থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার।

১১. ঐ।

১২. Charge sheet no. 8, Dated 6.4.1950, of Nachole P.S, case no. 3, Dated 5.1.50, G·R. no. 10/50. Submitted by sub-Inspector Harun al Rashid, O/C, Nachole P.S. on 7.4.50. kept in the file mentioned above (Source no 9).

১৩. আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার।

১৪. তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লেখাগুলো হলো—

Adrienne Cooper, *Sharcropping and Sharecroppers Struggle in Bengal 1930-50,* Unpublished Ph. D. Thesis, University of Sussex, March, 1984.

Sunil Sen, *Agrarian Struggle in Bengal (1946-7),* New Delhi, 1972 ; D. N. Dhanagre, 'Peasant Protest and Politics, Tebhaga Movement in Bengal (1946-47)', *Journal of Peasant Studies,* London, vol. 3, No. 3, April 1976 ; আব্দুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, কলিকতা, ১৩৭৬।

বদরুদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, ঢাকা, ১৯৮৯ এবং পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ঢাকা ১৯৮২।

Kamal Siddiqui, and et, al, 'Tebhaga Movement in Bengal (1946-67) ; An Assessment', *Bangladesh Historical Studies,* Dhaka, vol. iii, 1978.

মেসবাহ কামাল, 'দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলন ; প্রস্তুতি পর্ব,' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫।

মেসবাহ কামাল/আহমেদ কামাল, 'দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৮)', বিচিত্রা, একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮৩।

১৫. অমল সেনের টেপকৃত সাক্ষাৎকার।
অমল সেন জাতীয় ভাবে সুপরিচিত কম্যুনিষ্ট নেতা, যশোরের নড়াইলে তাঁর বাড়ী এবং কাজের মৌলিক ক্ষেত্র। ত্রিশ দশকের গোড়ার দিক থেকেই কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এবং অব্যবহিত পর থেকেই নেতৃত্বের সারিতে সমাসীন। জমিদার পরিবারের সন্তান অমল সেন একাডেমিক পড়াশুনার দিক দিয়েও উচ্চ শিক্ষিত। বর্তমানে বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির অন্যতম প্রধান কর্ণধার ও প্রধান তাত্ত্বিক।

১৬. আব্দুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা ৮৪—৮৫।

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৯০।

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১০০।

২০. ঐ, পৃষ্ঠা ১০৩।

২১. হাজী মোঃ দানেশের টেপকৃত সাক্ষাৎকার।
দিনাজপুরে কৃষক সমিতির সংগঠন গঠিত হবার প্রথম দিকেই একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসেবে হাজী মোঃ দানেশ তাতে যোগদান করেন এবং অচিরেই নেতৃপদে সমাসীন হন। ১৯৩০ সালে জেলখানায় মার্কসবাদে দীক্ষিত হন, কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ পান ১৯৪২ সালে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তার পিতা ছিলেন একজন ছোট জোতদার এবং তিনি নিজে একজন আইনজীবী। বর্তমানে গণতান্ত্রিক পার্টির ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য।

২২. কৃষ্ণবিনোদ রায়, চাষীর লড়াই, কলিকাতা, পৃষ্ঠা—২।

২৩. Prosecution Story of Nachole Murder case, Presented by Magistrate Ahmed Meah, রাজশাহী জেলা জজের রেকর্ডরুমে রক্ষিত নাচোল পুলিশ হত্যা মামলার পূর্বে উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত। এছাড়া আজাহার হোসেনও সাক্ষাৎকারে একই কথা জানিয়েছেন।

২৪. আজাহার হোসেন ও লক্ষী কর্মকারের টেপকৃত সাক্ষাৎকার। লক্ষীকর্মকার হচ্ছেন মৃত রবি কর্মকারের বড় মেয়ে। রবি কর্মকার এবং নাচোল পুলিশ হত্যা মামলায় ৬ নং আসামী রবি কামার একই ব্যক্তি কিনা তা লক্ষী কর্মকার বলতে পারেননি। তবে তাঁর পিতাও আন্দোলন ও সংগঠনে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন এবং আটবছর জেল খেটেছেন। তাঁর ভাই মৃত ভগীরথী কর্মকারও জেল খেটেছেন তিন বছর। পুলিশও আনসারের প্রচণ্ড নির্যানের তারা '৫০ সালের গোড়ার দিকেই দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। কয়েক বছর পর ফিরে এসে আর নাচোলে নিজ গ্রাম, চণ্ডীপুরে, ফিরে যেতে পারেননি। পার্শ্ববর্তী থানা তানোরের কৃষ্ণপুর গ্রামে

নতুন করে বসতি স্থাপন করেছেন। আধিয়ার পরিবারের সন্তান লক্ষী কর্মকার স্বল্পশিক্ষিত।

২৫. ঐ।

২৬. আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার। আরও দেখুন আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক কামাল লোহানীর লেখা—'আজহার হোসেন ও নাচোল বিদ্রোহ', দৈনিক বার্তা, দ্বিতীয় বর্ষপুর্তি সংখ্যা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা—৯৭।

২৭. ঐ।

২৮. ঐ।

২৯. Seizure list—Presented to Court by the Police, নাচোল পুলিশ হত্যা মামলার পূর্বে উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত। এছাড়া ঐ মামলাটিরই পূর্বে উল্লিখিত চার্জশীটটিতেও কমুনিস্ট পার্টি কর্তৃক ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

৩০. আজাহার হোসেন ও লক্ষী কর্মকারের সাক্ষাৎকার।

৩১. ইলামিত্র কর্তৃক প্রদত্ত বলে কথিত পূর্বে উল্লিখিত জবানবন্দী।

৩২. আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার।

৩৩. কামাল লোহানী, পূর্বে উল্লিখিত নিবন্ধ, পৃষ্ঠা—৯৭।

৩৪. আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার।

৩৫. ঐ।

৩৬. ইমানুয়েল মরমু'র সাক্ষাৎকার। তিনি একজন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক এবং নাচোলের পার্শ্ববর্তী থানা তানোরের জোয়ার পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে বয়স ৩০/৩২ বছর, অর্থাৎ নাচোল বিদ্রোহের সময় তাঁর জন্ম হয়নি। উল্লিখিত কবি গানটি লোক মুখের প্রচার থেকে শুনেছেন।

৩৭. পূর্বে উল্লেখিত Prosecution Story of Nachole Murder Case, by Magistrate Ahmed Meah.

৩৮. কামাল লোহানী, পূর্বে উল্লিখিত নিবন্ধ, পৃষ্ঠা—১০৩।

৩৯. ঐ।

৪০. আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার।

৪১. First Information Report, Lodged by Lalunath Karmakar, নাচোল পুলিশ হত্যা মামলার পূর্বে উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত। লালুনাথ কর্মকার ছিলেন নাচোল ঘটনায় নিহত দারোগা তফিজউদ্দিনকে বহনকারী গরুর-গাড়িটির গাড়োয়ান। এবং Head OC Charge to the Jury, chapter II.-The Prosecution Case, by the District Sessions Judge Mr. S Ahmed, নাচোল পুলিশ হত্যা মামলার পূর্বে উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত।

৪২. ঐ।

৪৩. দৈনিক আজাদ, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৫০।

৪৪. পূর্বে উল্লিখিত First Information Report, by Lalunath Karmakar.

৪৫. পূর্বে উল্লিখিত Head OC Charge to the Jury, chapter II.-The Prosecution Story, by the District Sessions Judge MrS. Ahmed.

৪৬. Ejahar, lodged in Nachole Police Station, by Mr Afjal Haque, S. I. (P. R. O.) Amnura, on. 9, 10 50, নাচোল পুলিশ হত্যা মামলায় পূর্বে উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত। এছাড়া আজাহার হোসেনও তাঁর সাক্ষাৎকারে একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন।

৪৭. আজাহার হোসের ও লক্ষী কর্মকারের সাক্ষাৎকার। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় নাচোল, চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ ও তানোরের আরো অনেকে সরকারী বাহিনীর সন্ত্রাস সম্পর্কে একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন।

৪৮. আজাহার হোসেন সাক্ষাৎকার।

৪৯. ঐ।

৫০. ঐ।

৫১. দৈনিক আজাদ, ১২ জানুয়ারী, ১৯৫০।

৫২. Order sheet, G. R. No. 10/50, Signed by Magistrate K. Ahmed, নাচোল পুলিশ হত্যা মামলায় পূর্বে উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত।

৫৩. Examination of Accused নামক ফর্ম-এ বৃন্দাবন সাহা কর্তৃক লিখিত statement, নাচোল পুলিশ হত্যা মামলায় পূর্বে উল্লেখিত ফাইলে সংরক্ষিত।

৫৪. জেলা সেশনস্ জজ জনাব এস. আহমদের কোর্টে ইলা মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দী। জবানবন্দীটির একটি কপি নাচোল পুলিশ হত্যা মামলার পূর্বে উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত আছে। জবানবন্দীটি কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত না হওয়ায় ইস্তাহারের আকারে ছাপিয়ে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে বিলি করা হয়েছিল। বদরুদ্দীন উমর তার "পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" পুস্তকটিতে (প্রথম খণ্ড) ঢাকা, ১৯৭০ (পৃষ্ঠা নং—৩৩৫-৩৬) ঐ ইস্তাহর আকারে জবানবন্দীটি হুবহু ছাপিয়ে দিয়েছেন।

৫৫. General Dairy Book of Nachole P. S., Dated 11-1-1950, P—58, নাচোল হত্যা মামলার পূর্ব উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত।

৫৬. ডাঃ আইয়ুব আলীর সাক্ষাৎকার।
ডঃ আইয়ুব আলী ছিলেন চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের নামকরা চিকিৎসক। ইলা মিত্র নওয়াবগঞ্জ জেল খানায় থাকাকালীন সময়ে তিনি তার চিকিৎসা করেন।

৫৭. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৩৩৮-৩৯ ; এবং

East Bangal Legislative Assembly Proceeding, Fourth Session, 1949-50, vol, IV, No. 6, 6th Feb; 1950, pp 12—19,

৫৮. Commitment Order by Magistrate Ahmed Meah, Ist class Magistrate of Rajshahi, Dated 10-11-1950, নাচোল পুলিশ হত্যা মামলায় পূর্বে উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত।

৫৯. Commitment Order by District Sessions Judge Mr. S Ahmed, Dated 1-1-1951. নাচোলের পুলিশ হত্যা মামলার পূর্বে উল্লেখিত ফাইলে সংরক্ষিত।

৬০. Finding and Order (Judgement by District Sessions Judge Mr. S Ahmed,) Dated 11. 1. 1951. নাচোলের পুলিশ হত্যা মামলার পূর্বে উল্লিখিত ফাইলে সংরক্ষিত।

৬১. ঐ।

৬২. Appeal to High Court, No 176/51 (criminal).

৬৩. আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার।

৬৪, আজাহার হোসেনের ও লক্ষ্মী কর্মকারের সাক্ষাৎকার।

৬৫. আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার।

৬৬, বদরুদ্দিন উমর, পূর্বে উল্লিখিত নিবন্ধ, পৃষ্ঠা, ৩০০-৩০৯।

৬৭. কামাল লোহানী, পূর্বে উল্লেখিত নিবন্ধ, পৃষ্ঠা,১০৩।

৬৮. চরু হেমরমের টেপকৃত সাক্ষাৎকার।

চরু হেমরম একজন মাঝারী কৃষক এবং নাচোলের পার্শ্ববর্তী থানা ভানোরের জোয়ারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর এলাকায় তেভাগার জন্য আন্দোলন হয়নি, তবে তার হাওয়া খুব ভাল ভাবেই এসে লেগেছিল। তাছাড়া নাচোল থেকে অনেকেই পালিয়ে এসে তাদের এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, পুলিশ এবং আনসারাও তাদের সন্ধানে এসে হামলা করেছিল। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নন।

৬৯. বদরুদ্দিন উমর, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ৩৩২।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ।* স্বল্পকালীন স্থায়িত্ব এবং শেষ পর্যায়ে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সরাসরি অংশগ্রহণ এই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। ব্যাপক কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই প্রায় নিরস্ত্র বাঙালীকে সেদিন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। পাকিস্তানী সামরিক চক্রের আকস্মিক আক্রমন ও গণহত্যার মুখে আর কোন বিকল্প ছিলনা। এমনি পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়ঃ প্রথমে সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনা; এবং তারপর ব্যাপক সংগঠন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ব্যাপার খুব কমই ঘটেছে যখন ব্যাপক পূর্বপ্রস্তুতি বা সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই একটি বিরাট আকারের সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্ম হয়েছে।[১] প্রাথমিক পর্যায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষুদ্র-খন্ড প্রতিরোধ হলেও তা ক্রমান্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আকার ও রূপ গ্রহণ করে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আর একটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। সে সময়ের বাঙালী সমাজে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত 'ইস্যু'-গুলো প্রচন্ড সামাজিক-রাজনৈতিক টানাপোড়নের সৃষ্টি করেছিল; এবং তার কারণ, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতাদর্শ।

এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য চারটি। প্রথমত, একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা। দ্বিতীয়ত, আলোচিত হবে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক। তৃতীয়ত, বিশ্লেষণের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, যুদ্ধে বামপন্থী দলগুলোর ভূমিকা। উপসংহারে

---

* এই প্রবন্ধের জন্যে তথ্য সংগ্রহে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ডঃ আনোয়ার হোসেন (সহকারী অধ্যাপক, প্রাণ রসায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); মেজবাহ কামাল (প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও শাহীন রাজা (এম, এ, শেষ পর্বের ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী অনেক ব্যক্তিত্ব সাক্ষাতকার দিয়ে বাধিত করেছেন। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

আলোচিত হবে কিভাবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ ও ভারতের যোগসাজশে একটি প্রলম্বিত গণযুদ্ধের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : তাত্ত্বিক কাঠামো

একটি জনগোষ্ঠী কেন বিদ্রোহ করে? কোন্ পরিস্থিতিতে তাদের জন্যে সশস্ত্র প্রতিরোধ অপরিহার্য হয়? অথবা কোন্ প্রেক্ষাপটে এমনি প্রতিরোধের প্রচন্ডতায় তারতম্য দেখা যায়? প্রশ্নগুলোর একটি সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে বের করার জন্যে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন, এবং রচিত হয়েছে অসংখ্য যুক্তি ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাকর্ম।[২] কিন্তু তবুও মনে হয় প্রশ্নগুলোর গভীরে প্রবেশ করা আজও সম্ভব হয়নি বা মেলেনি সঠিক উত্তর। কাজেই গণবিদ্রোহের সঠিক কারণ ও প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত বিতর্ক আজও চলছে। এই গবেষণার সীমাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, যাকে বলা হয় 'ইন্টারডিসিপ্লিনারী' গবেষণার অভাব। বিশেষ করে এক্ষেত্রে প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও আর্থ-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণমূলক গবেষণা-র সমন্বয়ে একটি 'ইন্টারডিসিপ্লিনারী' গবেষণা।

অবশ্য এ যাবত বিষয়টি নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে বর্তমান প্রবন্ধের জন্যে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মানের চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত এই কাঠামোর মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি। নীচের মডেলটি[৩] কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে ধারনা দিতে পারে :

গণবিদ্রোহের কারণ

Intrusion → অভিঘাত	Cultural Cores (CC) Relative Deprivation (RD) মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহ। আপেক্ষিক বঞ্চনা।	→	High Intensity of Collective Violence সমষ্টিগত প্রতিরোধের প্রচন্ডতম সম্ভাবনা।
Intrusion → অভিঘাত	Cultural Peripherals (CP) Relative Deprivation (RD) প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহ। আপেক্ষিক বঞ্চনা।	→	Low Intensity of Collective Violence সমষ্টিগত প্রতিরোধের অপেক্ষাকৃত কম সম্ভাবনা।
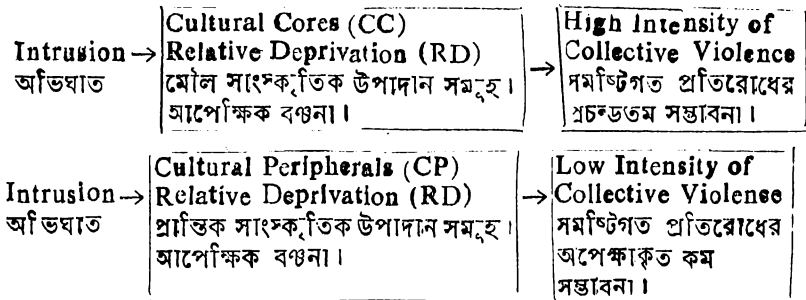
এখানে কেন্দ্রীয় বক্তব্য হলো, একটি সমাজে প্রতিরোধ বা বিদ্রোহের সূচনা হতে পারে দু'ধরনের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথমত, বাইরের কোন শোষণকারী শক্তির নীতি ও কর্ম-কান্ডের ফলে সেই সমাজের মৌল

সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের (Cultural Cores) ওপর অভিঘাত এলে প্রচণ্ড রকমের সমষ্টিগত প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদান (cultural peripheral) সমূহের ক্ষেত্রে এমনি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে যে প্রতিরোধ জন্ম নেবে তা হয়তো তুলনামূলকভাবে খুব ব্যাপক হবেনা, বা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে গোটা জনগোষ্ঠীকে সমানভাবে আলোড়িত করে একটি মৌল পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবেনা। মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান বলতে সমাজ ব্যবস্থার সেই উপাদানগুলোকেই নির্দেশ করা হচ্ছে যার ওপর নির্ভর করছে একটি জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্ব। অপরপক্ষে প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত সেই বৈশিষ্ট্যগুলো, যেগুলোর প্রকৃতি শোষণমূলক প্রক্রিয়ার কারণে বিকৃত হলে হয়তো একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবেনা, কিন্তু চেতনালোক হবে বিক্ষুব্ধ।[৪] এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ সৃষ্টিতে একটি অভিন্ন উপাদান সক্রিয়; এবং তা হলো আপেক্ষিক বঞ্চনা (Relative Deprivation)। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বা শোষণমূলক প্রক্রিয়ায় পরাধীন ও শোষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে বঞ্চনার চেতনা গড়ে ওঠে। আপেক্ষিক বঞ্চনার জন্ম হয় যখন গণমানসে সাংস্কৃতিক উপাদানভিত্তিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগের আকাঙ্খা ও বিরাজমান পরিস্থিতির (যা বাইরের শক্তির সৃষ্টি) পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অধিকারের মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে বা যদি তা ক্রমেই বেড়ে চলে।[৫]

৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই মডেলটির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে হলে ৭১-এর পূর্বে রাজনৈতিক পটভূমির ওপর আলোকপাত করতে হবে। একটি বহুল আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের চেতনায় অভিঘাত সৃষ্টিকারী মূল ঘটনাগুলো-ই মাত্র আলোচনার আওতাভুক্ত করা সঙ্গত। ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই প্রস্তাবটিকে পরবর্তীকালে বিকৃত করে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সৃষ্টি হলো পাকিস্তান নামে এক অদ্ভুত রাষ্ট্রের। হাজার মাইলের ব্যবধানে এই রাষ্ট্রের দু' অংশের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্যে ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়। ইসলাম বন্ধনের আড়ালে পাকিস্তানী অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদ শুরু হতে সময় লাগেনি। প্রথমেই আঘাত এসেছিল ভাষা-সংস্কৃতির ওপর। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন ৪৭—উত্তর প্রথম প্রতিরোধ। বায়ান্নো ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় একটি মোড় পরিবর্তনের সময়। দ্বিতীয় প্রতিরোধ ৬২-র শিক্ষা আন্দোলন। শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি—এসব ক্ষেত্রে বঞ্চনার সমন্বিত ফসল হিসেবে জন্ম

নেয় ৬৬-র ছয়দফা আন্দোলন। এরপর ছয় দফা ও এগারো দফা-র মিলিত ধারায় গড়ে ওঠে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। তারপর ৭০-এর নির্বাচন পরবর্তী বঞ্চনার মধ্য দিয়ে এলো ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সংক্রান্ত দুটো বক্তব্য এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমত, ৭১-পূর্ব যে প্রতিরোধ তা প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহে অভিঘাত থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। আর সে কারণেই সে প্রতিরোধগুলোতে প্রচন্ডতা ছিলনা বা ছিলনা যুগান্ত-কারী কোন পরিকল্পনা। পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরেই পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকার ও স্বায়ত্ত শাসনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন ছিল সেগুলো। কিন্তু ৭১-এ পাকিস্তানী সামরিক চক্রের গণহত্যা ছিল মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহে অভিঘাত। এ ধারাকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পূর্ব বাংলার বাঙালীর অস্তিত্বকে মুছে ফেলার নীল-নকশা নিয়েই পাকিস্তানী সামরিক চক্র সেদিন গণহত্যা ও অন্যান্য নির্যাতন শুরু করেছিল। আর এ জন্যেই প্রচন্ড ও ব্যাপক প্রতিরোধ, যার নাম ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি

এই প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে, অতর্কিত আক্রমণের প্রতিরোধ হিসেবে অপ্রস্তুত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। একাত্তরের ২৫ মার্চ হয়তো ব্যাপারটি এই ছিল; এবং সে সময় আওয়ামী লীগ বা তার কিছু অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঠিক ভাবতে পারেননি বা বুঝেও মানতে চাননি যে, পাকিস্তানের সামরিক চক্র রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে গণহত্যার পথ বেছে নেবে। যেমন, বঙ্গবন্ধু নিজেও স্থির নিশ্চিত ছিলেন পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট হোক, এমন কোন পদক্ষেপ শাসকগোষ্ঠী নেবেনা।[৬] এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালী অফিসারদের অনেকেই চরম পরিস্থিতির কথা ভাবতে পারেননি।[৭] কিন্তু পরিস্থিতি জটিল এবং হয়তো বা সংঘর্ষের পথ বেছে নিতে হবে এমনি একটি অস্পষ্ট ধারণা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ছিল ; আর সে কারণেই সুপরিকল্পিত বা সুশৃংখল না হলেও কিছু প্রস্তুতি ছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে বামপন্হী দলগুলোর চিন্তা চেতনা তুলনামূলকভাবে অনেক অগ্রসর ও বাস্তবধর্মী ছিল।[৮]

মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের সম্ভাবনা অনেকেই অনুধাবন করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে ১৯ মার্চ কর্ণেল ওসমানী ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে প্রথম আলোচনা হয়। ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক অফিসারও এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অন্তত প্রকাশ্যে একটি চরম সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতির সম্ভাবনাকে মেনে নিতে

চাননি। কাজেই তিনি ঠিক তখনই সশস্ত্র প্রতিরোধের নির্দেশ দিতে পারেননি। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুতি শুরু হলে তিনি দ্বিমতও করেননি বা বাধা দেননি। ছাত্র ও তরুণের সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছিলেন; এবং ২১ মার্চ কর্ণেল ওসমানী পল্টন ময়দানে প্রাক্তন সৈনিকদের প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করেননি।[৯] কিন্তু নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত-হীনতার ফলে যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল তা প্রয়োজন অনুসারে ছিল হাস্যকর।

উল্লেখ্য যে, তুলনামূলকভাবে ছাত্রলীগের একাংশের ভূমিকা অনেক অগ্রসর ছিল। ১৯৬২-তে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে একটি গোপন নিউক্লিয়াস গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্যে। ৬২-র পর থেকে প্রতিটি ঘটনার নিয়ন্ত্রক ছিল এই নিউক্লিয়াসটি। ১৯৬৬-র ছয় দফা আন্দোলনের সময়ে এরা "বিপ্লবী বাংলা" নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করে। ৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের পর নিউক্লিয়াসের নিয়ন্ত্রণাধীন ছাত্রলীগের জঙ্গী অংশ শ্লোগান দিত "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।" অথবা এদের বিরোধী অংশ নূরে আলম সিদ্দিকির নেতৃত্বে শ্লোগান দিত "বাঁশের লাঠি তৈরী কর, পাতি বিপ্লবী খতম কর।" ১৯৭০ থেকেই নিউক্লিয়াসের অধীনে একটি সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৭১-এর ২ মার্চ নিউক্লিয়াসের পক্ষ থেকে আ, স, ম, আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। একই সময়ে জাতীয় সঙ্গীতও নির্বাচন করা হয়।[১০]

তবে এটা ঠিকই যে, ২৫ মার্চ-এ ঘটনার আকস্মিকতার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিলনা। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর যে সব বাঙালী সদস্য প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, তাঁরা তো নয়ই।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব

৭১-এর ২৫ মার্চ রাত সাড়ে এগারোটায় ঢাকায় শুরু হয় গণহত্যা। ১৮ মার্চ-এ ঢাকা সেনানিবাসে তৈরী করা "অপারেশন সার্চলাইট" নীল নকসা অনুযায়ী শুরু হয় সামরিক অভিযান।[১১] লক্ষ্যণীয় যে, নিরস্ত্র জনতার ওপর সশস্ত্র সামরিক অভিযানের জন্যে সেনাবাহিনীকে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সব সময়েই ইসলামের নামে অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল। কুমিল্লা সেনানিবাসে জেনারেল মিঠ্ঠা খান বলেছিলেন, হিন্দুদের প্ররোচনায় বাঙালীরা তোমাদের অফিসার, সৈন্য এবং তাদের পরিবার পরিজনকে হত্যা করে চলেছে। তোমরা তাদের রক্ষ না করলে তারা সকলেই প্রাণ হারাবে। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সামনে এগিয়ে যাও। খুনের বদলে খুন। ইসলাম

এবং পাকিস্তানকে তোমরা রক্ষা কর।[১২] এবং এ আহ্বানে সেনাবাহিনী কতটুকু সাড়া দিয়েছিল তার অকপট স্বীকারোক্তি করেছিলেন একজন পাকিস্তানী অফিসার, "আমরা যে কোন কারণে যে কোন লোককে হত্যা করতে পারি এবং তার জন্য কারোর কাছেই আমাদের জবাবদিহি করতে হবেনা।"[১৩]

প্রতিরোধের সূচনা পর্বে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ২৬ মার্চ দুপুর আড়াইটায় কালুরঘাট ট্রান্সমিশন সেন্টার থেকে সর্বশক্তি নিয়ে হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। এই ঘোষণাটি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ-এর সম্পাদক এম, এ, হান্নান-এর কণ্ঠে প্রচারিত হয়। এই ঘোষণা প্রচারের সময় বেতার কেন্দ্রের নাম স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল। এই বেতার কেন্দ্র থেকেই মেজর জিয়া ২৭, ২৮ ও ৩০ মার্চ পর পর তিনটি ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা জানিয়ে দেন। যখন হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর জীবিত বা মৃত এ নিয়ে বাঙালীর মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল, তখন তাঁর নামে মেজর জিয়ার ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। ৩০ মার্চ হানাদার বিমান বাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে বেতার কেন্দ্রটি নীরব হয়ে যায়।[১৪]

অবশ্য ২৫ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনীর আঘাতের পর পরই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। সেদিন প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয় চট্টগ্রামে রাত ৮-৩০ মিনিটে।[১৫] এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স, পুলিশ, আনসার ও যুব সম্প্রদায়। উল্লেখ্য যে, এই পর্যায়ে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালী সদস্যগণ যদি প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন তবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ভিন্ন হতো। কারণ, সে সময়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মূল অংশই হয় ভারতের পথে ছিলেন নতুবা আত্মগোপন করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়

গতি প্রবাহের বিচারে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল : স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ও পশ্চাদপসরণ

খ. মে থেকে জুন : কিছুটা সুপরিকল্পিত প্রতিরোধ

গ. জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ঃ সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে শত্রুর ওপর আক্রমণ
ঘ. সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ঃ সর্বাত্মক যুদ্ধ ও শেষ পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বিজয়।

প্রবন্ধের এই অংশে মার্চ-এপ্রিল-এর স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ আলোচিত হবে।

২৬ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু পর্যাপ্ত অস্ত্র যানবাহন, যোগাযোগের সরঞ্জাম এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সুসংহত নেতৃত্বের অভাবে এই প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। হানাদার বাহিনীর সর্বশক্তি নিয়ে রচিত আক্রমণের মুখে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নতি স্বীকার করতে হয়। চট্টগ্রামের পতনের পর হতোদ্যম মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লেও অনেকেই রামগড়ে পিছু হটে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বিদ্রোহী মিজো সৈন্যরা পাক সেনাদের দলে যোগ দেয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের রামগড়েও টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। এপ্রিল-এর প্রথম দিকে ভারত থেকে যে সামান্য অস্ত্র সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়েও হতোদ্যম বাঙ্গালী সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয়ে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা অসম্ভব হয়। যুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন চট্টগ্রামে প্রতিরোধের অন্যতম বীর সেনানী মেজর রফিক-উল-ইসলাম, ... "আমাদের সৈন্যরা ভীষণ অসহায় অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করছিল। আমাদের গোলাগুলির সরবরাহ ছিল খুবই কম। ...কেউ আহত হলেও তার প্রাথমিক চিকিৎসা কিংবা তাকে অন্যত্র স্থানান্তরের তেমন কোন ব্যবস্থা আমাদের ছিলনা। এমন কি এক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পানি ও খাদ্য সরবরাহের কেউ ছিলনা। আমার ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টারে অয়্যারলেস কিংবা আধুনিক কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না থাকায় বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধরত সৈনিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ... ... আমরা যোগাযোগ এবং পরিবহণের অভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি বেশী।"[১৬]

ঢাকায় পাকবাহিনী সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে এবং সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল নিরস্ত্র জনতা এবং রাজারবাগ পুলিশ ফাঁড়ি ও পীলখানায়। তবে রাজারবাগ ও পীলখানায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ছিল; যদিও খুব কম সময়ের মধ্যে তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পীলখানার বাঙালী ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই, পি, আর)-দের ভূমিকার একটি স্বতন্ত্র দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। ২৩ মার্চ পীলখানার প্যারেড গ্রাউন্ডে উত্তোলন করা হয়েছিল বাংলাদেশের পতাকা। পতাকার এক অংশে উর্দুতে লেখা ছিল, "পশ্চিমারা আবি বাংলা ছোড়কে ভাগ যাও, নেহি ত ইধারই

তোম লোগ কো কবর বানায়েগা।"[১৭] ২৪ মার্চ বাঙালী ই, পি, আর-কে নিরস্ত্র করা হয়। ২৫ মার্চ রাত ৪টায় পীলখানা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তবে সামান্য কিছু বাঙালী ই, পি, আর প্রাণপণে আক্রমণকারী পাকবাহিনীকে প্রতিহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

এছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ই, পি, আর, আনসার, ছাত্র ও শ্রমিক সমন্বয়ে রাতারাতি মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল, এমনি একদল মুক্তিবাহিনীর সাথে তেজগাঁ রেল ষ্টেশনের কাছে পাকবাহিনী সামনা-সামনি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ২৯ মার্চ। এতে ১২৬ জন পাকসেনা হতাহত এবং তিনটি গাড়ী ধ্বংস হয়। ৩১ মার্চ আসাদ গেটের কাছে এদের হাতে ৫জন পাক সেনা নিহত হয়।[১৮]

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলা শহরে এরপর থেকে বাঙালী সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয়ে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকে। পাবনা ও রাজশাহীতে ২৭ থেকে ৩০ মার্চের মধ্যে পাকবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। এতে পাকবাহিনী বেশ ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

৩০ মার্চ কুষ্টিয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা ২৭ বালুচ রেজিমেন্টকে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়। কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় ২৬ মার্চ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ই, পি, আর-এর মেজর ওসমান। তিনি সামরিক অভিযানকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্যে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার-ও উদ্যোগ নেন। কিন্তু পাকবাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমনের মুখে ১৮ এপ্রিলের মধ্যে যশোর কুষ্টিয়ার পতন হয়।

এপ্রিলের শেষ নাগাদ শত্রুপক্ষের প্রবল বোমা বর্ষণের মুখে পতন হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়ার। সিলেটেও পাকবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মোকাবেলা না করতে পেরে বিমান বন্দরে সমবেত হতে বাধ্য হয়।

উত্তরবঙ্গে প্রাথমিক প্রতিরোধ ছিল প্রায় সম্পূর্ণ সফল। ২৬ মার্চ ই, পি, আর নওগাঁয় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। ২৯-৩০ মার্চ বগুড়ার যুদ্ধে পাকবাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়; এবং তাদের নিহত সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২৩। ৩১ মার্চ দিনাজপুর শহর পাক বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হয়। সৈয়দপুর পার্বতীপুর এলাকায় তৃতীয় ইষ্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন আশরাফের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু পাক বাহিনীর ট্যাংক আক্রমণের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিলনা। কাজেই ৮ এপ্রিল ক্যাপ্টেন আশরাফের মুক্তিযোদ্ধারা পাক বাহিনীর কাছে পরাস্ত হন।

বরিশালে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ছুটিভোগরত আর্মড কোর অফিসার মেজর জলিল। তিনি জনতা, ছাত্র, পুলিশ, আনসার, ও ই, পি, আর নিয়ে তাঁর বাহিনী গড়ে তোলেন ও বরিশাল শহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। ৪ এপ্রিল মেজর জলিল খুলনা বেতার কেন্দ্র দখল করেন। বিমান গানবোটের আক্রমণে ২৫ এপ্রিল বরিশালের পতন হয়।

২৭ মার্চ রাতে ময়মনসিংহে যে যুদ্ধ হয় তাতে পাক বাহিনী সম্পূর্ণ-ভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে বাঙালীরা বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করেছিল। ২৯ মার্চ মেজর সফিউল্লাহ ময়মনসিংহের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন।

এপ্রিলের প্রথমভাগেই নোয়াখালীর ফেনী শহরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়েছিল। চট্টগ্রাম থেকে পিছু হটে আসা বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন এদের সংগঠক। চমকপ্রদ ব্যাপার হলো জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশে শুধুমাত্র ৩০৩ রাইফেলের গুলীতেই মুক্তিবাহিনী পাক হানাদার বিমান বাহিনীর একটি বিমানকে ভূপাতিত করেছিল এবং অপরটি পালিয়েছিল। এ বিজয়ে সেদিন ফেনী শহর উল্লসিত হয়েছিল।[১৯]

মধ্য-এপ্রিল পর্যন্ত সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্যায়; এবং এরপর প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুক্তিযুদ্ধের এই পর্যায়ের সংগঠকদেরকে ভারতে ছুটতে হয় অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহের সন্ধানে। তবে এ পর্যন্ত পরিচালিত প্রতিরোধের দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের ফলে অধিকাংশ সময়ে সাফল্য; এবং দ্বিতীয়ত পরবর্তী পর্যায়ে পাক বাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণের মুখে পিছু হটে যাওয়া ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া। কেন এই ব্যর্থতা? একজন ভারতীয় সমরবিদ তিনটি কারণ নির্দেশ করেছেন। সেগুলো হলো, পাক বাহিনীর আক্রমণের ক্ষিপ্রতা ও প্রচন্ডতা, গেরিলা যুদ্ধের কৌশলের পরিবর্তে সম্মুখ সমর কৌশল অবলম্বন ও অভিযানে জুনিয়র অফিসারদের নেতৃত্ব।[২০] কিন্তু প্রশ্ন হলোঃ বিকল্প কি কিছু ছিল? সত্যি কথা বলতে কি কোন বিকল্পই ছিলনা। সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রাথমিক প্রতিরোধের ব্যর্থতার কারণ তিনটি নির্দেশ করা যেতে পারে। এবং সেগুলো হলো, পূর্ব প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক/সামরিক নেতৃত্ব ও সংগঠন, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও সরবরাহের অভাব ও যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। সবচেয়ে বড় কারণ হলো, আক্রমণকারী ও আক্রান্তের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু প্রাথমিক এই ব্যর্থতার সোপান বেয়ে আগামীতে এসেছিল বিজয়ের কাঙ্খিত উল্লাস।

মুক্তিযুদ্ধের মূল পর্যায় আলোচনার আগে এই মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, তা নাহলে মূল পরিপ্রেক্ষিত বোধগম্য হবেনা।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক শ্রেণী

এই অংশটুকু আলোচনার শুরুতেই বলে নেয়া প্রয়োজন যে, এই প্রবন্ধে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কোন রাজনৈতিক দলের প্রেক্ষাপটে না দেখে বরং আপামর জনগণের আশা-আকাংখার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ হিসেবে মূল্যায়ণ করা হয়েছে। আর সে কারণেই বিশ্লেষণের লক্ষ্য মুক্তিকামী গোটা বাঙালী সমাজ। গুটিকতক ধর্মান্ধ ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, যারা ছিলেন পাকবাহিনীর 'দালাল' (collaborator), 'শান্তি কমিটির' সদস্য ও গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যার সহযোগী কুখ্যাত 'আল-বদর' ও 'আল-শামস' ছাড়া সমাজের প্রতিটি মানুষ ছিল প্রতিরোধ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও শত্রুহননে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় 'চরমপত্র' পাঠক এম আর আখতার মুকুলের একটি বক্তব্য ঃ

> প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর ভূমিকার উল্লেখ করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর যেসব বাঙালী সদস্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে জীবনকে আত্মাহুতি দিয়েছে তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবো, অথচ শেখ মুজিবের নাম উচ্চারণ করবো না—তা হয়না। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবো, অথচ সেক্টর কমান্ডারদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর কথা বলবোনা—তা হয়না। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবো অথচ মুজিবনগর সরকারের কথা বলবোনা—তা হয়না ; তেমনি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবো অথচ পাকিস্তানের ক্যাম্পগুলোতে বাঙালী সৈন্যদের দুর্বিষহ জীবন যাত্রার কথা লিখবো না—তা হয়না। মুক্তি-যুদ্ধের কথা বলবো, অথচ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বীভৎস হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, গ্রেফতার আর নির্মম অত্যাচারের মধ্যে বসবাসকারী সাড়ে ছ'কোটি মানুষের কথা উল্লেখ করবোনা—তা হয়না। তখন সবাই আমরা ছিলাম এক প্রাণ, এক মন—বাংলাদেশের সন্তান। আমাদের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন—বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ···।[১২]

তবে সবচেয়ে বেশী অবদান ছিল ছাত্র সমাজের। এই প্রবন্ধের শেষাংশে উল্লেখিত হবে মুক্তি সংগ্রামের যে পূর্ব প্রস্তুতি, তা প্রধানত কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সত্য কথা বলতে কি, আটচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিল ছাত্র সমাজ।

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু হবার পর বিভিন্ন জেলা শহরে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তা সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালী সদস্যদের নেতৃত্বে হলেও তার প্রাণশক্তি ছিল ছাত্র সমাজ। ২৬ ও ২৭ মার্চ বগুড়ায় প্রতিরোধে প্রথম শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা স্কুলের ছাত্র টিটু, হিটলু, ছুনু ও দশম শ্রেণীর ছাত্র তারেক। উল্লেখ্য, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এদের অপটু হাতের আগ্নেয়াস্ত্রই বহু হানাদারের ইহলীলা সাঙ্গ করেছিল।[২২]

মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বেশী সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল কৃষক সমাজ। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার অপরাধে এদেরকে প্রায়ই ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পাকবাহিনীর হাতে নির্যাতন এবং মৃত্যু বা বাড়ী-ঘর ভস্মীভূত—এসব ছিল নিত্যকার ব্যাপার। কিন্তু তবুও মুক্তিযুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত এদের সহযোগী ও যোদ্ধার ভূমিকা ছিল অব্যাহত। "স্বাধীনতার জন্য তারা ছিল আন্তরিক এবং নিবেদিত। লাভ-ক্ষতির হিসাব তারা জানতোনা। একজোড়া বুট, একটি লুঙ্গী কিংবা কম্বল অথবা ভালো খাবারের প্রতিও তাদের কখনো লোভ দেখিনি। উচ্চাভিলাষহীন এই সব সরল লোককে যেখানেই যে কাজ দেয়া হয়েছে তা তারা হাসিমুখে পালন করেছে।"[২৩]

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর অংশ গ্রহণ ছিল খুবই সামান্য। মেজর রফিক-উল-ইসলামের সেকটরে চট্টগ্রামের মাত্র একশ' জন শ্রমিক ট্রেনিং নিয়েছিল। অথচ চট্টগ্রাম এলাকায় শিল্প শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় একলাখের ওপর।[২৪] এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে? অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদী শোষণ প্রক্রিয়ার শিকার তো এরাও ছিল? মনে হয়, প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংগঠনের অভাবই এর কারণ। অবশ্য ভিন্ন একটি তথ্য থেকে দেখা যায় যে, তৎকালীন জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রায় ৩০,০০০ শ্রমিক সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।[২৫] তবে নির্ভরযোগ্য কোন নিশ্চিত তথ্যের অভাবে এই প্রশ্নে চূড়ান্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা অসম্ভব।

ছাত্র সমাজের পাশাপাশি বাঙালীর জাতীয়তাবোধ উন্মেষে অবদান রেখেছিলেন বুদ্ধিজীবীগণ। আর সে কারণেই ২৫ মার্চ রাতেই হানাদার বাহিনীর প্রথম শিকার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ। এবং আসন্ন বিজয়ের মুহূর্তেও বুদ্ধিজীবী নিধনের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুজিবনগর ও ভারতের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই ভূমিকার পুরোভাগে ছিলেন ২৭মে মুজিবনগরে অধ্যাপক এ, আর মল্লিকের সভাপতিত্বে গঠিত 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'।[২৬] এই সমিতির সাধারণ

সম্পাদক ছিলেন ডঃ অজয় রায়।

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর অংশ গ্রহণের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নিয়ে স্বাধীনতাত্তোরকালে প্রচুর প্রশ্ন উঠেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে অনেক বিতর্কের।[২৭] এই প্রবন্ধের গোড়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মার্চ মাসের শেষ ক'দিনে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বা ই, পি, আর, সশস্ত্র প্রতিরোধের নেতৃত্ব না দিলে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যরকম হতো। কিন্তু এ কথা মেনে নিয়েও সার্বিক বিচারে দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর অংশ গ্রহণ ছিল খুব সামান্য; তৎকালীন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩০০০ জন ও ই, পি, আর-এর ১০,০০০ জন।[২৮] মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালী সৈনিকের সংখ্যা ছিল ১১০০ অফিসার সহ ২৮,০০০ জন। এদের মধ্যে মাত্র ২০ জনের মতো অফিসার পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।[২৯] অবশ্য যুক্তির খাতিরে মেনে নিতে হবে যে অনুকূল পরিবেশ পেলে হয়তো এ সংখ্যা আরো বেশী হতো। এ প্রসঙ্গে প্রয়াত কর্ণেল তাহেরের বক্তব্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে, "পাক সেনাবাহিনীতে এক হাজারের বেশী বাঙালী অফিসার ছিলেন। অথচ স্বদেশে কি ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের অধিকাংশেরই কোন মাথা ব্যাথা ছিলনা। আমি তাদের কয়েকশ' জনের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলাম। কিন্তু খুবই নগন্য সাড়া মাত্র পেয়েছিলাম।[৩০]" এখন প্রশ্ন ওঠেঃ বাংলাদেশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীঃ

> পাকিস্তানীরা সবচেয়ে বড় ভুল করেছিল বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নিয়ে। পাকিস্তানীরা বাঙ্গালী সৈন্যদের বিশ্বাস করেনি আর তাই বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করার আদেশ দিয়েছিলেন টিক্কা খান। প্রকৃত পক্ষে এ জন্য রাতারাতি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈনিকেরা মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হলেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে বাঙ্গালী হত্যা বাঙ্গালী সৈনিকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। জাতীয়তাবাদী চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাব গড়ে ওঠে। এই বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে যখন ওরা নিরস্ত্র করতে চাইলো তখন বিদ্রোহ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় রইলো না।[৩১]

জেনারেল ওসমানীর বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হয় আর একটি তথ্য থেকে। ২৪ মার্চ রাতেও লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল এম, আর, চৌধুরী ও মেজর জিয়াউর রহমান মেজর রফিক-উল-ইসলামকে বিদ্রোহমূলক কিছু না করতে

উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ, "ওরা [পাকিস্তানীরা] অমন চরম ব্যবস্থা [গণহত্যা] নেবেনা।"[৩২] কাজেই এই উপসংহারে উপনীত হওয়া বোধ হয় অযৌক্তিক হবেনা যে, হানাদার বাহিনীর অভিযান যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তবে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যগণ তৎপর হতেন কিনা সন্দেহ।

তুলনামূলকভাবে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ই. পি. আর-এর ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় এরাই ছিল অগ্রণী। উপরন্তু এ পর্যায়ে যুদ্ধের প্রায় সমুদয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ এসেছিল এদের কাছ থেকেই।[৩৩]

সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে আর একটি কথা স্মর্তব্য। আর তা হলো এরা অনিয়মিত বাহিনী নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে থেকেই গণ-যুদ্ধের কৌশলে আস্থাবান ছিলেন না। এরা যে সামরিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন তা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অনুরূপ।[৩৪] আর সে কারণে, ব্যাপকতর কোন অবদান রাখা এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মূল যুদ্ধ করেছে অনিয়মিত বাহিনীর কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র।

ভারতের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্যে উপস্থিত ছিল প্রায় আড়াই লাখ তরুণ। এরা সবাই ছিল সাধারণ মানুষ—ছাত্র, কৃষক শ্রমিক ও নিম্নবিত্তের পেশাজীবি।[৩৫] মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধার সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় এক লাখের মতো ; এদের মধ্যে সত্তর হাজার ছিল অনিয়মিত ও তিরিশ হাজার নিয়মিত বাহিনী।[৩৬]

রণকৌশল

অতর্কিত আক্রমণের মুখে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তা সুপরিকল্পিত ছিলনা, বা ছিলনা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। শত্রুকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের রণকৌশল নির্ধারণ করেছে। রণকৌশলের প্রকৃতি বিচারে ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :

ক. মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত : মোটামুটিভাবে আত্মরক্ষামূলক গেরিলাযুদ্ধ

খ. অক্টোবর—নভেম্বর আক্রমণাত্মক : যুদ্ধ

গ. ডিসেম্বর : সর্বাত্মক যুদ্ধ

যেহেতু পাকবাহিনীর প্রাথমিক আক্রমণধারার ওপর ভিত্তি করেই মুক্তি-যোদ্ধারা তাদের রণকৌশল নির্ধারণ করেছিল সেহেতু এই আক্রমণ ধারার বৈশিষ্ট্য জেনে নেয়া প্রয়োজন। পাকবাহিনীর প্রাথমিক আক্রমণ ছিল

তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে ছিলো হামলাকারী দল, এদের পরেই থাকতো সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় দল—যাদের কাজ ছিল অবাধে হত্যা, ও ধর্ষণ চালিয়ে যাওয়া। তৃতীয় দলে আসতো লুণ্ঠনকারীরা। এরা প্রতিটি ঘরবাড়ী লুন্ঠন করতো; এবং তারপর তাতে আগুন লাগিয়ে দিত। শোনা যায় এই শেষোক্ত কাজগুলো করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক কয়েদীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল।[৩৭] সহজেই অনুমেয় এধরনের নারকীয় অভিযানের দুটো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত বাঙালীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তাদেরকে বশে আনা; এবং দ্বিতীয়ত, অবাধ ধর্ষণের মাধ্যমে বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন করে দেয়া।[৩৮]

এমনি হামলা প্রতিহত করার জন্যে অতর্কিতে আক্রমণ করার কৌশল অবলম্বন করা হয়। এই ধরনের প্রথম আক্রমণ চালানো হয়েছিল চট্টগ্রামের কুমিরায় (২৬ মার্চ, বিকেল ৭-১৫ মিনিটে)।[৩৯] এই ধরনের আক্রমণকে ইংরেজীতে 'এ্যাম্বুশ' বলে। 'এ্যাম্বুশে' শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির আক্রমণ কৌশল ছিল। রেইড,—শত্রুর নিকটবর্তী হয়ে তাকে আক্রমণ করা। "এ্যাম্বুশ ও রেইড"—উভয়ই গেরিলা যুদ্ধের কৌশলভুক্ত। গেরিলা রণকৌশলের বৈশিষ্ট্যই হলো লক্ষ্যবস্তুর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে পালিয়ে যাওয়া। অবশ্য প্রথম থেকেই একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছিল যে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে গেরিলা বা অন্য রণকৌশলের প্রকৃতি নির্ধারিত হবে; এবং বাস্তবেও বিভিন্ন সেকটর কমাণ্ডারগণ নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে রণকৌশল নির্ধারণ করেছিলেন।[৪১] তবে লক্ষ্যণীয়, যেসব সেক্টরে প্রধানত গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল সেখানেই সাফল্যের পরিমাণ ছিল বেশী। সে সময়ের প্রেক্ষিতে গেরিলা পদ্ধতির কোন বিকল্প বাঙালীদের জন্যে ছিলনা। কারণ, প্রায় সম্পূর্ণ প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় পৃথিবীর অন্যতম সুশিক্ষিত একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালীকে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল। সীমাবদ্ধ রসদ, অপ্রতুল অস্ত্র, অনিয়মিত সববরাহ ও সীমিত সংখ্যক ট্রেনিংপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর অফিসার ও জোয়ান দিয়ে পেশাদার পদ্ধতির সামনাসামনি যুদ্ধ করা সম্ভব ছিলনা। গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা যে পদ্ধতিটি বেশী ব্যবহার করেছেন তা হলো, গ্রেনেড নিক্ষেপ। এবং গ্রেনেড নিক্ষেপের জন্যে থাকতো গ্রেনেড পার্টি বা সুইসাইড স্কোয়াড। এই গ্রেনেড পার্টি এপ্রিলের পর থেকে হানাদার বাহিনীর জন্যে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং রাতে তাদের গতিবিধি প্রায় বন্ধ করে দেয়। এই পদ্ধতির যুদ্ধে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী বিশেষ কৃতিত্বের

স্বাক্ষর রেখেছিল।[৪১] তবে সত্যি কথা বলতে কি, এমন অনেক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যখন ঠিক প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে শত্রুর মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি; মোকাবেলা করতে হয়েছে উপস্থিত বুদ্ধি প্রসূত কৌশল দিয়ে। এমনি দৃষ্টান্ত ছিল বগুড়ায় প্রাথমিক প্রতিরোধের একটি অভিযান। ১ এপ্রিল বগুড়া ক্যান্টমেনন্টের দিকে অনুকূল বাতাসে শুধুমাত্র মরিচের গুঁড়ো ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে আত্মসমর্পণ করানো হয়েছিল।[৪২]

অক্টোবর—নভেম্বরে শুরু হয়েছিল গেরিলা কমান্ডো অভিযানের পাশাপাশি আক্রমণাত্মক সম্মুখ সমরের কৌশল। ডিসেম্বরে এবং যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছিল সর্বাত্মক যুদ্ধের কৌশল। অবশ্য তা সম্ভব হয়েছিল ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গেরিলা কৌশল ভিত্তিক একটি প্রলম্বিত জনযুদ্ধের জন্যে মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। অক্টোবব মাসে কলকাতায় সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনে কর্নেল তাহের এমনি একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সঠিকভাবে অনিয়মিত গেরিলা বাহিনী বাড়ালে কৃষক-শ্রমিক ও ছাত্র সমন্বয়ে কমপক্ষে ২০ ডিভিশনের 'বাহিনী গড়ে তোলা' সম্ভব। এই প্রস্তাবের পক্ষে দুটো যুক্তি ছিল, প্রথমত, স্বাধীনতার পর এই উৎপাদন মুখী বাহিনী দেশের পুর্ণগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এরা শত্রুর গোলাবারুদ কেড়ে নিয়ে যুদ্ধ করবে সেহেতু বিদেশী অস্ত্র ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। কিন্তু সামরিক বাহিনীর বেশীরভাগ অফিসার ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।[৪৩] কারণ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, "...বইয়ে' লেখা ক্লাসিকাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার করে দেশ মুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৪৪] তবে মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক।

বর্তমান যুগকে বলা হয় অনেকাংশেই প্রচার মাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলতে হবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অনেকটা কৃতিত্ব যেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একদিকে যেমন মুক্তিযোদ্ধার মনোবল অটুট রাখতে সাহায্য করেছে তেমনি বাইরের বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরেছে। বলা যেতে পারে এই বেতার কেন্দ্র ছিল যেন মুক্তিযুদ্ধের "দ্বিতীয় ফ্রন্ট"।[৪৫] মুক্তিযোদ্ধা ও এই বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক মেজর ভূঁইয়ার বক্তব্য উদ্ধৃত করেই আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মূল্যায়ণ করতে পারি। আমাদের মুক্তি সংগ্রামে এই বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ঐতিহাসিক। এই

বেতার কেন্দ্রটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মনোবলকে অটুট ও অক্ষয় রেখেছে। বিশ্ব জনমত গঠনেও এই বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ন্যূন নয়। হানাদার দখলীকৃত বাংলার কোটি কোটি মানুষ যেমন এই বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনে সংগ্রামী চেতনায় এবং সাফল্যের আশাবাদে উদ্দীপিত হয়েছে তেমনি মুক্তাঞ্চলের মানুষও হয়েছে অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ। সুতরাং বেতার প্রচারণাকেও মুক্তিযুদ্ধের কৌশলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর নামেই চট্টগ্রাম থেকে এই বেতার মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। অথচ তখন সবাই জানতেন বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়েছেন। কিন্তু সব জেনেশুনে প্রচারের মাধ্যমে জাতির মনোবলকে অটুট রাখতে ও বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধের একটি সঙ্গত ভিত্তি উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এই সুপরিকল্পিত মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছিল।

বেতার কেন্দ্রটির প্রথম নাম ছিল 'বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। কিন্তু পরে সম্ভবত রাজনৈতিক কারণেই নাম বদলে গিয়ে হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।[৪৭]

মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র

মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিরোধে প্রধান অস্ত্র হলো যার হাতে যা ছিল। প্রাথমিক অস্ত্রের মধ্যে ছিল ৩০৩ রাইফেল, ৩" মর্টার, এস, এম, জি ইত্যাদি। কিন্তু মধ্য এপ্রিলের মধ্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও রসদপত্রের অভাবে পিছু হটে যেতে হয়। এরপর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় অস্ত্র সরবরাহের জন্যে। ব্যাপকহারে অস্ত্র সরবরাহে ভারত সরকারে অনীহা থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে সামান্য কিছু অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল; এবং তা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সামরিক অফিসার বা ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।[৪৮] মুক্তি-যোদ্ধাদের জন্যে অস্ত্র সরবরাহে ভারত সরকারের ইতস্তত করার পেছনে তিনটি কারণ ছিল। প্রথমত, এ অস্ত্র নকশালদের সশস্ত্র আন্দোলনে জন্যে ব্যবহার করা হতে পারে বলে ভারতের সন্দেহ ছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যত ও মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষতা সম্পর্কে ভারত প্রাথমিক পর্যায়ে নিশ্চিত, হতে পারেনি। তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে পরিস্থিতি আওয়ামী লীগ পন্থী জাতীয়বাতাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে কিনা, সে বিষয়ে ভারত সরকার নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন।[৪৯] অবশ্য আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার সাতষট্টি কোটি টাকার আধুনিক অস্ত্র ভারত থেকে

ছিল প্রায় ৪০,০০০ হাজার রাজাকার বাহিনী। বিমান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এক স্কোয়াড্রন স্যাবর বিমান, কয়েকটি পরিবহণ বিমান ও হেলিকপ্টার। পূর্ব পাকিস্তানের নৌ-বাহিনী মাত্র কয়েকটি গানবোট নিয়ে গঠিত ছিল।[৬২]

মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও বিক্ষিপ্তভাবে। অবশ্য এপ্রিল প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেদিন তেলিয়াপাড়া হেড কোয়ার্টারে বাঙ্গালী অফিসাররা কর্ণেল ওসমানীকে বাংলাদেশ সেনা-বাহিনীর প্রধান হিসাবে মনোনীত করেন। কিন্তু পাকবাহিনী সিলেট দখল করে নেবার পর এই হেডকোয়ার্টারের পতন হয়।[৬৩]

তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয় ১১-১৭ জুলাই কলকাতায় অনুষ্ঠিত সেকটর কমান্ডারদের বৈঠকে। এই সম্মেলনে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, সমস্যা ও ভবিষ্যত রণকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। চারটি প্রধান সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল; এবং সেগুলো হলো ঃ

১. গেরিলা যুদ্ধের আয়োজন

ক. নির্ধারিত এলাকায় নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে পাঁচ অথবা দশজনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হবে।

খ. গেরিলাদের শ্রেণী বিভাজন

এ্যাকশন সেনা ঃ এরা সরাসরি শত্রুর বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনা করবে। তারা শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ অস্ত্র বহনকারী হবে। গোয়েন্দা সেনা ঃ এরা সাধারণত কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হবেনা। এদের কাজ হবে শত্রুপক্ষের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা। এদের শতকরা ৩০ জনের কাছে অস্ত্র থাকবে।

২. নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে অবিলম্বে ব্যাটালিয়ন ফোর্স এবং সেক্টর ট্রুপ্স গঠন।

৩. শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরি-চালনার সিদ্ধান্ত ঃ

ক. শত্রুর বিরুদ্ধে রেইড ও এ্যামবুশের জন্যে বিপুল সংখ্যক গেরিলাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো,

খ. শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত করে এ কাজ করা,

গ. পাকিস্তানীদের কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানী করতে না দেয়া।

ঘ. শত্রুসেনার গতিবিধি ব্যাহত করার জন্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া।

ঙ. রণকৌশলের লক্ষ্য শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া; এবং

চ. ছত্রভঙ্গ সেনাদের বিচ্ছিন্ন দলগুলোর ওপর মরণ আঘাত হানা।

আপাত দৃষ্টিতে এ ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত একটি যুদ্ধের কৌশল ও প্রস্তুতি। কিন্তু প্রয়োজনীয় রসদ ও নেতৃত্বের অভাবে সব অভিযান ঠিক পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত হয়নি।

চতুর্থ ও শেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়ঃ

সেক্টর নম্বর ও এলাকা	কমান্ডারগণের পদবী ও নাম
১—চট্টগ্রাম, পাবত্য চট্টগ্রাম ও নদী পর্যন্ত	মেজর জিয়াউর রহমান ক্যাপটেন পরে মেজর মোহাম্মদ রফিক
২—নোয়াখালী জেলা, আখাউড়া ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা, ঢাকা জেলা এবং ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ	মেজর খালেদ মোশাররফ মেজর, এ টি, এম, হায়দার
৩—আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা ও সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা এবং ঢাকা জেলার কিছু অংশ ও কিশোর গঞ্জ	মেজর কে, এম, শফিউল্লাহ ক্যাপটেন পরে মেজর এ এন এম নূরুজামান
৪—সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেল লাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট ডাউকি সড়ক পর্যন্ত	মেজর সি আর দত্ত
৫—সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট-ডাউকি সড়ক হতে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পর্যন্ত	মেজর মীর শওকত আলী

৬—রংপুর জেলা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ মহকুমা (পরে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে রংপুর জেলার ব্রহ্মপুত্র নদী তীরের অঞ্চল ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে নেয়া হয়)	উইং কমান্ডার এম এ বাসার
৭—দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা	মেজর কাজী নুরুজ্জামান
৮—কুষ্টিয়া, যশোর ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক বাদে খুলনা পর্যন্ত	মেজর আবু ওসমান (আগস্ট পর্যন্ত) মেজর এম এ মঞ্জুর যুদ্ধের শেষ দিকে ৯ নম্বর সেক্টরও তাঁর অধীনস্থ হয়।
৯—দৌলতপুর—সাতক্ষীরা সড়ক হতে দক্ষিণে খুলনা জেলা এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা	মেজর জলিল (ডিসেম্বরের প্রথম পর্যন্ত) মেজর জয়নাল আবেদীন (ডিসেম্বর মাসের শেষ কয়দিন)
১০—নৌ-কমান্ডো সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ	নৌ-কমান্ডোরা বিভিন্ন সেক্টরে নির্দিষ্ট মিশনে নিয়োজিত থাকাকালে সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে কাজ করতেন।
১১—ময়মনসিংহ জেলা (কিশোরগঞ্জ বাদে) এবং টাঙ্গাইল জেলা	মেজর আবু তাহের (আগস্ট-নভেম্বর) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এস হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

এ ছাড়াও ছিল তিনটি ব্রিগেড আকারের ফোর্স ঃ

ফোর্স-এর নাম	অধিনায়ক
জেড ফোর্স	মেজর পরে লেঃ কর্ণেল জিলাউর রহমান
কে ফোর্স	মেজর পরে কর্ণেল খালেদ মোশাররফ (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) মেজর আবু সালেক চৌধুরী (নভেম্বর-ডিসেম্বর)
এস ফোর্স	মেজর পরে লেঃ কর্ণেল কে এম শফিউল্লাহ[৬৪]

সৈনিকদেরও বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়।

নিয়মিত বাহিনী ঃ

এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল উপরোক্ত তিনটি ফোর্সের সেনারা। এ'রা অধিকাংশই ই, পি, আর থেকে এসেছিলেন।

সেকটর ট্রুপ্স ঃ উপরোক্ত ব্যাটালিয়ান গুলোতে যে সব ই, পি, আর, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি তাদেরকে যার যার সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্যে ইউনিট ও সাব ইউনিটে ভাগ করা হয়। নিয়মিত ব্যাটালিয়নের চেয়ে সেক্টর ট্রুপের অস্ত্রবল ছিল কম।

অনিয়মিত বাহিনী অথবা ফ্রিডম ফাইটার্স (এফ এফ)

গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্যে যাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে বলা হতো ফ্রিডম ফাইটার্স—সরকারী নাম ছিল অনিয়মিত বা গণবাহিনী।[৬৫]

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের অধীন নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী ছাড়াও সম্পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে কিছু বাহিনী (বামপন্থী দল ছাড়া) গড়ে উঠেছিল। এদের কিছু অংশ বাংলাদেশের মাটিতেই জন্ম হয় এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে বিভিন্ন অঞ্চল মুক্ত করে।

মুজিব বাহিনী (বি, এল, এফ) ঃ এই বাহিনীগুলোর মধ্যে একমাত্র মুজিব বাহিনীর জন্ম হয় ভারতে। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বাছাই করা তরুণ ও শিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই বাহিনী। নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। বাংলাদেশ সরকার ও সেক্টর কমান্ডারদের অজ্ঞাতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (RAW) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই বাহিনীর

জন্ম। এদের ট্রেনিং হতো দেরাদুন ও আসামের হাফলঙে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এরা উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। কিন্তু বিভিন্ন সেক্টরে মুজিব বাহিনী সম্পর্কে অগ্রিম কোন নির্দেশ না থাকায় বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এমনকি যশোর ও আখাউড়ায় মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর মধ্যে অক্টোবর মাসে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছিল। এমনি সংঘর্ষ বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গেও হয়।[৬৬]

কাদেরিয়া বাহিনীঃ টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর (পরবর্তীকালে বাঘা সিদ্দিকী নামে খ্যাত) অধীনে গড়ে ওঠে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করেই এই বাহিনী নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনার কিছু অংশ ছিল এই বাহিনীর এলাকা। সব মিলিয়ে এরা প্রায় সাড়ে তিনশ'র বেশী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। প্রায় সহস্রাধিক পাকিস্তানী সেনা এদের হাতে নিহত হয়েছিল; কিন্তু নিজেরা হারিয়েছিল মাত্র একত্রিশ জন মুক্তি যোদ্ধাকে। কাদেরিয়া বাহিনী হানাদারদের কাছে ছিল এক মহা-আতঙ্কের নাম। কাদের সিদ্দিকীর নিয়ন্ত্রণে ছিল প্রায় ১৫০০০ হাজার বর্গমাইল এলাকা।[৬৭]

আফসার ব্যাটেলিয়নঃ ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার মল্লিকবাড়ী গ্রামে মাত্র একটি রাইফেল নিয়ে মেজর আফছার উদ্দীন আহমেদ তাঁর ব্যাটালিয়ন গঠন করেন। এই বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার। জুন মাসে ভালুকা থানার বাজু এলাকায় আফসার ব্যাটালিয়ন পাকবাহিনীর সঙ্গে একটানা ৪৮ ঘণ্টা সামনা সামনি যুদ্ধ করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন।[৬৮]

হেমায়েত বাহিনীঃ গোপালগঞ্জ এলাকার হেমায়েত উদ্দীন ছিলেন দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদার। ২৯ মে বরিশাল গৌরনদী থানার বাটরাবাজারে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হেমায়েত বাহিনীর উদ্বোধন করেন। জুন মাসের মধ্যেই এই বাহিনী বরিশাল ও ফরিদপুরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করে। সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীনভাবে গড়ে ওঠা এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০৫৪ জন। তাদের মধ্যে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছিল ৩৪০ জন। এদের অস্ত্র-শস্ত্রের বেশীর ভাগই ছিল পাকবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া। মোট আঠারটি সফল আক্রমণের কৃতিত্ব ছিল এই বাহিনীর।[৬৯]

বালাদেশ নৌবাহিনী

আগষ্ট মাসের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীনের নেতৃত্বে মুজিব

নগর সরকার বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা পোর্ট কমিশনারের নিকট থেকে 'এম ভি পলাশ' ও 'এম ভি পদ্মা' নামে দুটো জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। প্রায় ৩৮ লাখ টাকা খরচ করে এগুলোকে নৌ-যুদ্ধের উপযোগী করে তোলা হয়; এবং প্রতিটি জাহাজে দুটো করে ৪০ মিলিমিটার কামান বসানো এই দুটো জাহাজ ও বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী থেকে পালিয়ে আসা ৪৫ জন নৌ-সেনা নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গোড়া পত্তন হলো।

অক্টোবর থেকে শুরু হয় অপারেশন হট প্যান্ট্স সাংকেতিক নামে নৌ-কমান্ডো অভিযান, যার লক্ষ্য ছিল খুলনা ও মঙ্গলা এলাকায় শত্রু নৌযানের ওপর আঘাত হানা ও পসুর নদীর মোহনায় মাইন স্থাপন করা। নভেম্বর পর্যন্ত ৮৬০ জন নৌ-কমান্ডোকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। এরা বিপুল সংখ্যক কোস্টার, ট্যাংকার টাগ, বার্জ ও বড় জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত বা ডুবিয়ে দিয়েছিল। উপরন্তু ১৪ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দরে কমান্ডো অভিযানের ফলে পাকিস্তানের সম্ভার বহনকারী 'এম ভি আল-আব্বাস' ও 'এম, ভি, হরমুজ' ডুবে গিয়েছিল। ডিসেম্বর পর্যন্ত এমনি নৌ তৎপরতার ফলে পাকিস্তানীদের ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৪০ কোটি টাকার মতো। তবে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর বড় রকমের অভিযান ছিল ১০ ডিসেম্বর। গানবোট 'পদ্মা' ও 'পলাশ' মঙ্গলা বন্দর আক্রমণের জন্যে খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছুলে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত হয়। ব্যাখ্যা হিসেবে পরবর্তী সময়ে বলা হয়, যথাযথ বেতার যোগাযোগের অভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী জাহাজ দুটোকে পাকিস্তানী গানবোট মনে করেছিল। কিন্তু বোমা বর্ষণের আগে বিমান বহর গানবোট দুটোর কাছে দিয়ে খুব নীচু হয়ে উড়ে গিয়েছিল। এর পরেও গানবোট চিনতে অভিজ্ঞ পাইলটদের বিভ্রান্তি হবার কথা নয়। মূল ব্যাপারটি আজও রহস্যাবৃত।[৭০]

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

১৯৭১-এর ২৮ সেপ্টেম্বর নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে এয়ার কমোডর এ, কে, খন্দকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্ম হয়। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ১৭ জন বাঙালী অফিসার ও ৫০ জন দক্ষ টেকনিশিয়ান মুজিবনগর সরকারের প্রতি অনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। ভারত থেকে সংগ্রহ করা একটি ডাকোটা, একটি অটার বিমান ও একটি এলুয়েট হেলিকপ্টার দিয়েই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। এগুলোতে বসানো হয় ৩০৩ ব্রাউনিং মেশিন

গান আর বোঝাই করা হলো, কিছু রকেট ও ২৫ পাউন্ডের বোমা। প্রশিক্ষণ শুরু হবার প্রাক্কালে এই বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন পি, আই, এ, থেকে ডিফেক্ট করা ছ'জন বাঙালী পাইলট। ৩ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনী যে সফল আক্রমণধারা রচনা করেছিল তার প্রথম আক্রমণের কৃতিত্ব বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর। ঢাকা পতন পর্যন্ত এই বিমান বাহিনী প্রায় বারো বারের বেশী পাকিস্তানী লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল।[৭১]

মোটামুটিভাবে বলা যায় অর্থ, সামর্থ ও রসদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল। তবে একটি গতানুগতিক যুদ্ধের সামরিক সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সামরিক সংগঠনকে ব্যাখ্যা করা যাবেনা। কারণ মুজিবনগর সরকারের সংগঠনের বাইরেও ছিল বিভিন্ন বাহিনীর নিজেস্ব সংগঠন। উপরন্তু ছিল বামপন্থী দলগুলোর স্বতন্ত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ।

মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দল ঃ

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলোকে দুটি ভাগে করা যায়। প্রথম দলে ছিল বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (মস্কোপন্থী) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কোপন্থী), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), কৃষক সমিতি। এরা ভারতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় দলে ছিল অন্যান্য বামপন্থী সংগঠন।

প্রথম দলগুলোয় প্রায় ৬০০০ হাজার সদস্য মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সেক্টরে ভূমিকা পালন করে।[৭২] তবে এদের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে মূল আওয়ামী নেতৃত্ব কোন সময়ে সন্দেহমুক্ত ছিলেন না। বিশেষ করে মুজিব বাহিনী সৃষ্টি হবার পর এই বামপন্থী সহযোগী দল বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে। কাজেই সহানুভূতিশীল তাজুদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় মুজিব বাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে বামপন্থী কমান্ডো দল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন ছিল। এই কমান্ডো দলের প্রায় ২০০০ সদস্য ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।[৭৩]

১৯৭১-এর মে মাসে প্রণীত পার্টি থিসিসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে চারটি যুক্তি দেখানো হয়ঃ এই যুদ্ধের সফল পরিণতি দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে, পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করবে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অবসান করে ভারতের সঙ্গে

সম্পর্ক উন্নতি করবে; এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কও উন্নত হবে। উপরন্তু যুক্তি দেখানো হলো যে, বুর্জোয়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে সঠিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হতে পারে না।[৭৪] সুতরাং মুক্তিযুদ্ধকে একটি যথার্থ উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার জন্যে গঠিত হলো মন্ত্রণা পর্ষদ; যার সদস্য ছিলেন, মওলানা ভাসানী, মণি সিং, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, মনোরঞ্জন ধর, তাজুদ্দিন আহমেদ ও মুশতাক আহমেদ।

এই দলগুলোর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুখপত্র ছিল "নতুন বাংলা" ও "মুক্তিযুদ্ধ"।

মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পিকিংপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সিষ্ট লেনিনিষ্ট) দেশের অভ্যন্তরে থেকেই প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়, যার লক্ষ্য হবে পাকবাহিনী ও আওয়ামী লীগের বিনাশ সাধন। কারণ, পার্টি থিসিস অনুসারে এরা উভয়েই ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারী। এদের পাশাপাশি শ্রেণী শত্রু নিধনের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, সিলেট ও কুষ্টিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় দশ হাজার 'লাল বাহিনী' মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। অনেক সেক্টরে এদেরকে মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়ে। উপরন্তু আগষ্ট মাসের শেষ দিকে মুক্তিবাহিনীকে ভারতের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হলো লাল বাহিনীকে যে কোন মূল্যে নিশ্চিহ্ন করতে। এবং ২৮ আগষ্ট থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যশোর এলাকার লাল বাহিনীর বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য মুজিব বাহিনীর হাতে নিহত হয়।

১৯৭১-এর আগষ্ট মাসে স্বাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত চুক্তি এই দলকে দুভাগে বিভক্ত করে। আবদুল হকের নেতৃত্বে একটি অংশ যুক্তি দেখায় যে, এই চুক্তির পর বাংলাদেশ বলেছিল রুশ-ভারতের তাঁবেদার রাষ্ট্র। এবং এই কারণেই চীনের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করা হোক ও শুরু হোক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।[৭৫] মূল দলটি তোয়াহার নেতৃত্বে আগের মতোই মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এই দ্বিধা বিভক্তির পর দলটি দুর্বল হতে থাকে। উপরন্তু মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের মুখে অক্টোবর-এর শেষ দিক থেকেই পার্টির প্রকাশ্য অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে যশোর এলাকার পার্টি যোদ্ধারা যত শহীদ হয়েছে, তাদের অর্ধেকটার জন্যে দায়ী ছিল মুজিব বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী।

উল্লেখ্য যে, যশোর এলাকার পার্টির ভূমিকা ছিল বেশ স্বতন্ত্র। কারণ তারা যুদ্ধের পাশাপাশি কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে জোতদার ও ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরেছে। এ কারণেই জোতদার শ্রেণীর অনেকেই মুক্তি বাহিনীর সদস্য হয়ে পার্টির বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে প্ররোচিত করে।[৭৬]

পিকিংপন্থী পূর্ব বংলার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দুটি ভাগ ছিল। একটি অংশ টিপু বিশ্বাস ও দেবেন শিকদার মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে। অপরদিকে মতিন-আলাউদ্দীন এর দল দুই শ্রেণী শত্রু, মুক্তি বাহিনীও পাকবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার পক্ষপাতি ছিল।

এ পার্টির গেরিলা যোদ্ধারা রাজশাহীর আত্রাই এলাকায় বেশ তৎপর ছিল।[৭৭]

১৯৬৮-র জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনের মূল থিসিস ছিল, পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি উপনিবেপ এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান করতে হবে। এই লক্ষ্যে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে একটি 'বিপ্লবী পরিযদ' গঠিত হয়। ১৯৭০ পর্যন্ত বিপ্লবী পরিষদের সদস্যবৃন্দ পাকিস্তানী প্রশাসনের ও শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলায় গেরিলা অভিযান পরিচালনা করে। ১৯৭০-এর ৮ জানুয়ারী ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ ও ময়মনসিংহে স্বাধীন পূর্ব বাঙলার পতাকা উত্তোলন করে।

হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলার পর কমরেড সিরাজ সিকদার বরিশালের পেয়ারা বাগানে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ৩০ এপ্রিল জন্ম নেয় 'জাতীয় মুক্তি বাহিনী'। রণকৌশল নির্ধারণ ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে সিরাজ সিকদারের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো 'সর্বোচ্চ সামরিক পরিচালনা কমিটি'। ৩ জুন পার্টির নতুন নাম দেয়া হয় পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি।

বরিশাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চল, বিক্রমপুর, মানিকগঞ্জ, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় সর্বহারা পার্টির গেরিলারা পাকবাহিনীর সাথে লড়েছেন।

মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্যে বেশ কিছু পর্ষদ গঠিত হয়েছিল।

আগষ্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে মুজিব বাহিনী ও সর্বহারা পার্টির মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বেশ কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। এমনি পরিস্থিতিতে অক্টোবর-এ পার্টির পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হলো পাকবাহিনী, ভারতীয় বাহিনী ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। নভেম্বরের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থক মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছিল বহু সর্বহারা পার্টির সদস্য।[৭৮]

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় ও ঢাকার পতন

অক্টোবর-এর পর থেকেই প্রতিটি সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর সফল তৎপরতা প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়েছিল। এতে পাকসেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। অপর-দিকে আগষ্ট মাসে রুশ-ভারত চুক্তি হবার পর থেকেই ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আগের তুলনায় বেশী পরিমাণ আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। এমনি পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্ররোচনায় ভারতকে সরাসরি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয় ৩ ডিসেম্বর। অবশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালিত নভেম্বরে বেলুনিয়া অভিযানের সময় থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশ গ্রহণ শুরু হয়েছিল।

বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করতে কৌশলগত পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লক্ষ্য ছিল ঃ

ক. যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে (সর্বাধিক তিন সপ্তাহ) মুক্তি-বাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্বাধীন করা,

খ. চীনের দিক থেকে সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষা করা,

গ. আক্রমণাত্মক ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের সংহতি রক্ষা ; এবং

ঘ. নাগাল্যান্ড, মনিপুর এবং মিজোরাম এলাকায় বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা দমন।[৭৯]

অবশ্য ভারতকে একই সঙ্গে পশ্চিম রণাঙ্গণেও পাকিস্তানের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির কারণে এখানে দ্রুত গতিতে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টেনে দেয়া সম্ভব নয়। তবুও তিন সপ্তাহের পরিবর্তে দু'সপ্তাহেই ঢাকা মুক্ত হয়েছিল; এবং তা সম্ভব হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বিগত ক'মাসের ভূমিকার ফলে। ১৬ ডিসেম্বর সকাল দশটায় পাকিস্তানী ১৪ ডিভিশন কমাণ্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ মীরপুর ব্রীজের কাছে ভারতীয় জেনারেল নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১০-৪০ মিনিটে ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও কাদের সিদ্দিকী ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করেন। দীর্ঘ ন'মাসের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হলো। অবশ্য তখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-খাটো যুদ্ধ চলছিল।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। সময়, বিকেল ৪—২১ মিনিট। স্থান, ঢাকার রেসকোর্স ময়দান। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তি–বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন পাকিস্তানের খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক এবং ইষ্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান

নিয়াজী। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশ গ্রহণের যৌক্তিকতা ?

ন'মাস ধরে বহু বাধা বিপত্তি ও পরিস্থিতির প্রতিকূলতা কাটিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধ ক্রমান্বয়ে পূর্ণতার পথে ছিল প্রায়, তা যেন আকস্মিকভাবেই শেষ হলো! ঠিক যেমন আকস্মিকভাবে এর সূচনা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধার কৃতিত্ব ও দক্ষতা নিয়ে বিতর্ক আছে, বিতর্ক আছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিয়ে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কিছু ভারতীয় সামরিক ব্যক্তিত্ব মুক্তিযোদ্ধার পারদর্শিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।[৮০] একজন ভারতীয় সমরবিদের সুচিন্তিত মন্তব্য, "যদিও বাঙালীরা সোচ্চার যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা তাঁদের দেশকে মুক্ত করতে পারতেন; কিন্তু তবুও প্রতীয়মান হয়েছিল যে, বাস্তবে তা তাদের সাধ্যের বাইরে।" একই ব্যক্তি কিছুদূর এগিয়ে মন্তব্য করেছেন "এটা ভাবা অসঙ্গত হবে যে, মুক্তিবাহিনী সম্পূর্ণ অকেজো ছিল। দু-একটি ক্ষেত্রে হয়তো তারা, ভারতীয় অফিসারদের বক্তব্য অনুসারে অপেক্ষাকৃত কম সফল হয়েছিল। কিন্তু মোটের ওপর তারা যতটুকু করেছে তা অনেকেই ভাবতে পারেনি।"[৮১] বক্তব্য দুটোতে স্ব-বিরোধিতা আছে; কিন্তু তা এই বিতর্কের দুটো দিকও তুলে ধরেছে।

আত্মসমর্পণের পর জেনারেল নিয়াজী একবার বলেছিলেন, "তারা [মুক্তিবাহিনী] আমাকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছে।"[৮২] আত্মসমর্পনের প্রাক্কালে অনেক পাকিস্তানী সৈনিককে চীৎকার করতে শোনা গিয়েছে, "সারেন্ডার করুংগা—মগর মুক্তি কা পাস নেহী, হিন্দুস্থানী ফৌজ কা পাস্ করুংগা"।[৮৩] এ বক্তব্য দুটো এমন সব ব্যক্তিত্বের যারা ন'মাস মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেখেছে এবং তাদের কর্ম-কান্ডের লক্ষ্যবস্তু ছিল। সুতরাং যুক্তির বিচারে যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সংস্পর্শে মাত্র দু'সপ্তাহ ছিল তাদের চেয়ে যারা ন'মাস ছিল তাদের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। একটি প্রলম্বিত গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া বাংলাদেশকে মুক্ত করা যেত, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট সঙ্গত ভিত্তি আছে। জেনারেল ওসমানীও ভাবতেন এমনি কৌশলে আর দশমাসে তা সম্ভব হতো।[৮৪]

ভারতের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কারণ ও পটভূমি ভিন্ন। প্রথমত, পশ্চিম বাংলার দুর্বল অর্থনীতির ওপর প্রায় এককোটি শরণার্থীর চাপ অনির্দিষ্টকাল গ্রহণযোগ্য ছিলনা। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন গেরিলা যুদ্ধের

মাধ্যমে যে জনযুদ্ধের সৃষ্টি হতো, তা নতুন বিপ্লবী চেতনার জন্ম দিত; এবং যার সংক্রমণ থেকে হয়তো আসাম, নাগাল্যান্ড মিজোরাম —প্রভৃতি এলাকাকে দূরে রাখা যেতনা। তৃতীয়ত, এমনি পরিস্থিতিতে রুশভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ও সরকার গঠন অনিশ্চিত হতো। চতুর্থত, সর্বাত্মক সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশকে স্বল্প সময়ে স্বাধীন করিয়ে দিলে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে ভারতের প্রতি চিরদিন অনুগত থাকবে। পঞ্চমত, দীর্ঘদিনের বৈরী প্রতিবেশী পাকিস্তানকে একটু শিক্ষা দেয়া।

উপসংহার

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কোন সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত বিপ্লবী যুদ্ধ ছিলনা। এটি ছিল একটি প্রতিরোধ আন্দোলন মাত্র। বিপ্লবী যুদ্ধের পূর্ব-শর্ত সমূহ এখানে অনুপস্থিত। এমনকি গণহত্যার প্রায় প্রকাশ্য পাকিস্তানী প্রস্তুতি সত্ত্বেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কোন অর্থবহ সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে তৎপর হননি। একাত্তরের প্রতিরোধ প্রাথমিক পর্যায়ে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল; এবং তা ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিকভাবেই জনযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। প্রতিরোধের প্রকৃতি এমনিই ছিল যা লিন বিয়াও-র ভাষায় "Countryside overwhelming the cities"—এর মতো।

একাত্তরের প্রতিরোধ কোন ব্যক্তি বা দলের সৃষ্টি নয়। আপামর জনগণই ছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধের স্রষ্টা। বহুদিনের শোষণ নির্যাতনে যে সংগ্রামী চেতনার সঞ্চয় তারই বহিঃপ্রকাশ ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধ। সংগ্রামী চেতনার লালনে জনগণ ছিলেন নেতৃত্বের চেয়ে অগ্রসর।

তথ্যনির্দেশ

১. যেমন মেজর ভুঁইয়া মন্তব্য করেছেন, "২৬শে মার্চ ভোরে যে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে তা আমরা অনেকেই ২৫শে মার্চের মধ্য রাতেও জানতাম না।" দ্রষ্টব্য মেজর এম. এস. এম. ভূঁইয়া, "মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস", ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ২৭।

২. বিশেষ উল্লেখ্য হলো: ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে Karl Marx and Friedrich Engels, *Revolution and Counter-Revolution*, Eleanor Marx Aveling. (ed.), New York, 1896; Pritim A. Sorokin, *The Sociology of Revolution*, Philadelphia, 1925; George S. Pettee, *The Process of Revolution*, New York, 1938; Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution*, New York, 1938;

Hannah Arendt, *On Revolution*, New York, 1963 ; এবং বর্তমান প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রষ্টব্য Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Princeton, 1970 ; James C. Davies (ed.), *When Men Revolt And Why : A Reader in Political Violence*, London, 1971 ; Lois Kreisberg, *The Sociology of Social Conflicts*, Englewood Cliffs, New Jersey : 1973 ; W. G. Runciman, *Relative Deprivation and Social Justice*, Berkeley, 1960 ; Ted Gurr "Psychological Factors in Civil Violence" in *World Politics*, Vol. XX, January 1968, pp. 247-251.

৩. ওপরের পাদটীকার দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত বই ও প্রবন্ধের ভিত্তিতে মডেলটি নির্মাণ করা হয়েছে।

৪. ঔপনিবেশিক আফ্রিকার পরিপ্রেক্ষিতে এমনি ধরনের তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্রষ্টব্য Meddi Mugyenyi, "The Sources of Collective Rebellion : Nationalism in Buganda and Kikuyuland," in *Transafrican Journal of History*, Vol.8, Nos. 1 and 2, 1974, pp. 94—104.

৫. Relative Deprivation-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে "as actors' perception of discrepancy between their value expectations and their value capabilities. Value expectations are the goods and conditions of the life to which people believe they are rightfully entitled. Value capabilities are the goods and conditions they think they are capable of getting and keeping". দ্রষ্টব্য Gurr, *Why Man Rebel*, p. 24, এবং Runciman, *Relative Deprivation and Social Justice*, p. 9, ১৯৪০-এর দশকে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীগণ প্রথম RD তত্ত্বটি ব্যবহার করেন।

৬. মেজর রফিকুল ইসলাম, "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে", ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৬৮।

৭. নীচে দ্রষ্টব্য।

৮. বামপন্থী দলগুলোর ভূমিকা নীচে "মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদল" শীর্ষক অংশে আলোচিত হবে।

৯. একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে, পৃঃ ৬৭-৬৮।

১০. মহিউদ্দীন খোকন, স্বাধীনতার চেতনা, "মশাল", ২৮ মার্চ ১৯৮৬ ; ও মুক্তিযোদ্ধা কাজী আরেফ আহমেদ-এর সঙ্গে সাক্ষাতকার, ৯, ৮, ৮৫।

১১. ২৫ মার্চের সামরিক অভিযান ও তার পূর্ব পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য Lt. Col. Siddik Salik, *Witness to Surrender*

ও General Fazal Muqeem Khan, *Pakistan's Crisis in Leadership*, প্রয়োজনীয় অংশের বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত মেজর রফিকুল ইসলাম, "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে", ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৫৮-৬৩ ও ৮৩-৮৭। একজন ভারতীয় লেখক মনে করেন যে, ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বুদ্ধিজীবী নিধনের মূল পরিকল্পনা করেছিল ঢাকাস্থ USAID কর্মকর্তা জ্যাকসন এবং সহযোগিতা করেছিল পাক সেনাবাহিনীর কর্ণেল তাজ, বিগ্রেডিয়ার বশির, কাদের ও হিজাজি ; দ্রষ্টব্য Capt. S. K. Garg (Retd.), *Spotlight : Freedom Fighters of Bangladesh*, Dhaka, 1984, pp. 169-170.

১২. উদ্ধৃত মেজর (অব:) রফিক-উল-ইসলাম, "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ৯৯-১০০।

১৩. উদ্ধৃত, "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", পৃঃ ৯৯।

১৪. স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র এবং এম, এ, হান্নান ও মেজর জিয়ার ঘোষণার জন্যে দ্রষ্টব্য শামসুল হুদা চৌধুরী, "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ২২-৪৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিস্তারিত ভূমিকা নীচে আলোচিত হবে।

১৫. "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", পৃঃ ৯৯।

১৬. ঐ, পৃঃ ১১০। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই প্রবন্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধের স্থান হিসেবে চট্টগ্রামকেই চিহ্নিত করা হয়েছে, ঢাকাকে নয়। কারণ, সময়ানুক্রমের বিচারে চট্টগ্রামে প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ রাত ৮-৩০ মিনিটে ; এবং ঢাকায় রাত ১১-৩০ মিনিটের পর।

১৭. "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিল," [এরপর থেকে "দলিল",] নবম খণ্ড, পৃঃ ১৮।

১৮. ঐ, ৩১।

১৯. ঐ, প্রয়োজনীয় অংশ সমূহ, "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" প্রয়োজনীয় অংশ ; মেজর রফিকুল ইসলাম, "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে", প্রয়োজনীয় অংশ।

২০. Maj Gen. Sukhwant Singh, *The Liberation* of *Bangladesh*, vol. I, New Delhi, 1981, p. 31.

২১. এম আর আখতার মুকুল, "আমি বিজয় দেখেছি", ১৩৯১, পৃঃ ৮৩।

২২. "দলিল", পৃঃ ৪৮৪-৪৮৬।

২৩. "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", পৃঃ ১৮৬-১৮৭।

২৪. ঐ, পৃঃ ১৮৫।

২৫. "দৈনিক বাংলা", ১ জানুয়ারী ১৯৭২।

২৬. মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য শামসুল হুদা চৌধুরী "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", পৃঃ ১৫৯-১৮০।

২৭. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য ও আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য হাসান-উজ্জামান,

"সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও রাজনীতি", সাভার, ঢাকা ; ১৯৮৬, পৃ: ৪০-৫৫।

২৮. A. M. A. Muhith, *Bangladesh : Emergence of a Nation,* Dhaka, 1978, উদ্ধৃত হাসান উজ্জান, পৃঃ ৪৮।

২৯. Talukder Maniruzzaman *The Bangldash Revolution and Its Aftermath*, p. 136.

৩০. ট্রাইবুনালের সামনে কর্নেল তাহেরের জবানবন্দী, "রণাঙ্গন থেকে ফাঁসীর মঞ্চে", ঢাকা, ১৯৭৭, পৃঃ ৯।

৩১. উদ্ধৃত "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে", পৃ: ৬৬। মেজর রফিক-উল-ইসলামের একই ধরনের বক্তব্যের জন্যে দ্রষ্টব্য "রোববার", ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ পৃঃ ৫১।

৩২. "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", পৃঃ ৬৫-৬৬।

৩৩. ঐ, পৃঃ ১৯৩।

৩৪. "রণাঙ্গণ থেকে ফাঁসীর মঞ্চে", পৃঃ ১২-১৩।

৩৫. The *Bangladesh Revolution and Its Aftermath* p. 113.

৩৬. Capt S, K, Garg (Retd), Spotlight : *Freedom, Fighters of Bangladesh,* p. 119. আর একটি হিসাবে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দেড় লাখের মতো দেখানো হয়েছে। দ্রষ্টব্য "আমি বিজয় দেখেছি," পৃঃ ২০২।

৩৭. "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", পৃঃ ১৬৩—১৬৪।

৩৮. শোনা গিয়েছিল, এমনি ধর্ষনের ফলে বাঙালীর ঘরে সাচ্চা মুসলমানের জন্ম হবে। সেই কারণেই কি জামাতে ইসলামী ও তাদের সমর্থক দল এই নারকীয় কর্ম-কাণ্ড সমর্থন করেছিল ?

৩৯. "মুক্তিযুদ্ধে নয়মাস", পৃঃ ৬৭-৬৯।

৪০. "আমি বিজয় দেখেছি", পৃঃ ১৩৫। গেরিলা পদ্ধতির (ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য বিভিন্নতা যে ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত কাদেরিয়া বাহিনী। প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হবে) রণকৌশল। কাদেরিয়া বাহিনী সব সময় সনাতন গেরিলা পদ্ধতিতে আঘাত করে পালিয়ে যাবার নীতি অনুসরণ করেনি। এই বাহিনী বরং একটি নবতর রীতির সংযোজন করেছিল, তা হলো 'সাডেন হিট, স্টে এ্যাণ্ড এ্যাডভান্স',—অতর্কিতে এসে আঘাত হানো, অবস্থান করো ও এগিয়ে যাও। মাঝে মাঝে তাদেরকে সম্মুখ সমরেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। দ্রষ্টব্য "দলিল", নবম খণ্ড, পৃঃ ৬৩৮।

৪১. ঐ, পৃঃ ৬৫১।

৪২. ঐ, পৃঃ ৪৮৯।

৪৩. "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে" পৃঃ ১০৩—১০৪। এই পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধ

পরিচালিত হলে স্বাধীনতা অর্থবহ হতো এবং আজকের যে রাজনৈতিক সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা বোধহয় অনেকটা লঘু হতো।

৪৪. "দলিল", দশমখণ্ড, পৃঃ ৭৯১।
৪৫. "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", পৃঃ ১১৩।
৪৬. "মুক্তিযুদ্ধে নয়মাস", পৃঃ ২৩।
৪৭. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের জন্যে—দ্রষ্টব্য ঐ; এবং "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", পৃঃ ১১৩—১৪৪।
৪৮. "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", পৃঃ ১১৭-১২০, ১৪৬।
৪৯. দ্রষ্টব্য "আমি বিজয় দেখেছি" পৃঃ ১৩৬।
৫০. "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", পৃঃ ৯৬।
৫১. *Spotlight : Freedom Fighters of Bangladesh*, p. 147.
৫২. "দলিল", পৃঃ ৪৯০।
৫৩. "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", পৃঃ ১৫১।
৫৪. *The Liberation of Bangladesh*, vol. 1, pp. 35-36.
৫৫. শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর মাত্র দু'ঘন্টার মধ্যেই হানাদার বাহিনী এলাকাটি পুণর্দখল করে নিয়েছিল। কাজেই মুজিবনগর প্রশাসনকে সুবিধামত মুক্তাঞ্চলে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে মুজিবনগর নামের আর পরিবর্তন হয়নি।
৫৬. মুজিবনগর সরকার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", পৃঃ ৪ ৭১—৯৪।
৫৭. ঐ, পৃঃ ৯১।
৫৮. কাজী জহিরুল কাইউমের বক্তব্য, উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ ২৫২।
৫৯. আলমগীর কবির, 'একাত্তরের ডায়ারী', "মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি", পৃঃ ৪৪।
৬০. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নীচে করা হবে।
৬১. "আমি বিজয় দেখেছি", পৃঃ ১৭০—৭১।
৬২. "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে," পৃঃ ১১৯-১২০। রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও তাদের ঘৃণিত ভূমিকার জন্যে দ্রষ্টব্য, "বিচিত্রা", ১৪ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ২৮ মার্চ, ১৯৮৬।
৬৩. আসাদ চৌধুরী, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ", ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৭৯।
৬৪. "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", পৃঃ ৯৬—৯৯।
৬৫. "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", পৃ: ১১৬।
৬৬. ঐ, পৃঃ ২৪০-২৪৫, "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", পৃঃ ১০০-১০১, "আমি বিজয় দেখেছি", পৃঃ ৩৭-৩৮ ও ১৭০-১৭১।
৬৭. "দলিল", নবম খণ্ড, পৃঃ ৭৩৭-৬৫৫; "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", পৃঃ ১০১-১০২', বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য "মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত", পৃঃ ২৯১-৩০৭, ও "সাপ্তাহিক ছুটি", ২৮ মার্চ ১৯৮৬।

৬৮. "দলিল", নবম খণ্ড, পৃঃ ৬৫৫-৬৭০।

৬৯. ঐ, পৃঃ ৬৭১-৬৭৬।

৭০. ঐ, দশম খণ্ড, পৃঃ ৭৩০-৭৪৭; "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" পৃঃ ২৩৪-২৩৮, ২৬০-২৬৫; "আমি বিজয় দেখেছি", পৃঃ ৩৪-৩৮।

৭১. ঐ, পৃঃ ৭৪৮-৭৫১; "আমি বিজয় দেখেছি", পৃঃ ৩১-৩৩; "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে", পৃঃ ১০৪-১০৫; "মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর", পৃঃ ১০০।

৭২. মোজাফফর আহমদের বিবৃতি, "দৈনিক বাংলা", ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৮৩. Talukder Manirzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftarmth*, Dhaka ; 1980, pp. 141-142.

৭৪. "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়ন", উদ্ধৃত, ঐ, ১৪২।

৭৫. পার্টির মুখপত্র "জনযুদ্ধ", জানুয়ারী ১৯৭৩, উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ১৩৪।

৭৬. শামসুর রহমান, '৭১-এর যশোর মুক্তিযুদ্ধের এক অকথিত অধ্যায়', "বিচিত্রা", ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬।

৭৮. *The Bangladesh Revolution*, pp. 146-'47.

৭৮. Nural Amin, "Role of the Purba Banglar Sarbahara Party in the Liberation War of Bangladesh", *Dhaka University Studies*, vol. 42, No 1, part, A, June 1985, pp. 151-157.

৭৯. "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে", পৃঃ ২৭৭।

৮০. দ্রষ্টব্য "*Spotlight : Freedom Fighters of Bangladesh*, pp. 136-142.

৮১. ঐ, পৃঃ ১৩৯ ও ১৪৩।

৮২. উদ্ধৃত D. R. Manekkar, *Pakistan Cut to Size*, New Dehli, 1972, p. 134.

৮৩. "আমি বিজয় দেখেছি", পৃঃ ২৮৩।

৮৪. উদ্ধৃত *Spotlight : Freedom Figheters of Bangladesh*. p. 137.

পরিশিষ্ট

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের 'আঠারো-উনিশ শতকে কৃষক বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র' প্রবন্ধটির বক্তব্যের অন্তঃসার 'রাজনৈতিক চেতনা' আমি বুঝবার ও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব।

আমাদের বোঝা ও বিশ্লেষণের লক্ষ্য কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা। তিনি হবসবম এবং রনজিত গুহের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। তিনি হবসবমের যে-বইটির উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে *Primitive Rebels*। এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার *Primitlve Rebebls* বইটির বিষয় কৃষক বিদ্রোহ নয়। হবসবমের ভাষায় ঃ

My views on social banditry have been elaborated in a short book, Bandits (London, New York, 1969) in the light of material from a much wider area than that from which the chapter in Primitive Rebels is drawn, but with the minimum of duplication of evidence. This also contains a guide to the literature. Two modifications of substance in my view may be noted. I would now put more stress of the peculiar symbiosis between social banditry and primitive revolutionary (millenarian) movements, both of which tend to flourish in the same areas. The dialectical interplay between the primitive 'reformism' (by direct action) and primitive revolutionism, is evidently complex, though it is significant that where the two coexist, the bandits tend to regard themselves as subordinate to the wider movement or aspiration (p. III, preface to the third edition, 1974).

অর্থাৎ এই বইটির বিষয় নির্দিষ্ট অর্থে কৃষক কিংবা কৃষক বিদ্রোহ নয়।

যে-বিশেষ প্রবন্ধে হবসবম কৃষক এবং রাজনীতির সম্পর্ক আলোচনা করেছেন সেটি প্রকাশিত হয়েছে *The Journal of Peasant Studies* ভল্যুম ১, সংখ্যা-১, অক্টোবর ১৯৭৩। এই প্রবন্ধে তিনি প্রয়াস করেছেন কৃষকদের অ-কৃষকদের থেকে আলাদা করতে, কৃষক পৃথিবীর সাধারণ অধস্তনত্য নির্ণয় করতে, সেইসঙ্গে ক্ষমতার সম্মুখীনতা সোচ্চার করতে, যা-কিনা কৃষকদের রাজনীতির ক্ষেত্র। কৃষকদের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা এবং তাদের অজ্ঞতা তাদের রাজনীতিকে স্থানীয় পর্যায়ে আবদ্ধ করে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন কৃষকদের রাজনীতি

অনির্ণীত স্বগর্মীয় সার্বজনীনতা-ও নয়।

হবসবমের সঙ্গে রনজিত গুহের দূরত্ব যে-ভাবে অধ্যাপক ইসলাম চিহ্নিত করেছেন সেইভাবে রনজিত গুহ হবসবমের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব চিহ্নিত করেন নি। রনজিত গুহের ভাষায় ঃ

The image of the pre-political peasant rebel in societies still to be fully industrialised owes a great deal to E. J. Hobsbawm's pioneering work published over two decades ago. He has written there of 'pre-political people' and 'pre-political populations'. He uses this term again and again to describe a state of supposedly absolute or near absence of political consciousness or organisation which he belives to have been characteristic of such people. Thus, 'the social brigand appears', according to him only before the poor have reached *political consciousness* or acquired *more effective methods of social agitations*, and what he mean by such expressions (emphasized by ie, R. G) is made clear in the next sentence when he says : 'The bandit is a pre-political phenomenon and his strength is in *inverse* proportion to that of *organized revolutionism* and *Socialism* or *Communism*.' In general *'pre-political* people' are defined as those 'who have not yet found, or only begun to find, a specific language in which to express their aspirations about the world' (Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, pp. 5-6, 1983).

হবসবম *bandit* দের *'pre-political phenomenon'* হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের মধ্যে কৃষক অসন্তোষের ঐতিহ্যিক স্বরূপ লক্ষ্য করেছেন, এই স্বরূপে নির্দিষ্ট মতাদর্শ, সংগঠন কিংবা কর্মসূচীর অভাব রয়েছে। এই বক্তব্যকে অধ্যাপক ইসলাম এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : 'ইদানীং দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি গবেষণায় প্রশ্ন উঠছে প্রাক-ধনতান্ত্রিক যুগের কৃষক বিদ্রোহগুলি আদৌ রাজনৈতিক ছিল কি না। এ সন্দেহের প্রধান কারণ রাজনৈতিক চেতনা প্রসংগ। নীতি ও লক্ষ্য বিহীন বিদ্রোহ, হবসবমের ভাষায় রাজনৈতিক চেতনার পূর্বাভাষ মাত্র। হবসবমের অনুকরণে অনেকে এখানকার প্রাক্-ধনতান্ত্রিক কৃষক বিদ্রোহকে প্রাক্-রাজনৈতিক বলে আখ্যায়িত করার পক্ষপাতি। রনজিত গুহ (১৯৮৩) হবসবম এবং তাঁর অনুসারীদের চ্যালেঞ্জ করে অভিমত দেন যে, 'গ্রামীণ মানুষের সশস্ত্র

বিদ্রোহে এমন কোন উপাদান নেই যা রাজনৈতিক নয়। বক্ষ্যমান গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে হবসবমের বক্তব্য রনজিত গুহ যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যা অধ্যাপক ইসলাম গ্রহণ করেন নি। সেজন্য অধ্যাপক ইসলামের ব্যাখ্যা তাঁর নিজস্ব, হবসবমের নয়, রনজিত গুহেরও নয়।

কৃষকের রাজনৈতিক চেতনা এবং শ্রেণী-শক্তি সম্বন্ধে জাগ্রত বোধের প্রক্রিয়াকে কি ভাবে বিশ্লেষণ করব? হামজা আলাভীর ভাষায়ঃ

The Historical processes by which a class-in-itself is transformed into a class-for itself are complex and are mediated by a variety of factors, including influences of pre-existing forms of social organisation and institutions which embody primordial loyalties, such as those of kinship or ethnic identity etc ; this is especially true in peasant societies, furthermore, given an hiererchical social order in peasant societies, the absence of horizontal political cleavages along class lines implies the existence of vertical cleavages which cut across class lines. Questions therefore arise about the conditions in which the peasant is obliged to submit, as well as those about conditions in which he has the ability to rebel ('Peasant Classes and Primordial Loyalties', *The Journal of Peasant Studies* Vol. 1. No. Oct 1973, p.29).

কৃষকের চেতনা এবং কৃষকের শ্রেণী শক্তির এই সমস্যাকেই রনজিত গুহ বুঝতে চেয়েছেন 'On Some Aspects of the Historiography of Colonial India' (*Subaltern Studies* 1) এবং: The Prose of Counter-Insurgency (*Subaltern Studies* 11) দুটি প্রবন্ধে এবং *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* গ্রন্থে।

অধ্যাপক ইসলাম রনজিত গুহের বক্তব্য সম্বন্ধে বলছেনঃ 'গতানুগতিক তথ্যের উপর গুহের আ স্থা নেই। তিনি প্রাপ্ত তথ্যের উল্টো অর্থ করে সত্যে পেঁছাতে চান। তিনি মনে করেন যে, আয়নায় যেমন বস্তুর প্রতিচ্ছবি উল্টোভাবে প্রতিফলিত হয়, তেমনি ঔপনিবেশিক শাসক-চক্রের দলিলে কৃষক বিদ্রোহ উল্টোভাবে বিধৃত হয়েছে, অতএব কৃষকেরা কি ভাবে তাদের 'গ্রামীণ বিশ্বকে উল্টিয়ে দিতে চেয়েছে তা জানতে হলে ঐ দলিলগুলোকেও অবশ্যি উল্টিয়ে দিতে হবে। ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য 'দলিল উল্টানোর' প্রস্তাব অবৈজ্ঞানিক, এবং সে কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।' রনজিত গুহের নিজের ভাষায়ঃ 'The corpus of historical writings on peasant insurgency in colonial India is

made up of three types of discourse. These may be described a primary, secondary and tertiary according to the order of their appearance in time and their filiation. Each of these is differentiated from the other two by the degree of its formal and/or acknowledged (as opposed to real and/or tacit) identification with an official point of view, by the measure of its distance from the event to which it refers, and by the ratio of the distributive and integrative components in its narrative' ('The Prose of Counter Insurgency'; p.3). তিনি আরো বলছেন: The specificity of a rural insurrection is expressed in terms of many other contradictions as well. These too are missed out, blinded by the glare of a perfect and immaculate consciousness the historian sees nothing, for instance, but solidarity in rebel behaviour and fails to notice its Other, namely, betrayal. Committed inflexibly to the notion of insurgency as a generalised movement, he underestimates the power of the brakes put on it by localism and territoriality. Convinced that mobilization for a rural uprising flows exclusively from an overall elite authority, he tends to disregard the operation of many other anthorities within the primordial relations of a rural community' (ঐ, পৃঃ ৩৯-৪০)। মনে হচ্ছে অধ্যাপক ইসলাম খুব সরলভাবে রনজিত গুহের Domination Subordination-Resistance তত্ত্ব বুঝতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ইরফান হাবীবের সাবঅলটার্ণ স্কলারদের সম্বন্ধে সমালোচনা স্মরণযোগ্য: 'While the Subaltern scholars have given is a number of interesting facts, partly anthropological and partly political, their endeavours all the time suffer from a curious mystical belief in the virtue of an externally untainted movement of any segment of the non-elites' (*Theories of Social Change in South Asia*, p. 21. 1986). রনজিত গুহের বক্তব্যে এক ধরনের 'রেটরিকসের' ঝোঁক আছে, যেমন: দলিল উল্টে পড়া ইত্যাদি। ষ্টাইল বক্তব্য নয়, সরল করে বুঝতে গেলে তত্ত্বের configuertaion ধরা যায় না। অধ্যাপক ইসলাম সরলভাবে বুঝতে গেছেন, সেজন্য সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সরল সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষের বক্তব্য-ও বিকৃত হয়ে যায়, অধ্যাপক ইসলাম হয়তো এটা মানেন না।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

লেখক পরিচিতি

ডঃ সিরাজুল ইসলাম	অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রী রতনলাল চক্রবর্তী	সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ ভেলাম ফন স্কেন্ডেল	সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ইরাসমাস বিশ্ববিদ্যালয়, রটারডাম, হল্যান্ড
ডঃ মঈনুদ্দীন আহামদ খান	অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ বিনয় ভূষণ চৌধুরী	অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর	অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ চিত্তব্রত পালিত	অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ মুনতাসীর মামুন	সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রী পূর্ণেন্দু দস্তিদার	চটগ্রামের প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন মামলার অন্যতম আসামী
কমরেড অজয় ভট্টাচার্য	কৃষক সংগঠক ও কমিউনিস্ট নেতা, সিলেটের নানকার বিদ্রোহের সংগঠক
কমরেড মণি সিংহ	সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
ডঃ কামাল সিদ্দিকী	অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং, চীন
জনাব মেসবাহ কামাল	প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শব্দসূচী